বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

১৭৬৫ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ

দ্বিতীয় খণ্ড

কাবেদুল ইসলাম

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

উৎসর্গ

মিসেস পারভীন ইসলাম শিমু

মুখবন্ধ

গবেষণা আমার কাছে একধরনের প্রত্ন-খনন এবং সেই সূত্রে পুনর্নির্মাণও বটে। ফলে এ বিষয়ে যা বলার তা এই বইয়েই বলেছি। এর আগের দুটো খণ্ডেও যৎসামান্য প্রাক্‌কথনের চেষ্টা যেহেতু করেছি, সুতরাং এখানে তার বিস্তৃতি অনর্থক মনে করি। তথাপি কারও কারও অপরিমেয় ঋণ স্বীকারের জন্য যেটুকু না লিখলেই নয়—

১.১ আগের মতোই এটা লিখতে গিয়েও পূর্বসূরি কীর্তিমান লেখক-ঐতিহাসিকদের রচনার প্রভূত সহযোগিতা নিয়েছি। প্রায়শই তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছি, কোথাও হয়তো করিনি (এর পরিমাণ নিতান্তই কম), এজন্য এঁদের ঋণ আমি অকুণ্ঠচিত্তে ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি।

১.২ প্রকাশনার এই চড়া, ব্যয়বহুল বাজারে 'মাওলা ব্রাদার্স' আবারও তাদের উদার হাত আমার প্রতি প্রসারিত করেছে। এর জন্য, এককথায় দেশের এই অন্যতম সেরা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং এর কর্ণধার জনাব আহমেদ মাহমুদুল হক ভাইয়ের বদান্যতা প্রশংসার্হ। তিনি আরেকবার আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন।

১.৩ বইটি উৎসর্গ করেছি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী মিসেস পারভীন ইসলাম শিমু-কে। তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, সে বিষয়ে অধিক বলা, অন্তত এক্ষেত্রে অভব্যতা হবে। তবু বলবো, দিনের-পর-দিন এটা রচনা করতে গিয়ে আমার কাছে তাঁর প্রাপ্য সময় থেকে যেভাবে তাঁকে বঞ্চিত করেছি, এটা উৎসর্গ করে তার কিছুটা হলেও শোধ করার চেষ্টা করলাম মাত্র।

১.৪ কোনো প্রকার গবেষণা-নির্দেশক ছাড়াই, বিগত প্রায় ৯ বছর ধরে বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ওপর কাজ করছি। এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৪ খণ্ডে প্রায় ১৫শ' পৃষ্ঠারও বেশি লিখে ফেলেছি। জানি না কতটোকু, কী-করতে পেরেছি? তবে ইন্‌শা'আল্লাহ্, ৪র্থ তথা শেষ খণ্ড (এর পাণ্ডুলিপিও প্রায় প্রস্তুত) প্রকাশিত হলেই নিজের পরিশ্রম সার্থক বোধ করবো।

১.৫ পরিশেষে সকল ধরনের ভুলভ্রান্তি—তত্ত্ব ও তথ্যগত, ভাষিক ও বাক্য-গঠনের, পরিবেশনা বা উপস্থাপনার, এবং মুদ্রণপ্রমাদের জন্য পাঠককুলের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

কাবেদুল ইসলাম

সূচিপত্র

পটভূমিকা

বাংলায় ইংরেজ অধিকারের আদিপর্ব

অষ্ট্য-মধ্য বাংলার ইতিহাসে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল। একদিকে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি মেজর হেক্টর মনরোর নেতৃত্বাধীন সৈন্যদের কাছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব[১] মিরকাশিম ও তদীয় মিত্রবর্গের অন্যতম সদস্য মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়, অন্যদিকে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছত্রচ্ছায়ায় ভারতবর্ষে ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয় এবং পরের বছর এলাহাবাদে অবস্থিত মোগল সম্রাটের কাছ থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা 'পেশকাশে'র বিনিময়ে কোম্পানির বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানি লাভ (১২ই আগস্ট, ১৭৬৫) নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পলাশির যুদ্ধের সঙ্গে যদি বক্সারের যুদ্ধের ফলাফলের ঐতিহাসিক ও সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, 'The battle of Plassey was hardly more than a mere skirmish, but its result was more important than that of many of the greatest battles of the world. It paved the way for the British conquest of Bengal and eventually of the whole of India.'[২] অন্যদিকে বক্সারের যুদ্ধের ফলে, Dr. V. A. Smith-এর ভাষায় বলা যায়, 'Plassey was a cannonade but Baksar a decisive battle. It was this battle, the culmination of an obstinate campaign, which determined the British mastery of Bengal. Hitherto they had been rivals and manipulators of existing authority; their power was fortuitous and hedged with doubt; the issue was still open

---

১. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, '১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মীরকাশিমকে স্বাধীন নবাব বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।' (বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৪)। কারণ এই সময়ের আগে তিনি অনেকটাই ইংরেজদের নানামুখী চাপের মধ্যে ছিলেন। তবে এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, 'As soon as Mir Qasim was installed to the masnad, he began to behave as an all powerful person.' (The Career of Rajah DurlabhRam Mahindra [Rai-Durlabh] : Diwan of Bengal, 1710-1770, Dr. Subhas Chandra Mukhopadhyay, pp. 142).

২. An Advanced History of India, Three Drs., pp. 657. কে. এম. পানিক্করও মন্তব্য করেন, 'Plassey, unimportant as a battle, was important politically, as the Company became the zamindar of 24-Parganas, ... and became also the king-maker in Bengal.' (A Survey of Indian History, pp. 216).

It was now unchallenged and about to receive imperial recognition; henceforth its full extent was only partly concealed for a time by surviving legal fictions. Plassey marked the beginning of the British expansion in Bengal; Baksar determined the success of the enterprise."[৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পলাশির প্রান্তরে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার স্বাধীনতার যে সূর্য অস্তমিত হয় তার স্থায়ী সমাধি রচিত হয়েছিল গঙ্গার পূর্ব তীরে বক্সারে। নবাব মিরকাশিমের মৃত্যুর পর ইংরেজরা পুনরায় ভূতপূর্ব নবাব মিরজাফর আলি খানকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসায়, যদিও তাঁর এই পর্যায়ের শাসনও খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি (১৭৬৩--৬৫)। তাঁর বার্ধক্যজনিত মৃত্যুর পর (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৫) মাত্র ১৭/১৮ বছর[৪] বয়েসে তদীয় পুত্র নাজিম-উদ-দৌলা নবাবি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই অত্যন্ত তরুণ, অনভিজ্ঞ ও দুর্বল নবাবের আমলে ক্লাইভের সুচতুর পরিচালনায় ইংরেজ শক্তি বলা যায় চতুর্পাশ থেকে বাংলাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল -- বাংলার রাজনীতি, প্রশাসন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হওয়া শুরু হয়েছিল তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অঙ্গুলি হেলনে। তথাপি বাংলার নিস্তরঙ্গ সমাজ জীবনে বিশেষ করে আপামর জনমণ্ডলীর মাঝে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কোম্পানির প্রয়োজন ছিল দিল্লির সম্রাটের স্বীকৃতি (মোগল রাজশক্তি এ সময় যথেষ্ট নিস্তেজ ও প্রায় বিধ্বস্ত হলেও তার সম্রাটের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা সনদ-এর গুরুত্ব ও কদর তখনও নিতান্ত কম ছিল না)। বাদশাহকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা/ রাজস্ব 'কড়ারে' ক্লাইভ সেটাই হাসিল করলেন; কোম্পানি পেলো এদেশে রাজত্ব করার মহার্ঘ সুযোগ। এখানে একটা জিনিস বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে কোম্পানি ১২ই আগস্ট, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহি ফরমান বলে বাংলার নবাবি বা সুবাদারি আদৌ লাভ করেনি, করেছিল দিওয়ানি অর্থাৎ এই তিন প্রদেশের ভূমিরাজস্ব ও সায়েরসহ অন্যান্য কর আদায়ের রাজকীয় অনুমোদন। স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টেও বলা হয়েছে: 'By the agreement of August 1765, the Company obtained the Dewani of Bengal, Bihar and Orissa, in return for an annual payment of 26 lakhs to the Emperor Shah Alam. This meant that the Company became the representative of the Central Government and acquired the right to collect the revenue from those provinces, though the executive and judicial administration remained in the hands of the Nawab."[৫]

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য নাগাদ ভাগ্যান্বেষী কতিপয় দরিদ্র ইংরেজ এদেশে এসেছিল বাণিজ্য ব্যপদেশে, বিপুল ধনসম্পদ ও নৈসর্গিক ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ বাংলায় এসে দু'পয়সা কামাই করে 'গরিবি' হটানোই ছিল তাদের লক্ষ্য। কিন্তু মাত্র এক শতকের ব্যবধানে এদেশের রাজন্যবর্গের

৩. The Oxford History of India, pp. 471-72.

৪ Diwani in Bengal, 1765 (Career of Nawab Najm-ud-Daula), Dr. Subhas Chandra Mukhopadhyay, pp. 20.
অবশ্য এঁর মসনদে আরোহণের বয়স নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সকলেই স্বীকার করেন তা ১৫ থেকে ২০ এর ভিতর ।

৫ Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. I., pp. 2 .

করুণাপ্রার্থী বণিকহস্ত[৬] শেষ পর্যন্ত রাজদণ্ড ধারণের অধিকারী হয়। হয়তো এই এক শতাব্দীর ইতিহাসের কোন এক শুভক্ষণে ভাগ্যদেবীর কৃপাভিলাষী বণিকের মনের গোপনে প্রদেশের রাজক্ষমতা গ্রহণের দুরভিসন্ধি সংশয়ে হলেও উঁকি দিয়েছিল। সম্ভবত সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল তাদের সেই স্বপ্ন-সাধ পূরণের মহাপরিকল্পনা। তখন থেকেই তারা একের পর এক এদেশে বসতি স্থাপনের নামে জমি ক্রয় করেছে, কুঠি ও দুর্গ নির্মাণে হাত দিয়েছে, ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছে, আবার তার দুর্বলতার সুযোগে ফুঁসে উঠতেও কসুর করেনি। উল্লেখ্য ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তৎকালীন মোগল সুবাদার শাহসুজার সনদ পেয়েই তাদের বাণিজ্যযাত্রা শুরু হয়েছিল; একইভাবে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ং মোগল সম্রাট শাহআলমের সনদ লাভের মধ্য দিয়েই তাদের সেই বাণিজ্যাভিসারের নিশাবসান ও রাজকীয় প্রভুত্বের সূচনা হয়। ফলত এ সব কিছুই ছিল এক ধারাবাহিক প্রকাশ্য-গোপন কার্যক্রমের ফল (অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে), এ কথা না বললেও চলে । ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম বলেন, '১৬৫১ সনে শাহ সুজা ইংরেজদের সুযোগ সুবিধা দিয়া যে সনদ দান করেন তাহারই শেষ পরিণতি ১৭৬৫ সনের দিউয়ানী সনদ। এই শত বৎসর ব্যবধানে অনেক সংঘর্ষ, অনেক যুদ্ধ, অনেক চুক্তি, অনেক ষড়যন্ত্র ও হঠকারিতা হইয়াছে। সব ঘটনার লক্ষ্য ছিল একই -- এদেশে কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তার।'[৭] খ্রিস্টাব্দ ১৭৬৫ তাই বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের যুগ পরিক্রমায় এক মহাসন্ধিক্ষণ কাল।

যা হোক এখন বাংলায় ইংরেজদের আগমন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনুমোদন থেকে শুরু করে সময়ে সময়ে তাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা ও স্থানীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং সবশেষে দিওয়ানি লাভের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ক্ষমতার প্রভুত্ব অর্জনের ধারাবাহিক ইতিহাস কিছুটা তুলে ধরা জরুরি মনে করি, তা না হলে এই একশত বছরে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশে ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপকভিত্তিক নানা নীতি, পদ্ধতি ও পরিকল্পনার সামগ্রিক স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে না। তবে অবশ্যই স্বীকার্য যে এখানে মূলত অর্থনৈতিক, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কিত ইতিহাসই আলোচনা করা হবে এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাসের যেটুকু বিবৃত না করলেই নয় তার কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। বস্তুত এই অংশের আলোচনা হবে তাই উইলিয়াম কেরী'র ভাষায়, 'half political, half commercial.'[৮]

আগেই বলেছি ইংরেজরা এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে। ভারতবর্ষে তাদের প্রথম পদার্পণ ঘটে সুরাটে। ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় এই সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দিয়ে বিদেশ থেকে প্রধানত সোনা, রূপা, লোহা, টিন, কাঁচ, তামা, ঘোড়া, বাদাম, পারদ, গোলাপ জল, খেজুর, সিরাজি মদ প্রভৃতি

---

৬. ইংরেজ বণিকরা যে পুরোপুরি নবাব-বাদশাহদের করুণার ওপর নির্ভরশীল ছিল তা সমকালীন প্রখ্যাত ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা C. R. Wilson-এর ততোধিক বিখ্যাত পুস্তক The Early Annals of the English in Bengal, Vol.I., (Contents)-এর একটি শিরোনাম থেকেও জানা যায়, যা এ রকম --'How the English came to Bengal, for purely commercial purpose, Relying on the Goodwill and protection of the Native Government'.

৭. বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৭৭।

৮. The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I., pp. 6.

আমদানি করা হত।[৯] তেমনিভাবে রপ্তানি হত অন্যান্য ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর মধ্যে বাংলার জগদ্বিখ্যাত সুতিবস্ত্র মসলিন, রেশম, চিনি, চাল ইত্যাদি। এই বন্দরে তাই বিদেশি বিশেষ করে ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসি, ইংরেজ বণিকদের সার্বক্ষণিক ভিড় লেগেই থাকত। ব্যবসায়িক স্বার্থ দেখাশুনা ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রত্যেকেই এখানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেছিল। ইংরেজ বণিকদের সংস্থা ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরও প্রথম বাণিজ্য কুঠি নির্মিত হয়েছিল সুরাটেই (১৬১৩)।[১০] এরপর অবশ্য তারা মুসলিপট্টম, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানেও কুঠি স্থাপন করেছিল। সুরাটের দু'দশক পর ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাংলার সঙ্গে তারা পরীক্ষামূলকভাবে বাণিজ্য শুরু করেছিল। ঐ বছর তারা ওড়িশার উপকূলে বালেশ্বর (বালাশোর) ও হরিহরপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করত ব্যবসায় শুরু করেছিল।[১১] কিন্তু সত্যি বলতে পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ বণিকদের শত্রুতা ও আরাকানি মগ জলদস্যুদের অত্যাচার ও আরও কিছু কারণে তারা সেখানে স্থল বাণিজ্যে সুবিধা করে উঠতে ব্যর্থ হয়। নীতি নির্ধারক পর্যায়ে বেশ কয়েকবার তাদের বাণিজ্য বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল।[১২] তা সত্ত্বেও বোধগম্য কারণে কোম্পানি বাংলায় ব্যবসায় করার আশা পুরোপুরি ত্যাগ করেনি। C. R. Wilson-এর ভাষায়, 'the agent and factors at Fort St. George were forced to look abroad in the hope of discovering new openings for commercial enterprise.'[১৩]

১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি নবোদ্যমে বাংলায় বাণিজ্য চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরের বছর ক্যাপ্টেন জন ব্রুকহ্যাভেন-এর নেতৃত্বে তারা হুগলিতে একটি কুঠি স্থাপন করে।[১৪] প্রসঙ্গত এখানে একটি আপাতসরল কিন্তু ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনার উল্লেখ করা দরকার।

অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিক স্বীকার করেন যে, ডাঃ গ্যাব্রিয়েল বাউটন নামীয় একজন ইংরেজ চিকিৎসক ('হোপওয়েল' নামক জাহাজের সার্জন) মোগল সম্রাট শাহজাহানের জনৈকা অগ্নিদগ্ধা কন্যা (মতান্তরে নিকটাত্মীয়া)-কে চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ মুক্ত করে সম্রাটের সন্তুষ্টি

---

৯ সমুদ্রের সন্নিকটে তপতী (Tuptee) নদীর তীরবর্তী ভারতের এই বন্দরের প্রসিদ্ধি সেই প্রাচীনকাল থেকে। প্রায় সকল ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন ঘটে এই পথে। Walter Hamilton তাঁর 'East-India Gazetteer ..' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'After the discovery of the passage to the East by the Cape of Good Hope, it was much frequented by vessels belonging to European nations, who exported from hence pearls, diamonds, ambergris, civet, musk, gold, silks and cottons of every description, spices, fragrant woods, indigo, saltpetre, and other objects of Indian traffic.' (pp. 609-10).

১০. বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ড. সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪; The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I., pp. 10.

১১. The Cambridge History of India, Vol V., H. H. Dodwell (Ed.), pp. 88; The Agrarian Policy of the British in Bengal, Dr. Subhas Chandra Mukhopadhyay, pp. 2.

১২. বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃষ্ঠা ৫।

১৩. The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I., pp. 23.

১৪. অবশ্য কোম্পানিকে এখানে ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকেই বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। দেখুন, East-India Gazetteer, pp. 663.

অর্জন করেছিল। সম্ভবত এটা ছিল ১৬৩৬ সালের দিককার ঘটনা। মহানুভব সম্রাট 'তাকে' স্বীয় সাম্রাজ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[১৫] উইলিয়ম কেরীও এ কথা স্বীকার করেছেন, 'This he *(Mr. Gabriel Boughton)* did with such success that the imperial favors were liberally bestowed upon him, and in particular he obtained a patent, permitting **him** to trade, without paying any duties, throughout the Emperor's dominions.'[১৬]

এই সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র শাহসুজা। বাউটন সুবাদারের মহিয়সীরও চিকিৎসা করে সুখ্যাতি[১৭] এবং সুবাদারের সুনজর -- দুই-ই কাড়তে সমর্থ হয়েছিলেন (১৬৪৫)।[১৮] তারই অনুরোধ ও প্ররোচনায় ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা, বাউটনসহ ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বার্ষিক মাত্র ৩,০০০ টাকার শুল্কে (একে 'পেশকাশ' বা নজরানা বলাই শ্রেয়) বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি দেন।[১৯] অবশ্য ইতোমধ্যে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দের দিকে কোম্পানি জন ব্রিজম্যান[২০] ও এডওয়ার্ড স্টিফেন্স-এর নেতৃত্বে হুগলিতে কুঠি স্থাপন করেছিল, যা আগেই উল্লেখ করে হয়েছে। সুজা ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশায় বাণিজ্য করার জন্যে কোম্পানিকে এই সুবিধা দেন।[২১] তবে এখানে উল্লেখ করার বিষয় যেটা তা হল, ডাঃ বাউটন ব্যক্তিগতভাবে সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে গোটা মোগল সাম্রাজ্যব্যাপী বাণিজ্য করার যে অনুমতি লাভ করেছিলেন, যা কেরী'র বক্তব্য থেকেও স্পষ্টত প্রমাণিত, সেটাকে তারা পরবর্তীকালে অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোম্পানির তথা সমষ্টির কাজে লাগিয়েছিল। শাহসুজা-উত্তর বাংলার পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক সুবাদার-নবাবের সঙ্গে তাদের একটা ব্যাপারে প্রায় স্থায়ী বিরোধ লেগে ছিল যে, দিল্লির সম্রাটের প্রদত্ত বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকারের প্রতি সুবাদার ও নবাবরা কখনোই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। বরং নবাবরা সর্বদাই বাণিজ্যের জন্যে ইংরেজদের কাছে নিয়মিত শুল্ক বা কর দাবি করেছেন। এ নিয়ে সময়ে সময়ে উভয়পক্ষে বিরোধ-মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, হয়েছে ছোটখাট সংঘর্ষও। কিন্তু সত্য এই যে, ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা স্বয়ং বাউটনও কখনো সম্রাটের সেই তথাকথিত লিখিত 'ফরমান' দেখাতে পারেননি। তাদের বরাবর দাবি ছিল,

১৫. The Good Old Days of Honourable John Company, pp. 15; Modern India and the Indians, Sir Monier Monier-Williams, pp. 268; British India, R. W. Fraser, pp. 39.
William Hunter এটিকে ১৬৪৫ সালের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন, A Brief History of the Indian Peoples, pp. 172.

১৬. The Good Old Days of Honourable John Company, pp. 15.

১৭ Ibid., pp 15.

১৮. A Comprehensive History of India, Ed. by Drs. Anil Chandra Banerjee & D. K. Ghose, Vol. IX., pp. 568.

১৯. The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I., pp. 27.

২০. ড. মাজহারুল হক তাকে 'founder of the first factory in Bengal' বলে আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন, The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, 1698—1784, Dr. Mazharul Huq, pp. 7.

২১. The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 2

এটি ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে ওয়েলডিগ্রেভ বাংলা থেকে মদ্রাজ যাবার সময়ে নদীপথে হারিয়ে ফেলেছিলেন।[২২] অথচ সম্রাট শাহজাহান এই জাতীয় কোন লিখিত ফরমান আদৌ দিয়েছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকে সঙ্গত কারণেই সন্দেহ পোষণ করেছেন। ড. মাজহারুল হক বলেন, 'There is considerable doubt whether any farman for Bengal trade was at all obtained from Emperor Shah Jahan in 1634?'[২৩] ড. সুশীল চৌধুরী তো একে আজগুবি গল্প বলেই উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'the English claim of duty-free trade was only a myth hardly based on any legal or valid imperial sanction behind it.'[২৪]

যা হোক ব্যক্তিগতভাবে যে সুবিধা পেয়েছিল কোম্পানির বেতনভোগী সামান্য একজন কর্মচারী, সেটাকেই একান্ত দুরভিসন্ধিমূলকভাবে ইংরেজরা সমষ্টির কাজে ও স্বার্থে লাগাতে চেয়েছিল; যে কারণে পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মোগল সম্রাটদের প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন সময়ে নানা ছলে-বলে-কৌশলে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার স্বার্থান্বেষী কর্মচারী ও এজেন্টরা বাংলার স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রায় গোটাটাই একটা বৈরিতা ও অস্থিরতার ভাব জিইয়ে রেখেছিল। বস্তুত কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না থাকলে এটা কখনোই সম্ভব হতো না, অন্তত অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলো যে ক্ষেত্রে শক্তিতে তাদের চেয়ে এগিয়ে থেকেও এই জাতীয় কোন পদক্ষেপ নেয়নি বা নিতে সাহসী হয়নি।

হুগলির পর কোম্পানির লোকজন কাশিমবাজারেও একটি কুঠি নির্মাণ করেছিল (১৬৫৮)। এ সময়ে তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ৭,০০০ পাউন্ড (১৬৫২) থেকে বেড়ে ২৩,০০০ পাউন্ডে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২৫] প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, দিল্লির মসনদেও এই সময় ক্ষমতার একটি বড় ধরনের পালাবদল ঘটেছিল। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর সম্রাট শাহজাহান দিল্লিতে মারাত্মক অসুস্থতায় শয্যাশায়ী হন। তাঁর অবস্থা এতটা সঙ্গিন হয়ে পড়েছিল যে প্রায় প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছিল সম্রাট মৃত্যুবরণ করেছেন।[২৬] অচিরেই তাঁকে আগ্রায় স্থানান্তর করা হয় (১৮ই অক্টোবর)। ইত্যবসরে ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি চলে যায় জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোব হাতে। অন্তর্বালে তিনিই তখন সম্রাটের নামে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেছিলেন। স্বভাবতই সুনির্দিষ্ট মোগল উত্তরাধিকার-নীতির অবর্তমানে মুমূর্ষু সম্রাটের জীবিত পুত্রদের মধ্যে চিরাচরিত ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যা হোক, এতে শেষ পর্যন্ত সম্রাটের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব আলমগীর জয়ী হন এবং দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন (৫ই জুন, ১৬৫৯)। কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায়ও সুবাদারের বদল ঘটে। নতুন সুবাদার নিযুক্ত হলেন মিরজুমলা। আওরঙ্গজেবের ইঙ্গিতে মিরজুমলা ভূতপূর্ব সুবাদার শাহজাদা সুজাকে বাংলা রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। সুজা অতঃপর আরাকানে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই আরাকানিদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। নতুন সুবাদার মিরজুমলা, ইংরেজদেরকে তদীয় পূর্বসূরী প্রদত্ত বিনা শুল্কে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার

২২ The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 2.

২৩ The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal pp. 4.

২৪. Trade and Commercial Organisation in Bengal, 1650--1720, pp. 28.

২৫. মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৬৪।

২৬. Aurangzeb and His Times, Dr. Zahiruddin Faruki, pp 49

সুবিধা প্রদানে অস্বীকার করেন। এক্ষণে বাণিজ্য শুল্ক পরিশোধে ইংরেজদের গড়িমসির কারণে তাঁর আদেশে হুগলির ফৌজদার রাজমহলের নিকটে ইংরেজদের সোরা (saltpetre) বোঝাই কয়েকটি নৌকা আটক করেন। পাল্টা ব্যবস্থা হিশেবে ইংরেজরাও ক্ষতিপূরণের দাবিতে ফৌজদারের একটি নৌকা আটক করে (১৬৬১)। পরাক্রমশালী মোগল সুবাদার মিরজুমলা এতে ক্ষুব্ধ হন। তিনি আটক নৌকা ফেরতসহ ইংরেজদের কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দেন, সেই সঙ্গে তাদের সমস্ত ছোট-বড় কুঠি ধ্বংস এবং বাংলা মুলুক থেকে বহিষ্কারের হুমকিও প্রদান করেন। ফলত উপায়ান্তর না দেখে মাদ্রাজস্থ কোম্পানির মূল কর্ণধারদের পরামর্শে তারা ক্ষমা চায় ও নৌকা ফেরত দেয়। মিরজুমলা তাদের ক্ষমা করেন।[২৭]

১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে মিরজুমলা ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পর আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশায় একে একে সুবাদার নিযুক্ত হলেন যারা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শায়েস্তা খান (প্রথমবার ১৬৬২--১৬৭৭ ও দ্বিতীয়বার ১৬৭৯--১৬৮৯), ইব্রাহিম খান (১৬৮৯--১৬৯৭) ও সম্রাট-পৌত্র আজিম-উদ-দীন ওরফে আজিম-উশ-শান (১৬৯৭--১৭১২) প্রমুখ। এঁদের মধ্যে শায়েস্তা খান, বাণিজ্য শুল্ক প্রদানে অস্বীকৃতি ও বাংলা, বিহার ও ওড়িশার যত্রতত্র বিনানুমতিতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন (ঢাকায় ১৬৬৮, মালদহে ১৬৭১/১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রভৃতি) সংক্রান্ত বাদানুবাদে ইংরেজদেরকে চরমভাবে হেনস্থা করেন। অবশ্য এ সময় ইংরেজদের ব্যবসায়ও বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে যেখানে তাদের মোট নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৩,০০০ পাউন্ড, সেখানে ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে তা -- ১,০০,০০০ পাউন্ড, ১৬৭৯-তে ১,১০,০০০, ১৬৮০-তে ১,৫০,০০০, ১৬৮১-তে ২,৩০,০০০ পাউন্ডে উন্নীত হয়েছিল।[২৮] সামগ্রিকার্থে কোম্পানির এই ক্রমোন্নতির কথা ইংরেজ ঐতিহাসিক Sir William Foster-ও স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'The East India Company now entered upon a period of great commercial prosperity, ... in the main a satisfactory rate of dividend was maintained, and in 1682 the Company was able not only to pay 50 per cent. in money but also to declare a bonus of double that figure, crediting each share holder with the half-payment still due on the original subscription.'[২৯] কোম্পানির এই রমরমা অবস্থায়ও এরা পূর্বের মতো বাংলার সুবাদারকে বার্ষিক মাত্র ৩,০০০ টাকাই শুল্ক দিতো এবং সময়ে সময়ে সেটাও দিতে অস্বীকার করতো।[৩০] এতে করে স্বাভাবিক কারণেই প্রদেশের সায়ের শুল্ক বাবদ রাজস্ব আয় কম হতো। অথচ কেন্দ্রে সরকারকে নিয়মিত ভূমিরাজস্বের বাইরেও প্রচুর অর্থ পাঠাতে হতো। শায়েস্তা খান তাই ইংরেজদের ওপর শুল্ক বৃদ্ধির জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। উল্লেখ্য সম্রাট আওরঙ্গজেবও কোম্পানির এই রাজস্ব ফাঁকির কথা জানতে পারেন। তিনি সাম্রাজ্যব্যাপী সকল বণিকগোষ্ঠীর জন্য সম- ও ন্যায্য হারে শুল্ক ধার্যের আদেশ দেন। তাঁর আদেশে নতুনভাবে

---

২৭. The Life of Mir Jumla: The General of Aurangzeb, Dr. Jagadish Narayan Sarkar, pp.

২৮ The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 10.

২৯. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 96.

৩০. বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৮১।

ইংরেজদের ওপর পণ্য দ্রব্যের শতকরা সোয়া ৩ টাকা হারে শুল্কারোপ করা হলো।[৩১]
এর ফলে কোম্পানির অসৎ কর্মচারীদের শুল্ক ফাঁকি দেয়ার নতুন প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য কড়াকড়িভাবে শুল্ক আদায়ের নামে দিওয়ানের কর্মচারীরাও যে ইংরেজদের ওপর দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেনি তা নয়। এতে অতিষ্ঠ হয়ে হুগলিস্থ কোম্পানির এজেন্ট মিঃ উইলিয়ম হেজ শায়েস্তা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে (১৬৮২) শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীদের অন্যায় আচরণের প্রতিকার প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ঢাকায় বসে[৩২] দূরবর্তী হুগলি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজস্ব কর্মচারীদের অন্যায় দাপট নির্মূল করা নবাবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে কোম্পানি তখন নিজেদের স্থানীয় সমরশক্তি বাড়ানোব উদ্যোগ নেয় ও ইংল্যান্ডে পত্র চালাচালি শুরু করে। এরই এক পর্যায়ে ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিলাত থেকে কয়েকটি রণপোত বাংলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, বাংলার সুবাদার তথা মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে এ যাবৎ এটাই ছিল ইংরেজদের প্রেরিত সর্ববৃহৎ যুদ্ধজাহাজের যাত্রা -- 'They despatched a large fleet – the largest which they had yet employed in the Indian seas—against Bengal.'[৩৩]
তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল চট্টগ্রাম।[৩৪] এখানে আরও উল্লেখ্য, এই সময়ে ভিতরে ভিতরে ইংরেজদের শক্তি ও সাহস যে যথেষ্ট বেড়েছিল তা Wilson-এর এ উক্তি থেকেই টের পাওয়া যাবে: 'The men who in 1661 apologised for seizing a small boat, in 1685 waged open war upon the Mogul, capturing his (Shayista Khan) ships and burning his ports.'[৩৫]
যা হোক কোম্পানির এই যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ গুপ্তচর মাধ্যমে শায়েস্তা খান আগেই পেয়েছিলেন। তিনিও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন এবং ইংরেজদের বাংলা থেকে বিতাড়নের প্রতিজ্ঞা করলেন। তবে ইতোমধ্যে আকস্মিক এক ঘটনায় উভয়পক্ষে ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর হুগলির রাজপথে মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজরা হুগলির ফৌজদার আবদুল গনিকে যুদ্ধে কোনঠাসা করলেও শেষ পর্যন্ত শায়েস্তা খানের প্রেরিত অশ্বারোহী সৈন্যদের সহযোগিতায় তাদেরকে হুগলি এবং এর আশেপাশের এলাকা থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব হয়।
১৬৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উভয়পক্ষে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত অব্যাহত ছিল।

---

৩১. বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৮১।

৩২. ঢাকা এই সময় বাংলা সুবার রাজধানী ছিল। সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে রাজমহল থেকে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। উল্লেখ্য শাহসুজার রাজত্বকালের (১৬৩৯ থেকে ১৬৫৯) প্রায় ২০ বছর বাদ দিয়ে (তিনি পুনঃ রাজধানী রাজমহলে নিয়ে গিয়েছিলেন) পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দীকাল ঢাকাই ছিল বাংলার রাজধানী। দেখুন, মোগল রাজধানী ঢাকা, ড. আবদুল করিম, পৃষ্ঠা ১০-১১। অবশ্য ড. আহমদ হাসান দানী, রাজধানী হিশেবে ঢাকার প্রতিষ্ঠার তারিখ নির্ধারণ করেন ১৬০৮ খ্রিঃ। দেখুন, Dacca: A Record of Its Changing Fortunes, pp. 31.

৩৩ A Comprehensive History of India. Vol. IX., pp. 570.

৩৪. The Early Annals of the English in Bengal. Vol. I, pp 90.

৩৫. Ibid., pp 38.

এ সময় জব চার্নক নামক কোম্পানির একজন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল তার সঙ্গীদের নিয়ে হুগলি থেকে পালিয়ে বর্তমান কলকাতার সন্নিহিত সুতানটি গ্রামে (কোম্পানি এখানে আগেই জমি ক্রয় করেছিল) আশ্রয় নেন এবং পরে তৎকালীন সুবাদার ইব্রাহিম খানের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টা করেন। তারা দিল্লির সম্রাটের কাছেও পূর্বের কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। সম্রাট ইংরেজদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে প্রথমে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,৫০,০০০ পাউন্ড জরিমানা পেয়ে তাদেরকে রেহাই দেন। এ ছাড়া তিনি ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৬৯১ সালে এক লিখিত ফরমান বলে বার্ষিক ৩,০০০ টাকার রাজ কর-এ ইংরেজদেরকে পুনরায় বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন।[৩৬]

এতে করে জব চার্নক ও কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারীরা সুতানটিতে ফিরে আসার সুযোগ পেলো। সেখানে ফিরে তারা দেখতে পায় তিনটি মাটির কুটির ছাড়া[৩৭] তাদের পূর্বের নির্মিত কুঠি ও আস্তানার সবই বিধ্বস্ত। অতঃপর জব চার্নক কোম্পানির মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের অসম্মতি সত্ত্বেও সেখানে নতুনভাবে বসতি স্থাপন করেন। তবে সুতানটিতে বসবাসের ভাগ্য তাঁর বেশি দিন হয়নি। ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এখানে অবশ্য সুতানটিতে ও এর সন্নিহিত দু'টি গ্রাম -- গোবিন্দপুর ও ডিহি কলকাত্তা বা কলকাতা অঞ্চলে জব চার্নকের বসতি স্থাপন ও পরবর্তীকালে কলকাতায় ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য কুঠি স্থাপন ও দুর্গ নির্মাণ এবং একে ঘিরে বাংলায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে বিস্তৃত আর্থ-রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা আধুনিক ভারতের ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত, তার পশ্চাদ্‌ভূমি তৈরির যে কৃতিত্ব, এবং যেটা সকল ঐতিহাসিকই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন, সেই নিরিখে জব চার্নকের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজনীয় মনে করি ।

১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন এজেন্ট[৩৮] জব চার্নক কলকাতার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন।[৩৯] আগেই বলেছি হুগলির ফৌজদারের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদে তদানীন্তন বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের আদেশে মোগল সৈন্যদের তাড়া খেয়ে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা সেখান থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন সুতানটিতে। শায়েস্তা খান সেখান থেকেও তাদের হটিয়ে দিয়েছিলেন (১৬৮৭)। পরে অবশ্য সুবাদারের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টা করে চার্নক একই সালের আগস্ট মাসে সুতানটিতে ফিরতে সক্ষম হন। পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হীথ, জব চার্নকের স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় কোম্পানির লোকজন চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে নভেম্বর নাগাদ সুতানটি ছাড়ে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তারা সুতানটি ছেড়েছিল তা পূরণ হয়নি। ১৬৯০ খিস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট জব চার্নক দ্বিতীয়বার সুতানটিতে

৩৬. The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I., pp. 124-25.

৩৭. Ibid., pp. 140.

৩৮. ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'এজেন্ট' বলতে বুঝাতো এর পরিচালক (Directors)-দের; স্বদেশে-বিদেশে মিলিয়ে এদের সংখ্যা ছিল ২৪। এদের শেয়ারের পরিমাণ হতো কমপক্ষে ২,০০০ পাউন্ড এবং বর্ষভিত্তিতে এরা নির্বাচিত হতো। বিস্তারিত জানতে দেখুন, Analytical History of India: From the Earliest Times to the Abolition of the Honourable East India Company in 1858, Robert Sewell, pp. 80-85.

৩৯. অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, কলকাতার পুরাকথা, দেবাশিস বসু সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৩; প্রাচীন কলকাতা, নিশীথরঞ্জন রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১০৬।

পা রাখেন। এবারও মাদ্রাজস্থ কোম্পানির উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এখানে ইংরেজদের বসতি স্থাপনের পুরোপুরি বিপক্ষে ছিল। তা সত্ত্বেও চার্নক বাস্তব কিছু কারণে সুতানটিতে[৪০] ইংরেজ বসতি স্থাপন ও কুঠি নির্মাণ করেন। তাঁর মোটামুটি ৩টি উদ্দেশ্য ছিল। যথা:

১. তখনকার দিনে আদি গঙ্গার উত্তরে বড় বড় সওদাগরী মাল বোঝাই নৌকা বা জাহাজ যেতে পারতো না। সচরাচর খিদিরপুর থেকেই ছোট ছোট নৌকায় করে মালামাল বোঝাই করে হুগলি পর্যন্ত তা আনা-নেয়া করতে হতো। বস্তুত সুতানটিতে কুঠি স্থাপন করলে এই অসুবিধার অনেকখানি দূর হয়;
২. সুতানটি গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত। এর পূর্বদিকে ধাপার জলমগ্ন বিল থাকায় এখানে মারাঠা দস্যুদের আক্রমণ ও মোগল ফৌজদারের উৎপাতের সম্ভাবনা ছিল কম;
৩ তারপরও কখনও যদি পলায়নের নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে তা'হলে এই স্থান থেকে সদলবলে সমুদ্র পথে বেরিয়ে পড়া ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ।

Sir William Foster বলেন, 'The site had disadvantages, for it was girdled on the land side by swamps which rendered it unhealthy; but its position on the eastern bank of the river gave it security, while it was accessible from the sea and had good anchorage close inshore.'[৪১]
১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্থান নির্বাচনে জব চার্নকের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে সঠিক ও সুদূর-ফল-প্রসারী ছিল, তার প্রমাণ বাংলার পরবর্তী আড়াই শ' বছরের ইতিহাস। মূলত জব চার্নক আবাদকৃত সুতানটিতে খুঁটি গেড়ে এবং পরে আরও দু'টি গ্রাম ক্রয় করে (ডিহি কলকাতা ও গোবিন্দপুর মূলত জব চার্নকের মৃত্যুর পরে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ই নভেম্বরে স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে কোম্পানি ১৫০০ টাকায়[৪২] ক্রয় করেছিল। এজন্যে তাদেরকে তৎকালীন বাংলার সুবাদার আজিম-উশ-শান ওরফে আজিম-উদ-দীনকে ১৬,০০০ টাকা নজরানাও দিতে হয়েছিল) এবং এরও অনেক পরে (১৭৫৭) সন্নিহিত ৩৮টি গ্রামের মালিক হয়ে ইংরেজরা বাংলায় যে জমিদারি স্বত্ব[৪৩] (ক্লাইভের জমিদারিও এর অন্তর্ভুক্ত) লাভ করেছিল; প্রত্যক্ষত সেখান থেকেই তারা বাংলার রাজনীতিতে নাক গলানোর সুযোগ, গভীর ষড়যন্ত্র ও প্রভাব বিস্তার করেছিল -- মূলত পত্তন হয়েছিল প্রায় পৌনে দু'শ বছরের ইংরেজ

৪০. বর্তমান কলকাতার বাগবাজারের খাল থেকে নিমতলা পর্যন্ত এলাকা। সেকালে এর পশ্চিমে ছিল গঙ্গা, দক্ষিণে আদিগঙ্গা (প্রাচীন উপবঙ্গের মূল নদীপ্রবাহ এই আদিগঙ্গা। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, আদিগঙ্গা প্রত্ন-পরিক্রমা, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়) ও পূর্বে জলাভূমি -- অর্থাৎ এক কথায় স্থলবাহিনীর জন্যে অনেকটা দুর্গম বললেই চলে।

৪১ The Cambridge History of India, Vol. V., pp 108.

৪২. ড. মাজহারুল হক-এর মতে মূল দলিলে মূল্যের উল্লেখ ছিল ১,৩০০ টাকার। দেখুন, The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 19; আরও দেখুন, The Report of the Land Revenue Commission, Bengal, 1940, Vol. II., pp.11.

৪৩. কোম্পানি সুতানটিকে ঘিরে জমিদারি, না তালুকদারি ক্রয় করেছিল, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। বলাবাহুল্য দু'টিতে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে।

শাসন। বস্তুত এ সব কিছুর মূলে ছিল জব চার্নকের সুতানটিতে বসতি স্থাপন ও বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ। সত্যি বলতে কোম্পানির তদানীন্তন মাদ্রাজ অধিকর্তাদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে তিনি যদি সুতানটিকে ঘিরে কলকাতা শহরের পত্তন না করতেন অথবা সরে যেতেন অন্য কোথাও, তা'হলে হয়তো পলাশির বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা অধিগত করা তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হতো না। তাই ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ বিজয়ের নায়ক হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে জব চার্নকই ছিলেন সেই বিজয়-সোপানের মূল স্থাপয়িতা বা স্থপতি।

C.R.Wilson যথার্থই বলেছেন, 'The foundation of Calcutta marks the beginning of the fourth period in the history of the English in Bengal, the period in which their trade is established on a fixed basis and their policy of armed industrialism definitely formulated.'[৪৪]

শায়েস্তা খানের মৃত্যুর পর সুবাদার ইব্রাহিম খানের শাসনামলে তাঁর পরোক্ষ সহযোগিতায় ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য বিষয়ে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল।[৪৫] শায়েস্তা খানের কঠোর নিপীড়নে তাদের বাংলা ত্যাগের ফলে প্রদেশের সায়ের শুল্ক যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল তা অনস্বীকার্য। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় সরকার তথা স্বয়ং সম্রাট আওরঙ্গজেবও চাইছিলেন ইংরেজরা পুনরায় বাণিজ্য শুরু করুক এবং ধার্য শুল্ক পরিশোধ করুক। কেননা এই সময় তিনি দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, এবং তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল।

ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ইব্রাহিম খাঁর অহৈতুকী বদান্যতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ বণিকেরা --যারা বাংলা থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত হয়েছিল -- আবার এদেশে উপস্থিত হল। তবে এ ব্যাপারে আওরঙ্গজেবেরও প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইংরেজ-মোগল সংঘর্ষের অবসান হয়েছিল, সুরাটের ইংরেজ বণিকেরা তাঁকে সাড়ে চার লক্ষ টাকা দিয়েছিল। তিনি দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে পশ্চিম উপকূলে এবং পূর্ব ভারতে যুদ্ধে তাঁর অর্থ ব্যয় হচ্ছিল, তা'ছাড়া বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটায় রাজস্বের দিক থেকে ক্ষতি হচ্ছিল। তাই তিনি ইব্রাহিম খাঁকে হুকুম দিলেন ইংরেজদের আবার বাণিজ্যের অধিকার দেবার জন্য (এপ্রিল ১৬৯০)। কিছুকাল পরে (ফেব্রুয়ারী ১৬৯১) এক বাদশাহী নির্দেশ (হাসব-উল-হুকুম) জারি হল: ইংরেজরা বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিয়ে বাংলায় অবাধে বাণিজ্য করতে পারবে, তাদের আর কোনরকম শুল্ক দিতে হবে না।'[৪৬]

তবে সুবাদার ইব্রাহিমের দিক থেকেও ইংরেজদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলার প্রবল তাগিদ ছিল। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের অন্তর্গত চেতো-বরদার জমিদার শোভা সিংহ ও ওড়িশার আফগান সেনাপতি রহিম খানের বিদ্রোহের ফলে রাজ্যব্যাপী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়ঙ্কর অবনতি ঘটেছিল। এর ফলে শান্তিপ্রিয় ইব্রাহিম খান নিজেও বিচলিত হন এবং 'বিদেশী কোম্পানিগুলোকে অনুমতি দেন তাদের স্ব স্ব প্রধান কুঠিতে দুর্গ স্থাপন করে নিজেদের

৪৪. The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I., pp. 139.
৪৫. হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, ১ম খণ্ড, সুধীর কুমার মিত্র, পৃষ্ঠা ৬৩১।
৪৬. মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৬৬।

আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা গ্রহণ"[৪৭] করুক।"[৪৮] ফলত এই সুবর্ণ সুযোগের জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় ছিল ইংরেজরা। Wilson স্বীকার করেন, 'In the year 1696 events happened in Bengal which gave the English the very opportunity for which they had so long waited.'"[৪৯]

বস্তুত অতঃপর ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে সুতানটির মাটিতে ফিরে এসে 'ফোর্ট উইলিয়াম' নামে (ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় উইলিয়াম-এর নামানুসারে) বাণিজ্য কুঠি প্রতিষ্ঠা ও দুর্গ নির্মাণ শুধু ইংরেজদের নাম-কা-ওয়াস্তে ফিরে আসাই ছিল না, বরং এবার তারা আটঘাট বেঁধেই বাণিজ্য যাত্রা শুরু করেছিল। ভাগ্যদেবীর কৃপায় এবং তাদের নানারূপ কূট প্রচেষ্টায় ক্রমশ কোম্পানির ব্যবসারও প্রসার ঘটেছিল।"[৫০]

১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে[৫১] চার্লস আয়ার-এর নেতৃত্বে ও ওয়ালশ-এর মধ্যস্থতায় কোম্পানি বাংলার তৎকালীন সুবাদার আজিম-উদ-দীন ওরফে আজিম-উশ-শান-এর (১৬৯৭-১৭১২) কাছ থেকে ১৬,০০০ টাকা নজরানা দিয়ে বার্ষিক ১,১৯৪-১৪-৪ টাকা খাজনা[৫২] প্রদানের অঙ্গীকারে সুতানটি (এর জন্য খাজনা ধার্য হয়েছিল ৫০১-১৫-৬ টাকা), ডিহি কলকাতা বা কলকাত্তা (৪৬৮-৯-৯ টাকা) ও গোবিন্দপুর (২২৪-৫-২ টাকা) নামক তিনটি গ্রাম ক্রয় ও রায়তদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায়ের[৫৩] লিখিত অনুমতি বা 'নিশান' (এটি পরে হারানো যায় বা বিনষ্ট হয়) লাভ করে। স্মর্তব্য যে, ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান -- কর্তৃপক্ষকে যথারীতি শুল্ক পরিশোধ করে এতদঞ্চলে বাণিজ্য করাই ছিল তার প্রধানতম লক্ষ্য; কিন্তু আজিম-উশ-শানের কাছ থেকে তারা ৩টি গ্রামের জমিদারি বা তালুকদারি (যাই বলা হোক না কেন), ক্রয়ের ফলে একদিকে তারা যেমন রাষ্ট্রীয় তহবিলে বার্ষিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিরাজস্ব প্রদানের সুযোগ পেলো, তেমনি অন্যদিকে এই প্রথমবারের মতো

৪৭. বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃষ্ঠা ১০-১১।

৪৮. ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সুবাদার ইব্রাহিম খানের এই অনুমতি দান এক প্রকার তাঁর বাধ্যবাধকতারই ফল বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'It was this disturbance that compelled the Governor of Bengal, Nawab Ibrahim Khan, to give permission in general terms to the English, the Dutch, and the French, to fortify their respective factories.' (The Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. II., pp. 175).

৪৯. The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I., pp. 147.

৫০. বাংলায় ভ্রমণ, ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে, পৃষ্ঠা ১২।

৫১. ড. নিশীথরঞ্জন রায়ের মতে এটি ছিল ১লা আগস্ট, ১৬৯৮ সাল। দেখুন, The Good Old Days of Honourable John Company, pp. 44.

৫২. যতদূর জানা যায় মূল দলিলে খাজনার কোন উল্লেখ ছিল না। পরে তা সম্রাট ফররুখশিয়ারের ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের ফরমানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

৫৩. Firminger-এর 'The Fifth Report'-এর ভাষায়, 'the English by their transaction with Azim-ush-Shan, obtained these three rights: (1) To collect the rents from the ryots. (2) To deal at pleasure with waste lands. (3) To impose petty taxes, duties and fines.' (pp 378).

একটি বিদেশি 'ফটকাবাজ' কোম্পানি সরকারের অধীনে ভূমিরাজস্ব আদায়ী চিরাচরিত এজেন্টদের ন্যায় রায়তদের কাছ থেকে খাজনা সংগ্রহের অধিকার বা ক্ষমতাও লাভ করেছিল। এককথায় বলতে গেলে, ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের তথাকথিত এই 'নিশান' তাদের সেই বহুল প্রত্যাশিত আইনি ক্ষমতা ও সুযোগ--দুই-ই প্রদান করেছিল।

Firminger-এর রিপোর্টের ভাষায়: 'By this acquisition the Company obtained for the first time a legal position within the Mughal Empire, and thus brought into existence a working theory, in the development of which the acceptance of the Diwani in 1765 is the final and logical completion.'[৫৪]

এখানে আরও একটি বিষয় গভীর তাৎপর্যের সঙ্গে লক্ষ্যণীয় তা হলো, মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় রাজস্ব আদায়ের যে বেসরকারি 'machineries' বা 'apparatuses' ছিল (আমলগুজার, আমিল, কড়োরি প্রভৃতি ব্যতীত), -- তারা প্রত্যেকেই ছিল এক-একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবিশেষ, যেমন জমিনদার, তালুকদার প্রভৃতি -- এরা যত শক্তিশালী ও প্রভাবসম্পন্নই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত ছিল এক-একজন ব্যক্তি-ই। অন্যদিকে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুতানটি ও অন্য দু'টি গ্রামের খাজনা আদায়ের দায়িত্বাধিকার অর্পণ বা প্রদান ছিল একান্তই একটি প্রতিষ্ঠানকে, তাও স্বীকৃত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, এবং বিদেশি; বস্তুত এই অধিকার হস্তান্তর বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় তো প্রথম ছিল বটেই[৫৫], সম্ভবত সমগ্র মোগল ভারতেও এর কোন পূর্ব নজির পাওয়া যাবে না।

সুতানটিতে বসতি স্থাপনের পিছনে জব চার্নকের যে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল তা আগেই বলেছি। এবার সুতানটির সংলগ্ন আরও দু'টি গ্রাম ক্রয়ের মূলে কোম্পানির সম্ভবত আরও একটি উদ্দেশ্য পূরণ হলো, যা এ রকম: 'বিপুল ভূমিরাজস্ব আসতে পারে এ রকম কোন স্থান নিজেদের দখলে আনা যাতে সেই ভূমিরাজস্বকে তারা বাংলাদেশে তাদের এদেশীয় বাণিজ্যের মূলধন হিসাবে ব্যবহার করতে পারে।'[৫৬]

যা হোক, এই তিনটি গ্রামের অধীনে কোম্পানি মোট ১,৬৯২ একর বা ৫,০৭৭ বিঘা ভূমির (১৭০৭ সালে পরিমাপকৃত) খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করেছিল।[৫৭] কোম্পানির লোকেরা একে 'কলকাতাকেন্দ্রিক শহর' বলতো এবং সেই শহরের জন্যে তারা একটি রাজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামোও দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিল। তা সত্ত্বেও এটা স্বীকার করতে হবে যে, সুতানটি বা

৫৪. The Fifth Report , pp. 374

৫৫. ঐতিহাসিক পূর্ণেন্দুনাথ নাথও বলেন, 'ইতিপূর্বে জমিদারির অধিকার শুধু ব্যক্তিবিশেষকেই দেওয়া হতো। এই প্রথম সেই অধিকার অর্জন করল একটি প্রতিষ্ঠান।' (কলকাতায় করারোপ, কলকাতার পুরাকথা, দেবাশিস বসু সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৩৭)।

৫৬. ড. রঞ্জিত সেন, আঠারো শতকে কলকাতার নগরায়ন, ইতিহাস অনুসন্ধান-৭, পৃষ্ঠা ২৬২।

৫৭. The Agrarian System of Bengal, Vol. I., Dr. Anil Chandra Banerjee, pp. 76

কলকাতা তখন পর্যন্ত মোগল খালসা'র অন্তর্ভুক্ত[৫৮] একটি উন্নতমানের গ্রাম বৈ অন্য কিছুই ছিল না। তথাকথিত এই 'শহরে'র প্রশাসনিক প্রয়োজনে বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে একে তারা ৪টি প্রধান 'জোন' বা ভাগে বিভক্ত করেছিল।

ক. বড় বাজার;
খ. শহর কলকাতা;
গ. সুতানটি ও
ঘ. গোবিন্দপুর।

যা হোক আলোচ্য জমিদারি ক্রয়ের পর কলকাতাকেন্দ্রিক যে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা কোম্পানি গড়ে তুলেছিল, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার আগে এখানে কোম্পানির জমিদারির প্রসার ও ক্ষমতা বিস্তারের আরও কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো।
১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি জন স্যারমেন-এর নেতৃত্বে রাজস্বসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির তদ্বিরের জন্যে দিল্লির রাজদরবারে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। তারা তৎকালীন মোগল বাদশাহ্ ফররুখশিয়ারকে ৩০,০০০ পাউন্ড 'পেশকাশ' প্রদান করে। এতে বাদশাহ খুশী হয়ে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে এক ফরমান বলে কোম্পানিকে নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন।

১. কোম্পানি বরাবরের মতো ৩,০০০ টাকার বার্ষিক 'পেশকাশ' প্রদানের শর্তে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবে;
২. তারা চাইলে সুতানটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর -- এই তিনটি গ্রাম ছাড়াও সন্নিহিত আরও ৩৮টি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করতে পারবে;
৩. কোম্পানির মালামাল চুরি হলে চোরকে ধরা ও শাস্তি প্রদানের অধিকার এবং সেই সঙ্গে চোরাই মাল ফেরত পাবার অধিকার তাদের থাকবে;
৪. মাদ্রাজের টাকা (আর্কট মুদ্রা) বিনা বাটায় বাংলায় প্রচলনের সুবিধা;
৫. কোম্পানির পলাতক খাতককে ফিরে পাবার অধিকার;
৬. বাণিজ্যকুঠির প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত 'দস্তক' বা পাশ সঙ্গে থাকলে এর বহনকারীর মালামাল বিনা তল্লাশিতে যেতে দেয়া বা চলাচলের সুবিধা পাবে;

৫৮. The Report of the Land Revenue Commission, Bengal, 1940, Vol. II., pp. 176.
'শহর' নাম হলেও এটি যে তখন পর্যন্ত একটি উন্নতমানের গ্রাম ছিল তার প্রমাণ ড. অতুল সুরের তৎকালীন কলকাতা সম্পর্কিত এই বর্ণনা। তাঁর ভাষায়, '১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার মোট আয়তন ৫০৭৭ বিঘার মধ্যে মাত্র ৮৪১ বিঘা ১০ কাঠায় ঘরবাড়ী ছিল। বাকী জমির ১৫২৫ বিঘা ছিল ধান ক্ষেত, ৪৮৬ বিঘা বাগান-বাগিচা, ২৫০ বিঘায় হত কলার চাষ, ১৮৭ বিঘায় তামাকের চাষ, ১৫০ বিঘায় তরিতরকারীর চাষ, ৩০৭ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি, ১৬৭ বিঘা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির এলাকাভুক্ত; ১১৬ বিঘায় ছিল রাস্তাঘাট, পুকুর, কুয়া ইত্যাদি আর ১১৪৪ বিঘা পতিত জমি। এই সকল পরিসংখ্যান থেকে কলকাতার তখনকার দিনের গ্রাম্য রূপটা বেশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।' (কলকাতা: এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৪)।

৭. মুর্শিদাবাদের টাঁকশালে কোম্পানির নিজস্ব মুদ্রা তৈরির অধিকার;
৮. সদাশয় সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত মূল সনদ স্থানীয় রাজকর্মচারীদের না দেখানোর অধিকার।

উপরোল্লিখিত প্রতিটা অধিকারই একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট প্রতিভাত হবে যে, ১৬৯৮ থেকে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ মাত্র দু'দশকে কোম্পানি বাংলার তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মোটামুটি একটি শক্ত, মজবুত, আপাতস্থায়ী ও প্রভাব বিস্তারকারী ভিত্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। কারণ অপরাধী ধরা, কুঠি-প্রধানের পাশ থাকলে মালামাল চেক না করা এবং বিশেষ করে মুদ্রা তৈরি ও প্রচলনের অধিকার -- এগুলি অনেকটা সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক। কোম্পানি যদিও তখন পর্যন্ত এ সবের কিছুই বাস্তবে আদৌ প্রয়োগ করতে পারেনি, -- কারণ বাংলার তৎকালীন সুবাদার স্বনামধন্য মুর্শিদকুলি খান (১৭১৩-১৭২৭) তাদের পূর্বোদ্ধৃত অধিকারগুলো কার্যকর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন[৫৯], তা সত্ত্বেও এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হবে যে, সম্রাট ফররুখশিয়ারের এই ফরমান ছিল কোম্পানির জন্যে 'Magna Charta' স্বরূপ।[৬০] এই ফরমানে প্রদত্ত সুবিধা ও অধিকারের কথা উল্লেখ করেই এবং সেগুলি বাস্তবায়নের দাবিতে পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক নাজিম-সুবাদারের ওপর ইংরেজরা চাপ সৃষ্টি করার আইনানুগ জোর পেয়েছিল। যা হোক এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও আলোচনা হবে, এখানে কোম্পানির কলকাতা জমিদারি সম্বন্ধে আরও খানিকটা ধারণা দেয়া হলো।

সুতানটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর -- এই গ্রাম তিনটির ভৌগোলিক অবস্থান ছিল গঙ্গার পূর্ব তীরে, অন্য কথায় বাংলার সুবাদারের স্থানীয় ফৌজদারি -- 'হুগলি থেকে দূরে, কিছুটা নিরাপদ স্থানে'[৬১] এবং স্বভাবতই 'এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের দিকে নবাবী প্রশাসনের দৃষ্টি (*তেমন*) একটা না থাকায় কোম্পানির পক্ষে এখানে জমিদারী ক্ষমতা পরিচালনার সুযোগ উপস্থিত হল।'[৬২] বলাবাহুল্য অতঃপর এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুরোদমে করেছিল সে কথা পরবর্তী ইতিহাস বলে।

প্রথম থেকেই কলকাতাকে ঘিরে কোম্পানি শহর গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। ১৬৯৬-৭ সাল নাগাদ সেখানে তারা বাণিজ্যকুঠির চতুর্দিকে মজবুত প্রাচীর নির্মাণ ও প্রাচীরের উপরে কামান বসায়। এছাড়া বাঁশ-কাঠের তৈরি যে গুদামে এ যাবৎ মালপত্র রাখতো সেটাও বদলে সেখানে মাটি ও ইটের দালান নির্মাণ করেছিল। আর এটিই ছিল বিখ্যাত 'ফোর্ট উইলিয়াম' -- বাংলার পরবর্তী ইতিহাসের পাঠকমাত্রকেই যে নাম বারবার পড়তে হয়।

ইতোমধ্যে কলকাতার জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠেছিল। এখানে বিভিন্ন জাতির লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। জব চার্নক যখন কলকাতায় (আসলে সুতানটিতে) ছাউনি ফেলেন তখন

৫৯. বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃষ্ঠা ১২।
৬০. East India Company and the Economy of Bengal, Dr. S. Bhattacharya, pp. 29; Murshid Quli Khan and His Times, Dr. Abdul Karim, pp. 168.
৬১. ড. রঞ্জিত সেন, ইতিহাস অনুসন্ধান-৭, পৃষ্ঠা ২৬২।
৬২. মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৭৪।

এর লোকসংখ্যা ছিল ১২,০০০ -এর মতো।[৬৩] ১৭০৪ সালে ছিল ১৫,০০০।[৬৪] কিন্তু হলওয়েল প্রদত্ত এক পরিসংখ্যান থেকে[৬৫] জানা যায় ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে প্রায় ৪,০৯,০৫৬ জনে দাঁড়িয়েছিল। মধ্যবর্তী সময়ের স্থির কোন তথ্য-পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না বিধায় এ থেকেই এই সময়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুতগতির মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারে। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে কোম্পানি দুর্গ-শহর কলকাতায় নিয়মিত প্রশাসন ব্যবস্থা চালুরও চেষ্টা করেছিল, যদিও তখন পর্যন্ত তা ছিল নিতান্তই অসংগঠিত। তবে এখানে উল্লেখ করার বিষয় এই যে, কোম্পানি এর মধ্যেই বাংলা (কলকাতা বলাই শ্রেয়)-কে মাদ্রাজের মতো একটি 'প্রেসিডেন্সি' ঘোষণা করেছিল --'At the close of 1699, however, Bengal was declared a presidency and the governor and council thus became possessed of full judicial authority.'[৬৬] তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার পাশাপাশি মোগল শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম অংশীদার জমিদারদের মতো স্থানীয় জনসমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বাজার-ঘাট, পয়ঃপ্রণালী তৈরি প্রভৃতি কাজও শুরু করেছিল।

১৭০০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'-র কাউন্সিলে অতিরিক্ত একজন সদস্য নিয়োগ দিয়ে পাঠায়।[৬৭] এর পদবি হয় 'কালেক্টর' বা জমিদার।[৬৮] র‍্যালফ শেলডন (Ralph Sheldon) ছিলেন এই জাতীয় প্রথম ইংরেজ কালেক্টর বা জমিদার। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও জানিয়ে রাখা ভালো যে পরবর্তীকালে এদেশে (ব্যাপকার্থে ভারতবর্ষে) ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে অদ্যাবধি দৈনন্দিন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিশেষ করে রাজস্ব প্রশাসনে যেহেতু কালেক্টর পদবি ও ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব বর্তমান, সেহেতু এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কালেক্টর পদে র‍্যালফ শেলডন-এর নিযুক্তি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা এবং শেলডন সেই ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। Wilson যথার্থই বলেছেন, 'In 1700 Ralph Sheldon became the first Collector of Calcutta, and from him through many an inheritor whose name is now part of the history of British India, the line of the Calcutta collectors runs in unbroken succession down to

৬৩. বাংলায় ভ্রমণ, ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে, পৃষ্ঠা ১৩।

৬৪. মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৭৪-৭৫।

৬৫. East-India Gazetteer, pp. 320.

৬৬. A Constitutional History of India: 1600-1935, Dr. Arthur Berriedale Keith, pp. 49.

৬৭. সাধারণত কোম্পানির প্রতিটি 'প্রেসিডেন্সি' (একে 'Government of Presidency' বলাই ভালো) গঠিত হতো ১ জন প্রেসিডেন্ট (সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে মনোনীত ও প্রেরিত) ও ৩ জন সিভিল সার্ভেন্ট-এর সমন্বয়ে। শেষোক্তরা বোর্ড অভ ডিরেক্টরস কর্তৃক নিযুক্ত হতো। বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Analytical History of India, pp . 84; India in 1858, Arthur Mills, Chapter I & II; India in 1858, Arthur Mills, Chapter II; Indian Studies, General Sir O'Moore Creagh, Chapters VII, VIII & IX.

৬৮. ইংরেজদের কাছে ও স্থানীয়ভাবে ইনি 'কালেক্টর' হিশেবে পরিচিত ছিলেন। তবে সরকারি সেরেস্তায় এর অভিধা ছিল জমিদার।

the present day.'[৬৯] র‍্যালফের অধীনে আবার ছিল একজন 'Native' বা এদেশীয় ছোট জমিদার বা নায়েব, যাকে বলা হতো 'Black Collector'. প্রথম যুগের ব্লাক কালেক্টরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নন্দরাম সেন, জগৎ দাস, গোবিন্দরাম মিত্র প্রমুখ।

মোগলদের প্রচলিত জমিদারি ব্যবস্থায় কোম্পানির নবনিযুক্ত কালেক্টরের কাজ ছিল মূলত, 'In accordance with zamindari customs, the English zamindar of the Three Towns acted as magistrate of police, and held courts in which petty offences and cases of revenue disputes were decided.'[৭০]

বলাবাহুল্য পর্যালোচ্য ক্ষেত্রে আমাদের রচনার বিষয় যেহেতু ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসন, সুতরাং এখানে আমরা কালেক্টরের রাজস্বসংক্রান্ত কার্যাবলির মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করবো।

কোম্পানি তার ভূমিরাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা নির্বাচিত করে। স্থানীয় ভাষায় এর নাম দেয়া হয়েছিল 'কাছারি' (the Collector's Cutchery)। মোগল আইনানুসারে বিচার কার্য চালানোর জন্যে তারা যে 'Court of Cutchery' প্রতিষ্ঠিত করেছিল[৭১] সেখানে বসেই কালেক্টর তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতেন -- 'the Collector's Cutchery exercising its jurisdiction in the affairs and causes involved in the collection of ground rents.'[৭২]

১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলেছিল।[৭৩]

শুরুতে কালেক্টর স্থানীয় ভূমি-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদের মধ্যে পাট্টা দিয়ে জমির বিলি বন্দোবস্ত করতেন।[৭৪] আগেই বলেছি সরকারি তহবিলে তাদেরকে বার্ষিক প্রায় ১,২০০ টাকা দিতে হতো। এই টাকা এবং অতিরিক্ত আদায়ের লক্ষ্যে তারা বিঘা প্রতি গড়পরতা খাজনা ধার্য করেছিল ৩ টাকা।[৭৫] অবশ্য এটা ছিল বিঘা প্রতি আদায়ের সর্বোচ্চ সীমা। আইনগতভাবে এর

৬৯. The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I., pp. 190-91.
৭০. The Fifth Report, pp. 378.
৭১. পরবর্তীকালে 'কোর্ট অভ কাচারি বা কাছারি ' ছাড়াও Mayor's Court (1726), Court of Records, Court of Request (1753) নামে আরও তিনটি কাছারি বা কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।
৭২. The Administration of Justice under the East India Company in Bengal, Bihar and Orissa, Dr. Atul Chandra Patra, pp. 33.
৭৩. The Fifth Report, pp. 381.
৭৪. মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৭৪;
ড. অতুল সুর বলেন, 'এই সকল জমি ইংরেজরা বিলি করেছিল প্রজাস্বত্ব ভিত্তিতে।' তিনি আরও জানাচ্ছেন, 'প্রত্যেক জমির জন্য কোম্পানি ইংরেজি ও বাংলায় লেখা একখানা করে দলিল দিত, এবং সমস্ত দলিলই বছরে একবার করে রেজিষ্ট্রী করতে হত।' (কলকাতা : এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৪)।
৭৫. The Report of the Land Revenue Commission, Bengal, 1940, Vol. II., pp. 177.

বেশি আদায়ের সুযোগ তাদের ছিল না। স্মর্তব্য যে তখনও পর্যন্ত ভূমিরাজস্ব বিষয়ে কোম্পানির নিজস্ব কোন ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠেনি, বরং মোগল ভূমিরাজস্ব নীতিই ছিল তাদের প্রধান ও একমাত্র পাথেয়। তবে যেহেতু তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য করা এবং যেনতেন প্রকারে আয় বৃদ্ধি, স্বভাবতই সরকারের নির্ধারিত হার বা পরিমাণের বেশি তারা প্রায়শই আদায় করতো। অন্যভাবে বললে এটাও বলা যায় যে, যেহেতু তাদের নির্দিষ্ট কোন খাজনার হার ছিল না, সুতরাং যখন যেখানে, যার কাছে যেমন আদায় করা সম্ভব, সেটা আদায় করতে তারা আদৌ কসুর করতো না। এ ছাড়া এক এক রকম জমির জন্যে তারা এক এক রকম খাজনা দাবি ও উসুল করতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কৃষি জমিতে ধান চাষের জন্যে খাজনা নিতো ১ টাকা, কিন্তু বাঁশের জমির ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৪ টাকা বা তারও কিছু বেশি।[৭৬] এ ছাড়াও -- 'the Company drew considerable sums from various aids and benevolences from tolls levied on the markets and ferries, and from other miscellaneous town duties.'[৭৭]

এককথায় খাজনা ধার্য ও আদায়ের ব্যাপারে ইংরেজ কর্মচারীরা বেশ স্বৈরাচারী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এ সংক্রান্ত মোগল সাধারণ নিয়ম-নীতি তারা মানতো না। তাদের ব্যাপক কড়াকড়ির একটা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এই যে, 'After paying the land revenue (*certainly to the Government*) the average monthly balance to the credit of the Company amounted to Rs. 480 in 1704.'[৭৮] অর্থাৎ কোম্পানি এক বছরে সরকারকে যে পরিমাণ ভূমিরাজস্ব দিতো তা তারা ৩ মাসেরও কম সময়ে রায়তদের কাছ থেকে উসুল করে ফেলতো। এ থেকে বুঝা যায় কী বিপুল পরিমাণ আয়ের উৎস তারা খুঁজে পেয়েছিল সুতানটিতে জমিদারি ক্রয়ের মাধ্যমে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তখন পর্যন্ত নিম্নপদস্থ যে সকল রাজস্ব কর্মচারী ছিল তাদের বেতন-ভাতা ছিল খুবই কম। বস্তুত কোম্পানির ভূমিরাজস্ব আদায়ের, আরও নির্দিষ্ট করে বললে মোট আয়ের বেশির ভাগই ব্যয় হতো শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেন্ড পরিশোধে এবং প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলরদের বেতন-ভাতা প্রদানে।[৭৯] নিম্নপদস্থরা যেহেতু বেতন-ভাতা পেতো কম, অথচ ভাগ্য ফেরানোর জন্যে মধ্যকালীন বাংলা ছিল অত্যন্ত উর্বর এক দেশ, স্বভাবতই সেই দেশের সস্তা অর্থ হাসিলের সবচেয়ে সহজ পথ হিশেবে তারা খুঁজে নিয়েছিল কোম্পানির মূল ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার পাশাপাশি ব্যক্তিগত ব্যবসা। এতে করে এই সীমিত অঞ্চলের (সুতানটি, কলকাতা ও

৭৬. The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 19

৭৭. The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I., pp. 191.

৭৮. The Report of the Land Revenue Commission, Bengal, 1940, Vol. II., pp. 177.

৭৯. একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন-ভাতা কীরূপ ছিল : তৎকালীন মুদ্রায় এক কালেক্টরেরই বার্ষিক বেতন ছিল ২,০০০ টাকা (কলকাতার পুরাকথা, পৃষ্ঠা ১৩৭)। ভুলে গেলে চলবে না যে কালেক্টর ছিলেন কাউন্সিলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। অথচ 'ব্লাক কালেক্টরে'র মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৪ টাকা। দেখুন, কলকাতাঃ এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, ড. অতুল সুর, পৃষ্ঠা ২৫।

গোবিন্দপুর) জনগণের ওপর ইংরেজ রাজস্ব কর্মচারীদের অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিল। তাদের এই অত্যাচারের কথা যখন তৎকালীন বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দোর্দণ্ড প্রতাপশালী দিওয়ান মুর্শিদকুলি খানের কানে গিয়ে পৌঁছোয়, তৎক্ষণাৎ তিনি কোম্পানিকে এই অন্যায় কাজ হতে বিরত হবার নির্দেশ দেন।[৮০] অনন্যোপায় কোম্পানি তখন রাজস্ব আয়ের বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য হলো। তারা বুঝেছিল দিওয়ান জাফর খান ওরফে মুর্শিদকুলির রাজত্বে প্রজাদের উপর খাজনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তার পরিণাম হবে অত্যন্ত কঠোর ও চূড়ান্ত। সুতরাং অন্য পথে যাওয়াই শ্রেয়। এই চিন্তা-ভাবনা থেকেই কোম্পানি খাজনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ভূমি অধিগ্রহণ ও জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদি জমি বাড়িয়ে তাতে নতুন বসতি স্থাপনের দিকে মনোযোগ দিলো।

এখানে উল্লেখ্য যে কোম্পানি ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে তথাকথিত তিনটি 'শহরে'র ভূমি জরিপের কাজ হাতে নিয়েছিল। প্রায় দু'বছর লাগলো তাদের এই কাজ শেষ করতে। এতে কোম্পানির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ দখলে মোট ১৮৬১ একর[৮১] বা ৫০৭৭ বিঘা[৮২] ভূমি পাওয়া গিয়েছিল। এর মধ্যে লাখেরাজের পরিমাণ ছিল ৩৬০ বিঘা।[৮৩] বলাবাহুল্য লাখেরাজ-ব্যতীত অবশিষ্ট ভূমি থেকেই কোম্পানি বিভিন্ন হারে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করতো।

আগেই বলেছি কলকাতাসংলগ্ন ৩৮টি গ্রামের জমিদারি ক্রয়ের জন্যে ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে[৮৪] (জুলাই?) কোম্পানি জন স্যারমেন (John Surman)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল দিল্লিতে। তখন মোগল বাদশাহ ছিলেন ফররুখশিয়ার (১৭১৩-১৭১৯)। প্রতিনিধি দল তাঁকে নগদ ৩০,০০০ পাউন্ড ও প্রচুর উপঢৌকনাদি দিয়ে ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর (এটি বাংলায় পৌঁছায় ১৭১৭ সালে; সে জন্য একে '১৭১৭ সনের ফরমান' বলে) এক বাদশাহি ফরমান বলে স্থানীয় জমিদারদেরকে বার্ষিক ৮,১২১ টাকা[৮৫] প্রদানের শর্তে উক্ত গ্রামগুলি ক্রয়ের অনুমতি পায়। বস্তুত যদিও কোম্পানি কেন্দ্রীয় মোগল সরকার থেকে 'খোদ বাদশাহি ফরমান' বলে স্থানীয়ভাবে ভূমি ক্রয় করে জমিদারি স্থাপনের অনুমতি লাভ

৮০. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Murshid Quli Khan and His Times, Chapter IV.

৮১. The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I., pp. 191. ড. অতুল সুর উল্লেখ করেছেন ১৮৬৬ একরের। বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, কলকাতা: এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২২ -২৪।

৮২. দেশি মাপে প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ৫০৭৬ বিঘা ১৮.৭৫ কাঠা । দেখুন, The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 34.

৮৩. Ibid., pp. 34.

৮৪. প্রকৃত সন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। পি . ই . রবার্টস (History of British India under the Company and the Crown , pp. 61) ও ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (The Report of the Land Revenue Commission, Bengal, 1940, Vol. II., pp. 177)-এর মতে সনটি ছিল ১৭১৫; কিন্তু ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন ১৭১৩ বলে (মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৭৬)।

৮৫. The Imperial Gazetteer of India: Provincial Series : Bengal, Vol. I., pp. 28; The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 77.

করেছিল এবং সত্যি বলতে আঞ্চলিক শাসনকর্তা হিশেবে নবাব-সুবাদার মুর্শিদকুলি খানের পক্ষে এটিকে অস্বীকার করার নৈতিক কোন সুযোগই ছিল না। কেননা এই ফরমান কোম্পানির জমিদারিকে মোগল সাম্রাজ্যের একটি স্বীকৃত অংশে পরিণত করেছিল। P. E. Roberts-এর ভাষায়, '(*By the farman of 1717*) the East India Company in a legal sense now became an integral part of the empire of the Mughals.'[৮৬] তা সত্ত্বেও মুর্শিদকুলি নানাভাবে কোম্পানির এই অধিকার বাস্তবায়নে বাধা দিতে লাগলেন। তিনি কলকাতার স্থানীয় জমিদারদের মৌখিকভাবে নির্দেশ দিলেন ইংরেজদের কাছে নতুন করে জমি বিক্রি বা সমর্পণ না করতে। দিল্লির সম্রাটের তখন যে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা তাতে করে পরাক্রমশালী সুবাদারের এই আদেশ অমান্য করার দুঃসাহস জমিদারদের আদপেই ছিল না। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তারা নিজেরাও ছিল এই বিক্রয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী।

ফলত কোম্পানি কাগজেপত্রে যদিও কলকাতা ও এর সন্নিহিত ৩৮টি গ্রামের জমিদারি ক্রয়ের রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন করেছিল, কিন্তু বাংলার সুবাদার ও স্থানীয় জমিদারদের অসহযোগিতার কারণে তাদের পক্ষে এই অধিকার ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত[৮৭] নিতান্ত কাগুজে ব্যাপার হয়েই ছিল এ কথা না বললেও চলে। Firminger-এর 'The Fifth Report'-এ-ও এ কথা স্বীকার করা হয়েছেঃ 'The labour of the Surman Embassy thus, so far as Calcutta was concerned, proved nugatory,..'[৮৮] অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে দিল্লির সম্রাটের সনদ বলে ইংরেজরা বাংলায় নিজেদের জমিদারি বা আধিপত্য সম্প্রসারিত করতে সক্ষম না হলেও, এই সনদের একটা বিশাল মূল্য তাদের কাছে ছিল এ কথা অনস্বীকার্য। নবাব মুর্শিদকুলি পরবর্তী আরও দু'জন শক্তিশালী সুবাদার -- নবাব শুজাউদ্দিন খান (১৭২৫-১৭৩৯) ও নবাব আলিবর্দি খান (১৭৪০-১৭৫৬)-এর সময়েও এই বিরোধিতা অব্যাহত থাকলেও একটা বিষয় না বললেই নয় যে বস্তুত কোম্পানি বরাবরই তথাকথিত এই ফরমান বা সনদের দোহাই দিয়ে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দোত্তর বাংলার প্রায় প্রত্যেক নবাব-সুবাদারের সঙ্গে একটা স্থায়ী বিরোধ ও রেষারেষি চালিয়ে যাবার নৈতিক শক্তি ও সাহস পেয়ে এসেছিল।[৮৯] তবে নবাব শুজাউদ্দিন ও নবাব আলিবর্দি যথেষ্ট যোগ্য ও ক্ষমতাধর শাসক হওয়ায় তাদের পক্ষে জমিদারি ক্রয়ের ব্যাপারে এঁদের ওপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। তবে তাঁদের সময়ে কোম্পানির

৮৬. History of British India under the Company and the Crown , pp. 62 .
৮৭. The Judicial Administration of the East India Company in Bengal, 1765-1782 , Dr. B. B. Misra , pp. 4.
৮৮. pp. 386.
৮৯. ড. মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেন, 'The Emperor, Farrukh Siyar, granted this application but the masterful Governor of Bengal, Murshid Quli Khan, refused to give effect to the Emperor's order in allowing the English Zemindary rights in more towns. This gave the English the ground of a standing quarrel with the Local Government of Bengal under the Nawab, which they might take up any time.' (The Report of the Land Revenue Commission, Bengal, 1940, Vol. II., pp. 178).

ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল বেশ শনৈঃ শনৈঃ। Sir W. Foster বলেন, 'The domestic history of the East India Company from the time of the union in 1709 to the middle of the century was one of quiet prosperity.'[৯০] ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির মোট আমদানির পরিমাণ যেখানে ছিল ৫,০০,০০০ পাউন্ডের, সেখানে ১৭৪৮ সাল নাগাদ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১১,০০,০০০ পাউন্ডে। অন্যদিকে রপ্তানি ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে যেখানে ছিল ৫,৭৬,০০০ পাউন্ডের, প্রদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে প্রচুর সুবিধা হওয়ায় সেখানে তা একই সময়ে বেড়ে হয়েছিল ১১,২১,০০০ পাউন্ড।[৯১] কোম্পানি তার শেয়ার হোল্ডারদের ১৭০৮-৯ সাল নাগাদ ডিভিডেন্ড দিতো গড়ে মোটামুটি ৫%; অথচ মাত্র ৩ বছরে অর্থাৎ ১৭১১-১২ খ্রিস্টাব্দে এর হার হয়েছিল ১০% এবং মধ্য-অষ্টাদশ শতক নাগাদ তা গড়ে ৭-৮% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৯২] একইভাবে ১৭০৮ থেকে ১৭১৩ -- এই সময়কালে ভারতের পথে (বাংলাভিমুখেও বটে) বাণিজ্য ব্যপদেশে লন্ডন থেকে যেখানে বছরে গড়ে ১১টি বাণিজ্যিক তরী বন্দর ত্যাগ করতো, সেখানে ১৭৪৩ থেকে ১৭৪৮-- এই অর্ধ-যুগেই (তখন ছিল আলিবর্দির শাসনকাল) বছর প্রতি গড়ে সেই সংখ্যা উঠেছিল ২০টিতে এবং এগুলিতে মালামাল পরিবহনের পরিমাণও ছিল পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি।[৯৩] বলাবাহুল্য এই বিশাল বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে বাংলায় প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ভূমিকাই যে মুখ্য ছিল সে কথা সহজেই অনুমেয়। ফলত এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এটা স্বীকার করতে হয় যে, যদিও আলিবর্দির সময়ে ইংরেজরা ব্যাপক হারে জমিদারি ক্রয় করে বাংলার সামাজিক প্রভুত্বে অংশীদার হতে পারেনি[৯৪], কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে, 'The Company's position improved in the time of Alivardi Khan.'[৯৫]

শুধু তাই নয়, জমিদারির পাশাপাশি প্রভূত অর্থ-সম্পদ হাতে পাওয়ায় এই সময়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রভাব ও গুরুত্ব, ভারতে বিশেষত বাংলায় বাণিজ্যরত অপরাপর ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী যেমন ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতির তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। ড. কালীকিঙ্কর দত্ত বলেন, 'The English Company also tried, during this period (*of Alivardi Khan*), to assert a superior right over others in matters of trade in Bengal.'[৯৬]

কোম্পানির এই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি মূলত মজবুত ভিত্তি পেয়েছিল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে নবাব মিরজাফর কর্তৃক ইংরেজদের বরাবরে কলকাতা-সন্নিহিত (দক্ষিণ দিকে) বহুল প্রতীক্ষিত ৩৮টি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব হস্তান্তর চুক্তির মাধ্যমে। যদিও এ পর্যন্ত আসতে তাদের

---

৯০. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 108.

৯১. Ibid., pp. 108.

৯২. Ibid., pp. 109.

৯৩. Ibid., pp. 109.

৯৪. আলিবর্দির সময়ে ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি মারাঠা খালের অপর পাড়ে মাত্র বেনিয়াপুকুর, পাগলা ডাঙ্গা, ট্যাংরা প্রভৃতি কয়েকটি এলাকা (এক নামে এগুলি 'আজনগর' বলে পরিচিত)-র তালুকদারি ক্রয়ের মাধ্যমে এর খাজনা আদায়ের অধিকার অর্জন করেছিল।

৯৫. The Agrarian System of Bengal , Vol. I., pp. 77.

৯৬. Alivardi Khan and His Times , pp. 170.

প্রচুর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল, ইত্যবসরে বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চেও ঘটেছিল যুগান্তকারী পালাবদল, সেই ইতিহাসের কিছুটা এখন তুলে ধরছি।

আগেই জানিয়েছি, নবাব শায়েস্তা খান থেকে শুরু করে নবাব আলিবর্দি খানের আমল পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজরা ব্যাপক হারে জমিদারি ক্রয় করতে না পারলেও অপরাপর ইউরোপীয় কোম্পানির বিপরীতে ঈর্ষণীয় প্রতিপত্তি অর্জনে তারা সক্ষম হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে বাংলা ও বিহারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন ও দুর্গ নির্মাণ ও সংস্কার করেছিল। এর মধ্যে ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাস্থ বাণিজ্যকুঠির পুনর্প্রতিষ্ঠা[৯৭] ও ১৭৪১-৪২ সালে কলকাতাস্থ কাশিমবাজার কুঠির সংস্কার বিশেষ করে কুঠির চতুর্পাশে ইটের মজবুত দেয়াল ও বুরুজ নির্মাণ[৯৮] এবং পরের বছরে (১৭৪২-৪৩) দ্বিতীয় মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে আলিবর্দির সম্মতিক্রমে[৯৯] শহর কলকাতার চারপাশে 'মারাঠা খাল' ('Maratha Ditch' নামেই সমধিক পরিচিত ছিল। বর্তমানে এটি ভরাট করে এর ওপর দিয়ে 'সার্কুলার রোড' নামে কলকাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নিয়ে যাওয়া হয়েছে) খনন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মারাঠা আক্রমণের দিনগুলিতে আলিবর্দির নানামুখী যুদ্ধ লিপ্ততার সুযোগে কোম্পানি কলকাতা দুর্গকে যেভাবে মজবুত ও দুর্ভেদ্য করে তুলেছিল এবং ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছিল, তাতে করে এদেশীয় উচ্চপদস্থ অনেক রাজকর্মচারী, জমিদার, বণিক, ব্যাঙ্কার প্রভৃতির মনে ইংরেজদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং দুর্দিনে তারা কলকাতায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।[১০০] এই সুযোগে অর্থলোভী চতুর কোম্পানি খাল খনন ব্যয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশও কলকাতাবাসীর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছিল। ড. মুহম্মদ মোহর আলী উল্লেখ করেন, 'A major part of the cost of digging the Maratha Ditch .... was indeed met by raising contributions from the merchants and inhabitants there. Soon the English own over to their side a number of the influential zamindars, merchants and bankers, and embarked upon the scheme of capturing the political power of the country, even before the death of Alivardi Khan.'[১০১]

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলিবর্দি খানের মৃত্যু হয়। নতুন নবাব হলেন তাঁরই আপন দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলা। তাঁর সময়ে প্রথম থেকেই সুচতুর ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী ছলে-বলে-কৌশলে দরবারের প্রধান প্রধান নীতিনির্ধারক ও কলাকুশলীর সঙ্গে অন্তরালে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ও তাদের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় বাংলার নবাবের সঙ্গে একটা স্থায়ী বিরোধ জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে আসছিল। এবারে বাণিজ্যের চেয়ে বাংলার মসনদের দিকেই তাদের লক্ষ্য ছিল প্রবল। ড. সি. এস. শ্রীনিবাসচারীর ভাষায়, 'Ali Vardi Khan's death in 1756, the English

৯৭. মোগল রাজধানী ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৩।

৯৮. A Statistical Account of Bengal, Vol. IX., W. W. Hunter, pp. 181.

৯৯. Analytical History of India, pp. 80.

১০০. History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, Dr. Muhammad Mohar Ali, pp. 640.

১০১. Ibid., pp. 640.

were mere concerned with the doings of the Nawab than with the activities of the Dutch and the French in the province.'[১০২]

এ পর্যায়ে কোম্পানি নবাবের সঙ্গে বেশ কিছু বিষয়ে ইচ্ছাকৃত বিরোধ ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে কয়েকটি ছিল এরূপ প্রকৃতির, যা বাংলার স্বাধীন নবাবের জন্যে ছিল অপমানজনক ও গুরুতর। নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর ১০ই এপ্রিল সিরাজ যখন মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহণ করেন তখন বরাবরের প্রথানুযায়ী ইংরেজরা তাঁকে কোন উপঢৌকন পাঠায়নি বা কোনরূপ অভিনন্দনও জানায়নি। কোম্পানির তৎকালীন ফ্যাক্টর (ফ্যাক্টরি-প্রধান) উইলিয়াম টুক (William Tooke) নিজেও এ কথা স্বীকার করেছেন। তার ভাষায়, 'I have already observed by which means Seir Raja Doulet (*Siraj-ud-Daula*) came to the Nabobship, upon which occasion it is usual according to an old Eastern custom on being appointed Prince of the country to be visited by the different foreign nations and proper presents made him. This in the first place we neglected doing, and gave him no small vexation .'[১০৩]

দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল ইংরেজগণ কর্তৃক রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে অবৈধভাবে রাজনৈতিক আশ্রয় দান। রাজবল্লভ ছিলেন জাহাঙ্গিরনগর তথা ঢাকার দিওয়ান। আলিবর্দির সময় থেকেই তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় তহবিল তছরুপের অভিযোগ ছিল। তার জীবদ্দশাতেই রাজবল্লভের কাছে সিরাজ রাজকোষের হিসাব চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজা তা দেননি। এবার সিরাজ সেই হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তলব করলেন। বিপদ বুঝতে পেরে তরুণ নবাবের রুদ্ররোষ থেকে বাঁচাতে দিওয়ান স্বীয় পুত্র কৃষ্ণবল্লভের মাধ্যমে রাজকোষের ৫৩,০০,০০০ টাকা সরিয়ে গোপনে তাকে ও তার পরিবারকে কলকাতায় ইংরেজদের কুঠির আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলেন (১৩ই মার্চ, ১৭৫৬)। এই সময় কলকাতায় কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ বা প্রধান ছিলেন অ্যাডমিরাল ড্রেক (Roger Drake)। তিনি পলাতক কৃষ্ণবল্লভ ও তার পরিবারকে সবকিছু জেনেশুনেই আশ্রয় দেন। নবাব কৃষ্ণবল্লভকে তার হাতে সোপর্দ করতে ড্রেককে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ড্রেক তা অস্বীকার করেন। উল্লেখ্য নবাব আগে থেকেই নানা কারণে ইংরেজদের আচরণে ছিলেন যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। এবার কৃষ্ণবল্লভকে ফিরিয়ে দিতে ড্রেক যে জবাব দেন তাতে করে নবাবের ক্রোধ বহ্নি আরও জ্বলে উঠলো।

এ ছাড়া নবাব আলিবর্দির সূত্র ধরে সিরাজ, কোম্পানিকে তাদের কলকাতার কুঠি নতুনভাবে সংস্কারের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন। কিন্তু তারা তাঁর এ নির্দেশটিকেও উপেক্ষা করে সংস্কার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এতে নবাব আরও অপমানিত বোধ করেন। তবে ইংরেজ বণিকদের অন্য আর একটি কুকর্ম যা একদিকে নবাবের রাজকোষের জন্যে ছিল মারাত্মক ক্ষতিকর এবং দেশীয় বণিকদের স্বার্থবিরোধী, সেটিই নবাবকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের তথাকথিত ফরমানের ধারাবাহিকতায়

১০২. The Maratha Supremacy: The History and Culture of the Indian People, Vol. VIII., pp. 314-15.

১০৩. Quoted from, History of the Muslims of Bengal, Vol. I A., pp. 656-57.

সর্বশেষে বাদশাহ ফররুখশিয়ার কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার যে লিখিত অনুমতি দিয়েছিলেন, তার একটি প্রধান বিষয় ছিল 'দস্তক'। আধুনিকার্থে দস্তক হলো এক ধরনের বাণিজ্য পাশ, যা মূলত কোম্পানির অধ্যক্ষ কর্তৃক এর নিজস্ব কর্মচারীদের বরাবরে ইস্যু করা হতো -- এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বাণিজ্যিক মালামাল পরিবহনের জন্যে। বলাবাহুল্য এই দস্তকধারীর পরিবহনাধীন মালসামান সাধারণত নবাবের রাজস্ব কর্মচারীদের 'চেক' করার কোন অনুমতি ছিল না। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, দস্তক ব্যবহারের সুযোগ মূলত ও একমাত্রত কোম্পানির নিজস্ব কর্মচারীদেরই ছিল। কিন্তু বাস্তবে দস্তক ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে কর্মচারীরা কোম্পানির বাণিজ্যিক মালের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মালও চেকিংবিহীন পাচার করতো এবং সেক্ষেত্রে অবধারিতভাবে সরকার তার প্রাপ্য সায়ের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হতো। নবাব ইংরেজ কর্মচারীদেরকে তাদের এই অপকর্ম থেকে বিরত হতে নির্দেশ দেন এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত রাজস্ব দিয়ে ব্যক্তিগত বাণিজ্য করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু বেনিয়াগোষ্ঠী নবাবের এ আদেশটির প্রতিও কোনরূপ মর্যাদা দিতে অস্বীকার করলো।

ফলত তরুণ নবাবের উপর্যুপরি এই সকল আদেশ-নির্দেশ উপেক্ষিত হওয়ায় সিরাজ-উদ-দৌলা স্পষ্টত বুঝতে পারলেন, ইংরেজরা ইতোমধ্যে প্রভূত রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি সঞ্চয় করেছে যা তাদেরকে নবাবের সঙ্গে 'টক্কর' লাগানোর মতো পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তিনি এ-ও অনুভব করলেন, তারা নবাবের রাজ্যের মধ্যেই আরেকটি ক্ষুদ্র রাজ্য (state within a State) স্থাপন করে ফেলেছে।[১০৪] অবশ্য ইংরেজদের এই অভূতপূর্ব শক্তিমত্তা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের পিছনে মুর্শিদাবাদ রাজদরবারের বেশ কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির যে অদৃশ্য হাতের কারসাজি আছে সেটিও নবাবের অগোচর ছিল না। যা হোক শেষ পর্যন্ত তিনি অবাধ্য ইংরেজদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জুন কাশিমবাজার কুঠি আক্রমণ করে তা দখল করেন এবং পরে কলকাতাভিমুখে অগ্রসর হয়ে সেটিও দখল করে সেখানকার ইংরেজ সৈন্য ও অধিবাসীদের বন্দি করলেন (২০শে জুন)। নবাব বিজিত কলকাতার দায়িত্বে সেনাপতি মাণিকচাঁদকে রেখে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু পরের বছরই ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে ইংরেজরা পুনঃ সংগঠিত হয় এবং নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে কলকাতা আক্রমণ ও তা দখল করে (২রা জানুয়ারি, ১৭৫৭)। বস্তুত এ সময় পূর্ব ষড়যন্ত্রের কারণে ফৌজদার মাণিকচন্দ্র ইংরেজদেরকে কোনরূপ প্রতিরোধ করারই চেষ্টা করেননি। বরং কৌশলে তিনি কলকাতা থেকে সরে পড়েছিলেন। তখন বিজয়ী ইংরেজ দল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে প্রবেশ করে একে নতুনভাবে সুরক্ষিত করে গড়ে তোলে।

এদিকে নবাবের কানে কলকাতার পতনের সংবাদ পৌছা মাত্রই তিনি পুনরায় কলকাতার পথে যুদ্ধযাত্রা করলেন। কিন্তু এবার ইংরেজদের কূটকৌশল, বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্যের কাছে এবং স্বীয় উচ্চপদস্থ সেনাপতিদের ইংরেজদের সঙ্গে গোপন আঁতাতের আভাস পেয়ে নবাব শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হলেন। তাছাড়া এ সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে বিখ্যাত আফগান সেনাপতি আহমদ শাহ আবদালির (তিনি ৮-বার ভারত আক্রমণ করে পাঞ্জাব প্রভৃতি জয় করেছিলেন) বাংলা আক্রমণের আশঙ্কা থাকায় সিরাজ বরঞ্চ ইংরেজদের সঙ্গে এক চরম অপমানকর সন্ধি করতে বাধ্য হলেন (৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭)। বাংলার ইতিহাসে এটিই

১০৪. মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৮১।

'আলিনগরের সন্ধি' নামে সমধিক পরিচিত।[১০৫]
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলার আধুনিক পর্বের ভূমিরাজস্ব ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার আলোচনায় আমরা এ যাবৎ যে রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা করলাম, তার মূল উদ্দেশ্যই হলো এদেশে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও তাদের মধ্যে সম্পাদিত এই আলিনগরের সন্ধির বেশ কয়েকটি ধারা এখানে তুলে ধরা যেগুলির বাস্তবায়নের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী, এবং বাংলা, বিহার ও ওড়িশার স্বাধীন নবাবির জন্যে আগাম অশনি সঙ্কেত। বস্তুত এর মধ্যেই নিহিত ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরবর্তীকালে বাংলায় তথা ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি ও ভিত্তিপ্রস্তব।
১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি সম্পাদিত আলিনগরের সন্ধির মোট ধারা ছিল সাতটি[১০৬]। এর মধ্যে ৫টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এগুলি নিম্নরূপ:-

১. দিল্লির সম্রাট ফররুখশিয়ার কর্তৃক ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানিকে প্রদত্ত সর্বশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলির বাস্তবায়ন বিশেষ করে কলকাতার সন্নিহিত ৩৮টি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব ক্রয়াধিকার, অন্যকথায় পূর্ববর্তী নবাবদের মতো সিরাজ এতে বাধা দিতে পারবেন না;
২. বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় কোম্পানির 'দস্তক' ব্যবহারের সুযোগ অক্ষুণ্ণ থাকবে;
৩. তাদের বাণিজ্যকুঠি ও দুর্গগুলি বহাল থাকবে এবং নবাবের আক্রমণের ফলে এর যে ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে, নবাব তা যথাসম্ভব পূরণ করবেন ('All the Company's factories seized by the Nabob shall be returned. All the money, goods, and effects belonging to the Company, their servants and tenants, and which have been seized and taken by the Nabob, shall be restored. What has been plundered and pillaged by his people shall be made good by the payment of such a sum of money as his justice shall think reasonable.'[১০৭]);
৪. বিশেষ করে কলকাতার দুর্গকে তারা আরও মজবুত ও সুরক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারবে;
৫. কোম্পানি তার নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের জন্য টাঁকশাল চালু করতে পারবে।[১০৮]

উপরিউক্ত শর্তগুলোর প্রথমটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এই প্রথম বাংলার কোন সুবাদার

---

১০৫. কলকাতা আক্রমণ ও বিজয়ের পর নবাব বিজিত নগরের এই নতুন নামকরণ করেন মাতামহ তথা ভূতপূর্ব নবাব আলিবর্দি খানের নামানুসরণে।
১০৬. Sirajuddaulah and the East India Company : Background to the Foundation of British Power in Bengal (1756-1757), Dr. Brijen K. Gupta, pp. 100.
১০৭. The Fifth Report, pp. 402-3.
১০৮. বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Advanced Study in the History of Modern India, Vol. I., Dr. G. S. Chhabra , pp. 147.

দিল্লির সম্রাটদের দ্বারা ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত ফরমানোল্লিখিত সুবিধাদি প্রদানের কথা লিখিতভাবে মেনে নেন। এর আগে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাদের এই সুবিধা দিয়েছিলেন, কিন্তু তার বাস্তব প্রয়োগ কোম্পানি, সুবাদার শায়েস্তা খান ও মুর্শিদকুলি খানের আমলে করতে পারেনি। একইভাবে ফররুখশিয়ার প্রদত্ত সুবিধাদিও মুর্শিদকুলি ও তৎপরবর্তী নবাব শুজাউদ্দিন ও আলিবর্দি খান বাস্তবায়িত হতে দেননি। সত্যি বলতে তাঁরা এই বিষয়টি আদৌ কখনো আমলে নেননি। কিন্তু সিরাজ-উদ-দৌলা 'আলিনগরের সন্ধি'র মাধ্যমে ইংরেজদের এই অধিকারই শুধু স্বীকার করেননি, পরন্তু চুক্তির অপরাপর যে ধারাগুলি বিদ্যমান, তা থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে, 'There is no doubt that the terms of this treaty were both 'honorable and advantageous for the Company'.[১০৯] তার চেয়েও বড় কথা, 'The treaty of 'Alinagar thus secured to the English all the commercial and military advantages they asked for.'[১১০]

তবে এ কথা ঠিক যে সিরাজ-উদ-দৌলার পক্ষ থেকে কোম্পানি পূর্বোক্ত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের লিখিত প্রতিশ্রুতি পেলেও তাঁর সময়ে বহুল আলোচিত ৩৮টি গ্রামের জমিদারি-স্বত্ব তারা পুরোপুরি হস্তগত করতে পারেনি। এটি সম্ভব হয়েছিল পলাশির যুদ্ধের পর ক্ষমতাসীন নতুন নবাব মিরজাফর আলি খানের রাজত্বকালে। অবশ্য মিরজাফর এ ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে আগেই গোপন চুক্তি করে রেখেছিলেন (৩রা জুন, ১৭৫৭)। এই চুক্তির মধ্যে বেশ কয়েকটি ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল যা মূলত কলকাতাকে ঘিরে কোম্পানির জমিদারি ও বসতি সম্প্রসারণের সহায়ক হয়েছিল বললে ভুল হবে না। যেমন, চুক্তিতে নবাব লিখিত অঙ্গীকার করেন[১১১] :-

8 Within the ditch which surrounds the borders of Calcutta, are tracts of lands belonging to several zemindars; besides this I will grant the English Company six hundred yards without the ditch.

9 All the lands laying to the south of Calcutta, as far as Calpee, shall be under the zemindary of the English Company, and all the officers of those parts shall be under their jurisdiction. The revenues to be paid by them in the same manner with the other zemindars.'

চুক্তির উল্লিখিত ৯নং শর্ত মোতাবেক কোম্পানি কলকাতা-সুতানটিসন্নিহিত যে বিশাল জমিদারি বা ভূখণ্ড লাভ করেছিল তাই-ই বাংলার ভৌগোলিক ইতিহাসে ও সাধারণ্যে '২৪-পরগণা' নামে

১০৯. Comprehensive History of India, Vol. IX ., pp. 659.

১১০. History of the Muslims of Bengal, Vol. 1A., pp. 671.

১১১. দেখুন, The Fifth Report , pp. 404. আরও দেখুন, চব্বিশ পরগণা : উত্তর, দক্ষিণ ও সুন্দরবন, কমল চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৬১; প্রাচীন জরীপের ইতিহাস, অরুণকুমার মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৬২।

খ্যাত।[১১২]

৮নং ধারা বলে যে ভূমি হস্তান্তরিত হয় (এটি মূলত ১৭৫৮ সালে হস্তান্তরিত) তা ছিল কলকাতার পুরাতন জমিদারির অংশসহ মারাঠা খালের ভিতর ও বাইরের কিছু ভূমি।[১১৩]

২৪-পরগণার জমিদারি ক্রয়ের জন্যে স্থানীয় ভূম্যধিকারী জমিদারদেরকে কোম্পানির যে মূল্য বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ছিল, তা তারা কখনই প্রদান করেনি।[১১৪] এ নিয়ে পরবর্তীকালে বিশেষ করে হেস্টিংস-এর সময়ে অনেক দেনদরবার করেও কাজ হয়নি।[১১৫] তবে কোম্পানি এর ভূমিরাজস্ব দিতো। অন্যদিকে আলোচ্য জমিদারি ক্রয়ের জন্যে তারা বাদশাহকে 'পেশকাশ'স্বরূপ ২০,১০১ টাকা দিয়েছিল, আর এর বাৎসরিক খাজনা নির্দিষ্ট হয়েছিল ২,২২,৯৫৮ টাকা।[১১৬] তবে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কোম্পানির ওপর কোনরূপ 'আবওয়াব' ধার্য করা হয়নি, ফলে এই খাতে সরকারের রাজস্ব ঘাটতি হয়েছিল বার্ষিক প্রায় ২,০০,০০০ টাকা।[১১৭] যা হোক এ থেকে মূল ভূমিরাজস্বের বাইরে আবওয়াব ধার্যের পরিমাণ সম্পর্কেও অবগত হওয়া গেল।

আনুষ্ঠানিকভাবে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশির যুদ্ধের পরের মাসেই (জুলাই ২৬, ১৭৫৭) সমুদয় জমিদারি অধিগ্রহণ করেছিল[১১৮], তবে পাকাপোক্তভাবে তাতে জেঁকে বসতে তাদের আরও কিছু সময় ব্যয় হয়েছিল (২০শে ডিসেম্বর, ১৭৫৭)।[১১৯] এ পর্যায়ে তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল অধিগ্রহণকৃত মোট ভূমির পরিমাণ কতো ও তা থেকে কী পরিমাণ খাজনা উসুল হতে পারে -- সে সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা লাভ করা। এ জন্যে নবাবের মাধ্যমে তারা ভূমিরাজস্ব বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ সরকারি কানুনগো নিয়োগ করেছিল, 'to take an account of the Lands, Villages, Districts, Revenues and other particulars of the territory from the great Lake Eastward of Calcutta as far as Calpee on the South.'[১২০] এছাড়া কোম্পানি তার নিজস্ব কর্মচারীদের মধ্য থেকে জনৈক ক্যাপ্টেন রবার্ট

---

১১২ . ২৪টি পরগণার নাম:- (১) কলকাতা, (২) আকবরপুর, (৩) আমিরপুর, (৪) আজিমাবাদ, (৫) বালিয়া, (৬) বরিদহাটি বা বুরজুটি, (৭) বাসুন্দি বা বাসুন্দ্রি, (৮) দক্ষিণ সাগর, (৯) গড়, (১০) হাতিয়াগড়, (১১) ইকতিয়ারপুর, (১২) খাড়িজুরি, (১৩) খাসপুর, (১৪) মেদিনীমল্ল বা মেদনমল্ল, (১৫) মাগুরা, (১৬) মানপুর, (১৭) ময়দহ বা ময়দা, (১৮) মুনরাগাছা বা মুড়াগাছা, (১৯) পাইকান বা পৈথান, (২০) পাঁচকুলি বা পেঁচাখালি, (২১) সাতাল বা মেলাংমহল, (২২) শাহনগর, (২৩) শাহপুর ও (২৪) উত্তর পরগণা বা আমিরাবাদ।

১১৩ . এই অংশ কোম্পানি লাভ করেছিল সম্পূর্ণ নিষ্কর স্বত্বে -- প্রধানত কলকাতার দুর্গকে নদী ও সমুদ্রের দিক থেকে বহি:শত্রুর আক্রমণের প্রথম প্রতিরোধক হিশেবে ব্যবহারের অজুহাতে। দেখুন, The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 39-40.

১১৪ . The Fifth Report, pp. 404.

১১৫ . Ibid., pp. 404.

১১৬ . বাস্তবে কোম্পানি স্থানীয় জমিদারদের এ জন্যে দিয়েছিল ২,১৫,০০০ টাকা।

১১৭ . The East India Company's Land Policy and Commerce, pp. 40.

১১৮ . The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 24.

১১৯ . A Statistical Account of Bengal , Vol. I., W. W. Hunter , pp. 18.

১২০ . The Report of the Land Revenue Commission, Bengal, 1940, Vol. II., pp. 179.

বার্কার (Captain Robert Barker) ও তার সহযোগী হিশেবে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম সোয়ালো (Captain William Swallow; ইনি ছিলেন মূলত একজন শিল্পী ও নাবিক)-কে নিযুক্ত করে। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে পাকাপোক্তভাবে জমিদারি অধিগ্রহণের আগে থেকেই ক্লাইভ এদের দিয়ে মোটামুটি জরিপের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন।[১২১] এখন তা আনুষ্ঠানিকতার রূপ পেলো। অচিরেই (১৭৫৮) ২৪-পরগণা জমিদারিতে উইলিয়াম ফ্রাঙ্কল্যান্ড (William Frankland)[১২২] নামক একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে 'কালেক্টর' নিযুক্ত করা হয়। তার ওপরই বিস্তৃত পরিসংখ্যানভিত্তিক নতুন জরিপ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল।[১২৩] তাকে সহযোগিতার জন্যে এদেশীয় একজন অভিজ্ঞ হিন্দু কর্মচারীও নিয়োগ করা হয়েছিল, এর নাম কাশীনাথ।

ফ্রাঙ্কল্যান্ড ও তার জরিপকর্মি-দল[১২৪] একটানা ৬ মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে দক্ষিণ কলকাতার মোট ৮,১৬,৪৪৬ বিঘা ভূমি পরিমাপ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[১২৫] এর মধ্যে করাধীন ভূমি ছিল ৪,৫৪,৮০৪ বিঘা, করমুক্ত ২,১৭,৪৪৩ এবং অবশিষ্ট সমুদয় ভূমি -- 'being either barren and untenanted'.

সেপ্টেম্বর, ১৭৫৮-এর দিকে কোম্পানি কালেক্টরের কাছ থেকে ২৪-পরগণা জমিদারির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব-ভার তুলে নিয়ে 'কমিটি অভ নিউ ল্যান্ডস' (Committee of New Lands) নামক নবগঠিত একটি পরিষদের ওপর ন্যস্ত করলো। এখানে উল্লেখ্য যে, এই কমিটির সদস্যরাই ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'ইজারা প্রথা' (Farming System) প্রবর্তিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার দেখভাল করতো।

যা হোক কোম্পানির প্রায় দেড় বছরের সরাসরি ভূমিরাজস্ব পরিচালনা, ও আদায় কার্যক্রম তাদের মতে শেষ পর্যন্ত অসফল ও অসন্তোষজনক (unsatisfactory) বিবেচিত হয়েছিল। কারণ, একটি ভিনদেশি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী হিশেবে তারা চেয়েছিল অল্পসময়ে অধিক আয়; স্বাভাবিক পথে হোক, কী জোরজুলুম করে -- যেভাবেই হোক না কেন, নবীন জমিদার হিশেবে তাদের প্রত্যাশা ছিল প্রচুর অর্থ, অধিক মুনাফা। কিন্তু তা না-হওয়ায় তখন তারা আরও বিকল্প পথের সন্ধানে ব্যাপৃত হলো।

১২১. The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 41.

১২২. ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এর নাম 'William Frankling' হিশেবে উল্লেখ করেছেন। দেখুন, The Report of the Land Revenue Commission, Bengal, 1940, Vol. II., pp. 179 কিন্তু তা ঠিক নয়।

১২৩. The Report of the Land Revenue Commission, Bengal, 1940, Vol. II., pp. 179; The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 41; The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 25.

১২৪. সরকারি কানুনগো দপ্তরেরও ব্যাপক সংখ্যক জরিপকর্মী এই কাজে শরিক হয়েছিল।

১২৫. এই জরিপ কাজে তৎকালীন মুদ্রায় প্রায় ৫০,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছিল। দেখুন, The Fifth Report, pp. 406; কলকাতার প্রথম জরিপ সম্বন্ধে আরও জানার জন্যে দেখুন, প্রাচীন জরীপের ইতিহাস, অরুণকুমার মজুমদার, পৃষ্ঠা ১২২-২৭।

বস্তুত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার নতুন পথ বা পন্থা বের করতে গিয়েই অনেক চিন্তা-ভাবনা, নিজেদের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে মতামত চালাচালি, এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানির গভর্নর ও কাউন্সিল-এর কাছে প্রাথমিকভাবে লাভজনক বিবেচিত মনে হওয়ায় ১৭৫৯ সালের যে মাসে 'ইজারা ব্যবস্থা' চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এই নতুন ব্যবস্থার অধীনে কাজ শুরু হয় ঐ বছরের জুলাই মাসে।[১২৬] প্রসঙ্গত এখানে একটু বলা দরকার যে, নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের সম্মুখে মোট ৩টি প্রস্তাব ছিল।[১২৭] যথা:-

ক. প্রচলিত ব্যবস্থার অধীনে রায়তদের কাছ থেকে বা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি ভূমিরাজস্ব গ্রহণ;

খ. স্থানীয় এজেন্ট বা নেতৃত্বশীল ভূস্বামীদের মাধ্যমে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ;

গ. ফটকামূলক ব্যবসায় নিরত ধনিকশ্রেণী বা পুঁজিপতিদের (Speculative Capitalists) মাঝে ভূখণ্ড ইজারা দিয়ে বছরের শুরুতেই এককালীন ভূমিরাজস্ব আদায়।

কোম্পানি এই শেষের বিকল্পটিকেই গ্রহণ করেছিল।

নতুন ব্যবস্থায় গোটা ২৪-পরগণা জমিদারিকে মোট ১৫টি বড় 'লট' (lot)-এ বিভক্ত করা হয়েছিল[১২৮] এবং ৩ বছর মেয়াদি প্রকাশ্য নিলামে সর্বোচ্চ ডাককারীকে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ইজারা দেয়া হয়েছিল। শর্তগুলো[১২৯] :-

১. ইজারা প্রাপ্ত ভূমিতে স্থিত রায়তের দখলি ভূমির খাজনা সাধারণত বাড়ানো যাবে না; তবে সংলগ্ন জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদ করা হলে সেক্ষেত্রে ইজারাদার যুক্তিসঙ্গত খাজনা বৃদ্ধির সুযোগ পাবে;

২. 'পাট্টা' চুক্তিতে উল্লিখিত খাজনা যথাসময়ে পরিশোধ করতে রায়ত অস্বীকৃত বা পাওনা বকেয়া না হলে তাকে ভূমি থেকে উৎখাত করা যাবে না[১৩০] ;

৩. আগে-ভাগে না জানিয়ে ভূমিতে দণ্ডায়মান কোন গাছ কাটা যাবে না;

---

১২৬. The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 41.

১২৭. The Fifth Report, pp. 409; The Report of the Land Revenue Commission, Bengal, 1940, Vol. II., pp. 180.

১২৮. ১৫টি বৃহৎ 'লট'-এর স্থলে কোম্পানির তদানীন্তন প্রভাবশালী সদস্য হলওয়েলের প্রস্তাব ছিল পরগণাওয়ারি (২৪/২৫টি লটে) প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে সেগুলি ইজারা দেয়ার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমেই ১৫টি লটে ডাকের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

১২৯. The Report of the Land Revenue Commission, Bengal, 1940, Vol. II., pp. 179.

১৩০. বৈধ উত্তরাধিকারী না-রেখে কোন রায়ত মৃত্যুবরণ করলে তার পরিত্যক্ত ভূমির ব্যাপারে সরেজমিন তদন্ত ক্রমে কালেক্টর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। দেখুন, The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 25; Politics and Land System in Bangladesh, Dr. A. M. M. Shawkat Ali, pp. 10.

৪. ইজারা-গ্রহীতাগণ রায়তদের কাছ থেকে সাবেক ইজারাদারদের মতোই খাজনা আদায় করবে; এবং

৫. প্রচলিত প্রথানুসরণে ইজারাদারগণই প্রাপ্ত ভূমির বিভিন্ন নদীর তীর রক্ষণাবেক্ষণ ও বাঁধ তৈরি এবং পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার ও দেখাশুনা করবে।

উল্লেখ্য কোম্পানি ৩ বছরের জন্যে ইজারাদারদের হাতে ২৪-পরগণা জমিদারির ভূমিরাজস্ব দাবি ও আদায়ের ভার তথা রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দিলেও ভূমির 'রয়্যালটি'সহ অন্যান্য প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্বহস্তেই রেখে দিয়েছিল -- 'reserving to the Company the royalties of the land, as also the judicial power, fines, confiscations, burried treasures, etc.'[১৩১]

উল্লেখ্য, ১৭৫৯ সালে কলকাতার টাউন হলে প্রকাশ্যে এই নিলাম ডাক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিচে মোট ১৫টি লটের ডাকের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো[১৩২] ঃ-

পরগণার নাম	সরকারি মূল্য ('সিক্কা' টাকায়)	নিলাম ক্রেতার নাম	ডাক-মূল্য ('সিক্কা' টাকায়)
মাগুরা	১,০২,০০০	রাধাকৃষ্ণ মল্লিক	১,২৬,১০০
মনরাগাছা	৮৯,০০০	মিঃ স্যামুয়েল গ্রিফিথ	১,২০,০০০
আজিমাবাদ	৭১,০০০	শুকদেব মল্লিক	৮০,৫০০
গড়	১৪,০০০	চাঁদ হালদার	১৭,০০০
মেদিনীমল-আকবরপুর	৫৭,০০০	জে. জেড. হলওয়েল	৭২,০০০
গাউসপুর বা খাসপুর	১০,০০০	এডওয়ার্ড হ্যান্ডেল	১৫,৭০০
হাতিয়া গড় ও ময়দহ	৫০,০০০	জে. জেড. হলওয়েল	৫১,৫০০
বরিদহাটি-আক্তারপুর	৫০,০০০	কুণ্ডু ঘোষাল	৭০,০০০
মামুদ মিয়াপুর	৩০০	রামচরণ ন্যায়	৬০০
শাহপুর	১১,০০০	সপ্তরীরাম বিশ্বাস	১৩,৩০০
শাহনগর	৭,০০০	রামচরণ ন্যায়	১০,৩০০
দক্ষিণ সাগর	২,০০০	রাধা কৃষ্ণ মল্লিক	৩,৮০০
বালিয়া-বাসনধারী	৫৩,০০০	রাম সন্তোষ সরকার	৭০,০০০
কলকাতা, মানপুর, পাইকান ও খাড়িজুরি	৪৫,০০০	রাধাচরণ মল্লিক	৮১,৫০০
			৭,৬৫,৭০০

১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি কোম্পানির গভর্নর ও কাউন্সিলের এক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত

১৩১. The Fifth Report, pp. 409-10.
১৩২. Ibid., pp. 410.

হলো যে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে কোম্পানির নিজস্ব কোন কর্মচারী অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।[১৩৩] 'কোর্ট অভ ডিরেকটর'গণও উক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছিল। তারপরও উপরিউক্ত তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, স্যামুয়েল গ্রিফিথ, হলওয়েল ও এডওয়ার্ড হ্যান্ডেল নামে কোম্পানির তিন জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী অংশ গ্রহণ করেছিল এবং তন্মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ডাকই ছিল বহুল আলোচিত নাম জে. জেড. হলওয়েল-এর (দু'টি মিলিয়ে)। এই তালিকার আরও একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয় ছিল, তা এই যে (এটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও তাৎপর্যপূর্ণও বটে), এতে কোন মুসলমানের নাম নেই। মূল নিলাম ডাকে কোন মুসলমান ধর্মাবলম্বী অংশ গ্রহণ করেছিল কি-না, অথবা করলেও, সর্বোচ্চ ডাকে তারা যে টেকেনি, তার প্রমাণ উক্ত তালিকা। তবে প্রকৃত কারণ যাই হোক না কেন, পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসনামলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে অবনতি, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, শোচনীয় দুর্গতি দেখা দিয়েছিল, তার প্রাথমিক নমুনার কিছুটা এর মধ্যেও পাওয়া যাবে বলে মনে করি।

ইজারা প্রথায় কোম্পানির নিজস্ব কর্মচারীর তেমন প্রয়োজন ছিল না। ফলে একদিক থেকে তা সরাসরি বা রায়তওয়ারি ব্যবস্থার চেয়ে কম ব্যয়বহুল ছিল। এতে স্থানীয় খাজনা-প্রদেতা রায়তগণের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ না হওয়ায় ভূমিরাজস্ব আদায়ের ন্যায় একটি বিরক্তিকর ও ঝামেলাপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় যে অবাঞ্ছিত কঠোরতা ও নৃশংসতা প্রদর্শন করতে হতো, যার ফলে জনসাধারণের মাঝে তাদের ভাবমূর্তি কখনও কখনও ক্ষুণ্ন হতো, -- সেই সম্ভাবনাও অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল। তথাপি কোম্পানির দৃষ্টিতে ইজারা প্রথা অলাভজনক বিবেচিত হয়েছিল। ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে মেয়াদ শেষে এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হলো। বস্তুত যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ইজারা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, এককথায় তা অর্জিত না হওয়াই এ থেকে কোম্পানির সরে আসার কারণ।[১৩৪] অন্য যে সব কারণ ছিল:-

প্রথমত ইজারাদারেরা ফ্রাঙ্কল্যান্ডের প্রস্তুতকৃত ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দের 'রেন্ট-রোল' (Rent-Roll)-এর ভিত্তিতে রায়তদের কাছ থেকে খাজনা গ্রহণের জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকলেও বাস্তবে তারা এর ধার-ই ধারতো না, অন্য কথায় প্রায়শই তারা দরিদ্র রায়তদের কাছ থেকে পাওনার অতিরিক্ত আদায় করতো। সঙ্গত কারণে তা রায়তসাধারণের আর্থিক কষ্ট ও দুর্গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। অবশ্য তাদের পক্ষেও যুক্তি ছিল। যেহেতু ইজারা-ডাক গ্রহণের সময়ই তারা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অত্যন্ত চড়া মূল্যে (পূর্বোদ্ধৃত তালিকা থেকেই দেখা যাবে, একটি ডাকও সরকারি মূল্যের নিচে নেই, যা সাধারণত হয় না) ইজারা নিয়েছিল, এবং একটা সুনির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যেই তাদেরকে লগ্নিকৃত অর্থ (ভুলে গেলে চলবে না যে এরা ছিল মূলত

১৩৩. The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 43.

১৩৪. ড. মাজহারুল হকের মতে এই ব্যবস্থা চালুর মুখ্য কারণ ছিল: 'The policy of farming was adopted by the Governor and Council with the intention of bringing to the credit of the Company all the rents the ryots paid, less reasonable costs of collection or such profits as the farmers must retain for their labours.' (The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 44). বস্তুত এটি বাস্তবায়িত না হওয়ায় তারা এ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। মুনাফালোভী কোম্পানির পক্ষে সেটাই ছিল স্বাভাবিক।

প্রত্যক্ষ-ভূমি-সম্পর্কহীন শহুরে নব্য পুঁজিপতি বা ধনিকশ্রেণী) সুদে-আসলে অর্থাৎ যাবতীয় খরখরচা ও লাভসহ মূল অর্থ ফিরে পেতে হবে, স্বভাবতই তারা চাইতো ভালো-মন্দ দু'পথেই খাজনা আদায় করতে।

দ্বিতীয়ত ইজারা-শর্তেই উল্লেখ ছিল যে ইজারাদারগণ প্রাপ্ত লটের নদীর তীর রক্ষণাবেক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণসহ পয়ঃপ্রণালী সংস্কার ব্যক্তিগত ব্যয়ে করবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল তারা জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট এই কাজগুলো কমবেশি করছে বটে, তবে এর জন্যে যে ব্যয় সেটা তারা সুদসহ রায়ত ও ভূম্যধিকারীদের কাছ থেকেই উসুল করে নিচ্ছে। ড. মাজহারুল হক বলেন, 'It appears that the money spent on these public services was recovered from the rayots with an interest of 12 % per annum.'[১৩৫] বলাবাহুল্য এটি ছিল ইজারা-শর্তের মারাত্মক বরখেলাফ ও কোম্পানির অভিপ্রায়-বহির্ভূত।

তৃতীয়ত এই ব্যবস্থার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক ছিল, এটি প্রবর্তনের ফলে আবহমানকাল ধরে বাংলা তথা ভারতীয় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় রায়ত ও রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র হিশেবে যে ক্ষমতাশালী ঐতিহ্যবাহী শ্রেণীটি ছিল, সাধারণভাবে যার অভিধা ছিল জমিদার ও তালুকদার, সেটা ইজারাদারদের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ভুঁইফোড় মধ্যস্থতার কারণে ক্রমশ নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ছিল। প্রচলিত ব্যবস্থায় রায়ত-ভূম্যধিকারীদের কাছ থেকে যুগ যুগ ধরে এরাই রাষ্ট্রের হয়ে রাজস্ব আদায় করতো, আদায়কৃত রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দিয়ে অবশিষ্টাংশ তারা ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের জন্যে রেখে দিতো। অবশ্য প্রতি বছরই যে ধার্য রাজস্বের সবটাই আদায় হতো, তেমন নয়। কখনো কখনো বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, মহামারিসহ অন্যান্য দৈব-দুর্বিপাকে ফসল হানি বা আদৌ না হলে রায়তের দেয় খাজনা বকেয়া পড়তো। এ সময় রায়তের পক্ষে খাজনা পরিশোধ দূরের কথা, বেঁচে থাকাই হতো দায়। তখন এই জমিদার-তালুকদারেরাই রায়তকে 'তাকাবি ঋণ' দিয়ে তাকে পুনঃ কোমর সোজা করে দাঁড়াতে সাহায্য করতো। এ ছাড়া অনেক সময় তারা রায়তের খাজনা মওকুপের জন্যেও সরকারের কাছে দেন-দরবার করতো। ফলত এভাবে রায়ত ও জমিদার-তালুকদারের মধ্যে অজান্তেই একটা নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতো। কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে ইজারাদারদের এই দায় ছিল না। বরং তারা স্বল্প সময়ে যতোটুকু পারতো, কর্তৃপক্ষের অগোচরে রায়তদেরকে শুষে নিতে চেষ্টা করতো -- 'Their whole interest was to squeeze out from the rayots as much as they could.'[১৩৬] এতে করে একদিকে যেমন গরিব রায়ত আরও শোষিত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লো, অন্যদিকে ইতিহাস-প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিশেবে রায়তদের সুখ-দুঃখের 'নিকট বন্ধু' (!) জমিদার-তালুকদারগণ অস্তিত্ব-শূন্য ও গুরুত্বহীন-ই শুধু হয়ে পড়লো না, পরবর্তীকালে আমরা দেখবো তাদের অবস্থা কী ভয়াবহ পরিণামের দিকে গেছে।

চতুর্থত ইজারাদারগণ প্রাপ্ত ভূমি মাত্র ৩-বছরের জন্যে হাতে পাওয়ায় সঙ্গত কারণেই তারা এর ভূমির যে কোন ধরনের উন্নয়নে পয়সা ব্যয় করতে উৎসাহিত ছিল না। কারণ মেয়াদ শেষে একই ভূখণ্ডের পরবর্তী ইজারা সে পাবে -- এই নিশ্চয়তা তার আদৌ ছিল না। ফলে প্রাথমিক

১৩৫. The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 45.
১৩৬. Ibid., pp. 44.

লগ্নিকরণের পর এতে পরবর্তী যে কোন ধরনের ব্যয় তার কাছে অপচয়ের শামিল ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

সুতরাং যেহেতু আমরা জানি যে, 'Under the system of short term farming, agriculture was bound to suffer and its effect rebounded upon all the people connected with land.'[১৩৭] সেহেতু কোম্পানির পক্ষে, 'It was .... decided to try direct management again in order to ascertain the real value of lands.'[১৩৮] এখন সে আলোচনাই করবো।

২৪-পরগণা জমিদারি কোম্পানির সরাসরি ব্যবস্থাপনায় আসার পর তাদের জন্যে প্রাথমিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইতোপূর্বেকার ইজারা প্রদত্ত ভূমিখণ্ডগুলি থেকে প্রকৃত ভূমিরাজস্ব আয় সম্পর্কে একটা সম্যক জ্ঞান বা ধারণা লাভ করা। কারণ ইজারা প্রথা প্রবর্তনেব পর কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তথা নেতৃস্থানীয়রা সর্বদাই মনে করে আসছিল যে, ইজারাদারগণ ভূমির প্রকৃত প্রাপ্য রাজস্ব আয় বা মূল্য গোপন করেছে -- 'There was a suspicion that the farmers had concealed the real value.'[১৩৯] সত্যি বলতে ইজারাদারগণ প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে অত্যন্ত চড়া মূল্যে 'লট' ক্রয় করলেও এবং তাদের প্রত্যেকেরই ব্যয় কমবেশি তা থেকে উঠে এলেও, তখন পর্যন্ত (১৭৬২) পাট্টা গ্রহণকারী রায়তদের কাছে তাদের বকেয়া থেকেই যাচ্ছিল বা গিয়েছিল। এবার কোম্পানি 'কমিটি অভ নিউ ল্যান্ডস'-কে সেগুলি আদায় করার নির্দেশ দিলো।[১৪০] এখানে বলা দরকার যে, ইজারা প্রথা রায়তি ভূমির ক্ষেত্রে উঠিয়ে নেয়া হলেও জমিদারির অন্তর্গত বিভিন্ন বাজারে তা তখনও বহাল ছিল। এ ব্যাপারে কোম্পানির বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল বাজারের টোল ও অন্যান্য কর আদায়ের জন্যে তাদের নিজস্ব কর্মচারীর তুলনায় স্থানীয় ইজারাদারেরাই অধিক উপযুক্ত।

যা হোক নতুন ব্যবস্থায় 'কমিটি অভ নিউ ল্যান্ডস' ভূম্যধিকারী রায়তদের মধ্যে নতুন পাট্টা বিলির লক্ষ্যে প্রথমেই বিভিন্ন পরগণাব বন্দোবস্তযোগ্য ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য বা ফসলের একটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হিসাব সংগ্রহের জন্যে সমুদয় ভূমির পরিমাপ করলো। রায়তদেব মধ্যে ভূমি বণ্টনে তারা দু'টি জিনিসের প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছিল।

এক . কালেক্টর বিভিন্ন প্রকারের ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের গড় নিরিখের ওপর উক্ত দ্রব্যের প্রচলিত বাজার মূল্যে বন্দোবস্তযোগ্য ভূমির রাজস্ব নির্ধারণ করবেন, এবং তা অবশ্যই রায়তের সামর্থ্যের মধ্যে হতে হবে।[১৪১] অবশ্য এটা বলা খুবই দুষ্কর, উক্ত গড় মূল্য উৎপন্ন দ্রব্যের কতোটুকু অংশে, কী হারে নির্দিষ্ট হয়েছিল -- অর্থাৎ মোট উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ, না অর্ধেকাংশ হিসেবে বাজার

১৩৭ The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 28.

১৩৮ . Ibid., pp. 28-9.

১৩৯ . The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp 46.

১৪০ . Ibid., pp. 46.

১৪১ . Proceedings of the Committee of New Lands, 9th June, 1762, quoted from, The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 46.

মূল্য নিরূপিত হয়েছিল, তা আজ আর সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে সমকালীন বাস্তবতায় এটা ভাবা সম্ভবত অনুচিত হবে যে, তা উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশের কম ছিল।

দুই পাট্টা সাধারণত ৫-বছরের জন্যে অর্থাৎ মধ্য-মেয়াদে লিখিত চুক্তিতে দেওয়া হবে, এবং এই সময়-পরিসরে রায়তের ভোগদখলে পাট্টায় বর্ণিত জমির অধিক (এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন রায়ত সন্নিহিত জঙ্গল ভূমি আবাদ করলে, ভূমিসংলগ্ন খাল বা নদীতে পয়স্থি হলে ইত্যাদি) পাওয়া গেলে উপযুক্ত পরিমাপান্তে তাতে পাট্টায় উল্লিখিত একই হারে রাজস্ব ধার্য করা হবে। নতুন ব্যবস্থার আর একটি বিশেষত্ব ছিল, পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট 'কমিটি অভ নিউ ল্যান্ডস'-এর যিনি প্রধান বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাকে বন্দোবস্ত প্রাপক রায়তের ভূমিসংক্রান্ত যে কোন বিরোধ শুনানি ও নিস্পত্তি করার একটি ব্যাপক ও সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এ জন্য তাকে আদায়কৃত বা সংগৃহীত ভূমিরাজস্বের শতকরা আড়াই ভাগ কমিশন বা 'উপ্রি' বাবদ দেয়া হতো।[১৪২]

'কমিটি অভ নিউ ল্যান্ডস'-এর সদস্যরা ভূমিসংক্রান্ত সমস্যাদি ও এর অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনার জন্যে প্রতি সপ্তাহে মোটামুটি একবার বৈঠকে বসতেন। সামগ্রিক কাজের সুবিধার্থে প্রতিটি পরগণার দেখাশুনার ভার তারা নিজেদের মধ্যে আপোষে ভাগ করে নিয়েছিলেন। এ ছাড়া যেহেতু তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি ভূমিখণ্ডের প্রকৃত মূল্য (উৎপন্ন দ্রব্যের গড় মূল্যের নিরিখে) সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা সেহেতু পরগণাগুলিকেও তারা আরও ছোট ছোট অংশে বা ইউনিটে ভাগ করার পরিকল্পনা করেছিলেন, যাতে করে ইজারাদারের চেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী রায়ত প্রাপ্ত ভূমির উন্নয়নের প্রতি আরও আগ্রহী ও যত্নশীল হয়।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও কোম্পানির সরাসরি ব্যবস্থাপনা প্রার্থিত ফলোৎপাদনে ব্যর্থ হয়েছিল। ড. মাজহারুল হক-এর ভাষায়, 'The direct management of the zamindary of the 24 Pargannahs by the members of the Committee of New Lands for three years did not produce the expected results.'[১৪৩]

এ পর্যায়ে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি পরীক্ষামূলকভাবে ইজারা প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

অবশ্য ততোদিনে ২৪-পরগণা জমিদারি ও সংলগ্ন ভূমির প্রকৃত মূল্যের একটা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য চিত্র বা তথ্য তাদের হাতে এসে গিয়েছিল। স্বভাবতই তাই ইজারা প্রথায় কোম্পানির লাভের সম্ভাবনা ছিল নিশ্চিত। তবু এবারে গভর্নর ও তার কাউন্সিলে, ইজারা ডাক প্রকাশ্যে দেয়ার পরিবর্তে নির্ভরযোগ্য ও সঠিক লোক বাছাই করে তাদের কাছে বন্দোবস্ত দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় ডাককারীদের মূল লক্ষ্য হলো, আগের মতো পরগণাওয়ারি বা কয়েকটি পরগণা একত্র করে ডাক না দিয়ে গোটা জমিদারিকে ছোট ছোট তালুকে বিভক্ত করে সামাজিকভাবে অর্থ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে ইজারা দিয়ে কোম্পানির অনুগত ও পছন্দের -- 'persons carefully chosen' -- একশ্রেণীর ইজারাদারগোষ্ঠী সৃষ্টি করা।

উল্লেখ্য, এ সময় কলকাতার কালেক্টর ছিলেন সামনার (Sumner)। নব্য ইজারাদার বাছাইয়ের

১৪২. The Agrarian Policy of the British in Bengal pp. 29.

১৪৩ The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp 46.

ব্যাপারে তার হাতে ছিল কাউন্সিলের প্রায় সার্বিক ক্ষমতা। ফলে তিনি নিজস্ব পছন্দে কলকাতার তৎকালীন ধনী ও অবস্থাপন্নদের মধ্যে তালুকদারি প্রদান করা যেতে পারে এমন লোকদের একটি তালিকা তৈরি অন্তে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর (ইতোমধ্যে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানি লাভ করেছিল; এ সম্পর্কিত আলোচনা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য) সেটি গভর্নর ও কাউন্সিলের সভায় অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন।

যা হোক এ সময় ইংল্যান্ডস্থ কোম্পানির ডিরেক্টরমণ্ডলী বক্সারের যুদ্ধোত্তর মুর্শিদাবাদের অবস্থা মোকাবিলা করতে ক্লাইভকে দ্বিতীয়বারের ন্যায় বাংলায় প্রেরণ (৩রা মে, ১৭৬৫)। ক্লাইভ, পূর্বোক্ত তালুকদারি বিলিবণ্টনসংক্রান্ত কাউন্সিলের অনুমোদনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলেন। তিনি কলকাতার ৩৫ জন ধনাঢ্য নাগরিকের নামসম্বলিত একটি দরখাস্ত গভর্নর ও কাউন্সিলের বিশেষ সভায় পেশ করে জানালেন যে, কালেক্টর সামনারের প্রস্তাবিত তালুকদারগণের যে নাম-তালিকা অনুমোদন করা হয়েছে, তা যথাযথ বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়নি। অধিকন্তু তালুকদারগণ তালুকের যে মূল্য হেঁকেছে তা থেকেও অধিক মূল্য তার উল্লিখিত ৩৫-দরখাস্তকারী দিতে প্রস্তুত। ক্লাইভ আরও লোভ দেখালেন, দরখাস্তকারীগণ ২৪-পরগণা জমিদারির জন্যে বার্ষিক ৯,২০,০০০ টাকার খাজনা ও তৎসহ অতিরিক্ত ৮০,০০০ টাকা দিতে আগ্রহী যদি তাদের অনুকূলে ইজারা দেয়া হয়।

শোনা যায় ক্লাইভ দরখাস্তকারীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের উৎকোচ নিয়ে তাদের পক্ষে এই 'অবৈধ' ওকালতি করেছিলেন। তবে শোনা কথার কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও পলাশি-পূর্ব ও উত্তর তার যে সুবিধাবাদী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে এ অভিযোগ একেবারে অমূলক ছিল তা বলা যাবে না।

যা হোক ক্লাইভের বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণেই হোক, কী তার লোভনীয় প্রস্তাবের ফলেই হোক, কাউন্সিল তার কথা মেনে নিল বা নিতে বাধ্য হলো। অন্যদিকে কালেক্টর সামনারকে পরামর্শ দেয়া হলো প্রস্তাবিত ইজারাদারদের তালিকায় ৩৫ জনের মধ্য থেকে আরও কিছু নতুন নাম অন্তর্ভুক্ত করতে এবং তাদের আয়-ব্যয়ের প্রতি কড়া নজর রাখার। কিন্তু যেহেতু ইতোমধ্যে ইজারাদারদের মধ্যে তালুক বণ্টনের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সামনারের নতুন প্রস্তাবে ইজারাদারদের কেউ-ই রাজী ছিল না, স্বভাবতই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, প্রদত্ত তালুক মাত্র ১-বছর মেয়াদি হবে। বলাবাহুল্য মেয়াদান্তে ২৪-পরগণা জমিদারি ও সংলগ্ন ভূমি পুনরায় কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলে এসেছিল।

এ পর্যায়ে ক্লাইভ-উত্তর ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অব্যবহিত পরবর্তী গভর্নর হ্যারি ভেরেলস্ট (Harry Verelst) ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ২৪-পরগণা তথা কলকাতা জমিদারির আয়-ব্যয় ও জমাজমির যে বিস্তৃত পরিসংখ্যান তৈরি করেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলে ধরছি। বস্তুত এ থেকে একদিকে সংশ্লিষ্ট জমিদারির পূর্বাপর আয়-ব্যয় বা ভূমিরাজস্বের একটি বাস্তব চিত্র যেমন ফুটে উঠবে, তেমনি অন্যদিকে তাদের শোষণ-নিষ্পেষণের মাত্রা সম্পর্কেও প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করি।

সিলেক্ট কমিটির ২৯শে এপ্রিল (১৭৬৭) তারিখের সভায় উপস্থাপিত ভেরেলস্ট-এর বিবরণীতে ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি পাওয়া যায়[১৪৪]:-

১৪৪. The Fifth Report, pp. 415-16.

২৪-পরগণা জমিদারির চাষাধীন ভূমি	১০,৮২,৫৪৩	বিঘা	১৫	কাঠা		
তন্মধ্যে লাখেরাজ জমির পরিমাণ	২.৮৩,৭০২	,,	২	,,	৮	গণ্ডা
জমিদারি অধিগ্রহণ কালে লাখেরাজ	২,০২,৪৮১	,,	১৮		৮	,
দীর্ঘ সময়েব জন্যে পতিত জমি	২৫,৬৭৯	,,	১৩	,,		
ইজারা প্রদত্ত বা বায়তি জমি	৫,৯১,১৭২	,,	৯	,,		
খামার বা চুক্তিভিত্তিক চাষের জমি	১,৯৮,৩০৫	,,	১৯	,,	১২	,,
ইজাবা .থকে বার্ষিক ভূমিবাজস্ব আয়	১০,১২,৩০৫	টাকা	১২	আনা		
লাখেবাজ ভূমির জন্যে রাজস্ব ক্ষতি	৩,১৪,৬৩৮	,,	১২	,,		
খামাব থেকে বার্ষিক ভূমিরাজস্ব আয়	২,৯১,৮৪২	,,	১০	আনা	১১	পাই

এ ছাড়া 'বাজে জমা' যেমন পণ্য শুল্ক ও টোল, মুদ্রা বদলের বাটা, বিবাহ কর, নৌকা, রাস্তা, ফেরিঘাট, সেতু বা পুলের ওপর ধার্য কর, গ্রাম পরিদর্শনের নজর সেলামি, তাকাবি-র ওপর সুদ প্রভৃতি থেকেও কোম্পানির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আয় হতো।

সব কিছু মিলিয়ে হ্যারি ভেরেলস্টের হিসাবে ২৪-পরগণা তথা ব্যাপকার্থে কলকাতা জমিদারি থেকে কোম্পানির আয় ছিল বার্ষিক প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা[১৪৫]। অন্তত এই পরিমাণ আয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে এখানে এটাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, হ্যারি ভেরেলস্টের তালিকায় হিসাবের গড়মিল বা অতিরঞ্জন যদি কিছু থেকেও থাকে (কেউ কেউ তা মনেও করেন), তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, কোম্পানি-সমীপে -- 'Verelst's investigation therefore revealed that the lands were worth much more than they had so far yielded.'[১৪৬]
প্রাথমিক অবস্থায় এটা নিশ্চয়ই কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল না।

এখানে আরও একটি বিষয় তুলে ধরলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে, কলকাতার তথাকথিত ৩টি শহর (সুতানটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর) সমন্বিত পুরাতন জমিদারি ও ২৪-পরগণা জমিদারি থেকে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে আধিপত্য বিস্তারের সূচনা লগ্নে জমিদারি ব্যবস্থাপনার সমস্ত খয়-খরচা বাদ দিয়ে --'clear of all charges', 'nett revenue' হিশেবে যে বিশাল অঙ্কের অর্থ (একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিবেচনায়) আয় বা অর্জন করেছিল, তার দিকে একপলক দৃষ্টি দিলেই বুঝা যাবে, বেনিয়াগোষ্ঠী এদেশের আপামর জনমণ্ডলীকে গোড়া থেকেই কী নির্মমভাবে শোষণ-দোহন শুরু করেছিল।
যা হোক ১৭৬০ থেকে ১৭৭০ -- এক দশকে আলোচ্য জমিদারি থেকে কোম্পানির আয় (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য):-

১৪৫. The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal., pp. 49; The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 32
১৪৬ The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 32 .

বছর (মে থেকে এপ্রিল)	রাজস্ব আয় (টাকায়)
১৭৬০-৬১	৭,৩০,৫৯১
১৭৬১-৬২	৫,৯৭,৩৫৫
১৭৬২-৬৩	৪,৮৬,৩৫২
১৭৬৩-৬৪	৭,৪০,৪৭৩
১৭৬৪-৬৫	৯,৭৯,৩৪৯
১৭৬৫-৬৬	৬,০২,৪৫৯
১৭৬৬-৬৭	৮,০১,৫৭১
১৭৬৭-৬৮	১১,১৬,৩৯৫
১৭৬৮-৬৯	১০,৩০,৪৬৪
১৭৬৯-৭০	১০,২২,৮৪৫

উপসংহারে বৃহত্তর কলকাতা জমিদারি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলে এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করবো।

১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে শাহজাদা মুহম্মদ আলি গহর (পরবর্তীকালের মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলম) বাংলার নবাব মিরজাফর আলি খানকে কিছুটা 'size-up' করার জন্যে ৪০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বিহার আক্রমণ করেছিলেন। নবাব এতে ভীষণ ভীত হয়ে পড়েন। এদিকে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে নবাবকে না জানিয়ে সম্পূর্ণ একক শক্তিমত্তায় মাত্র ৩,০০০ সৈন্যসহ (৫০০ ইউরোপীয় ও ২,৫০০ এদেশীয়) যুদ্ধযাত্রা করে কৌশলে শাহজাদাকে মোকাবিলা করে বিহার থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হন। পরে নবাব জানতে পেরে ঐ বছরের জুলাই মাসে কৃতজ্ঞতার পুরস্কারস্বরূপ তাকে (ক্লাইভ) ২৪-পরগণা জমিদারি সমর্পণ করেন। The Fifth Report-এর ভাষায়, '.. .the Nawab Mir Jafar, either out of gratitude, or as a means for securing or confirming Clive's fidelity, bestowed upon him the jagir of the lands known as the Twenty-four Parganahs ."[১৪৭]
পরবর্তীকালে মিরজাফর-তনয় নবাব নাজিম-উদ-দৌলা (জুন ২৩, ১৭৬৫) ও মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম প্রদত্ত সনদ বলে (আগস্ট, ১৭৬৫) ক্লাইভের এই জায়গির বৈধতার তথা আইনি স্বীকৃতি লাভ করেছিল। উল্লেখ্য, শেষোক্ত এই সনদ ব্যক্তিগতভাবে প্রথমবারের মতো পলাশির 'নাটের গুরু' ক্লাইভকে মোগল সাম্রাজ্যের একজন 'আমির' ('Omrah') হিশেবেও স্বীকৃতি দিয়েছিল।[১৪৮] যা হোক, ক্লাইভকে ২৪-পরগণা জমিদারি প্রদান করা হয় মূলত ১০-বছর

১৪৭. pp 418.
১৪৮ The Fifth Report, pp.418.

মেয়াদে[১৪৯] এ থেকে প্রাপ্ত ভূমিরাজস্ব আয় ভোগ করার জন্যে। এক্ষেত্রে কৌতূহলের বিষয় এই ছিল যে, দিওয়ানি দপ্তরের দলিল-দস্তাবেজে এখন থেকে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব সরকারের পরিবর্তে ক্লাইভকেই খাজনা দিতে হতো।[১৫০]
নবাব-প্রদত্ত সনদ থেকে জানা যায়, ক্লাইভকে কোম্পানির দেয় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছিল ২,২২,৯৫৮ টাকা ১০ আনা। কোম্পানি প্রথম-প্রথম তাকে এই রাজস্ব দিলেও সত্যি বলতে এই সময় রাজস্ব আয় আগের তুলনায় কিছুটা কমে গিয়েছিল। এরও কারণ সম্ভবত কোম্পানি ও ক্লাইভের আন্তঃসম্পর্ক। মাসিক ৩০/৪০ টাকা বেতনের সামান্য একজন কর্মচারী[১৫১] এদেশে 'নোকরি' (চাকুরি) করতে এসে ভাগ্যদেবীর অসীম কৃপায় সৌভাগ্যের যে স্বর্ণ-চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন, সে তো স্বদেশে কোম্পানির ডিরেক্টরেরা তাকে চাকুরি দিয়ে এদেশে পাঠিয়েছিল বলেই ! সুতরাং ২৪-পরগণা জমিদারি থেকে স্বজাতীয়বা তাকে যা দিতো তাতেই বলা যায় ক্লাইভ বাহ্যিকভাবে খুশী ছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে ক্লাইভের এই জমিদাবি পাওয়া এদেশে এবং বিশেষ করে তার নিজের দেশেই তাকে বিবাট প্রশ্ন ও জবাবদিহিতার সম্মুখীন করেছিল। এ জন্যে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে তার হয়রানিও কম হয়নি। তার পক্ষে একটাই যুক্তি ছিল যে, -- যে কারণে কেন্দ্রীয় মোগল বাদশাহের বর্তমানে অর্থাৎ তাঁর অনুমোদন ছাড়া নবাব মিরজাফর ও নবাব মিরকাশিম, ব্রিটিশ ঈস্ট কোম্পানিকে বাংলা সুবার কোন অংশই নিষ্কর প্রত্যর্পণ করতে পাবে না বা আইনত তাঁরা সে ক্ষমতার অধিকারী নন, (কাগজে-পত্রে ও আনুষ্ঠানিকতায় তখনও পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও ওড়িশা ছিল বিশাল মোগল সাম্রাজ্যেরই একটি দূরবর্তী প্রদেশ), সত্যি বলতে প্রচলিত আইনে তাঁদের জন্যে সেটি যেমন ছিল অবৈধ ও কর্তৃত্ব-বহির্ভূত কাজ, -- তেমনিভাবে ক্লাইভের এই জমিদারি লাভও ছিল একটি অসঙ্গত নবাবি ক্রিযার ফল --'When the Company in England, at a later time, chose to quarrel with Clive, they raised the question of the legality of this transaction; but it must have been obvious to any disinterested person that Mir Jafar's right to bestow the jagir on Clive stood on precisely the same ground as his right to bestow the zamindari on the Company.'[১৫২]
এ যুক্তি একেবারে ফেলা দেয়ার নয়।

১৪৯. ১০ই মে, ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০-বছরেব জন্যে ক্লাইভকে ২৪-পরগণা জমিদারি দেয়া হলেও এর অন্যতম শর্ত ছিল, যদি এই সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হয়, তবে তা অব্যবহিত পরেপরেই কোম্পানি বরাবরে বাদশাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত 'আলতমঘা' (মোগল সম্রাটদের দেয় উত্তরাধিকারযোগ্য এক ধরনের রাজকীয় অনুদান) হিশেবে গণ্য তথা প্রত্যর্পিত হবে।

১৫০ The Fifth Report, pp. 418.

১৫১. ক্লাইভ যখন এদেশে প্রথম আসেন তখন তার মাসিক বেতন ছিল ৪০ টাকা। দেখুন, ইংরেজ শাসনে বাজেয়াপ্ত বই, দ্বিতীয় খণ্ড, বিষ্ণু বসু ও অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫২।

১৫২ The Fifth Report, pp 419.

প্রথম অধ্যায়

'হস্তান্তরিত চাকলা'র রাজস্বাধিকার : চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান

মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহণের জন্য ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুন সেনাপতি মিরজাফর আলি খান, ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন স্থানীয় কুশীলবদের সঙ্গে যে গোপন চুক্তি করেছিলেন তার ফল ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সুদূরপ্রসারী। তরুণ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার করুণ মৃত্যুর পর মিরজাফর সিংহাসন লাভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু এ জন্য যে মূল্য তাকে দিতে হয়েছিল, তা একদিকে বাংলার রাজকোষের জন্য যেমন ছিল সমূহ ক্ষতিকর, তেমনি অন্যদিকে নতুন নবাবের নিজের জন্যও ছিল সার্বক্ষণিক চাপের ও একান্ত হুমকিস্বরূপ :
ভূতপূর্ব নবাবের (সিরাজ-উদ-দৌলা) কলকাতা আক্রমণের ফলে ইংরেজদের জানমাল ও কুঠির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তা কড়ায়-গণ্ডায় পুষিয়ে দিতে তাকে (মিরজাফর) পূর্বোক্ত চুক্তির বিভিন্ন অনুচ্ছেদের শর্ত মোতাবেক প্রথমেই নিম্নরূপ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে হয়েছিল।
কলকাতার ইংরেজ অধিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের বিশেষ করে আর্মেনীয়দের ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,৭৭,০০,০০০ টাকা; ইংরেজ সৈন্য ও নৌবাহিনীর জন্যে ৬,০০,০০০ পাউন্ড এবং কোম্পানির নানা স্তরের কর্মচারীদের উপঢৌকন বাবদ ৫৩,৯০,০০০ টাকা।[১] কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে 'নাটের গুরু' ক্লাইভ একাই পেয়েছিলেন ২,৩৪,০০০ পাউন্ড।[২] এখানে বলে রাখা ভালো যে, এ সময় স্থানীয় রাজা-বাদশাহ ও আমির-ওমরাহদের কাছ থেকে উপহার সামগ্রী ও নগদ অর্থ গ্রহণে কোম্পানির আইনে কোন বিধিনিষেধ না থাকায়[৩] ইংরেজ কর্মচারীরা নিঃসঙ্কোচে মিরজাফরের এই অযাচিত (!) দান গ্রহণ করেছিল। নবাব কোম্পানিকে তাদের কলকাতার জমিদারি সংলগ্ন (মারাঠা খালের অপর পাড়ে) আরও প্রায় ৬০০ গজ ভূমি সমর্পণ করেন। উল্লেখ্য কোম্পানির সঙ্গে জায়গা-জমি বিতরণ ও অর্থ-কড়ি মিটমাটের এই ব্যাপারটি মিরজাফর ক্ষমতারোহণের পরেপরেই মোটামুটি সেরে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে এই বিশাল অঙ্কের প্রতিশ্রুত পাওনা মিটাতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের রাজকোষের যে দুরবস্থা সূচিত হলো, তাতে করে নবাবের নিজস্ব সৈন্য-সামন্তেরই বেতন-ভাতা বকেয়া পড়ে গেলো। এক পর্যায়ে মিরজাফর বাধ্য হলেন কলকাতার ইংরেজদের কাছে রাজকীয় ও ব্যক্তিগত

---

১. The Fifth Report, pp. 420. বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, মৎপ্রণীত 'বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ১ম খণ্ড'।

২. History of British India under the Company and the Crown, P.E. Roberts, pp. 143.

৩. Ibid., pp 143.

ধনাগারের বহু মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার ও মণিমুক্তা প্রভৃতি বন্ধক রাখতে। কিন্তু তাতেও রক্ষা হলো না। শেষ পর্যন্ত ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে নবাব, ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বরাবরে বর্ধমান ও নদীয়া[৪] (কৃষ্ণনগর) জেলা ছেড়ে দিলেন যাতে করে এর রাজস্ব আয় থেকে তারা নিজেদের বিভিন্ন ব্যয় সঙ্কুলান করতে পারে। এরপরও কাউন্সিলের তৎকালীন গভর্নর সুচতুর হেনরি ভ্যান্সিটার্ট (Henry Vansitarrt) মিরজাফরের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন সিলেটের ফৌজদারি ও চট্টগ্রাম অঞ্চল কোম্পানিকে একইভাবে দেয়ার জন্য। কিন্তু মেরুদণ্ড ভাঙ্গা নবাব এই প্রথম ও শেষবারের মতো বেঁকে বসলেন এবং প্রত্যাখান করলেন বেনিয়াগোষ্ঠীর অন্যায় আবদার।[৫] অবশ্য এ ছাড়া তখন আর তার করারও কিছু ছিল না। কারণ ইতোমধ্যে তিনি রাজকোষের ধন-সম্পদ এবং নিজের ব্যক্তিগত মান-সম্মান যেটুকু ছিল, তার সবটুকুই খুইয়ে ফেলেছিলেন।
এবার আর ইংরেজরা কোন রাখঢাকের ব্যবস্থা রাখলো না। তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশ্যেই, এমন কি দরবারে পর্যন্ত নবাবের বিরোধিতা শুরু করলো এবং তলে তলে নবাব পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রেও মেতে উঠলো। বলাবাহুল্য মুর্শিদাবাদের দরবারি রাজনীতির তখন যে হাল, তাতে এ কাজে তাদের ভয়ের যেমন কিছু ছিল না, তেমনি নতুন নবাব খুঁজে নিতেও বিশেষ বেগ পেতে হলো না। ক্ষমতাসীন নবাবের জামাতা মিরকাশিমকেই তারা নবাব মনোনয়ন করে তার সঙ্গে দর কষাকষিতে লিপ্ত হলো। মিরকাশিম তখন ছিলেন রংপুরের ফৌজদার। শ্বশুর মিরজাফরই তাকে সেখানে ফৌজদারি দিয়েছিলেন।[৬] তার কাছে মুর্শিদাবাদের মসনদের মোহ ছিল সাত পুরুষের স্বপ্নেরও অতীত। ইংরেজদের যে কোন শর্তে নবাব হতে তিনি স্বীকৃত হলেন। যা হোক, ইংরেজদের সর্বগ্রাসী কূটচাল ও দরবারি ষড়যন্ত্রে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ২০শে অক্টোবর[৭] তিনি হলেন বাংলা, বিহার ও ওড়িশার[৮] নতুন নবাব। এ জন্য গোপন চুক্তির (মিরজাফর ক্ষমতায় থাকাকালে ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মিরকাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে সম্পাদিত) ৫ নং অনুচ্ছেদের শর্ত মোতাবেক নবাব মিরকাশিম আলি খান ষড়যন্ত্রকারীদেরকে নগদ অর্থ-কড়ি ও দামি উপঢৌকনসহ অন্য যে সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে মুখ্য হলো ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বরাবরে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম ও পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও মেদিনীপুর -- এই ৩টি 'চাকলা'র ভূমিরাজস্ব ও অন্যবিধ আয়সমূহ হস্তান্তর। এ জন্যে উভয়পক্ষে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল এরূপ --'For all charges of the Company and

---

৪ ১৭৫৯ সালের ২০শে আগস্ট তারিখের সরকারি এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, তৎকালীন নদীয়ার বার্ষিক রাজস্ব আয় ছিল ৯ লক্ষ টাকার মতো। দেখুন, নদীয়া-কাহিনী, কুমুদনাথ মল্লিক, পৃষ্ঠা ৩০।

৫. The Fifth Report, pp 420

৬ Mir Qasim Nawab of Bengal (1760-1763), Dr. Nanda Lal Chatterji, pp 6

৭. Ibid.; কিন্তু Firminger-এর The Fifth Report-এ মিরকাশিমের ক্ষমতারোহণের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ২৭শে অক্টোবর (pp 421)

৮ ওড়িশা বলতে এই সময় সুবর্ণরেখা নদীপারের পরগণা পটাশপুর ব্যতীত মেদিনীপুর জেলাকেই মূলত বুঝাতো। দেখুন, The Land-Systems of British India, Vol. 1, B.H Baden-Powell, pp. 299; মূল ওড়িশার অবশিষ্টাংশ আগেই মারাঠা বর্গীদের দখলে চলে গিয়েছিল।

of the said army and provisions for the field, etc., the lands of Burdwan, Midnapore, and Chittagong, shall be written and granted. The Company is to stand all losses, and receive all profits of these countries, and we will demand no more than the assignment aforesaid"[৯]

এখানে উল্লেখ্য যে, এই সময় উল্লিখিত চাকলা তিনটি থেকে যে রাজস্ব আয় হতো তা ছিল সমগ্র বাংলা সুবা'র মোট রাজস্ব আয়ের এক-তৃতীয়াংশ। Sir William Hunter বলেন, 'At that time these three Districts were estimated to furnish one-third of the whole revenue of Bengal.'[১০] এই চাকলাগুলির আয় থেকে কোম্পানি তার নিজস্ব খরচাদি বিশেষত সৈন্যবাহিনীর বেতন-ভাতা ও প্রতিপালন-ব্যয় নির্বাহ করার আইনগত অধিকার পেলেও --'nominally to meet the expenses of the army which it (*Company*) was agreed to maintain for his (*Nawab*) support'[১১],-- এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের -- 'customary rights of the different categories of people connected with land management'[১২]-এর ওপর হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ তাদের ছিল না। তবে সত্য কথা বলতে, কোম্পানির পরবর্তীকালের বিভিন্ন কার্যকলাপ থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হবে যে, তারা নবাবের সঙ্গে চুক্তির মূল শর্ত থেকে সম্পূর্ণ সরে এসেছিল।[১৩] কলকাতা ও ২৪-পরগণা জমিদারির মতো এই ৩টি চাকলার আপামর রায়ত সাধারণের সঙ্গেও তারা যাচ্ছেতাই আচরণ শুরু করেছিল।

যা হোক নবাব মিরকাশিমকর্তৃক ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত চাকলা চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর -- বাংলার ভূমিরাজস্বের পরিভাষায় এগুলি সম্মিলিতভাবে 'হস্তান্তরিত ভূমি বা জেলা' (Ceded Lands or Districts) হিসেবে পরিচিত।[১৪] পরবর্তীকালে মিরকাশিমের রাজ্যচ্যুতির পর মিরজাফর যখন পুনরায় নবাব হন, তখন তার সঙ্গেও কোম্পানি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল (জুলাই ১০, ১৭৬৩)। এই চুক্তির বিশেষত্ব, নবাব স্থায়ীভাবে কোম্পানির কাছে চাকলাগুলির ভূমিরাজস্ব-স্বত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। চুক্তির প্রধানতম অংশ ছিল এ রকম : 'I do

৯. The Fifth Report, pp 421

১০. A Statistical Account of Bengal, Vol VI, pp. 115; আরও দেখুন, Eastern Bengal District Gazetteers, L S S O'malley, pp 23.

১১. Memorandum on the Revenue History of Chittagong, Henry J S Cotton, pp. 4.

১২. The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 36

১৩. Ibid., pp. 36.

১৪. ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ একে 'Ceded Lands' বলেছেন, দেখুন -- The Fifth Report, pp 420; Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp 4. আবার কেউ কেউ 'Ceded Districts'ও বলেছেন, দেখুন-- Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. II., pp 181, The Agrarian Systems of Bengal, Vol. I., pp. 88, The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 35

grant and confirm to the Company, for defraying the expenses of their troops, the Chucklas of Burdwan, Midnapore, and Chittagong, which were before ceded for the same purpose."[১৫]
দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে ১২ই আগস্ট, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিওয়ানি লাভের আগে পর্যন্ত মিরজাফর-তনয় নবাব নাজিম-উদ-দৌলাও এটি পিতার মতো প্রায় একই ভাষায় ভিন্ন সনদ মূলে কোম্পানির অনুকূলে সমর্পণ সুনিশ্চিত করেছিলেন (২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৫)। সনদটির-ক্ষিয়দংশের উল্লেখ থেকেই বুঝা যাবে যে বাংলার নবাবেরা এই সময় কোম্পানির কতোটা অনুগত ও বশংবদ হয়ে পড়েছিল। তরুণ নবাব নাজিম-উদ-দৌলাকর্তৃক প্রদত্ত সনদের প্রধানতম অংশ ছিল এ রকম: 'I do confirm to the Company, as a fixed source, for defraying the ordinary expenses of their troops, the Lands of the Chucklas of Burdwan, Midnapore, the Chittagong in as full manner as heretobefore, ceded by my father."[১৬]

বলাবাহুল্য ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে নবাব মিরকাশিমের কাছ থেকে 'হস্তান্তরিত ভূমি' হিশেবে চাকলাগুলি পাওয়ার অব্যবহিত পরেপরেই কোম্পানি চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের তৎকালীন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এর ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব-ভার বুঝে নিয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় এগুলিতে প্রচলিত ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখলেও নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল মোটামুটি দু'ভাবে -- কোথাও প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব গ্রহণ করে, আবার কোথাও 'রেসিডেন্ট' নিয়োগ করে, অর্থাৎ কিছুটা পরোক্ষভাবে। এখন সে ইতিহাসই সংক্ষেপে তুলে ধরবো।

চট্টগ্রাম

স্বাধীন নবাবি আমলে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার যে সকল এলাকা বা জেলা একে একে ইংরেজদের শাসনাধিকারে এসে পড়ছিল, তার মধ্যে চট্টগ্রামের অবস্থান ছিল, বলা যায় একনম্বরে।[১৭] আগেই বলেছি, অন্য দু'টি হস্তান্তরিত চাকলা (বর্ধমান ও মেদিনীপুর)-র মতো চট্টগ্রামের ভূমিরাজস্ব আদায়ের অধিকার কোম্পানিকে দেয়া হয়েছিল মূলত ইংরেজদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রক্ষণীয় সৈন্যবাহিনীর নিয়মিত প্রতিপালনের ব্যয় নির্বাহের জন্য। এ ক্ষেত্রে চাকলে চট্টগ্রামের ভূমিরাজস্ব নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে কোন্ ধরনের, কতো সৈন্যদল কোম্পানি সংরক্ষণ করবে, সেটাও নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। সনদের ভাষায়, 'the thana of Islamabad or Chittagong is granted to the English Company in part disbursement of their expenses and the monthly maintenance of five hundred

---

১৫ Quoted from, The Fifth Report, pp. 425

১৬. সংগৃহীত, বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ২৬১।

১৭. 'Chittagong was one of the first Districts of Bengal which passed into the possession of the East India Company.' দেখুন, A Statistical Account of Bengal, Vol. VI, pp 114.

European horse, two thousand European foot and eight thousand sepoys, which are to be entertained for the protection of the royal dominions".[১৮] হস্তান্তরিত চাকলা চট্টগ্রামের এই সময়কার আয়তন ছিল প্রায় ২,৯৮৭ বর্গমাইল (জায়গিরসহ), যা থেকে সরকারের বার্ষিক আয় হতো ৩,২৩,১৩৫ টাকা।[১৯]
উল্লেখ্য, মাত্র দশ হাজার সৈন্য ও পাঁচশ' অশ্ব প্রতিপালনের ব্যয় বাবদ কোম্পানির অনুকূলে এই বিশাল পরিমাণের রাজস্ব আয়সম্বলিত ভূমি হস্তান্তর পলাশি-উত্তর বাংলার নবাবদের শক্তির দেউলিয়াত্ব ও ন্যুব্জ দশারই বহিঃপ্রকাশ সূচিত করে।
ভৌগোলিকভাবে চট্টগ্রাম ছিল (আজও তাই) পূর্ব বঙ্গোপসাগরের তীর-ঘেঁষা একটি দূরবর্তী প্রদেশের ততোধিক দূরবর্তী চাকলা। কোম্পানির দৃষ্টিকোণ থেকে তা ছিল প্রকৃতই 'outlying and remote.' স্বভাবতই শুরু থেকে কোম্পানি চেয়েছিল এখানকার ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্ত হাতে পরিচালনা করতে, অন্তত একটা 'strong local government' যেন চট্টগ্রামে গড়ে তোলা যায় সে ব্যাপারে তাদের চেষ্টা ছিল সর্বাত্মক।
যা হোক ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর কোম্পানির কলকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ হ্যারি ভেরেলস্ট (Harry Verelst)-কে চট্টগ্রামের 'প্রধান-নির্বাহি' (Chief) নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিল। অভিজ্ঞ ভেরেলস্টের সহযোগী হিশেবে আরও ৪জনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ৩জন ছিল ইংরেজ -- টমাস রামবোল্ড (Thomas Rumbold), র‍্যানডলফ ম্যারিয়ট (Randolph Marriot) ও ওয়াল্টার উইলকিন্স (Walter Wilkins) এবং গোকুল চাঁদ ঘোষাল। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনা তথা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ভেরেলস্টের অভিভাবকত্বে যে ৩-সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিল গঠন করা হয়, রামবোল্ড ও ম্যারিয়ট ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। আর উইলকিন্স পেয়েছিলেন স্থানীয় ফ্যাক্টরি দেখাশুনার দায়িত্ব; অন্যদিকে 'নেটিভ' গোকুল চন্দ্র ছিলেন কাউন্সিলের দিওয়ান।
নতুন দায়িত্ব পেয়ে ৩রা জানুয়ারি (১৭৬১) ভেরেলস্ট দলবলসহ সীতাকুণ্ড থেকে রওনা হয়ে দু'দিন পরে চট্টগ্রামে পৌঁছেছিলেন।[২০] একটি মাত্র প্রধান শহর নিয়ে ছিল তখনকার চট্টগ্রাম। এর তৎকালীন মোগল ফৌজদার[২১] ছিলেন বিখ্যাত সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খান। তবে এ সময় যদিও

---

১৮. Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp 4, Eastern Bengal District Gazetteers, pp 24

১৯ Eastern Bengal District Gazetteers, pp 24; A Statistical Account of Bengal, Vol. VI, pp 115 'ইসলামাবাদ', আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৪।

২০ চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন ও কুঠি নির্মাণের প্রতি কোম্পানির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও ইচ্ছা থাকলেও এই প্রথম তা বাস্তবায়িত হলো। দেখুন, The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 82

২১. ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো বলেন, 'According to the Seir-ul-Mutakharin, Islamabad or Chittagong constituted one of the ten faujdaris of Bengal and the governor of Chittagong was officially known as faujdar under the subah of Bengal' (A History of Chittagong, Vol. I., Dr. Suniti Bhushan Qanungo, pp 394)

রেজা খান ত্রিপুরাভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন[২২], কিন্তু গভর্নর হেনরি ভ্যান্সিটার্টের পূর্বপত্র যোগাযোগের সূত্র ধরে তিনি সীতাকুণ্ডে ভেরেলস্টের দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।[২৩] এখানে উল্লেখ্য যে কলকাতার কাউন্সিল আশঙ্কা করেছিল, সম্ভবত চট্টগ্রামের ফৌজদারি ছাড়তে রেজা খান কিছুটা ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারেন। সে জন্য তারা ভেরেলস্টের সঙ্গে ৫০০ সৈন্যের একটা দলও পাঠিয়েছিল।[২৪]

কিন্তু তাদের সকল আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণিত করে ৫ই জানুয়ারি, ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ক্ষমতা হস্তান্তর-পর্ব সম্পন্ন হয়েছিল। ড. আবদুল মাজেদ খানের ভাষায়, 'The fears (*of the Council*) proved groundless,.. . The English had occupied the district 'without molestation' ,...'[২৫] বস্তুত সুচতুর ও অভিজ্ঞ রেজা খান বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতা মুর্শিদাবাদের নবাবদের তখন যে অবস্থা তাতে করে ইংরেজদের সঙ্গে কোন প্রকার শত্রুতা না করে বরং বাস্তবতা মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে সখ্যতা করাই হবে তাঁর জন্য বুদ্ধিমানের কাজ। ফলত সে লক্ষ্যেই, 'In his six weeks with Verelst in Chittagong, the Khan had established a very close friendship with Verelst.'[২৬]

যা হোক ভেরেলস্টের ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পরে প্রথম কাজই ছিল ভূতপূর্ব ফৌজদার মুহম্মদ রেজা খানের কাছ থেকে রাজস্ববিষয়ক হিসাব-নিকাশ বুঝে নেয়া। Henry Cotton বলেন, 'Among the many cases with which the new administration were occupied on their first arrival, the most important was the settlement of accounts with the Nabob.'[২৭] উল্লেখ্য ভেরেলস্টের ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত পরবর্তী কার্যাবলি আলোচনার আগে এখানে তৎকালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার প্রাগৈতিহাস নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা দরকার। না হলে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন প্রশাসনের কাজের ব্যাপকত্ব ও কোম্পানির ব্যবসায়িক মৌল উদ্দেশ্য তথা অর্থলোলুপতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে না বলেই মনে করি।

ভূমিরাজস্বের পরিসংখ্যান বর্ণনায় চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর উল্লেখ আমরা পাই আবুল

---

২২ এঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, The Transition in Bengal (1756-1775). A Study of Saiyid Muhammad Reza Khan, Dr. Abdul Majed Khan.

২৩ ড মাজেদ খানের মতে, রেজা খান ১লা জানুয়ারি, ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে সীতাকুণ্ডে ভেরেলস্টের দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে রওনা হয়ে ৪ দিন পরে অর্থাৎ ৫ই জানুয়ারিতে চট্টগ্রাম নগরীতে পৌঁছান। দেখুন, The Transition in Bengal, pp. 37.

২৪. A History of Chittagong : From Ancient Times down to 1761, Vol. I., Dr. Suniti Bhushan Qanungo, pp. 409.

২৫. The Transition in Bengal, pp. 37.

২৬. Ibid., pp. 37.

২৭. Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 5.

ফজলের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী'তে।[২৮] মোগল-পূর্ব যুগে চট্টগ্রাম ছিল বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরাকেন্দ্রিক হিন্দু রাজন্যবর্গের শাসনে[২৯], সুলতানি যুগে বিশেষ করে ইলিয়াস ও হুসেনশাহি শাসকদের কর্তৃত্বে (তেরোশ' থেকে ষোড়শ শতাব্দী), তাদের কাছ থেকে আরাকানি শাসক ও তদীয় সহযোগী মগ-প্রধানগণ চট্টগ্রাম শাসন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে, যে সময়ে 'আইন-ই-আকবরী'তে চট্টগ্রাম বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল বলে দেখানো হয়েছে, আসলে তখন পর্যন্ত চট্টগ্রাম বা এ অঞ্চল আদৌ মোগল শাসক বা তাদের স্থানীয় সুবাদার-ফৌজদার ইত্যাদি কারোরই দখলে আসেনি বা ছিল না।[৩০] বরং চট্টগ্রাম সর্বপ্রথম মোগলদের দখলে আসে আওরঙ্গজেবের সুবাদার শায়েস্তা খানের আমলে; তাঁর সুযোগ্য পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের শাসক তৎকালীন মগ-প্রধানকে যুদ্ধে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন ও সেখানে প্রথমবারের মতো মোগলদের বিজয়-নিশান উত্তোলিত করেন।[৩১] অতঃপর 'Umed Khan changed the name of the city to Islamabad and annexed it to the province of Bengal, leaving a considerable force

---

২৮. এই মহাগ্রন্থে চট্টগ্রামকে যদিও বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অধীন একটি খালসা হিসেবে দেখানো হয়েছে কিন্তু সত্যি বলতে তা সম্রাট শাহজাহানের আমল পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়নি বা ছিল না। 'আইন-ই-আকবরী'তে ৭টি 'মহাল'বিশিষ্ট ১,১৪,২৪,৩১০ 'দাম' রাজস্ব-আয়সম্বলিত সরকার-ই চট্টগ্রামের যে ফিরিস্তি লক্ষ্য করা যায় তা: (১) তালাগাঁও বা মালগাঁও-- ৫,০৬,০০০, (২) চাঁটগাঁও বা চট্টগ্রাম-- ৬৬,৪৯,৪১০, (৩) দেওগাঁও বা দেবগ্রাম--৭,৭৫,৫৪০. (৪) সুলায়মানপুর বা শেখপুর--১৫,৭২,৪০০, (৫) শাহওয়া--৫০,৭৯,৩৪০, (৬) নওয়াপাড়া--৭ ,৩,৩০০ এবং (৭) নুন-মহাল থেকে আয়বাবদ ৭,৩৭,৫২০ দাম। দেখুন, The Ain-i-Akbari, Vol. II. , Abul-Fazl Allami, Trans. by H.S. Jarrett & Anotd by Sir Jadunath Sarkar, pp -152.

২৯. 'Chittagong originally formed a part of the once extensive independent Hindu kingdom of Tipperah; but prior to its conquest by the Muhammadans, it had frequently changed masters.' (A Statistical Account of Bengal, Vol. VI., pp. 110)

৩০. এ জাতীয় একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, চট্টগ্রামের এক সময়কার মগ-প্রধান জনৈক মটক রায় ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরাকান-রাজের পক্ষে তৎকালীন মোগল সুবাদার ইসলাম খান মাশহাদি-র কাছে ঢাকায় গিয়ে চট্টগ্রাম-নগরীর কর্তৃত্ব-ভার সমর্পণ করেছিলেন, এবং সেই থেকে চট্টগ্রামের নামকরণ হয় 'ইসলামাবাদ'। দেখুন, The Fifth Report , pp. 426.

৩১. Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 6; A Statistical Account of Bengal. Vol. VI , pp 114; The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp 80; A History of Chittagong: From Ancient Times down to 1761, Vol. I.,pp. 359; The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 58; Dr. Abdul Karim in 'Glimpses of Cox's Bazar', Cox's Bazar Foundation, pp. 128. তবে কোম্পানির ১৭৬১ সনের ৫ই জুনের একটি রিপোর্টে বুজুর্গ উমেদ খানের চট্টগ্রাম বিজয়ের সাল ভুলবশত ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন, The Fifth Report , pp 428; আরও দেখুন, হাজার বছরের চট্টগ্রাম, দৈনিক আজাদী, ৩৫ বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ২৭।

to defend it from the incursion of the Maghs (1666).'[৩২] উমেদ খান ও তৎপরবর্তী বেশ কয়েকজন ফৌজদারের সময়ে চট্টগ্রাম থেকে ভূমিরাজস্ব বাবদ কেন্দ্রীয় রাজকোষে তেমন কিছুই পাঠানো হতো না। উল্টো ঢাকা থেকেই এখানকার প্রশাসনিক ব্যয় মিটানো হতো বলে জানা যায় --'the expenses for maintaining the province were paid from Dacca.'[৩৩] অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, চট্টগ্রাম থেকে তখন কোন ভূমিরাজস্ব-ই উসুল করা হতো না। প্রকৃতপক্ষে গোটা চট্টগ্রাম ফৌজদারিকেই তখন বিভিন্ন প্রকার জায়গির ভূমিতে রূপান্তরিত তথা খণ্ড খণ্ড করে 'তরফে' ভাগ করায়, এখান থেকে সরকারি তহবিলে ভূমিরাজস্ব আসা বন্ধ হয়েছিল। William Hunter বলেন, 'Under the Mughuls, the greater part of Chittagong was assigned as a military *jagir*, or allotment, for the maintenance of a force of 3,532 men, forming the garrison. The *jagir* consisted of 117 small parganas, or estates, paying a total rental of Rs. 150,251.'[৩৪] যে কারণে আমরা দেখতে পাই, মধ্যকালীন বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় চট্টগ্রামের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি ছিল অনেকটা ভিন্ন।

এ অঞ্চলে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের কাজ শুরু হয়েছিল ১৭১৩ সালের দিকে। তখন ফৌজদার ছিলেন মির হাদি। তাঁর সময়ে চট্টগ্রাম থেকে 'আসল জমা' বাবদ কেন্দ্রে মোটামুটি বার্ষিক ৬৮,৪২২-১০-৭.২৫ টাকা পাঠানো হতো।[৩৫] যদিও কার্যত তিনি আদায় করেন প্রায় ১,৭৫,৪৫৮-০-২.৫০ টাকা।[৩৬] প্রসঙ্গত এখানে স্মর্তব্য যে, ইতোমধ্যে অর্থাৎ ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দিওয়ান মুর্শিদকুলি জাফর খানের দিওয়ানি-যুগ শুরু হয়ে গিয়েছিল।[৩৭] তাঁর দিওয়ানি দপ্তরের ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্রে তৎকালীন চট্টগ্রামের যে হিসাব বা তথ্য-পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, যা স্বনামখ্যাত জেমস গ্রান্ট তাঁর ততোধিক বিখ্যাত 'Historical and Comparative Analysis of the Finances of Bengal' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, সেটি এখানে উল্লেখ করা হলো। বস্তুত এ থেকে একদিকে যেমন মধ্যকালীন চট্টগ্রামের ভূমিরাজস্ববিষয়ক মোটা দাগের একটা বিবরণী পাওয়া যাবে, তেমনি তা তৎকালীন ভূমি ব্যবস্থাপনার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও একটা প্রাথমিক ধারণা দেবে বলে মনে করা যেতে পারে।

জেমস গ্রান্ট-বর্ণিত নবাব জাফর খান মুর্শিদকুলির আমলে (তজ্জামাতা নবাব শুজাউদ্দিন খানের সময়েও) চট্টগ্রামের ভূমিরূপ ও রাজস্ব ছিল মোটামুটি এ রকম (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য):-

---

৩২ Eastern Bengal District Gazetteers, pp. 21.
৩৩. Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 6.
৩৪. A Statistical Account of Bengal, Vol VI., pp. 114.
৩৫ Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 6.
৩৬ Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp 6, The Fifth Report, pp. 428
৩৭ Murshid Quli Khan and His Times, pp. 48

মধ্য-অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চট্টগ্রাম থেকে ভূমিরাজস্ব আয়		
ক.	জায়গির অসাম বা সৈন্যসামন্ত প্রতিপালনেব ব্যয় বাবদ	১,৫০,২৫১ টাকা
খ	জায়গিব মুশবাত ফৌজদাবি বা সৈন্যাধ্যক্ষদেব বেতন-ভাতা বাবদ	২৪,০০০ টাকা
গ.	জায়গিব নৌয়াবা বা নৌবাহিনীব জন্য বরাদ্দ	২,৫৪৪ টাকা
		১,৭৬,৭৯৫ টাকা

উল্লেখ্য বিভিন্ন জায়গিরের বাৎসরিক আয়বাবদ নথিপত্রে ন্যূনতম ১,৭৬,৭৯৫ টাকা দেখানো হলেও বাস্তবে তা ছিল আরও বেশী। তবে উপরের এই পরিসংখ্যান থেকে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট যে, কেন্দ্রীয় মোগল সম্রাটদেব মতো স্থানীয় পর্যায়ের মোগল শাসকেরাও শক্তিশালী নৌবাহিনী সংরক্ষণের প্রতি তখন পর্যন্তও তেমন একটা নজর বা জোর দেননি। অথচ নদ-নদীবহুল এই দেশে অধিকাংশ যুদ্ধেই প্রায় অত্যাবশ্যকীয়, বিশেষত চট্টগ্রাম জয়ে এর প্রয়োজনীয়তা যে কতো বেশি অনুভূত হয়েছিল, তা বুজুর্গ উমেদ খান ও তাঁর আগে-পরের ফৌজদারেরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। বলাবাহুল্য মোগল সেনাবাহিনীর এই দুর্বলতা বা যথোপযুক্ত নৌশক্তির ঘাটতি ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে চট্টগ্রামের যুদ্ধে বিপুলভাবে ধরা পড়ে, যদিও সে যুদ্ধে মোগলেরাই জয়ী হয়েছিল। যা হোক সে আলোচনা ভিন্ন। এ পর্যায়ে চট্টগ্রামের জায়গির ভূমি ও এর রূপান্তর সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হলো।

আগেই বলেছি মোগল যুগে চট্টগ্রাম ছিল বিভিন্ন ছোট-বড় জায়গিরে বিভক্ত। 'আইন-ই-আকবরী'তে এর মহালের সংখ্যা ৭টি বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং Hunter-এর 'Statistical Account' থেকে জানা যায়, মহালগুলি কমবেশি ১১৭টি পরগণা বা এস্টেটে বিন্যস্ত ছিল[৩৮]। কিন্তু সত্যি বলতে এই পরগণাগুলি বড় বড় জায়গিরদার বা মনসবদারদের সরাসরি কর্তৃত্বে (ভূমিরাজস্ব আদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে) না থেকে, ছিল মূলত অসংখ্য ছোট-বড় জমিদার ও তালুকদারদের দখলে। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'Committee of Revenue'-র ১৭৮১ সালের ২৩ ও ২৮ এপ্রিল তারিখের সভার কার্য-বিবরণীতেও এ কথা স্বীকার করা হয়েছে: 'The zemindars and talookdars of the chucklah are very many.'[৩৯] কাগজে-পত্রে চট্টগ্রামের মতো একটি দূরবর্তী অঞ্চলকে সাম্রাজ্যের সীমান্ত হিশেবে বিবেচনা করে এটিকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে এর ভূমিরাজস্ব আয় থেকে স্থানীয় সৈন্যসামন্ত প্রতিপালনের ব্যয়বাবদ চট্টগ্রামকে জায়গিরদার বা মনসবদারদেব মধ্যে বিলি করার সরকারি নীতি থাকলেও, বাস্তবে জায়গিরদারেরা আবার তাদের অধীনে রক্ষণীয় নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য প্রতিপালনের ভার দিয়ে অধীন জায়গিরদার সৃষ্টি করেছিল, যেগুলির সংখ্যা ছিল প্রচুর।

---

৩৮ মুর্শিদকুলির সময়ে এটি ছিল ত্রয়োদশ সংখ্যক চাকলা এবং এর পরগণা সংখ্যা ছিল ১৪৪টি। দেখুন, Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 6.

৩৯. Ibid, pp. 32.

বলাবাহুল্য মোগলদেব আইনকানুনে এই ধরনের তস্য-জায়গির সৃষ্টির কোন নিয়ম না থাকলেও কালক্রমে এই প্রবণতা এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল, অথবা অন্যভাবে বলা যায়, এখানকার বাস্তবতা. স্থানীয় শাসকদেরকে এটি করতে বাধ্য করেছিল। এবং যেহেতু অত্যন্ত দূরবর্তী ও দুর্গম এলাকা ('আইন'-এর ভাষায়, 'a large city situated by the sea and belted by woods'[৪০]) ছিল চট্টগ্রাম, কোন প্রকারে সীমান্ত রক্ষা ও সম্রাট বা সুবাদারের প্রয়োজনে বিভিন্ন অভিযানে এখান থেকে সৈন্য সরবরাহ লাভ করেই উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট ছিল, স্বভাবতই কেন্দ্রীয় সরকার ও সুবাদার, তস্য-জায়গির সৃষ্টির এই অনিয়ম জানা সত্ত্বেও বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করতেন না।

এখানে প্রসঙ্গত জায়গির ও জমিদারিব একটি প্রধান পার্থক্য উল্লেখ করা গেলো। মোটের ওপর জায়গিরদার হলেন সরকারের একজন সমর-বিশেষজ্ঞ বা সামরিক-সহযোগী; তিনি যে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যসামন্ত সংরক্ষণ করতেন, এদের ভরণপোষণ ও তার ব্যক্তিগত বেতন-ভাতা ইত্যাদি খরচের সমানুপাতিক ভূমিরাজস্ব প্রদান-ক্ষম একটি ভূখণ্ড তিনি পেতেন, এই ভূ-স্বত্বই ছিল তার জায়গির, অনেক ক্ষেত্রে মনসবও। তবে লক্ষ্যণীয় এটাই, এ জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিলে তাকে কোন রাজস্ব দিতে হতো না। অবশ্য কখনো কখনো বাদশাহ ও সুবাদারকে নজরানা ও 'তোহফা' (উপঢৌকন) দিতেন। অন্যদিকে জমিদারের জন্য সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণ বাধ্যতামূলক না হলেও (কখনো কখনো রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তিনি লোকবল ও অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে সরকারকে যে সাহায্য করতেন না, তেমন নয়) তাকে নিয়মিত সরকারি কোষাগারে 'পেশকাশ' দিতে হতো।

যা হোক, চট্টগ্রাম থেকে যেহেতু সরকার, মির হাদির আগে পর্যন্ত কোনরূপ ভূমিরাজস্ব পেতো না, সেহেতু মোগলদের হিসাবে তথা সরকারি নথিপত্রে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের বিবেচনায় চট্টগ্রামে কোন জমিদারি ছিল না।

কিন্তু এ তো গেল সরকারি দলিল-দস্তাবেজের কথা। বাস্তবে যে এখানে আগে থেকেই জায়গিরদারদের অধীনে অসংখ্য ছোট-বড় জমিদার ও তালুকদার সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা অনস্বীকার্য। এরা মূলত এক-একজন জায়গিরদারের 'তরফে' অত্যন্ত সুনিদিষ্ট এলাকা বা ভূখণ্ডের ভূম্যধিকারী রাযতদের কাছ থেকে খাজনা সংগ্রহ করতেন। এদের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, অন্যান্য অঞ্চলের জমিদারির যেমন একটি আপাত দৃশ্যমান ভূখণ্ডগত বা ভৌগোলিক সীমারেখা থাকতো, চট্টগ্রামের তথাকথিত এই সব জায়গিরের তা ছিল না। জায়গিরদারেরা মূলত ভূমিরাজস্ব প্রদাতৃগণের মাথা-গুণতি হিসাব সংরক্ষণ করতেন। রাযতদেরকে নির্ধারণ করে দেয়া হতো তারা কোন্ কোন্ ভূমি চাষাবাদ করবে এবং তাঁদের কাছ থেকে উসুলযোগ্য অর্থের পরিমাণ কতো হবে, সে অনুযায়ী জায়গিরদারগণ সৈন্য সংরক্ষণ করতেন।

যা হোক, হ্যারি ভেরেলস্টের প্রশাসন এই প্রথা রোধ করতে সক্ষম হলেও জায়গিরগুলি শেষ পর্যন্ত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের জমিদারির মতোই ভূ-স্বত্বে রূপান্তরিত হয়েছিল[৪১]। তবে ভেরেলস্ট যেটা করেছিলেন, বস্তুত তিনি দেখলেন যে, কোম্পানি সবেমাত্র ক্ষমতা গ্রহণ করেছে, স্থানীয় নিয়ম-প্রথার অনেক কিছুই তারা তখনও আদৌ অবগত নয়; ফলে সেই মুহূর্তে জমিদার-তালুকদারদের অপসারিত না করে বরঞ্চ তাদেরকে স্বস্থানে ও স্বপদে বহাল রেখে কোম্পানিব

৪০ The Ain-i-Akbari, Vol. II. , pp. 137.

৪১ The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 80

স্বার্থ উদ্ধার করাই যুক্তিসঙ্গত। ফলত তার পরবর্তী পদক্ষেপগুলি সে লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছিল, এবং এর মাধ্যমেই তিনি প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।
মির হাদির সময়ে 'আসল জমা' যা ছিল পরবর্তী বছরগুলোতে তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল। মুহম্মদ রেজা খানের মতো অত্যন্ত সুযোগ্য 'নায়েব-ই-নাজিম' বা ফৌজদারের হাতে পড়ে যে তা আরও বৃদ্ধি পাবে সেটাই স্বাভাবিক। যতোদূর জানা যায়, হাদির তুলনায় তাঁর সময়ে 'আসল জমা' প্রায় দ্বিগুণ (প্রকৃত আদায়ের) হয়েছিল। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে খান যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, সে বছর যে ভূমিরাজস্ব আদায় করা হয় তার পরিমাণ ছিল ৩,৩১,৫২৯-১-১৫ টাকা, যদিও শোনা যায় তিনি প্রকৃতপক্ষে উসুল করেছিলেন ৩,৩৭,৭৬১-১-১১.৭৫ টাকার মতো[৪২]। উক্ত 'মাল' বা ভূমিরাজস্ব ছাড়াও তাঁর সময়ে নিম্নলিখিত সায়রাতসহ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৪,৪৩,৯১৮-১৫-১৪.২৫ টাকা।[৪৩] সায়রাতসমূহ:-

	টাকা	আনা	পাই
'মাল'-ই সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খান	৩,৩৭,৭৬১	১	১১.৭৫
সোয়া (আলাদা হিসাবভুক্ত ভূমিরাজস্ব)	৪৩,৯৭৫	১০	১
মুৎফেরকাত (সাধারণত জরিমানা)	২,১২৭	২	০
ইজাফা তালকাত হাজারিয়ান	৩,৮৪২	৪	০
নয়াবাদ (জঙ্গল কেটে সাফকৃত ভূমির কর)	৯,৩৮২	৪	৯.৫০
সায়ের কসবা (শহরে আমদানি-রপ্তানি কর)	৭৬০	৭	১৪.৫০
বাজে দফা (বিভিন্ন রকমের খুঁটিনাটি কর)	৩৬,৫৪১	১৫	১১
রাসুল নগর (মুর্শিদাবাদের জন্যে ধার্য কর)	৯,৫২৮	২	৬.৫০
সর্বমোট	৪,৪৩,৯১৬	১৫	১৪.২৫

ভেরেলস্ট লক্ষ্য করেছিলেন, বিগত প্রায় সাড়ে চার দশকে (মির হাদি থেকে রেজা খান) চট্টগ্রামের ভূমিরাজস্বের যে ঊর্ধ্বগতি, তা কোম্পানির স্বার্থের যথানুকূল তো ছিলই, উপরন্তু ভূমিরাজস্বের বাইরেও যে 'আবওয়াব' (extra-impositions) পাওয়া যেতো তারও পরিমাণ ছিল প্রচুর। অবশ্য আবওয়াবের বেশিটাই ছিল বৈধ হিসাব-বহির্ভূত। সুতরাং হ্যারি ভেরেলস্টের কাউন্সিলে, 'It was, therefore, decided to continue the existing method of revenue management namely, to collect aboabs in addition to the nominal 'assul jumma' or original rent roll.'[৪৪] অধিকন্তু খাজনা ধার্য ও আদায়ের ব্যয়হ্রাস করবার জন্য কাউন্সিল আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রচলিত ব্যবস্থায় এ যাবৎ মাঠ পর্যায়ে

৪২. Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 7; The Fifth Report, pp. 428.
৪৩. Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 7; The Fifth Report, pp. 429.
৪৪. The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 84.

যারা কর্মরত ছিল তাদের সংখ্যা কমানোর। এর অবশ্য একটা পার্শ্ব ফলও হয়েছিল। কোম্পানি নিজের স্বার্থে জনবল বা রাজস্বকর্মী কমানোয় একদিকে যেমন তাদের ব্যয় কমেছিল, তেমনি অন্যদিকে এদের চিরাচরিত অত্যাচার থেকে রায়তশ্রেণী কিছুটা হলেও মুক্তি পেয়েছিল"[৫], যদিও কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য তা ছিল না। তবে ভেরেলস্ট কোম্পানির স্বার্থের সবচেয়ে অনুকূল যে দৃঢ় পদক্ষেপটি গ্রহণ করেছিলেন, তাৎক্ষণিকভাবে সেটি যদিও ছিল কিছুটা অমানবিক একটি প্রক্রিয়া, কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে, বিশেষ করে সরকারি কোষাগারের আয়-পথ বিবেচনা করলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, তার এই পদক্ষেপ ছিল খুবই প্রশংসনীয় ও সুদূর তাৎপর্যবাহী একটি উদ্যোগ। ভেরেলস্ট প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোম্পানির নতুন ব্যবস্থাপনায় স্থিত জায়গিরগুলিকে জমিদারি ও তালুকদারি ভূ-স্বত্বে রূপান্তরিত করা সত্ত্বেও এগুলি থেকে যে পরিমাণ ভূমিরাজস্ব পাওয়ার কথা, কার্যত তা পাওয়া তো যাচ্ছেই না, পরন্তু ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে তেমন সম্ভাবনাও ছিল কম। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রামের জায়গিরগুলির একটা ব্যাপকাংশ ছিল লাখেরাজ তথা করমুক্ত।"[৬] এ সম্পর্কে ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলে হেনরি ভ্যান্সিটার্টকে চট্টগ্রাম সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিয়ে ভেরেলস্টের কাউন্সিল যে সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিল, তাতে এক জায়গায় উল্লেখ ছিল: 'The province of Chittagong ...as we can see, the quantity of land cultivated is about 400,000 connys; but a very considerable part of it lays free of rent, having been lands formerly given in charity."[৭] পত্রে তারা উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে এটাও সুপারিশ করেছিল, যেহেতু মোগলদের প্রচলিত নিয়ম-নীতিতে লাখেরাজ ভূমিকে পবিত্র ('sacred') ও ধর্মীয় জ্ঞান করা হয়ে থাকে, এবং এর প্রাপক সামাজিকভাবে অত্যন্ত সম্মানিত অবস্থানে থেকে তা ভোগ করেন, সুতরাং লাখেরাজ ভূ-স্বত্বগুলি আপাতত বহাল রাখা হোক, এবং প্রাপকের মৃত্যু-পরবর্তীকালে তা সরাসরি কোম্পানির দখলে আনয়নের অনুমতি দেয়া হোক। কিন্তু কলকাতা কর্তৃপক্ষ তা মেনে নিলেও তারা ভেরেলস্টকে এটাও জানিয়ে দিলো যে (জুন ২৪, ১৭৬১ সনের পত্র): 'As Chittagong rents have been continually raised, raise them higher; but consult for the **Company's interest and the care and happiness of the inhabitants**. Give sunnud-holders double the time you propose to prove their rights; but charity lands are to lapse to the Company on the death of the present holders, except in particular cases."[৮]

---

৪৫. The East India Company's Land Policy and Commerce.., pp. 84.

৪৬ ১৭৬৪ সালে যখন চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ হয়েছিল, তখন দেখা গেল লাখেরাজভুক্ত ভূমির পরিমাণ (২৪,৮৪৩টি স্বত্বে) প্রায় ১৫,৮৮৯ দ্রোণ (পরিমাপকৃত ৪২,০৭১ দ্রোণের মধ্যে)। দেখুন, Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 10.

৪৭. Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 158
এ ছাড়া ১৭৬০ থেকে ১৭৮৭ সময়কালের চট্টগ্রামসংক্রান্ত কোম্পানির ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় কাউন্সিলের মধ্যে বিভিন্ন পত্র যোগাযোগের জন্য দেখুন, Bangladesh District Records, Vol. I., Ed. by Dr. Sirajul Islam.

৪৮. Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 9

এ অবস্থায় চট্টগ্রাম-কাউন্সিল এক নোটিশ জারি করেছিল: 'all persons possessed of perwannahs and grants executed by former governors should bring them to the cutcherry on or before the 1st of April, Bengal Style, in order that their right to the same might be examined into, confirmed, and registered; ... any person neglecting to comply with the order should forfeit all right to any lands he might lay claim to, for performance of which they were allowed one month and a half."[৪৯]

যা হোক কলকাতা ও চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষের উপরোল্লিখিত পত্রাংশ দু'টি বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে, কোম্পানি যে কোনভাবে এতদঞ্চলে ভূমিরাজস্ব বাড়ানোয় প্রথম থেকেই তৎপর ছিল। কাগজে-পত্রে রায়তসাধারণের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখার কথা বলা হলেও বস্তুত নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির দিকেই তাদের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। এবং সেক্ষেত্রে যদি লাখেরাজ জমি সম্পূর্ণ অধিগ্রহণ ও ভূমিরাজস্বের হার একের পর এক বাড়িয়েও যেতে হয়, তবুও তাদের কোন অনীহা ছিল না।

চট্টগ্রামের পতিত ও অনাবাদি ভূমির উন্নয়ন এবং তা থেকেও ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের জন্য ভেরেলস্ট উদ্যোগী হয়েছিলেন। তার পূর্বোক্ত পত্রেই তিনি লিখেছিলেন, 'The soil (*of Chittagong*) in general is very fertile, especially in the plains and valleys, but interspersed with sandy hills and some rocky mountains, which are covered with a high wood, and many of them about the boundaries yield variety of good timbers. The land is capable of producing quantities of wheat and rice, and all other kinds of grain, cotton, wax, oil, timbers of various sorts, and some elephants' teeth. The manufacturies at present are but very indifferent, but will admit of great improvement."[৫০]

এখানে 'great improvement' শব্দযুগল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা পত্রের ভাষা থেকে মনে হতে পারে যে কোম্পানি তথা ভেরেলস্টের কাউন্সিল বুঝি চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য খুব ব্যগ্র ছিল। কিন্তু সত্যি বলতে এক্ষেত্রে তাদের আসল লক্ষ্য ছিল ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি। নীতিগতভাবে কাউন্সিল ধরেই নিয়েছিল চট্টগ্রামের এই বিশাল বনপাদপসমাচ্ছন্ন অনাবাদি ও পতিত ভূমি যে কোন উপায়েই হোক, চাষাবাদের আওতায় আনতে --'It was Verelst's policy to clear as much waste land as possible."[৫১]

উল্লেখ্য যে, পতিত ভূমির অধিকাংশই ছিল চট্টগ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে, বিশেষত আরাকান (বর্তমানে মিয়ানমার বা বার্মা) সীমান্তের গা ঘেঁষা ভূভাগে। এখানে গভীর জঙ্গল থাকলেও দুর্ধর্ষ মগ ও পাহাড়িদের জন্য তা অগম্য ছিল না। ভেরেলস্ট প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন, যারা এই সকল পতিত ও জঙ্গল ভূমি কেটে পরিষ্কার করে চাষের আওতায় আনবে তাদেরকে উক্ত ভূমি ৫-বছরের জন্য সম্পূর্ণ নিষ্কর ভোগ-দখল করতে দেওয়া হবে। তার এই আহ্বানে অনেকেই

৪৯. The Fifth Report, pp. 429.

৫০. Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 158

৫১. The East India Company's Land Policy and Commerce.... pp. 36

সাড়া দিয়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চট্টগ্রামের এককালের সুবিখ্যাত ঘোষাল পরিবার। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীজয়নারায়ণ ঘোষাল (পরবর্তীকালে নয়াবাদ জমিদার হিশেবে স্বীকৃত ও খ্যাত) বিভিন্ন লোক-লস্কর দিয়ে যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বা জঙ্গল সাফ করেছিলেন, ১৭৬৪ সালের জরিপে বিভিন্ন লণ্ডে এর মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩৮৬৬ দ্রোণ। অবশ্য এর মধ্যে চাষাবাদ হতো মাত্র ৬৯২ দ্রোণে।[৫২] কিন্তু সেটিই বা কম কী!

উল্লেখ্য, সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খানের সময় পর্যন্ত চট্টগ্রামে বিভিন্ন মোগল নায়েব-ই-সুবাদারের বিশেষ করে মির আফজাল, আগা বাকের ও দিওয়ান মহাসিংহের রাজত্বকালে 'আসল জমা' বৃদ্ধির একটা উচ্চক্রম-প্রবণতা ছিল। বলাবাহুল্য যে, এই বৃদ্ধির হাব ভেরেলস্ট ও তার কাউন্সিলকে যথেষ্ট প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৭৬১ সালের ৫ই জানুয়ারি থেকে ১৭৬৪-এর শেষ অবধি[৫৩], অর্থাৎ যে ক'বছর হ্যারি ভেরেলস্ট নবাব মিরকাশিমকর্তৃক হস্তান্তরিত চাকলা চট্টগ্রামের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের প্রধান হিশেবে দায়িত্ব পালন করেন, সেই সময়ের ভূমিরাজস্ব আদায়ের নিম্নোদ্ধৃত পরিসংখ্যানই (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) বলে দেবে যে কেন তিনি বাংলার তৎকালীন ক্ষমতাসীন নবাবের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন, অথচ তলে তলে তার লোকজন সর্বতোভাবে বেনিয়া কোম্পানির স্বার্থোদ্ধারের ধান্ধায় ব্যাপৃত ছিলেন। কর্তৃপক্ষকে তিনি লিখেছিলেন, 'Cossim Ally Cawn (*Mir Kasim Ali Khan*), the Subah of Bengal, our good friend and ally, has granted to us the lands and privileges of the province of Chittagong, and we are come to settle here in order to establish trade and prosperity throughout the country.'[৫৪]

এ পর্যায়ে ভেরেলস্টের সময়কার কোম্পানির বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানি গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত চট্টগ্রামের ভূমিরাজস্ব আদায়ের একটি হিসাব দেয়া হলো। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, যেহেতু ১৭৬৫ সাল পরবর্তী ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে আলোচনা করবো, সেহেতু, মিঃ ভেরেলস্ট ও মিঃ চার্লটনের (১৭৬৪-৬৫) পরে চট্টগ্রামে কোম্পানির শাসন অব্যাহত থাকলেও, এবং 'The cession of the Diwani lands in 1765 did not affect the direct character of the Company's administration in Chittagong.'[৫৫] ধরে নিলেও, আমরা এ কথা স্বীকার

৫২. ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে মিঃ চার্লটন যখন চট্টগ্রামের 'চীফ' ছিলেন তখন এর ওপর ভূমিরাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল ৫,৮৭১ টাকা। দেখুন, Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 86.

৫৩. Henry Cotton ভেরেলস্টের চট্টগ্রামে প্রকৃত কর্মকাল ১৭৬১ থেকে ১৭৬৪ নির্দিষ্ট করেন। দেখুন, Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 10. কিন্তু ড. সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তা ১৭৬১ থেকে ১৭৬৫ বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন, The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 35.

৫৪. Memorandum on the Revenue History of Chittagong, pp. 160.

৫৫. The Fifth Report, pp. 430.

করতে বাধ্য যে, চট্টগ্রামের ১৭৬৫-পরবর্তী ভূমির জস্ব ব্যবস্থাপনা কমবেশি তার (ভেরেলস্ট) রচিত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই প্রবর্ধিত হয়েছিল।

১৭৬১ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত চাকলা চট্টগ্রামের ভূমিরাজস্ব	
জানুয়ারি ১৭৬১ থেকে এপ্রিল ১৭৬২	৭,২৮,৫০৮ টাকা
মে ১৭৬২ থেকে ,, ১৭৬৩	৪,৬৭,৩৬৮ ,,
,, ১৭৬৩ থেকে ,, ১৭৬৪	৪,২০,৮৭৪ ,,
,, ১৭৬৪ থেকে ,, ১৭৬৫	৪,০৪,৭২১ ,,

প্রসঙ্গত জানিয়ে দেয়া দরকার যে, চট্টগ্রামের শেষ মোগল নায়েব-সুবাদার সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খানের যুগের তুলনায় এই আদায় আগাগোড়াই ছিল বেশী।

মেদিনীপুর

'আইন-ই-আকবরী' সূত্রে জানা যায় মোগল আমলে মেদিনীপুর ছিল ওড়িশা সুবান্তর্গত সরকার জলেশ্বর (Sarkar of Jalesar)-এর অধীন ১,০১৯,৯৩০ 'দাম' রাজস্বোৎপাদনক্ষম একটি বৃহৎ নগরী (a large city with two forts).[৫৬] মেদিনীপুর ছাড়াও তখন এর অন্তর্ভুক্ত ছিল হিজলির দক্ষিণ ও পশ্চিমের কিয়দংশ।[৫৭] বস্তুত ওড়িশা থেকে আগত মেদিনীপুর (সেই সঙ্গে মূল জলেশ্বর, হিজলি ও তমলুক) সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদই বাংলা সুবা-সন্নিবেশিত হয়েছিল।[৫৮] অবশ্য ড. রত্নালেখা রায় মনে করেন, অষ্টাদশ শতকে তথা ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে নবাব মিরকাশিমকর্তৃক 'হস্তান্তরিত ভূমি' হিশেবে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে সমর্পণের সময় মেদিনীপুর ছিল ওড়িশাভুক্ত।[৫৯] কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য সঠিক নয়। সত্যি বলতে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সময় কিছুকালের জন্যে হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল হিজলি ও তমলুক। পরে যথারীতি তা মেদিনীপুরের সঙ্গে একীভূত হয়। তবে আগেপরের অবস্থা যাই থাকুক, ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন মেদিনীপুর হস্তগত করে তখন তা ছিল মূলত -- 'a part of the present district of Midnapur'.[৬০]

যা হোক চট্টগ্রামের মতো নবলব্ধ মেদিনীপুর জমিদারির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে কোম্পানির

৫৬. The Ain-I Akbari, Vol. II., pp. 156.
৫৭. A Statistical Account of Bengal, Vol. III The Districts of Midnapur and Hugli including Howrah, pp. 18.
৫৮. The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 95.
৫৯. Change in Bengal Agrarian Society, pp. 131.
৬০. The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 95.

কলকাতা কাউন্সিল সেখানে রেসিডেন্ট[৬১] হিশেবে জনৈক মিঃ জন জনস্টোনকে নিয়োগ দিয়ে পাঠায়। তিনি ছিলেন কোম্পানির একজন অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত কর্মচারী।

মেদিনীপুর পৌঁছে জন পুরাতন কিল্লায় প্রাথমিক ডেরা বাঁধতে সমর্থ হলেও অচিরেই তাকে বাংলার নবাবদের পুরোনো শত্রু মারাঠাদের (তখনও পর্যন্ত কাগজে-পত্রে কোম্পানি ছিল নবাবদের প্রতিনিধি-জমিদার) আক্রমণের শিকার হতে হয়েছিল। ফলে একেবারে সূচনাতেই জন নিজের নিয়ন্ত্রণে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। অল্পকালের মধ্যে সেটিও তিনি সম্ভব করে তোলেন কাউন্সিলের সঙ্গে নিয়মিত পত্র যোগাযোগ করে। এবার জন নজর দিলেন এখানকার প্রচলিত জমিদারি ব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্বের দিকে। এক্ষেত্রে শুরুতেই তাকে একটা ভিন্নতব সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো।

মোগল আমল থেকে মেদিনীপুর ও সংলগ্ন অঞ্চল ছিল বিভিন্ন ছোটবড় জমিদাবি-তালুকদারিতে বিভক্ত। প্রসঙ্গত বর্ধমান জমিদারির কথা এখানে উল্লেখ করা হলো। কোম্পানি চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের মতো এটিকেও 'হস্তান্তরিত ভূমি বা অঞ্চল' হিশেবে লাভ করলেও বর্ধমানের সঙ্গে এদের পার্থক্য ছিল। এককথায়, বর্ধমান আগাগোড়াই ছিল একটি বৃহৎ ও একক জমিদারির অধীনে। ফলে একজনকে নিয়ন্ত্রণ করা যতোটা সহজ ছিল, মেদিনীপুরের অসংখ্য জমিদার-তালুকদারকে বশে আনা জনস্টোনের পক্ষে ততোটাই ছিল কঠিন এক কাজ। কিন্তু সেটাও হয়তো খুব অসুবিধের হতো না যদি না এখানকার জমিদার-তালুকদারেরা কোম্পানির রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণ মানতে অস্বীকাব করতো এই অজুহাতে যে, তারা অধিকাংশই দিল্লিব কেন্দ্রীয় মোগল সম্রাট ও তাদের প্রতিনিধি-নবাব, স্থানীয় রাজন্যবর্গ প্রভৃতির কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত 'পেশকাশ', উপঢৌকন প্রভৃতি দিয়ে জমিনদারি-তালুকদারি 'সনন্দ' (সনদ) হাসিল করেছে। এখন বাংলার নবাব ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিযা কোম্পানিকে এতদঞ্চলের ভূমিবাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রদান করলেও তারা তা মানতে রাজি নয়।

ফলে বলা যায় একদিকে মারাঠা আক্রমণের ভীতি এবং অন্যদিকে জমিদাব-তালুকদার বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলীয় জঙ্গল মহালের দুর্ধর্ষ 'চুয়াড়' প্রজাদের নেতা পাহাড়ি জমিদারশ্রেণীর প্রবল বিরোধিতা ও অসংখ্য দস্যু-তস্করসৃষ্ট বিশৃঙ্খলার মধ্যেই জনস্টোন মেদিনীপুরে কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থে ভূমিরাজস্ব পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন।

উল্লেখ্য, ক্লাইভ ও সিলেক্ট কমিটির ইচ্ছা ছিল গোটা মেদিনীপুর জমিদাবি বড় বড় লটে ইজারা (Farming System) দেয়ার।[৬২] কমিটির ইচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিজের ক্ষমতা-কেন্দ্রকে মজবুত ও পাকাপোক্ত করার জন্যে প্রথমে জন কোম্পানির তৎকালীন বাণিজ্যিক সদর-দপ্তর (Commercial Head-quarters or Factory) বন্দর বালাশোর

---

৬১. আধুনিক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরদের মতোই ছিল এর ক্ষমতা। এ সম্পর্কে ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেন, 'His duties ranged from revenue settlement to the expulsion from the district of gangs of robbers and dacoits, to the destruction of a hostile french armament or a skillful negotiation with the Marathas.' (সংগৃহীত, মেদিনীপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫।

৬২. The History of Bengal (1757-1905), Edited by Dr. Narendia Krisna Sinha, pp. 87.

(বলেশ্বর?) থেকে মেদিনীপুরে স্থানান্তরিত করেন। তিনি জমিদার-তালুকদারদেরকে নির্দেশ দেন তাদের ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের খতিয়ান কোম্পানির দপ্তরে জমা দিতে। কারণ এ বিষয়ে প্রাথমিক খোঁজ-খবর নিয়ে তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন, জমিদার-তালুকদারেরা বিভিন্ন সময়ে বাৎসরিক যে পরিমাণ ভূমিরাজস্ব রায়তদের কাছ থেকে উসুল করে, তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তারা গোপন করে এবং নিজেরাই আত্মসাৎ করে অর্থাৎ সরকারি রাজস্ব কর্মচারীদের অগোচরে রেখে স্রেফ ফাঁকি দেয়। ফলে সঠিকভাবে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত বা ইজারা দিতে গেলে প্রকৃতপ্রস্তাবেই সংশ্লিষ্ট ভূমির আসল আয়ের হিসাব জানা দরকার।

কিন্তু জনের এই নির্দেশ মানতে অধিকাংশ জমিদার-তালুকদার অস্বীকার করে। এখানে বলে রাখা ভালো, জমিদারদের অজুহাতের মূল শক্তিবলয় তথা বাংলার নবাবদের অবস্থাই তখন যেহেতু ছিল নিতান্ত নাজুক, স্বভাবতই তাদের এই না-মানার দলে যেমন সমষ্টির সমর্থন ছিল না, তেমনি যারা একেবারেই মানতে চাইতো না তাদের মধ্যেও ছিল দ্বিধা-শঙ্কা। না জানি কখন কোম্পানির শক্তিশালী সৈন্যদল তাদেরকে আক্রমণ করে জমিদারি-তালুকদারি ছাড়া করে। বলাবাহুল্য বাৎসরিক খাজনা বা 'ভেট' -- যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেন, সেটা তারা দিতো এবং এ যাবৎ দিয়ে এসেছে -- তাই নবাবকে দি'ক, কি স্থানীয় উপরস্থ জমিদারশ্রেণীকে। ফলে কেউ কেউ চাইলো নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা ঠিক রেখে কোম্পানির রেসিডেন্টের সঙ্গে একটা আপোষ রফায় আসতে। অন্যদিকে জনস্টোনও দেখলেন প্রচলিত অবস্থার একেবারে আমূল পরিবর্তন করতে গেলে তার ভূমিরাজস্ব আদায়ের মূল উদ্দেশ্যই শুধু ব্যাহত হয় না, উপরন্তু তাকে প্রতিনিয়ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়। যাতে লোকক্ষয়ও যেমন ছিল, তেমনি ছিল প্রচুর অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। তাছাড়া কাউন্সিলের সিদ্ধান্তানুযায়ী ব্যাপক হারে ইজারা প্রথা চালু করতে হলে নিলাম শেষে যে সমস্ত প্রাচীন কিন্তু অভিজাত-সম্ভ্রান্ত জমিদারশ্রেণী জমিদারি হারাবে (দেশাচারানুসারে প্রচলিত বা মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় এদেরকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করার সুযোগ ছিল না), তাদেরকে উপযুক্ত আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সম্মান দিয়ে পুনর্বাসন করতে হবে। এ জন্যও কোম্পানির প্রয়োজন হবে এককালীন প্রচুর অর্থের।

ড. সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেন, "The removal of the zamindars would, according to the custom, necessitate the granting of maintenance allowance to them and this could cost the Company a considerable amount of money."[৬৩] আবার নবাব মিরকাশিমের যে 'সনদ' বলে কোম্পানি চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান 'হস্তান্তরিত ভূখণ্ড' হিশেবে পেয়েছিল, তাতেও নির্দেশ ছিল, কোম্পানি এই সকল এলাকার ভূমিরাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করলেও স্থিত জমিদারি-তালুকদারি রহিত করতে পারবে না, অর্থাৎ জমিদারদেরকে তাদের স্বস্থানে বহাল রেখেই কোম্পানিকে রাজস্বাদায়ের কাজ করতে হবে -- "When Mir Qasim ceded Burdwan, Midnapur and Chittagong to the British he insisted on a provision-- 'they shall continue the zamindars and renters in their places'."[৬৪]

তাই অনেক চিন্তা-ভাবনা এবং কলকাতা কাউন্সিলের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ করে শেষ পর্যন্ত তিনি

৬৩. The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 50.

৬৪. The History of Bengal (1757-1905), pp. 87. যদিও নবাবের এই নির্দেশ অনেকক্ষেত্রেই কোম্পানি অত্যন্ত সচেতনভাবেই উপেক্ষা করেছিল।

সিদ্ধান্ত নেন স্থিতাবস্থা মেনে নিতে। তবে এ বিষয়ে জমিদার-তালুকদারদের তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, বিদ্যমান নিয়ম-নীতি মেনে যারা আগের মতোই নবাবের স্থলে কোম্পানির দপ্তরে নিয়মিত বাৎসরিক খাজনা প্রদান করবে তাদেরকে তিনি কিছু বলবেন না বা তাদের জমিদারির ক্ষতি হয় এমন কোন পদক্ষেপ কোম্পানি গ্রহণ করবে না। কিন্তু যারা তার এই শর্তে রাজি হবে না তাদের বিরুদ্ধে কোম্পানি যথাসাধ্য ব্যবস্থা নিতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না। বস্তুত এ জন্য প্রয়োজন হলে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট জমিদার-তালুকদারদেরকে শক্তি প্রয়োগে উচ্ছেদ করতেও পিছপা হবে না। তা সত্ত্বেও সত্য কথা বলতে, রেসিডেন্টের এই হুমকি অনেক জমিদার-তালুকদার মেনে নিলেন না। বাধ্য হয়ে জন তখন যারা কোম্পানির অধীনতা মেনে নিয়ে নিয়মিত বার্ষিক খাজনা প্রদানে স্বীকৃত হলো তাদের কাছ থেকে প্রচলিত পদ্ধতিতে খাজনা গ্রহণ চালু রাখলেন। অন্যদিকে যে সকল অবাধ্য জমিদার ও তালুকদার কোনভাবেই কোম্পানির সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হলো না তাদের বিরুদ্ধে তিনি সৈন্য পাঠিয়ে তাদেরকে জব্দ করার পথে অগ্রসর হলেন। বলাবাহুল্য শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে তাকে যেমন চোর-ডাকাত ধরার জন্যে পুলিশি সহযোগিতা নিতে হয়েছিল, তেমনিভাবে প্রতিনিয়ত মেদিনীপুরের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষত পশ্চিমের জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চলের জমিদারদের (এরা 'রাজা' হিশেবে প্রজাদের কাছে পরিচিত ছিল) শায়েস্তার্থ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে হয়েছিল।"[৬৫]

সুতরাং এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, চট্টগ্রামের 'চীফ'-এর মতো জনস্টোনকে এখানে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় 'ফৌজদারে'র দায়িত্ব-কর্তব্যও পালন করতে হয়েছিল। 'The Fifth Report' এর ভাষায়, 'In regard to the administration of criminal justice, the Resident at Midnapur possessed the same power as that entrusted to the Chief at Chittagong; i.e., he was empowered to arrest robbers, dacoits, and disturbers of the peace, and was vested with the superintendence of the Faujdari courts. The police stations (thanas) were under his direction, and while the subordinate revenue-collectors (tehsildars) gave their assistance to the thanadars, the latter would at times be

৬৫. অবশ্য এই দুর্গম পাহাড়ি এলাকা যে খুব বেশি রাজস্ব-উৎপাদনক্ষম ছিল, তা নয়। কারণ হান্টার বলেন, 'The western jungle is an extent of country about eight miles in breadth and sixty in length. ... There is very little land cultivated in its whole extent, and a very disproportionate part of it is capable of cultivation. The soil is very rocky. The country is mountainous. and overspread with thick forests, which render it in many places utterly impassable. It has always been annexed to the Province of Midnapur, but from its barrenness it was never very greatly regarded by the Nawab's Government, and the *zamindars* sometimes paid their rent, or rather tribute, and sometimes not.' (A Statistical Account of Bengal, Vol. III., pp. 19).
তথাপি এখানকার রাজা-জমিদারদের পরাস্ত করা কোম্পানির শক্তিমত্তা প্রদর্শন ও ভবিষ্যত অস্তিত্বের জন্যেই একান্ত জরুরি ছিল। জন জনস্টোন সেটাই করতে চেয়েছিলেন।

required to assist the tehsildars.'[৬৬]
যা হোক জনের আপাত গৃহীত পদক্ষেপের ফল এই হয়েছিল যে, 'Now and again the Resident had to exercise the authority of removing one zamindar and installing another in his place.'[৬৭] রেসিডেন্ট এ-ও চেয়েছিলেন, যে সমস্ত জমিদার বার্ষিক নিয়মিত খাজনা দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু অবস্থা বৈগুণ্যে যথাসময়ে তা পরিশোধে উপর্যুপরি ব্যর্থ হবে, তাদের জমিদারি খণ্ড খণ্ড করে তিনি ছোট ছোট তালুকাকারে বন্দোবস্ত দিবেন।[৬৮]
জনস্টোনের পরে ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে বার্ডেট (Burdett) এবং তার দু'বছর পরে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে অ্যানসেল্‌ম বিউমন্ট (Ansclm Beaumont) মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট হয়ে আসেন। শেষোক্ত জন ছিলেন তৎকালীন কলকাতার একজন ধনী ব্যবসায়ী ('a wealthy free-merchant of Calcutta')।
এরা দু'জনই মূলত মেদিনীপুরের আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও জনস্টোনের রেখে যাওয়া পদ্ধতির সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। তন্মধ্যে বিউমন্টের পছন্দ ছিল বাৎসরিক খাজনা আদায়ের পরিবর্তে কয়েক বছরের চুক্তিতে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়ার প্রতি। কেননা এই ব্যবস্থা জমিদারদের জন্যে সহায়ক ছিল। এককালীন কয়েক বছরের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত পেলে তারা পতিত বা অনাবাদি ও জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা আবাদ করতে উৎসাহিত হবে, বিউমন্টের ভাবনায় এটাও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্রোহী জমিদাররা কোম্পানির রেসিডেন্টের কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করলো। তারা নবাবের খাজাঞ্চিখানায় বার্ষিক ভূমিরাজস্ব দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কোন অবস্থাতেই ভুঁইফোড় কোম্পানির দপ্তরে নয়। ফলে তাদের এই আগ্রহ এবং কোম্পানির ক্ষতির দিক বিবেচনা করে এক পর্যায়ে কলকাতা কাউন্সিলও বাধ্য হলো পরিস্থিতি মেনে নিতে। তাদের দরকার খাজনা, সেটা যেভাবেই আসুক না কেন। নবাবের নামে যদি ভূমিরাজস্ব দিতে জমিদার-তালুকদারেরা স্বীকৃত হয় তাহলে সেটাই করুক স্থানীয় কর্তৃপক্ষ -- এই মর্মে কলকাতা কাউন্সিলের পক্ষে তৎকালীন প্রধান হেনরি ভ্যান্সিট্যার্ট, অ্যানসেলম বিউমন্টকে এক জরুরি পত্র লিখলেন। পত্রের ভাষা এ রকম: ' ... application will be made to the nabob.... to order the zamindars to discharge in money such balances of former years and advances of this season.'[৬৯] রেসিডেন্টের প্রতি কাউন্সিলের আরও পরামর্শ ছিল -- 'to take all possible lenitive measures for recovering the rents.'
অ্যানসেল্‌ম বিউমন্ট যাওয়ার আগে মেদিনীপুরের প্রকৃত ভূমিরাজস্ব আয় নিরূপণের লক্ষ্যে একটি বিস্তৃত 'হস্তবুদ' তৈরি করতে কাউন্সিলের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা তিনি শেষ পর্যন্ত করে যেতে পারেননি।
যা হোক বিউমন্ট খুব স্বল্পকাল দায়িত্বে ছিলেন। তার পরে একই বছরের অক্টোবরে রেসিডেন্ট

৬৬. pp. 431.
৬৭. The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 68.
৬৮. See, John Johnstone's Letter to the Committee of New Lands, dated 8th January, 1761. I.O.R. Range 98, Vol. 10.
৬৯. Collected from, The Decline of the Bengal Zamindars: Midnapore (1870-1920), Dr. Chitta Panda, pp. 9.

নিযুক্ত হন হিউ ওয়াটস (Hugh Watts)। কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিল এবার তাকে শুরু থেকেই প্রয়োজনে খুব কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলো। ৬ই নভেম্বর, ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাকে লিখিত গভর্নর ভ্যান্সিট্যার্টের পত্রের ভাষা এখানে লক্ষ্যণীয়: 'We observe that from the time the Company were first put in possession of the province of Midnapore we have met with the greatest obstruction from the zemindars in the collection of the rents, and have always found them ready to join our enemies whenever they have an opportunity: we think, therefore, that the Company's possessions in that country would be much better secured and the rents ascertained by entirely annulling the authority of zemindars and allowing them a fixed income for their maintenance by assignments of lands, and appointing officers everywhere on the part of the Company to collect the rents immediately from the ryots.'[৭০]

কিন্তু মেদিনীপুরের সমকালীন বাস্তবতা ছিল অন্য রকম, যা কলকাতায় বসে ভ্যান্সিট্যার্ট ও তার কাউন্সিলের সদস্যদের পক্ষে পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না। ওয়াট্সও সেখানকার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে গভর্নরকে ফিরতি পত্র লিখলেন, যার উল্লেখযোগ্য অংশ এরূপ: 'The annulling of the authority of the zemindars and allowing them a fixed income, and appointing officers on behalf of the Company to collect the rents from the tenants, I am afraid, would be prejudicial to the country. They are so reduced that it is out of their power to do harm to the Country's affairs, and if encouraged (which granting leases will do), they well may be of great service. The assignment or allowance for their maintenance also to the zemindars and chowdries, with the charges of collections, must greatly exceed the increase of the revenues; ..... if we are too hard or oppressive, there is great reason to expect it (the flourishing of Midnapore under the Company) will rather decline.'[৭১]

হিউ ওয়াট্সের উপরিউক্ত পত্র থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তিনি জমিদার-তালুকদার সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চাকলা মেদিনীপুরের ভূমিরাজস্বের স্থিত ব্যবস্থাব উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন। কাউন্সিল চেয়েছিল জমিদারদের বাদ দিয়ে ভূমিরাজস্ব আদায়ের কাজটি সরাসরি রায়তদের সঙ্গে সম্পন্ন করতে। কিন্তু তাতে যে সমস্যা হতো এবং বিকল্প পন্থা অবলম্বন করলে কোম্পানি কিভাবে লাভবান হতে পারে, এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা তার কাছ থেকে পেয়ে কলকাতা কাউন্সিলও শেষ পর্যন্ত ওয়াট্সের প্রস্তাবেই সম্মত হলো। তবে তাদেরও সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল, যে পর্যন্ত কোন জমিদার-তালুকদার 'তাসখিস' (ধার্য ভূমিরাজস্ব) নিয়মিত পরিশোধ করবে অর্থাৎ রেসিডেন্টের বশ্যতা পুরোপুরি মেনে নেবে তখন পর্যন্ত তাদেরকে স্বপদেই পূর্ববৎ বহাল রাখা

---

৭০. The Fifth Report, pp. 432.
৭১. Ibid., pp. 433.

হবে। তারা রায়তদের কাছ থেকে যথারীতি খাজনা আদায় করবে এবং বছরের নির্দিষ্ট সময়ে কোম্পানির সদর দপ্তরে দেয় পরিশোধ করবে, এটা হলে রেসিডেন্ট তাদের বিরুদ্ধে সচরাচর কোন বিরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। অবশ্য তারা অবাধ্য হলে বা কোম্পানির শত্রুপক্ষ যেমন মারাঠারা ও অন্য বিদ্রোহী জমিদার-তালুকদারশ্রেণীর সঙ্গে আঁতাঁত (আঁতাত) করলে, সেক্ষেত্রে রেসিডেন্ট তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে কসুর করবে না।

এখানে উল্লেখ্য যে হিউ ওয়াট্‌স ছিলেন কোম্পানির একজন অন্যতম বোর্ড সদস্য। তখন পর্যন্ত কোম্পানির কাগজে-পত্রে মেদিনীপুরের আর্থ-রাজনৈতিক যে অবস্থা, তা কোম্পানির কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ফলে একজন শীর্ষ কর্মকর্তাকে সেখানে দীর্ঘদিন রাখা কলকাতা কাউন্সিলের কাছে জরুরি বলে মনে হয়নি।

তাই ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়াট্‌স বদলি হন। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন জনৈক টমাস গ্রাহাম (Thomas Graham)। উল্লেখ্য ইনি বিখ্যাত ডব্লিউ বি. সামনার-এর সহকর্মী হিশেবে বর্ধমানের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের কাজে ইতোমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও সুনাম অর্জন করেছিলেন। এর সময়ে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার অবকাঠামোগত একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি সিলেক্ট কমিটির নির্দেশক্রমে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর জেলার সমন্বয়ে একটি 'সার্কিট' (Circuit) প্রতিষ্ঠিত করেন। সার্কিট গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, যেন এর মাধ্যমে ভূমিরাজস্বের প্রকৃত আয়সম্বন্ধীয় তথ্যাদি বিভিন্ন সূত্রে হাসিল করা যায় এবং সেই অনুযায়ী কোম্পানি, ভবিষ্যত ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির অনুকূল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া রায়ত বিশেষত অভাবী ও গৃহহীন রায়তরা অধিক পরিমাণে পতিত ও জঙ্গলভূমি কেটে পরিষ্কার করে যাতে আবাদ বিস্তৃত করে এবং এর ফলে কোম্পানির ভূমিরাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়, সেজন্যও তিনি তাদের সঙ্গে অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন।[৭২]

যা হোক ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের আগপর্যন্ত মেদিনীপুরে মোটামুটি এটিই ছিল তাদের নিয়োজিত বিভিন্ন রেসিডেন্টের উল্লেখযোগ্য ভূমিরাজস্ব কার্যক্রম।

১৭৬০ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত চাকলা মেদিনীপুরের ভূমিরাজস্ব[৭৩] (মে থেকে এপ্রিল)	
১৭৬০-১৭৬১	১,১৬,৯২৫ টাকা
১৭৬১-১৭৬২	৮,৩৭,৯৮৩ "
১৭৬২-১৭৬৩	৭,৪৩,৩৩০ "
১৭৬৩-১৭৬৪	৭,৪৮,৭৭৭ "
১৭৬৪-১৭৬৫	৫,৯০,৯৩২ "
১৭৬৫-১৭৬৬	৭,৩২,০৫৫ "

উপরের ছক থেকে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, কোম্পানি ১৭৬০-১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে যখন চাকলা মেদিনীপুরের ভূমিরাজস্ব আদায়াধিকার লাভ করে, তখন নবাবের রাজস্ব দপ্তর বিভিন্ন জমিদার-

---

৭২. The Fifth Report, pp. 433.

৭৩. From Verelst's Book, see, The Fifth Report, pp. 438.

তালুকদারদের কাছ থেকে যে 'মাল' পেতো, তৎকালীন চলতি মুদ্রায় তার পরিমাণ ছিল মোটামুটি ১,১৬,৯২৫ টাকা। অথচ হ্যারি ভেরেলস্টের প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয়, অব্যবহিত পরের বছর তা ৭-গুণেরও বেশি শুধু বৃদ্ধিই পায়নি, বরং উত্তরোত্তর এই ধারা বা প্রবণতা কমবেশি অব্যাহত ছিল।

সুতরাং সহজেই অনুমেয়, কেবলমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে শুরু থেকেই মেদিনীপুরে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়াগোষ্ঠী 'মাল' ধার্য ও আদায়করণে কী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, এবং রায়তদের ওপর তার প্রতিফল কী হতে পারে!

বর্ধমান

বর্ধমান জমিদারি যখন কোম্পানির কাছে হস্তান্তরিত হয় তখন এটি ছিল মূলত চাকলে বর্ধমান, এবং হুগলি ও মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত।[৭৪] পলাশির যুদ্ধের সময় এর আয়তন ছিল প্রায় ৫,১৭৪ বর্গমাইল[৭৫], পরবর্তীকালে হুগলি, মেদিনীপুর প্রভৃতির অংশবিশেষ জুড়ে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর অন্তর্ভুক্ত গ্রামের সংখ্যা ছিল ৯,০০০টি।[৭৬] এখানে উল্লেখ্য যে, বর্ধমান ছিল মুসলমাল শাসনামলের বাংলার খুব বিখ্যাত প্রাচীন হিন্দু জমিদারিগুলির একটি। যতদূর জানা যায় ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের আগেই মোগল সম্রাটদের অধীনে একটি ক্ষুদ্র জমিদারি হিশেবে এর বিকাশ ঘটেছিল যা ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়ে এই বংশের সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য ও কীর্তিমান জমিদার মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের (১৭০১/২-১৭৩৯/৪০) সময়ে অর্থাৎ নবাব আলিবর্দির সুবাদারিকালের সূচনাতেই তা বিশালাকার ও খ্যাতি লাভ করেছিল।[৭৭] গোড়াতে মাত্র ৬/৭টি পরগণাসমন্বিত জমিদারির ভূমিরাজস্ব আদায় দিয়ে শুরু হয়েছিল কীর্তিচন্দ্রের কাজ। ফলত এই গুরুদায়িত্ব তিনি

---

৭৪. The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 54-55; The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp. 38.
শ্রী বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড', (পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭) গ্রন্থে এর যে সীমানা উল্লেখ করেছেন, তাঁর ভাষায় তা এ রকম: '১৭৬০ সালে মীরকাশিম বর্ধমান ইংরেজদের হস্তান্তর করেন। তখন বর্ধমান জমিদারীর সীমানা ছিল, বর্তমান বর্ধমান (সাতসৈকা ছাড়া), হুগলি ও হাওড়া (সরস্বতীর পূর্ব তীরাঞ্চল ছাড়া), মেদিনীপুর (ঘাটাল, সদবের গড়বেতা, শালবনি ও কেশপুর থানার উত্তরাংশ), বাঁকুড়া (রায়পুর থানা) এবং বীরভূম (অজয়ের উত্তরে খানিকটা অঞ্চল) পর্যন্ত বিস্তৃত।'

৭৫. মেজর রেনেল-এর বিখ্যাত জরিপের ভিত্তিতে জেমস গ্রান্ট এই পরিমাপ দিয়েছেন। দেখুন, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, ড. রজতকান্ত রায়, পৃষ্ঠা ৫১।

৭৬. Land and Local Kingship in Eighteenth -Century Bengal, Dr. John R. McLane, pp. 185.

৭৭. ড. রত্নলেখা রায় বলেন, 'The Burdwan Raj was a deliberate creation of Mughal official policy, which promoted its growth as a means of bringing the area under government control through a royal princely house .... Although the original possessions of the family were acquired as far back as 1680, it was only during the rule of

এতো সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন যে ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে নবাব শুজাউদ্দিনের সময়ে যখন 'জমা-ই তুমারি-তাসখিস' প্রণীত হয়েছিল, তার হিসাবে দেখা যায় ততোদিনে তাঁর নিয়ন্ত্রণে প্রায় ৫৬/৫৭টি পরগণার ভূমিরাজস্ব আদায়াধিকার অর্পিত হয়েছিল।[৭৮] যদিও স্বীকার্য যে, বর্ধমান জমিদারি অন্ত্য-মধ্যকালীন বাংলার সর্ববৃহৎ জমিদারি ছিল না, বরং রাজশাহি জমিদারি ছিল তদাপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ (জায়গির ব্যতীত ১৩৯টি পরগণা ছিল এর অন্তর্ভুক্ত, ভূমির পরিমাণ ১২,৯০৯ বর্গমাইল[৭৯] এবং রাজস্ব ১৬,৯৬,০৮৭ টাকা); কিন্তু বর্ধমান জমিদারির ভূমিরাজস্ব আয় ছিল ২০,৪৭,৫০৬ টাকা। উল্লেখ্য বর্ধমান জমিদারির ভূমিরূপের উৎপাদনশীলতা ('much highly cultivated') ও বাংলার সমসাময়িক অন্যান্য জমিদারিগুলির তুলনায় এর ভূমিরাজস্ব-আয় ক্ষমতার দিক বিবেচনা করে ঐতিহাসিক জেমস গ্রান্ট এটিকে মারাঠা রাজ্য তাঞ্জোর (তাঞ্জাবুর) ও রাজা চৈৎ সিংহের বারাণসীর সঙ্গে তুলনা করতেও পিছপা হননি।[৮০] স্বভাবতই এ ধরনের একটি বিপুল ভূমিরাজস্ব-আয়সম্বলিত জমিদারি হস্তগত করার অভিলাষ ছিল কোম্পানির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। ঐতিহাসিক জন আর. ম্যাকলেন যথার্থই বলেছেন, 'Of the four ceded districts, the Burdwan zamindari was the richest and the one the Company had "most wished to obtain".'[৮১]

বিপুল রাজস্ব ছাড়াও বর্ধমান জমিদারি হস্তগত করার পিছনে কোম্পানির আরও কয়েকটি কারণ ছিল, যথা: (১) বর্ধমান ও মেদিনীপুরের আর্থ-প্রশাসনিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রেখে কামারডিচর, পটাশপুর, ভোগরাই প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মারাঠাদের আক্রমণ হলে বর্ধমান থেকে তা প্রতিহত করা অধিকতর সুবিধাজনক; এবং (২) পূর্বেই প্রাপ্ত কলকাতা তথা ২৪-পরগণা জমিদারির মোটামুটি নিকটবর্তী এই বিশাল জমিদারি কোম্পানির কব্জায় রাখা গেলে এখানকার আয়-সম্পদ দিয়ে কলকাতা-নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা সম্ভব হবে।[৮২]

কাগজে-পত্রে 'হস্তান্তরিত ভূমি' হিশেবে বর্ধমান-জমিদারির 'মাল' আদায়াধিকার অর্জনের পর ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে কোম্পানি হিউ ওয়াটসকে সেখানে পাঠায় তৎকালীন রাজা

Maharaja Kirtichand (1701-1739) that the family came to possess the premier Raj in Bengal, paying the highest revenue among all Bengal zamindars.' (Change in Bengal Agrarian Society, Dr. Ratnalekha Ray, pp. 89-91).

৭৮. James Grant's, 'Historical and Comparative Analysis', pp. 410-12; quoted from, Land and Local Kingship in Eighteenth -Century Bengal, pp. 147.

৭৯. Analysis of the Finances of Bengal, dated April 27, 1786, quoted from, A Statistical Account of Bengal, Vol. VIII., pp. 21.
গ্রান্ট এটিকে 'the greatest territorial jurisdiction throughout Bengal or perhaps Hindustan' বলে আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন, The Revenue Administration of Northern Bengal, Dr. A.B.M. Mahmood, pp. 1.

৮০. দেখুন, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, পৃষ্ঠা ৫১।

৮১. Land and Local Kingship in Eighteenth -Century Bengal, pp. 185.

৮২. বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২৬১।

ত্রৈলোক্যচন্দ্র বা তিলকচাঁদের সঙ্গে নতুনভাবে ভূমিরাজস্ব চুক্তি সম্পাদনের জন্যে। তিনি সেখানে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলাসহ সামগ্রিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনার খুব দুরবস্থা দেখতে পান; বস্তুত নতুন চুক্তির বিষয়ে রাজার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ওয়াট্‌স সেখানকার বিভিন্ন অবস্থা জানিয়ে কলকাতার কাউন্সিলে এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তার রিপোর্টের ভিত্তিতে পরের বছর অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে লেফটেন্যান্ট নলিকিন্স-এর নেতৃত্বে কোম্পানি বর্ধমানাভিমুখে ৭৩০ জনের এক সৈন্যদল পাঠায় রাজাকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে কার্যোদ্ধারোদ্দশ্যে। কিন্তু রাজা ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া মানুষ। তাঁর জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতার ভিত ছিল যথেষ্ট শক্ত। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, তাঁর প্রভাব এবং প্রতিপত্তির কথা বিবেচনা করে জীবদ্দশায় আলিবর্দি খান পর্যন্ত তাঁকে স্বীয় দুর্দিনে মারাঠা নেতা ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তির বিষয়ে দৃতিয়ালির দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[৮৩] স্বভাবতই রাজা ওয়াট্‌সের অন্যায় চাপের কাছে সহজে নতি স্বীকার করার পাত্র ছিলেন না। তবে তাঁর দুর্ভাগ্য এই যে, সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক-প্রশাসনিক আবহই এমন ছিল যে তাঁর পক্ষ সমর্থন করার মতো মিত্র তেমন ছিল না। স্বয়ং নবাব মিরকাশিমই ছিলেন তাঁর বিরোধীদের একজন।

উল্লেখ্য নবাব মিরকাশিমের কাছ থেকে বর্ধমান 'হস্তান্তরিত ভূমি' হিশেবে পাওয়ার আগে ভূতপূর্ব নবাব মিরজাফরকর্তৃক কোম্পানি এটি (নদীয়াসহ) 'তনখা'রূপে পেয়েছিল (এপ্রিল, ১৭৫৮)। মোগল ভূমিরাজস্বের পরিভাষায় 'তনখা' ছিল --'an assignment on the revenue for personal support, or other purposes'।[৮৪] পলাশির যুদ্ধের আগে থেকেই এবং বিশেষ করে 'তনখা' ভূখণ্ডের রাজস্ব আদায় নিয়ে রাজার লোকদের সঙ্গে কোম্পানির নিয়োজিত কর্মচারীদের বিভিন্ন ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। রাজার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল, তিনি স্বীয় লোকদের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় জমিদারির প্রকৃত রাজস্ব আয় গোপন করছিলেন তথা কম দেখাচ্ছিলেন। দ্বিতীয়ত ইংরেজ ও নবাব -- উভয়েরই শত্রু লুণ্ঠনকারী মারাঠাদের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং দিল্লির তৎকালীন মোগল শাহজাদা আলি গওহর (পরবর্তীকালের বাদশাহ দ্বিতীয় শাহআলম) এর প্রতি অধিক দুর্বলতা।

রাজার প্রতি নবাব মিরকাশিমের ধারণা যে কতো বিরূপ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানিকে লিখিত নবাবের একটি পত্র থেকে। উক্ত পত্রের ক্ষিয়দংশ: 'I hear from Burdwan that the zemindar intends to fight, and that he has collected together 10 or 15 thousand Peons and robbers and takes

৮৩. The Role of the Zamindars in Bengal, 1707-1772, Dr. Shirin Akhtar, pp. 34.

৮৪. Wilkins, Glossary, pp. 35, quoted from, The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 87
'Broadly speaking, Tankha was a maintenance-allowance. In other words, it was a monetary allowance in lieu of maintenance granted by the grantor to the grantee principally and usually for discharging some moral obligation of the former to the latter. In this sense, every Tankha-holder was a maintenance-holder in receipt of a monetary allowance in lieu of maintenance' (Zamindars and Patnidars, Dr. Harasankar Bhattacharyya, pp. 73).

them into pay and joined the Beerbhoom Raja."[৮৫]

এর কোন কোন অভিযোগ যে পুরোপুরি সঠিক ছিল না তার প্রমাণ মারাঠারা ওড়িশা থেকে যখন বাংলার পশ্চিম ভূখণ্ড আক্রমণ করে তখন বর্ধমান ও আশেপাশের কতিপয় অঞ্চলও মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। শাহজাদার সৈন্যবাহিনীও বর্ধমানের কিছু অংশ তছনছ করতে দ্বিধা করেনি। উল্লেখ্য পরবর্তীকালে কাউন্সিলের কাছে এ সম্পর্কিত যে বিবরণী রাজা দাখিল করেছিলেন তাতে দেখা যায় এদের আক্রমণের ফলে তাঁর প্রায় ৭,৯৩,০৮০-৩-৯ টাকার ক্ষতি হয়েছিল।[৮৬]

যা হোক, সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিজের প্রতিকূল বুঝতে পেরে রাজা শেষ পর্যন্ত নবাব ও ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ মিটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ফলে ১৭৬০ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে প্রথমবারের মতো তিনি রাজচন্দ্র রায় নামক তাঁব একজন উকিল-প্রতিনিধিকে জমিদারির আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশসহ কলকাতায় ইংরেজদের কাউন্সিলে প্রেরণ করেন। উকিলের প্রদর্শিত হিসাবের ফিরিস্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা শেষে কাউন্সিল রাজার দেয নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারিত করেছিল। পরিসংখ্যানটি কিছুটা বিস্তৃত হলেও এখানে তুলে ধবা জরুরি মনে করছি এই জন্যে যে, এ থেকে অন্ত্য-মধ্যকালীন বাংলার মাত্র একটি জমিদারিতেই কতো ধরনের উপরস্থ ভূ-স্বত্ব ছিল ও তা থেকে এগুলির আয় কেমন ছিল তা যেমন জানা যাবে, তেমনি নবাবি কর্তৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে এক-একটি জমিদারি-তালুকদারিকে গ্যাঁড়াকলে ফেলে বিদেশি বণিকগোষ্ঠী যে কিভাবে অর্থনৈতিক শোষণ শুরু করেছিল (পরবর্তীকালেও তাদের এই শোষণ প্রবণতা অব্যাহত ছিল), তার কিছু স্পষ্ট নমুনা ও চিত্র এতে পাওয়া যাবে।[৮৭]

১৬ই ডিসেম্বর, ১৭৬০-পরবর্তী ৪ মাসের মধ্যে পরিশোধেয়			
	টাকা	আনা	পাই
খালসা, জায়গির ও 'চৌথ'-এর আয় থেকে	২৬,৩৭,৯৩৭	৬	৯
বিবিধ (যেমন দরবারি ব্যয়ার্থ দেয়)	২,১৮,১৮২	০	৯
মোট	২৮,৫৬,১১৯	৭	৬

উপরোল্লিখিত মোট দেয় থেকে নিম্নলিখিত কর্তন গিয়ে প্রকৃত দেয় ধার্য হবে এরূপ:-

	টাকা	আনা	পাই
কোম্পানির খাস অধিকৃত পরগণাব রেয়াত	৩৮,৭৫০	৭	১
খুচরা মালের ওপর মিরজাফরকর্তৃক ছাড়কৃত	১,১৬,৭১১	১	৯
মোট রেয়াত	১,৫৫,৪৬১	৮	১০
সুতরাং আগামী ৪ মাসের মধ্যে নেট দেয়	২৭,০০,৬৫৭	১৪	৮

আগেই বলেছি মারাঠা ও শাহজাদা আলি গহরের সঙ্গে রাজার গোপন সম্বন্ধ ছিল বলে তাঁর

৮৫ Qupted from, The Role of the Zamindars in Bengal, pp 110.

৮৬. The Fifth Report, pp. 440.

৮৭. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, The Fifth Report, pp. 440-441.

বিরুদ্ধে কোম্পানি ও নবাবের অভিযোগ ছিল। বলাবাহুল্য এরা যখন বাংলা আক্রমণ করেছিল তখন যেমন নবাবের নিজের লোকদের জানমালের ক্ষতি হয়েছিল, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নবাবের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কোম্পানির লোকজন ও সৈন্যসামন্তের। এবার সুযোগ পেয়ে কোম্পানি সেটাও রাজার কাছে দাবি করে বসলো। অবশ্য এ জন্যে তারা সময় বেঁধে দিয়েছিল ৫-বছরের; এর মধ্যে ফি-বছর বর্ধমান-রাজ যে পরিমাণ টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন তা এ রকম:-

	টাকা	আনা	পাই
১৭৬১ সালে	১,৫৩,০০০	০	০
১৭৬২ "	১,৭০,০০০	০	০
১৭৬৩ "	১,৭০,০০০	০	০
১৭৬৪ "	১,৭০,০০০	০	০
১৭৬৫ "	১,৮৪,০৬২	১৫	০
মোট	৮,৪৪,০৬২	১৫	০

এছাড়া রাজচন্দ্র রায়ের প্রদর্শিত হিসাবে কাউন্সিল পূর্ববর্তী বছরগুলোর রাজস্ব ফাঁকির যে নমুনা পেয়েছিল, সে জন্যও রাজার কাছে বকেয়া বাবদ দেয় ধার্য করেছিল প্রায় ১৬,৫১,৮৭২-১৫-১০ টাকার। তবে এটিই যে শেষ ছিল তা নয়। উপরন্তু এর ওপর কোম্পানি ১৭৬০ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়কালের জন্যে কিস্তি-বন্দি নিরূপণ করেছিল নিম্নোক্তভাবে:-

	'সিক্কা' টাকা	আনা	পাই
পৌষ শেষে ১০ই জানুয়ারিতে দেয়	২,৮৫,০০০	০	০
মাঘান্তে ১০ই ফেব্রুয়ারিতে দেয়	২,৭৫,০০০	০	০
ফাল্গুনের শেষে ১০ই মার্চে দেয়	২,৫০,০০০	০	০
চৈত্র নাগাদ ১০ই এপ্রিলে দেয়	২,২৫,২৮৪	৪	১০
মোট	১০,৩৫,২৮৪	৮	১০

মোটামুটি ১৭৬১ সাল নাগাদ বর্ধমান রাজ পরিবারের সঙ্গে কোম্পানির একটা আপাত ভালো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্চ মাসে কলকাতা কাউন্সিল সেখানে উইলিয়াম ব্রাইটওয়েল সামনার (William Brightwell Sumner)-কে পাঠিয়েছিল রাজার নিয়ন্ত্রিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ ও কোম্পানির স্বার্থ দেখাশুনা করতে। উল্লেখ্য মেদিনীপুরে প্রেরিত প্রতিনিধির মতো এরও পদবি ছিল 'রেসিডেন্ট'।

যা হোক সামনার-এর সঙ্গেও রাজার কর্মচারীদের খুব ভালো বোঝাপড়া হয়নি। কারণ পরবর্তীকালে কাউন্সিলের সম্মুখে তিনি (সামনার) যে লিখিত প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন তাতে দেখা যায় তারা (রাজার কর্মচারীরা) তাকে নাকি ৬ লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে চেয়েছিল যাতে করে সামনার রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রকৃতের তুলনায় কিছুটা কম করে দেখায়। এবং তার স্বীকারোক্তি থেকে এটাও জানা যায়, 'সাধু' সামনার তা গ্রহণে অর্থাৎ কর্মচারীদের অবৈধ প্রস্তাবে গররাজি

হয়েছিলেন।[৮৮] কিন্তু সামনার যে এতোটা নির্লোভ সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বরের এক পত্রে, কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিল যখন মারিয়ট, লরেল, গুডউইন ও গ্রাহাম-কে তাদের রেসিডেন্ট থাকাকালীন রাজার কাছ থেকে অবৈধভাবে গৃহীত উপঢৌকনের অর্থ ফেরত দিতে তাগিদ দিয়েছিল, তখনই জানা গিয়েছিল, কোম্পানির প্রদত্ত বেতন-ভাতার বাইরে সামনার ও তার সহযোগীরা রাজার কাছ থেকে বার্ষিক ৮০,০০০ টাকার নিয়মিত বৃত্তি (Stipend) পেতো অর্থাৎ নিয়মিত বেতন-ভাতার বাইরে সামনার এটি অবৈধভাবে গ্রহণ করতেন।[৮৯]

উল্লেখ করা যায় যে, উইলিয়াম সামনার প্রচলিত একসনা পদ্ধতি মোটামুটি বহাল রেখেছিলেন। তার রাজস্ব আদায়ে কড়াকড়ি ও কর্মচারীদের ওপর কঠোর শ্যেন দৃষ্টি রাখার ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল, ১৭৬১-৬২ সালের জন্যে কোম্পানিকে দেয় টাকার প্রায় নয়-দশমাংশই ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর নাগাদ উসুল হয়ে গিয়েছিল।[৯০]

কিন্তু যেহেতু বর্ধমান জমিদারি ছিল বাংলার এই আমলের বড় বড় জমিদারিগুলির মধ্যে অন্যতম এবং ভূমিরাজস্ব প্রদানের দিক থেকে সর্বশীর্ষস্থানীয় গণ্য হলেও বলাবাহুল্য যে, সেই রাজস্ব প্রদানেরও একটা চূড়ান্ত সামর্থ্য বা সীমা ছিল।

রায়তদের কাছ থেকে ইচ্ছে করলেই যখন-তখন রাজস্ব পাওয়া যেতো এমন নয়। তাছাড়া কিছুদিন আগে মাত্র রাজার জমিদারির ওপর দিয়ে শাহজাদা আলি গহরের অর্থ-চোষণ ও মারাঠা লুণ্ঠনকারীদের তাণ্ডব লীলা গেছে, স্বভাবতই সেই আঘাত তখনও তাঁর রাজকোষ সামলে উঠতে পারেনি। তার ওপর তাঁর নিজেরও ছিল এক বিশাল সৈন্যবাহিনী যাদের অনেকেই নিয়মিত বেতন-ভাতা না পাওয়ায় পার্শ্ববর্তী মারাঠা ও বিদ্রোহী 'ফকির'দের দলে যোগ দিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সামনার নিজে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার তদারকি করে এই সৈন্যদের কারও কারও বকেয়া বেতনাদি পরিশোধ করার চেষ্টা করেছিলেন যাতে করে অন্তত এই ধরনের বিদ্রোহীদের মোকাবিলার হাত থেকে কোম্পানি তাৎক্ষণিকভাবে রেহাই পায়।[৯১] অন্যদিকে অধীন কর্মচারীদের ওপরও রাজার তখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কারণ ততোদিনে তারাও বুঝে গিয়েছিল রাজার ক্ষমতার দৌড় ও ক্ষয়মাণ অবস্থার কথা। স্বভাবতই তারা নিজের নিজের আখের গুছোতে শুরু করায় নেট ভূমিরাজস্ব আয় দিনানুদিন হ্রাস পাচ্ছিল। এই অবস্থায় কাউন্সিল কর্তৃক ধার্য রাজস্ব আদায়ে রেসিডেন্ট সামনার-এর কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি, রাজার মানসিক স্থৈর্য ও অর্থনৈতিক নাজুকতা কোন্ পর্যায়ে উপনীত করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। ফলত এই দ্বিমুখী শোষণ-ত্রাসনের কবলে পড়ে বর্ধমান জমিদারি ও সংলগ্ন অঞ্চলসমূহের আপামর রায়তশ্রেণীর দুরবস্থা যে চরমে পৌঁছেছিল তা অনস্বীকার্য।

এখানে এটাও উল্লেখ্য যে, রেসিডেন্ট সামনার-এর সময়ে বর্ধমানে একসনা বন্দোবস্ত অনুসৃত হওয়ায় স্থিত জমিদারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তা ৩-ধরনের স্বত্ব-স্বামিত্বের সৃষ্টি করেছিল।

প্রথমত সামনার রাজাকে তাঁর ব্যক্তিগত ভোগ, বিলাস-ব্যসন, দরবার পরিচালনা ও সৈন্যসামন্ত

৮৮. Land and Local Kingship in Eighteenth -Century Bengal, pp. 186.
৮৯. The Fifth Report, pp. 440; বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬২।
৯০. Land and Local Kingship in Eighteenth -Century Bengal, pp. 186
৯১. Ibid., pp. 186.

প্রতিপালনের ব্যয় বাবদ প্রায় ১১ লক্ষ টাকা 'জমা'-আয়ক্ষম ভূখণ্ড সংরক্ষণের অনুমতি দিয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল সৈন্যদের বেতন-ভাতার জন্য, এবং অবশিষ্ট ৬,৯৬,৯০০ টাকা রাজার ব্যক্তিগত ব্যয়ার্থ।[৯২] এর ফলে রাজা ও তাঁর পোষ্য ব্যক্তিগণ কোম্পানির কাছে অপ্রকাশ্যে হলেও খানিকটা কৃতার্থ হয়েছিলেন তা বলা যায়।

দ্বিতীয়ত সামনার বিভিন্ন পবগণাস্থ অভিজাত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ (Private agreement) করে তাদেরকে একসনা ভূমি বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। এতে করে নতুন বন্দোবস্ত প্রাপকদের সঙ্গে কোম্পানির একটা সখ্যতা গড়ে ওঠার পথ সুগম হয়েছিল। সেই অনুপাতে রাজার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল যা কোম্পানির জন্যে সেই মুহূর্তে খুব জরুরি ছিল।

তৃতীয়ত প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মধ্য দিয়ে ভূখণ্ড 'লট' (lot) বা ইজারা (ijara) দেয়ার ফলে কলকাতা জমিদারির মতো বর্ধমানেও 'ইজারাদার' নামক নতুন এক স্বত্ব-স্বামিত্বের উদ্ভব হয়েছিল। ইতোপূর্বে নবাবি আমলে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ইজারাদারেরা কাজ শুরু করলেও উল্লেখনীয় যে, এরা ছিল স্থানীয় জনসমাজের সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন গোষ্ঠী। কিন্তু নতুন এই ব্যবস্থার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ও মারাত্মক দিক ছিল এই যে, এতে প্রথমবারের মতো বর্ধমান জমিদারিতে স্থানীয়দের বাইরেও ইজারাদার অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়।

যা হোক মোট ২০-দিনব্যাপী নিলাম ডাক চলে; এতে অংশ গ্রহণকারী (ছোট-বড় মিলিয়ে) প্রায় ৬৬৯টি 'লট'-ইজারাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যে বন্দোবস্ত প্রদান করে ১৬,৯০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। এই পরিমাণ ছিল মোট ধার্য রাজস্বের প্রায় অর্ধেক।[৯৩] এখানে জানানো দরকার যে, 'লট' ডাককারীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল কলকাতার স্থানীয় ফটকাবাজ ব্যবসাদার বা বণিকশ্রেণী, যাদেরকে পরবর্তীকালে ব্যঙ্গ করে বলা হতো -- 'Calcutta banians'।

বস্তুত যে উদ্দেশ্যে সামনার প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে একসনা বন্দোবস্ত বা ইজারা এখানে চালু করেছিলেন তা আদৌ পূরণ হয়নি। উপরন্তু তা বর্ধমান জমিদারিতে এ যাবৎ চলে আসা ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্যে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়েছিল। ড. জন আর. ম্যাকলেনের ভাষায়, 'The practice gained notoriety because it failed to bring in the expected revenues, it displaced zamindars from their customary role as revenue collectors, and it led to oppression of tenants and confusion in accounting practices.'[৯৪]

অবশ্য কোম্পানির কর্মচারীদের কাছে ইজারা পদ্ধতি যথেষ্ট লোভনীয় ছিল। কারণ পূর্বের একক

৯২. Land and Local Kingship in Eighteenth -Century Bengal, pp. 186.

৯৩. Abstract Inventory of the Burdwan Lands and their Revenues, 1760-61, and Accounts of Burdwan Lands Rented at Public Sale, 1761, nos. 17 and 19, Committee of New Lands, Accounts Received, Range 98, vol. 10; quoted from, Land and Local Kingship in Eighteenth -Century Bengal, pp. 186.

৯৪. Land and Local Kingship in Eighteenth -Century Bengal, pp. 186.

জমিদারিতে এখন অসংখ্য ইজারা-গ্রহীতা সৃষ্টি হওয়ায় এবং এদেরকে সময়ে-অসময়ে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধানের অজুহাতে এরা ইজারাদারদের তরফ থেকে মোটা রকমের উৎকোচ পেতো, যেটার কোন হিসাব পারতপক্ষে উর্ধতন মহলকে দিতে হতো না। সুতরাং এই ব্যবস্থার প্রতি তাদের সমর্থন ছিল ষোল আনা। কোথাও কোথাও এরা নিজেরাও স্বনামে-বেনামে 'লট' ইজারা নিয়েছিল। এর ফলে নবাবি ও জমিদাবি ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব প্রায় একক হস্তে, কোম্পানির বেতনভোগী কর্মচারীগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত হওয়ায়, 'they used their power with little restraint to enrich themselves.'[৯৫]

সামনারের পরে মিঃ জন জনস্টোনকে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে (সম্ভবত মে মাসে) বর্ধমানে রেসিডেন্ট নিয়োগ করে পাঠানো হলো।[৯৬] তাকে মেদিনীপুর থেকে এখানে প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিগ্রহণকৃত বা এর ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত ভূখণ্ড বা অঞ্চলসমূহে যে সকল ইংরেজ কর্মচারী (এক্ষেত্রে রেসিডেন্ট বা চীফ) নিযুক্ত করা হয়েছিল, আর্থিক অনিয়ম ও ব্যক্তিগত অসদাচরণের জন্যে জনস্টোনের কুখ্যাতি ছিল এদের মধ্যে সমধিক। ড. ম্যাকলেন বলেন, 'Johnstone was probably the most notorious of the Company's servants accused of profiting from both revenue farming and private trade.'[৯৭]
কোম্পানির একজন বেতনভোগী কর্মচারী হিশেবে তার একটা গুণ ছিল এই, তিনি এদেশের শাসকশ্রেণীর ভাষা ও তাঁদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সম্যক পরিচিত ছিলেন। স্বভাবতই নবীন শাসক মহলে তার যথেষ্ট কদর ছিল। কিন্তু মেদিনীপুরে স্বীয় যোগ্যতা ও কিছুটা নির্মোহের পরিচয় দিলেও বর্ধমানে শুরু থেকেই ভালো মানুষীর সেই মুখোশ জন খুলে ফেলেছিলেন।
পূর্বসূরী সামনার-এর অনুসৃত একসনা বন্দোবস্ত প্রথা নবাগত জনস্টোন বহাল রাখলেন। তবে সত্যি বলতে তার সময়ে এটির আরও সম্প্রসারণ ঘটেছিল। তিনি রাজার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য তথা খাস মহাল ছাড়া গোটা বর্ধমান জমিদারির অধিকাংশ এলাকাই ইজারা দিয়েছিলেন। জন ভেবেছিলেন সম্ভবত এর ফলে রাজার ব্যক্তিগত কর্মচারীদের ওপর খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কোম্পানির নির্ভরশীলতা অনেকখানি কমে আসবে। এতে করে তাদের ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা যেমন বন্ধ হবে, তেমনি অন্যদিকে প্রকাশ্য নিলাম ডাকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে 'লট' বন্দোবস্ত হলে ইজারাদারেরা যে সর্বোচ্চ মূল্যে সেগুলো কিনবে তাতে করে সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের

৯৫. Land and Local Kingship in Eighteenth -Century Bengal, pp. 188.
৯৬. এর নিযুক্তি ও বর্ধমানে আগমনের সন-তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জন আর. ম্যাকলেন বলেন, 'Revenue farming was broadened in May 1762 when John Johnstone arrived there as the new Resident ' (Op. Cit. pp. 188)। কিন্তু তাঁর এই সন নির্ধারণ ঠিক নয়। কারণ অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিক এবং খোদ 'The Fifth Report' (pp. 446)-এ-ই সাল হিশেবে ১৭৬৩ এর উল্লেখ করা হয়েছে --'At the beginning of the new revenue year (1763), Mr John Johnstone, was sent to make a new arrangement with the Raja.'
৯৭. Land and Local Kingship in Eighteenth-Century Bengal, pp. 188.

প্রকৃত মূল্যমান সম্বন্ধেও কোম্পানির একটা যথার্থ ধারণা অর্জিত হবে। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্ত আপাত সঠিক হলেও বাস্তবে এর খারাপ দিকও ছিল।

কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, এ পর্যায়ে বাংলার প্রকাশ্য নিলাম ডাকগুলিতে স্থানীয়রা ছাড়াও কলকাতার নব্য-ধনী ও বণিকগোষ্ঠী অংশ গ্রহণ করতো। আবহমান কাল থেকে বাংলায় ভূম্যধিকার যেহেতু একটি 'prestige or status symbol' হিশেবে গণ্য হতো (একার্থে এখনও তাই) এবং যে যতো ধন-সম্পদশালী ও প্রতিপত্তিশীলই হোক না কেন, বিপুল ভূমির ভোগ-দখলাধিকার তার সেই সামাজিক মর্যাদাকে যেহেতু অনেকগুণ বাড়িয়ে দিতো, সুতরাং কলকাতা 'বেনিয়ানরা' এই পর্বের বাংলার যেখানেই এ ধরনেব অনুপ্রবেশেব অর্থাৎ নিলাম ডাকে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেতো, তারা তা গ্রহণ করতো। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভূমির রাজস্ব আয় ছিল তাদের কাছে গৌণ চিন্তার বিষয়। বরং তাদের ধারণা ছিল, যতো উচ্চ মূল্যেই তারা তা ক্রয় বা হাসিল করুক না কেন, সময়ে এ থেকে তারা ঠিকই ব্যয় উঠিয়ে আনবে, এবং লাভবান হবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব এক ব্যাপার। ফলে এক সময়ে দেখা গেল জনস্টোনের রেসিডেন্সি-কালেই এরা বিপুল সংখ্যায় 'লট' ইজারা বা বন্দোবস্ত নিলেও ভূমিরাজস্ব আদায়ের বেলায় যখন দেখলো স্বাভাবিকভাবেই নানা কারণে রায়তদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য 'মাল' ঠিক মতো উসুল করা যাচ্ছে না, তখন তারা তাদের ওপর জোর-জবরদস্তির চূড়ান্ত করা শুরু করলো।[৯৮]

উল্লেখ্য আগে যেখানে মোগল ও প্রাক-মোগল জমিদারি ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক কারণে রায়তের ফসল উৎপাদন কম হলে বা আদৌ না হলে রায়ত যুক্তিযুক্ত হারে 'তাসখিস' রেয়াত পেতো, কিন্তু এক্ষেত্রে ইজারাদারেরা সেটা না করে বরং কঠোরভাবে তা আদায় করতে লাগলো। ফলে ইজারাদারদের নির্মম কড়াকড়ি ও পেষণে অনেক রায়তই নিজেদের দখলি ভূমি ও ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। আগে যারা রাজার কাছ থেকে ছোট ছোট তালুক বন্দোবস্ত নিয়ে ভোগ করতো, এবং সমাজে যাদের কিছুটা হলেও একটা গ্রহণযোগ্যতা ও অবস্থান সৃষ্টি হয়েছিল, নব্য বেনিয়ানদের দৌরাত্ম্যে ও প্রতিপত্তির মুখে এদেরও সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটলো।

তারপরও এক সময় দেখা গেল যতো কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি ব্যবস্থাই অবলম্বিত হোক না কেন, ইজারাদারেরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি ভূমিরাজস্ব আদায় করতে ব্যর্থ হলো। ফলে কোম্পানির বকেয়ার দায়ে তারাও ধরা খেলো। ড. মাজহারুল হক বলেন, 'The result of the farming of land revenues to the highest bidders did not at all prove satisfactory. .... It appears that all the farmers were in arrears.'[৯৯]

---

৯৮. অবশ্য এদেরও রাজস্বাধিকারের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কারণ ইজারা অন্তে (এই সময় ৩ বছরের জন্য ডাক দেয়া হতো) তারা যে পুনরায় তা ডেকে নিতে পারবে, সে ধরনের কোন আশ্বাস জনস্টোন তাদেব দেননি। ফলে এককালে রায়তদের থেকে যতো পারা যায় ততোটুকু নিংড়ে শুষে আদায় করে নিতে চাইতো ইজারাদারেরা।

৯৯. The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 58-59.
ড. জন ম্যাকলেন এই অবস্থার আরও চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'Farmers who overbid pressed their tenants to pay more rent than they were willing to or able to pay. And the farmers, with no guarantee of holding the i ara for more than three years, failed to advance the

কিন্তু এ ছিল সামগ্রিক চিত্রের একটা দিক। এর উল্টো ভাগের ছিল আরও ভয়াবহ অবস্থা। বস্তুত প্রকাশ্য নিলাম ডাক নিয়ে আখেরে আশানুরূপ ফল না পেয়ে ইজারাদারেরা ক্রমশ ইজারা গ্রহণে অনুৎসাহী হয়ে পড়লো। আর এই অবস্থার সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো কোম্পানির নিজস্ব কর্মচারীগোষ্ঠী বিশেষত উচ্চ-পদাসীনরা।[১০০]
অবশ্য এরা প্রথম থেকেই কলকাতা বেনিয়ানদের পাশাপাশি নিজেরাও প্রকাশ্য নিলাম ডাকে অংশ গ্রহণ করে আসছিল। তবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপাব ছিল এই যে, এরা যখন কোন 'লট' ডাকে অংশ গ্রহণ করতো, বা বেনামে কোন ডাকে এদের প্রচ্ছন্ন অংশ গ্রহণ বা মদদ আছে জানতে পারলে, সঙ্গত কারণে এদেশীয়রা তখন সেই ডাকে অংশ নিতে উৎসাহী হতো না, বা ক্ষেত্রত আদৌ অংশ গ্রহণ করতো না। ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা তখন সুযোগ (প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলে যা হয়) বুঝে স্বল্প মূল্যে তা ডেকে নিতো। এই প্রক্রিয়ায় স্বয়ং জনস্টোনও কিছু 'লট' ইজারা নিয়েছিলেন।[১০১]

যা হোক, জন জনস্টোনের কার্যকালে বর্ধমান জমিদারিতে কোম্পানির সামগ্রিক স্বার্থ যেমন একদিকে ক্ষুণ্ন হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি বর্ধমান রাজস্বয়ং, তাঁর জমিদারির এ যাবৎকালের স্বীকৃত, উচ্চপদস্থ রাজস্ববিভাগীয় কর্মচারীকুল যাদের মধ্যে অন্যতম ছিল গোকুলচন্দ্র মজুমদার, রামকান্ত রায়, দিওয়ান অমিয়চন্দ্র ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র মাণিকচন্দ্র প্রমূখ এবং সর্বোপরি আপামর রায়তশ্রেণী চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কোম্পানির তাৎক্ষণিক স্বার্থ হানির একটা প্রমাণ এই যে, ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে (জনস্টোনের রেসিডেন্সিকাল) আদায়যোগ্য 'জমাবন্দি' নিরূপণ করা হয়েছিল ৪৪,৮১,০৩৫-১০-১৫ টাকা, কিন্তু প্রকৃতার্থে উসুল হয়েছিল ৩৭,১৯,৪৬৪-৯-৪ টাকা।[১০২] উল্লেখ্য এটি ছিল ১৭৬১ সালের নিরূপিত রাজস্ব (৩৭,২৪,৪৭৪-১০-৮) অপেক্ষা পাঁচ হাজার টাকার মতো কম। অথচ বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রবণতা হিশেবে 'জমাবন্দি' ও তদানুযায়ী উসুল ফি-বছর বৃদ্ধি পাওয়াই যেখানে নিয়ম; তাছাড়া প্রতি বছর নতুন

customary loans for cultivation The result was that many tenants abandoned their lands, further reducing the ijaradars' ability to fulfill their revenue obligations.' (Land and Local Kingship in Eighteenth-Century Bengal, pp. 190).

১০০. কোম্পানির কর্মচারীদের দেখাদেখি রাজার কিছু সুযোগসন্ধানী ও দুর্নীতিবাজ রাজস্ব কর্মচারীও সুবর্ণ সুযোগ দেখে ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে আঁতাত করে নামে-বেনামে কিছু 'লট' ইজারা নিয়েছিল।

১০১. কোম্পানির 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের লিখিত এক পত্র (১৭ই মে, ১৭৬৬) থেকে জানা যায়, জনস্টোন ও তার সঙ্গীরা বর্ধমানে থাকাকালীন রাজার কাছ থেকে অবৈধভাবে বার্ষিক ৮০,০০০ টাকা নিতো, যা আগেই উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া রাজার সঙ্গে মিলে এরা সকল প্রকার রাজস্ব আয়ের লাভের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল। এর ফলে তাদের ওপর কোম্পানির যে মূল দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পিত হয়েছিল, বলাবাহুল্য তা থেকে তারা সরে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে দায়িত্বে অবহেলা ও অবৈধ আয়-রোজগারের জন্য এদের বিরুদ্ধে ক্লাইভ লিখিত অভিযোগ এনেছিলেন এর বিচার হয়েছিল ইংলন্ডে। (দেখুন, The Fifth Report, pp. 446).

১০২. The Fifth Report, pp. 447.

নতুন 'waste-lands' চাষ ও 'জমা'র আওতায় আসার ফলে ভূমিরাজস্ব দাবি বর্ধিত হবে -- এটা শাসক মহলে প্রায় স্বীকৃত, সেখানে সামনার ও জনস্টোনের প্রকাশ্য নিলাম ডাক বা 'চীৎকার' (তারা একে বলতো 'out-cry') পদ্ধতি অনুসরণ ও তারা নিজেরা এতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ায় কোম্পানির মোট রাজস্ব ঘাটতি পড়েছিল ১৬,৫৪,১৩৪-১২-৬ টাকা।[১০৩] তাছাড়া রাজার ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের জন্য তাঁকে যে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব-আয়ক্ষম ভূখণ্ড দেয়া হয়েছিল, সেটাও ছিল কোম্পানির পরিচালকদের মতে অপ্রয়োজনীয়, ফলত ক্ষতিকর।
দ্বিতীয়ত নির্দিষ্ট সময়ে ধার্য ভূমিরাজস্ব আদায়ে ইজারাদার ও কোম্পানির কর্মচারীদের কঠোরতা ও নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে যে সকল রায়ত বাপ-চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়েছিল, এদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মারাঠা এবং 'ফকির' বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছিল। এদেরই কেউ কেউ ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে নবাব মিরকাশিমের যখন যুদ্ধ বাঁধে, তখন নবাবের দলে যোগ দিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াইও করেছিল।[১০৪] তাই এদের বিদ্রোহী হওয়ার পিছনে পরোক্ষভাবে জনস্টোনের নীতির ভূমিকা ছিল এ কথা বললে উক্তি হবে না।
উল্লেখ্য জন জনস্টোনের অনুসৃত এই ব্যবস্থা কোম্পানির 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণ শেষ পর্যন্ত অনুমোদন করতে গররাজি হন। ১৭ই মে, ১৭৬৬ তারিখে লিখিত এক সাধারণ পত্রে ডিরেক্টরদের এতদসংক্রান্ত অসন্তুষ্টির বিষয় সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে:
'For after all the various experiments of putting the farms up to public sale, by which means many families seem to have been utterly ruined, of keeping the lands in the hands of the Company, which you call Coss (*khas*), and the various methods that have been tried, find the collections brought to the Company's credit for the year 1764 are five laaks less than what were paid in Ali Verdi Cawn's time in 1752."[১০৫]
অবশ্য বর্ধমানে জনস্টোনের মোটামুটি ৩-বছরের রেসিডেন্সির একটা খুব ভালো দিক ছিল এই, তিনি রাজার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর (রাজা) বেতন-বাকি সৈন্যদের অনেকেরই বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর ফলে বিদ্রোহী ও অসন্তুষ্ট সৈন্যদের ভিতরকার দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ কমেছিল এবং এরা পরবর্তীকালে কোম্পানির অনুগত ও বশংবদরূপে দেখা দিয়েছিল।

জনস্টোনের রেখে যাওয়া এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ১৭৬৫ সালের আগস্টে বিখ্যাত হ্যারি ভেরেলস্ট বর্ধমানে রেসিডেন্ট হয়ে আসেন। বলাবাহুল্য এ বছরই দিল্লির তৎকালীন বাদশাহ দ্বিতীয় শাহআলম কর্তৃক বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানি লাভ করেছিল কোম্পানি। ফলে শুরু থেকেই তার দায়িত্ব ছিল ব্যাপক, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি চেয়েছিলেন বর্ধমান জমিদারির স্থিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন তথা উত্তরণ, এবং সেটি যে নতুন প্রথা অবলম্বন ছাড়া ছিল অসম্ভব তাও অভিজ্ঞ ভেরেলস্ট বুঝেছিলেন। বস্তুত হ্যারি ভেরেলস্টের রেসিডেন্সি-কাল তাই এই নিরিখেই বিচার্য বলে মনে করি।

---

১০৩. The Fifth Report, pp. 447
১০৪. Ibid. pp. 446.
১০৫ Ibid. pp 447.

হ্যারি ভেরেলস্ট যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার কয়েক মাস আগেই তার পূর্বসূরী দ্বিতীয়বারের ৩-বছর মেয়াদি প্রকাশ্য নিলাম ডাকের কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। কিন্তু ডাক-সংশ্লিষ্ট সমুদয় কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভেরেলস্ট লক্ষ্য করলেন, এর মধ্যে কোম্পানির স্বার্থবিরোধী প্রচুর উপাদানই শুধু নিহিত নয়, বরং যুগপৎ তা বর্ধমান তথা বাংলার চিরায়ত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থারও প্রতিকূল বটে।

কারণ প্রথমত জনস্টোনের আত্মস্বার্থসর্বস্ব ভূমি-ব্যবস্থাপনা নীতি একদিকে বর্ধমানের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার কিন্তু আপাত নির্বীর্য রাজা তিলকচাঁদকে যেমন জমিদারি পরিচালনার মূল দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে প্রায় স্থায়ীভাবে বিচ্যুত, অপসারিত ও সম্পর্কশূন্য করেছে, তেমনি অন্যদিকে তা রাজার অধীন ছোট ছোট জমিদার-তালকুদার ও খাজনা সংগ্রাহকশ্রেণীকেও দূরে সরিয়ে ফেলেছে।

দ্বিতীয়ত জমিদার প্রভৃতির ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ক্রম-বর্ধমান সম্পর্কহীনতা ও স্বনামে-বেনামে নবাবি ও কোম্পানির বেতনভোগী কর্মচারীদের অধিক সংখ্যায় কিন্তু কম মূল্যে নিলাম ক্রয়ের ফলে চলতি ১৭৬৫ সনের জন্য যে মূল্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, গোটা জমিদারির কিঞ্চিদধিক মাত্র দুই-পঞ্চমাংশ ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট বৃহদংশ ভূখণ্ডই কোম্পানির খাস ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষিত। বলাবাহুল্য ভেরেলস্ট এর আগে চট্টগ্রামের চীফ ছিলেন। তাই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, কোম্পানির কর্মচারীদের খাস ব্যবস্থাপনায় ভূমিরাজস্ব আদায়ের ভার নীত হওয়া মানে কোম্পানির আয়ের সিংহ ভাগ কমে যাওয়া। বস্তুত এই অবস্থা পরিবর্তনে তিনি চাইলেন স্থিত ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনা।

নতুন ব্যবস্থায় তার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল রাজাকে তাঁর স্ব-মূর্তিতে ফিরিয়ে এনে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজেকর্মে জড়িত ও উৎসাহিত করা অর্থাৎ বাংলার আবহমান ভূমি ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রেখে, এদেশীয়দেরকে এর প্রত্যক্ষ দায়িত্বে নিয়োজিত করে এর মধ্য দিয়ে কোম্পানির স্বার্থোদ্ধার করা। তিনি কোম্পানি ও নবাব সরকারের কর্মচারীদেরকে তাদের স্বপদে ও দায়িত্বে ফিরে আসতে আহ্বান জানালেন। তাদেরকে হয় প্রাতিষ্ঠানিক চাকুরি অথবা তা পরিত্যাগ করে সরাসরি ইজারাদারি-বন্দোবস্ত পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্তি -- এই দু'টির যে কোন একটিকে বেছে নিতে নির্দেশ দিলেন। এর পাশাপাশি অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তিনি করেন, এর বাস্তবায়ন কোম্পানির নেতৃস্থানীয়রা কলকাতা তথা ২৪-পরগণা জমিদারির ক্ষেত্রে আগেই করেছিলেন।

এটি ছিল, তার ভাষায়, 'men of substance and character'-দের মধ্যে বাৎসরিক চুক্তিতে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া। এ জন্য তিনি উভয়পক্ষের (কোম্পানি ও বন্দোবস্ত-প্রাপক) যৌথ সম্মতির ভিত্তিতে বছর-বছর ক্রম-বর্ধমান হারে রাজস্ব বৃদ্ধির শর্তে বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন। ভেরেলস্ট, 'men of substance and character'-দের এই মর্মে নিশ্চয়তা দিলেন, 'with a promise, that if they exerted themselves in the improvement (of both land and revenues), they should never be dispossessed, but meet with all due encouragement and favour from the Company.'[১০৬]

উল্লেখ্য হ্যারি ভেরেলস্টের এই ব্যবস্থা কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিল (এতে তার বন্ধুদেরই প্রাধান্য ছিল) ও লন্ডনস্থ 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণ অনুমোদন করলেন এবং মোটামুটি ব্রিটিশ

১০৬. The Fifth Report, pp. 450.

ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ-উত্তর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য যে ভূমিরাজস্ব সংস্কার হয়েছিল (যথাস্থানে আলোচিত) তার পূর্ব পর্যন্ত এটিই ছিল এ অঞ্চলে তাদের গ্রহীত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সর্বশেষ প্রকৃতি।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, তার বন্দোবস্ত গ্রহীতাদের মধ্যেও তথাকথিত কলকাতা বেনিয়ান ও কোম্পানির উচ্চপদস্থদের কেউ কেউ ও তাদের পোষ্যবর্গ স্বনামে-বেনামে ঢুকে পড়েছিল।[১০৭] তবে ভেরেলস্ট-প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থা আখেরে কোম্পানির স্বার্থানুকূল হয়েছিল। এর বড় প্রমাণ -- 'Despite the annual increments, the lease-holders managed to pay their revenues without apparent trouble. The Burdwan revenues were paid in full before the end of 1766-67 and the arrears in 1767-68 were only Rs. 58,832.'[১০৮]

সামনার পরবর্তী জনস্টোনের সময়কার অর্থাৎ ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত বর্ধমান রাজের কাছে বকেয়া বাবদ কোম্পানির যে প্রাপ্য তার মোট পরিমাণ ছিল ১৬,৫৪,১৩৪-১২-৬ টাকা; সেটা ভেরেলস্টের অনুসৃত যুগোপযোগী (অবশ্যই কোম্পানির দৃষ্টিকোণ থেকে) ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কমবেশি ৩-বছরে মাত্র ৫৮,৮৩২ টাকায় এসে ঠেকেছিল। এই বিশাল অর্জন বা কৃতিত্বের গৌরব নিঃসন্দেহে বর্ধমানের দক্ষ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপক ভেরেলস্টেরই পাওনা।

যা হোক, আমরা আগেই দেখিয়েছি কলকাতা ও ২৪-পরগণা জমিদারির ক্ষেত্রে কোম্পানিকে যেমন, যেমন চট্টগ্রামের চীফ ও মেদিনীপুরের রেসিডেন্টদেরকে তাদের স্ব-স্ব এলাকায় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানসহ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজও করতে হতো, তেমনিভাবে বর্ধমানে নিযুক্ত রেসিডেন্টদেরও বর্ধমানের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নির্বাহের পাশাপাশি এখানকার সাধারণ প্রশাসনের কায়-কারবার বিশেষত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও চুরি-ডাকাতি নিরোধের কাজ (তখন পর্যন্ত বিচার প্রশাসনের ভার নবাবের কর্মচারীদের হাতে ছিল) করতে হতো। বস্তুত এই দায়িত্ব খুব নিবিড়ভাবে পালন করতে গিয়ে বর্ধমানে ভেরেলস্ট নবাবি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে রাজস্বসংক্রান্ত যে কর্ম-বিভাজন লক্ষ্য করেছিলেন তা এখানে তুলে ধরা জরুরি মনে করছি এ জন্য যে, সম্ভবত এ থেকে ধারণা পাওয়া যাবে সমকালীন বাংলার অন্যত্রও এই জাতীয় বা অনুরূপ ব্যবস্থাপনা কমবেশি বিরাজমান ছিল। ভেরেলস্টের নিজের ভাষায়, 'the like administration prevails in nearly all the provinces (এক্ষেত্রে জমিদারি বলাই ভালো) of Bengal.'[১০৯]

এখানে ভূমিরাজস্ব ও অর্থ আদায় জড়িত রয়েছে এমন দপ্তরগুলিরই কেবল বর্ণনা করা হলো :

সদর কাছারি

নিম্নস্তরের প্রশাসনিক 'এককে' (lower or subordinate administrative units or circles) যে সব জায়গায় সরকারি কোষাগার (government treasury) থাকতো না,

১০৭. The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 64.

১০৮. Land and Local Kingship in Eighteenth-Century Bengal, pp. 191.

১০৯. Quoted from, The Fifth Report, pp. 452.

সেখানে সদর কাছারি'তেই সকল ধরনের ভূমিরাজস্ব বা খাজনা ও সায়রাতজাত কর প্রভৃতি জমা নেয়া হতো। রাজস্ব আয়-ব্যয়ের সকল প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ, খতিয়ান-পরিসংখ্যান এবং ভূমি দান ও ক্রয়-বিক্রয়বিষয়ক তথ্যাদি এখানে সংরক্ষণ করা হতো। জমিদার ও রায়ত তথা খাজনা সংগ্রাহক (পরবর্তীকালে প্রাপক) ও প্রদাতৃশ্রেণীর মধ্যে যে কোন ধরনের বিরোধ-বিসম্বাদের প্রাথমিক শুনানি গ্রহণ ও মুর্শিদাবাদের নবাবি দরবার (পূর্বে দিল্লির বাদশাহি দরবারেরও) থেকে জারিকৃত ভূমি ও ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত বিভিন্ন ফরমান, বিধিনিষেধও সরকারি এই দপ্তর থেকে স্থানীয়ভাবে প্রচারিত হতো। স্বভাবতই ধারণা করা যায় নিম্নস্তরের এই প্রতিষ্ঠানটির কাজের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্ব ছিল।

বড় আদালত ও ছোট আদালত

৫০ বা তদূর্ধ টাকার যে কোন ভূমিসংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসা বা নিষ্পত্তি এখানে করা হতো। অপরদিকে ছোট আদালতে শুধু অর্থঋণ সংক্রান্ত মামলার শুনানি গ্রহণ করা হতো, তা-ও ৫০ টাকার নিচের।

আমিন দস্তুর

এটি কার্য-সীমা বা অধিক্ষেত্রের দিক থেকে ছিল সদর কাছারি'র অধস্তন। সাধারণত ভূমিরাজস্ববিষয়ক মামলাগুলি প্রথমে এই দপ্তরে নিষ্পত্তির জন্য শুনানি গ্রহণ করা হতো। পরে মামলার ধরন ও গুরুত্ব বিবেচনায় তা উর্ধতন দপ্তর হিশেবে সদর কাছারি'তে প্রেরিত হতো।

বাজে-জমিন দস্তুর

মাদাদ-ই-মাশ, ইনাম বা মিল্‌ক তথা সকল ধরনের দাতব্য ও জনহিতকর কাজে প্রদত্ত ভূমির মালিকানা ও এবম্বিধ যে কোন বিরোধ মীমাংসার জন্য এই আদালত দায়িত্ব নির্বাহ করতো। বলা যায় এই আদালতের ঘোষিত আদেশই প্রাথমিকভাবে সকলকে মানতে হতো।

বাজে-জমা দস্তুর

এর কার্যাবলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেকটা ফৌজদারি প্রকৃতির হলেও জনস্বার্থসম্বলিত ভূ-স্বত্ব যেমন সরকারি পুকুর, পথচারী-নিবাস বা সরাইখানা প্রভৃতির দেখভাল ও এ সম্পর্কিত যে কোন আদেশ দেয়ার নিম্নস্তরীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল এর ওপর।

খারিজ দস্তুর

সাধারণত ভূমিরাজস্ব বকেয়াগ্রস্ত জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার প্রভৃতি সকল ধরনের বন্দোবস্ত প্রাপকের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদানুযায়ী ফয়সালা শেষে পাওনা পরিশোধের জন্য এই দপ্তরে এদেরকে পাঠানো হতো, যাতে করে সংশ্লিষ্টরা সে অনুযায়ী সেখানে ভূমিরাজস্ব জমা দিতে পারে। তবে এরপরও যারা পুরো দেয় পরিশোধে ব্যর্থ হতো, তখন খারিজ দস্তুর তাদের সঙ্গে নতুনভাবে প্রয়োজন মতো আপোষ রফা করতে পারতো।

এক্ষণে ভূমি ও ভূমিরাজস্ববিষয়ক উপরিউক্ত দপ্তরগুলির কাজ-কারবার সম্পর্কে আর বিশদ আলোচনা না করে (এ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু তথ্য এই বইয়ে স্থানান্তরে কমবেশি পাওয়া

যাবে)[১১০], আমরা এখানে চাকলে বর্ধমান থেকে কোম্পানির ১৭৬০ থেকে দিওয়ানি লাভ পর্যন্ত য়র পারসংখ্যান নিচে তুলে ধরে এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ ক ।

১৭৬০ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত চাকলা বর্ধমানের ভূমিরাজস্ব[১১১] (মে থেকে এপ্রিল)		
১৭৬০-৬১	৬,০৭,৪৮২	টাকা
১৭৬১-৬২	৩৮,৪১,৯৮৭	"
১৭৬২-৬৩	৩৯,৪৯,১৬৭	"
১৭৬৩-৬৪	৩৯,৮৬,১০১	"
১৭৬৪-৬৫	৩৬,২৯,৭৮৯	"
১৭৬৫-৬৬	৩৫,৬৭,৮৫৪	"

১১০. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ১ম খণ্ড'; The Role of the Zamindars in Bengal; The Administration of Justice under the East India Company in Bengal, Bihar and Orissa, Dr. Atul Chandra Patra; The Judicial Administration of the East India Company in Bengal, Dr. B. B. Misra.

১১১. The Fifth Report, pp. 454.

কোম্পানির বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানি লাভ, ১৭৬৫ খ্রিঃ

বক্সারের যুদ্ধের পরাজয়ের মধ্য দিয়েই মূলত বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্ষমতার চূড়ান্ত রকমের পালাবদল ঘটে গিয়েছিল। অতঃপর বাঙালির পরাজয়ের সেই মৃত কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে ছিলেন পরাস্তদের অন্যতম শরিক দিল্লির তৎকালীন মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্‌আলম, বিজয়ী পক্ষ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানি-ক্ষমতার উষ্ণীষ ভূষিত করে (১২ই আগস্ট, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। বস্তুত এটি এমন এক সময়কার ঘটনা যখন বলা যায় বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের পুরো নিয়ন্ত্রণই ছিল বিজয়-মুকুট ধারণকারীদের অনুকূলে।

৩রা মে, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বারের মতো বাংলায় গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসেন।[১] ততোদিনে ক্লাইভের 'জানি দোস্ত' বৃদ্ধ ও অসুস্থ নবাব মিরজাফর আলি খান (মিরকাশিমের পর তাকেই ইংরেজরা পুনরায় মুর্শিদাবাদের মসনদে বসিয়েছিল) ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন (ফেব্রুয়ারি ৫/৬, ১৭৬৫)। তার মৃত্যুর পর তদীয় দ্বিতীয় পুত্র নাজিম-উদ্দৌলা[২] মুর্শিদাবাদের নবাব হন। এখানে উল্লেখ্য যে বৃদ্ধ নবাব জীবদ্দশায়ই এঁকে মসনদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন।[৩] স্বভাবতই ধরা যায় এঁর নবাব হওয়া ছিল স্বাভাবিক একটা শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। কিন্তু যেহেতু আমরা আগেও লক্ষ্য করেছি যে, পলাশি-উত্তর মুর্শিদাবাদের নবাবি তখ্‌তে ক্ষমতার হাত বদল হলেই ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশীয় শীর্ষস্থানীয়রা নতুন নবাবের কাছ থেকে নানা রকমের উপঢৌকনাদি পেতো, যার মধ্যে নগদ নারায়ণই থাকতো মুখ্য (অথচ আগে এই ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো অর্থাৎ এরাই নবাবকে খুশী করতে মূল্যবান উপহার সামগ্রী বহে এনে দিতো); এবারও নতুন নবাবের নিযুক্তিতে বেনিয়াগোষ্ঠী সেই সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করলো না।

কোম্পানির শীর্ষস্থানীয়রা কিশোর নবাবকে বাধ্য করলো নতুনভাবে তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে। এ জন্য নবাব নতুন চুক্তির নামে তাদের চাপিয়ে দেয়া অপমানকর অন্যায় দাবি-দাওয়াই কেবল মেনে নিলেন না, উপরন্তু কোম্পানির তৎকালীন গভর্নর ও ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষকে নগদ টাকা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের উপহার সামগ্রী মিলিয়ে ১,৩৯,৩৫৭ পাউন্ড-স্টার্লিংয়ের মতো দিতে বাধ্য

১ The Fifth Report, pp. 455; Lord Clive, Colonel G. B. Malleson, pp. 131.

২. এ সময় এঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ থেকে ২০ এর মধ্যে।

৩. How the British Occupied Bengal: A Corrected Account of the 1756-1765 Events, Dr. Ram Gopal, pp. 335.

হলেন।[8] তারা জনস্টোন, র‍্যাল্‌ফ লেইচেস্টার, এ. ডব্লিউ. সিনিয়র ও স্যামুয়েল মিডলটন নামক ৪জন পদস্থ কর্মচারীকে মুর্শিদাবাদে পাঠালো (২৩শে ফেব্রুয়ারি) নবাবের সঙ্গে চুক্তির শর্তাদি ঠিক করার জন্যে। ফেব্রুয়ারি ২০-২৫, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত এই চুক্তির বিভিন্ন ধারায় নবাব ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় 'তেজারতি' করার যে সুযোগ-সুবিধাদি দিয়েছিলেন তার কয়েকটি নিচে তুলে ধরা হলো:-

১ ইতোপূর্বে মিরজাফর আলি খান তার প্রথম নিজামতকালে ইংরেজদের সঙ্গে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তার সব শর্তাদি বর্তমান নবাব যথারীতি মেনে চলবেন;

২ নবাব যেহেতু বয়েসে তরুণ এবং বিশাল প্রশাসনিক দায়িত্ব-কর্তব্য নির্বাহ করার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞ নন, সেহেতু দেশের বৃহত্তর মঙ্গল এবং বিশেষ করে কোম্পানির সুষ্ঠু ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বার্থে তাঁর একজন প্রাজ্ঞ সহযোগীর প্রয়োজন, এ জন্য এই পদে তথা 'নায়েব-ই নাজিম' হিশেবে তিনি জাহাঙ্গির-নগর বা ঢাকার 'ডেপুটি নায়েব' মুহম্মদ রেজা খানকে নিযুক্ত করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, নবাব একে ইংরেজদের পরামর্শ ও পূর্বানুমোদন ছাড়া কোন অবস্থাতেই পদচ্যুত করতে পারবেন না। আর প্রশাসনিক কাজেকর্মে নবাবের অব্যবহিত পরেই হবে এর অবস্থান;

৩. প্রশাসনিক সকল বিষয়ে নবাবের ক্ষমতা প্রয়োগের অগ্রাধিকার থাকলেও মূলত ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত বিষয়াবলি দেখভাল ও তত্ত্বাবধানের কাজ করবেন 'নায়েব-ই-নাজিম' বেজা খান। রাজস্ব বিভাগ দুই বা ততোধিক শাখাসমন্বিত হবে এবং এখানে নবাবের যে সকল কর্মচারী ও মুৎসুদ্দি নিযুক্ত হবেন তাদের নিয়োগের ব্যাপারে যেমন কোম্পানির সমর্থন লাগবে, তেমনি কারও বিষয়ে গভর্নর ও কাউন্সিলের সদস্যদের অভিযোগ থাকলে নবাব সেই অভিযোগের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তার সুরাহা করবেন;

---

৪. History of the Muslims of Bengal, Vol. II A, Dr. Muhammad Mohar Ali, pp. 32. ড. কালীকিঙ্কর দত্ত মহাশয় সিলেক্ট কমিটির ১৭ই মে, ১৭৬৬ তারিখের পত্র-সূত্রে কোম্পানির সদস্যদের অর্থ প্রাপ্তি সংক্রান্ত ভাগাভাগির বিশদ বিশ্লেষণ দিয়েছেন এভাবে। যথাঃ- (১) তৎকালীন গভর্নর জন স্পেন্সার-- ১,০০,০০০ টাকা, (২) জনস্টোন-- ২,৩৭,৫০০ টাকা, (৩) লেইচেস্টার, সিনিয়র ও মিডলটন (প্রত্যেকে) -- ১,১২,৫০০ টাকা, (৪) প্লেডেল, বার্ডেট ও জর্জ গ্রে (প্রত্যেকে) -- ৫০,০০০ টাকা। এদের ধৃষ্টতা ও লালসা কতো দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল তা বোঝা যায়, এ পর্যায়ে জনস্টোন তার ভাইয়ের (জি. জনস্টোন) জন্যও নবাবের কাছে অর্থ দাবি করে প্রায় ৫০,০০০ টাকার মতো গছিয়ে নিয়েছিল, অথচ শেষোক্ত ব্যক্তি কোন উপায়েই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। দেখুন, Shah Alam II and the East India Company, Dr. KaliKinkar Datta, pp. 34.

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাই যথার্থই উপমা দিয়ে বলেছেন, 'Every occasion for setting up a new Nawab was considered a suitable opportunity for shaking the proverbial pagoda-tree of the East.' (The Economic History of India, pp. 23). উল্লেখ্য নায়েব-ই নাজিম রেজা খান ও জগৎ শেঠের কাছ থেকেও তারা এ সময় প্রায় ৩,১৫,০০০ টাকার মতো হাতিয়ে নিয়েছিল।

৪. ভূতপূর্ব নবাবদের বিশেষ করে মিরজাফর আলি খান কর্তৃক অনুসৃত চুক্তি বলে কোম্পানিকে প্রদত্ত চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমানের রাজস্ব আয় কোম্পানি যথারীতি ভোগ করবে। এ ছাড়া নবাবের নিরাপত্তার জন্য রক্ষণীয় ইংরেজ সৈন্যদেরকে নবাব মাসে মাসে ৫ লক্ষ 'সিক্কা রুপি' দিতে বাধ্য থাকবেন যতোকাল না কোম্পানি নিজস্ব তহবিল থেকে তা প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করে। বলাবাহুল্য এই সৈন্যদেরকে নবাব স্বীয় সৈন্য হিশেবেই গণ্য করবেন;

৫. ইতোপূর্বে দিল্লির মোগল সম্রাট ও মুর্শিদাবাদের নবাবগণকর্তৃক ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিভিন্ন ফরমান, 'হাসবুল-হুকুম' প্রভৃতি মূলে বিনা শুল্কে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার যে সুযোগ-সুবিধাদি (লবণের ক্ষেত্রব্যতীত) দেয়া হয়েছে, নতুন নবাব তা যথারীতি অক্ষুণ্ন রাখবেন;

৬. পূর্ণিয়ার লবণ কেনা-বেচার বাণিজ্য চলবে শুধু নবাব তথা সরকারি কর্মচারীকুল ও ইংরেজদের মধ্যে, -- উভয়পক্ষ আধাআধি হিশেবে;

৭ নবাবের প্রভাব ও ছত্রচ্ছায়া রাজ্যের সর্বত্র বিরাজমান বিবেচিত হলেও তাঁর শাসনতান্ত্রিক মূল কেন্দ্র (seat of administrative business) হবে মুর্শিদাবাদে। ফলে ইংরেজদের পক্ষে তাদের দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ, এককথায় কোম্পানির স্বার্থ দেখাশুনার জন্যে একজন পদস্থ কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকবেন মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে, যার পদবি হবে 'রেসিডেন্ট'। অনুরূপভাবে নবাবের পক্ষেও একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী থাকবেন কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে;

৮. নবাব তাঁর প্রশাসনে ইংরেজ ব্যতীত অন্য কোন বিদেশি বিশেষত বণিকগোষ্ঠীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিবেন না, এবং যারা ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে তাঁর আনুকূল্য লাভ করেছে তাদের থেকে তিনি তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিবেন;

৯. ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে ভূতপূর্ব নবাবের (মিরজাফর) যে চুক্তি ছিল সেটা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন এবং এতদসহ ফরাসি বণিকদেরকে তাঁর রাজ্যে কোনরূপ দুর্গ নির্মাণ বা সংস্কার ও সৈন্যসামন্ত সংরক্ষণ করতে বা তাদেরকে জমাজমি ক্রয়ের অনুমতি দিবেন না। তবে তারা (ফরাসিরা) ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করতে চাইলে তাদের কাছ থেকে পূর্ববৎ শুল্ক আদায় করবেন।

যা হোক চুক্তির উপরিউক্ত শর্তাবলি বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে বলা যাবে, এটি ছিল ক্ষমতার মোহে ন্যূনতম সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেয়া ও ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিলের কুশীলবদের দয়ায় টিকে থাকা এক অল্পবয়সী, ক্ষমতাহীন ও অপরিণামদর্শী নবাবের চরম নতজানু অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ। তবে অবস্থা যাই হোক, এই চুক্তির ফলে যে ইংরেজ ও বাংলার নবাবের (নবাবদের বলাই ভালো) মধ্যে এ যাবৎ চলে আসা বিরোধ ও সংগ্রামের একপ্রকার স্থায়ী নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছিল তা বলা যেতে পারে। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক H. H. Dodwell বলেন, 'By this agreement the long struggle between the English and the nawab was brought to an end.'[৫]

চুক্তি সম্পাদনের অনতিকাল মধ্যে (৩রা মার্চ) রেজা খান মুর্শিদাবাদের 'নায়েব-ই নাজিম'-এর

৫. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 174.

পদ অলঙ্কৃত করেন।[৬]

এ ছাড়া রাজস্ব বিভাগকে দু'টি প্রধান শাখায় বিভক্ত করে সেগুলির দায়িত্ব ন্যস্ত হলো নন্দকুমার ও রায় দুর্লভের ওপর। শেষোক্ত জন কোম্পানির বরাবরের বন্ধু ও বশংবদ বিবেচিত হলেও রাজা নন্দকুমার ছিলেন তাদের অনেক অপকর্মেরই বিরোধিতাকারী ও প্রকাশ্য সমালোচক। তিনি বাংলার নবাবের দিনানুদিন এই মুষিকে পরিণত হওয়া ও প্রশাসনের সর্বমহলে ইংরেজদের নাক গলানোকে মনে-প্রাণে আদৌ মেনে নিতে পারছিলেন না, যে কারণে ইংরেজরা ছিল তাঁর ওপর প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ, এবং এক পর্যায়ে, 'Nanda Kumar was removed from Murshidabad and brought to Calcutta by a party of the Company's troops early in April, 1765. He was detained there virtually as a prisoner of the Company."[৭]

যা হোক এখানে রাজস্ব বিভাগের বিভক্তি সম্বন্ধে বলার কথা এটাই যে, একটি নিয়ন্ত্রিত 'check and balance' রক্ষার জন্য এদের দু'জনকেই সমান ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল যাতে করে কেউ কারও ওপর প্রকাশ্য খবরদারি করতে না পারে, অথচ নিজস্ব কৃতিত্ব জাহিরের প্রয়োজনে একে অপরের প্রতি কড়া দৃষ্টি রেখে ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব বা অপচয় গোপনে হলেও তারা সংগ্রহ করে কোম্পানিকে তা সরবরাহ করতে সক্ষম হয়।

বাংলার আর্থ-রাজনৈতিক এই পরিস্থিতিতে ক্লাইভ (বাংলায় কোম্পানির স্বার্থ বিকাশে উত্তুঙ্গ ভূমিকা পালনের জন্য এ সময় তিনি স্বদেশে 'ব্যারন' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন[৮]) দ্বিতীয়বারের মতো ভারতে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নরের দায়িত্ব নিয়ে এলেন। এবার অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব ছিল তার ঘাড়ে। প্রথমত এ সময় কোম্পানির সকল স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে এতো বেশি অর্থ-লালসা ও দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করেছিল যে, এদেশে কোম্পানির অস্তিত্বের স্বার্থেই তা নির্মূল করা জরুরি ছিল, এবং দ্বিতীয়ত কোম্পানি এ যাবৎ তাদের কায়-কারবার প্রধানত ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে (কলকাতা, ২৪-পরগণা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জমিদারি পরিচালনা ছাড়া) সীমিত রাখলেও বাংলার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা তখন দিন-কে দিন এমন পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল যে, কোম্পানির মূল পরিচালকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এব এখানকার নেতৃস্থানীয়রা সেই পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ছিল। ফলে অন্তরালে থেকে হলেও অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষমতা-পরিচালনার ভার তাদের ওপরে চলে আসছিল। সুতরাং এই নতুন কিন্তু বিশাল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে নির্বাহার্থ কোম্পানির দরকার ছিল তার মতো দক্ষ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও উচ্চ ধী-শক্তির অধিকারী লোকের।

কলকাতায় পৌঁছেই ক্লাইভ প্রথম কাজ যেটা করলেন তা নতুনভাবে সিলেক্ট কমিটিকে ঢেলে সাজানো। মাত্র দু'দিনে এই জরুরি কাজটি ক্লাইভ সমাধা করলেন। নতুন সিলেক্ট কমিটি গঠিত হলো ৪-সদস্য সমন্বয়ে, যাঁদের শীর্ষে থাকলেন ক্লাইভ স্বয়ং। অন্য সদস্যরা হলেন -- হ্যারি

৬. The Transition in Bengal (1756-1775): A Study of Saiyid Muhammad Reza Khan, pp 78.

৭. Shah Alam II and the East India Company, pp. 36.

৮ The Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire, Vol II, pp. 479; A Brief History of the Indian Peoples, Sir W. W. Hunter, pp. 185.

ভেরেলস্ট ও কর্নেল কারন্যাক (এরা বাংলাতেই ছিলেন) এবং উইলিয়াম ব্রাইটওয়েল সামনার ও ফ্রান্সিস সাইক্স (এরা ক্লাইভের সঙ্গে ইংল্যান্ড থেকে এসেছিলেন)।[৯]

তিনি সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনের (কর্নেল কারন্যাককে দিয়ে এই পুনর্গঠনের কাজ করা হয়েছিল) পাশাপাশি সবচেয়ে ব্যাপক যে সংস্কারের কাজে হাত দেন তা কোম্পানির অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও কর্মচারীদের দুর্নীতি নির্মূলের লক্ষ্যে কঠোর বিধিবিধান প্রণয়ন। উল্লেখ্য এই সময় কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতির নির্লজ্জ পরাকাষ্ঠা কতো নিম্নস্তরে গিয়ে উপনীত হয়েছিল যে, কর্নেল জি. বি. ম্যালেসন পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'Nothing had impressed Clive more than the evil effects of the predominance of venality and corruption during the rule which had followed his first departure, and he was resolved to put them down with a strong hand.'[১০]

আগে থেকেই পদস্থ কর্মচারীরা নামে-বেনামে ব্যক্তিগত ব্যবসায় করতো। তবে আগে যেখানে অল্প কিছু লোকের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল, ক্লাইভ-উত্তরকালে কোম্পানির ছোট-বড় কর্মচারী ছাড়াও সৈন্যদের মধ্যেও তা সম্প্রসারিত হয়েছিল। অবশ্য এখানে কর্মচারীদের বিষয়টিও তুলে ধরা দরকার। ক্লাইভ-লিখিত এক পত্র থেকে জানা যায়, এদের বেতন-ভাতা হতো খুবই কম (বাৎসরিক মাত্র ১৫ পাউন্ড-স্টার্লিংয়ের মতো), অথচ তার (ক্লাইভ) ভাষ্যে এদেশে সেই পরিমাণ টাকায় ভদ্রভাবে চলা আদৌ সম্ভব নয়।

ক্লাইভ একদিকে কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর আশ্বাস দিলেন। এবং অন্যদিকে, যেন তিনি নিজে আগে কখনও এ ধরনের অবৈধ কাজ বা দুষ্কর্ম করেননি এমন নিষ্কলুষ ভাব[১১] নিয়ে কঠিন গলায় তাদের সরাসরি বললেন (বলা যায় হুকুম দিলেন), হয় তারা কোম্পানির চাকুরি

---

৯. History of the Muslims of Bengal, Vol. II A , pp. 32.

১০. Lord Clive, pp. 131
ইংরেজ কর্মচারীদের দুর্নীতির অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় ক্লাইভের এ উক্তিতেও। তাঁর ভাষায়: 'I shall only say that such a scene of anarchy, confusion, bribery, corruption and extortion was never seen or heard of in any country but Bengal; nor such and so many fortunes acquired in so unjust and rapacious a manner. The three provinces of Bengal, Bihar and Orissa, producing a clear revenue of 3,000,000st., have been under the absolute management of the Company's servants ever since Mir Jafar's restoration to the Subaship; and they have, both civil and military, exacted and levied contribution from every man of power and consequence, from the Nawab down to the lowest zamindar.' (Malcolm's Life of Clive, pp. 379).

১১. প্রসঙ্গত Dodwell-এর বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। এই স্বনামধন্য ঐতিহাসিক বলেন, 'Clive feared nothing, not even his own past; and he was as fully bent on enforcing the orders of the Company as if he himself had never made a rupee by the revolution of 1757 or were not still in enjoyment of a jagir of 30,000st a year.' (The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 177).

করবে, নতুবা তা পরিত্যাগ করে যথানিয়মে শুল্ক দিয়ে এদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে রত হবে। তার এ ঘোষণার প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সামরিক-বেসামরিক -- দু'মহলেই। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, সিভিলিয়ন কর্মচারী ছাড়াও প্রায় ২০০ সামরিক কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্লাইভ সংস্কারের সংকল্প থেকে পিছিয়ে আসেননি -- 'Despite the united resistance of the civilians, and an actual mutiny of 200 military officers, Clive carried through his reforms. Private trade and the receipt of presents were prohibited for the future, while a substantial increase of pay was provided out of the monopoly of salt."[১২]

কোম্পানির এই অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক সংস্কার ও আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীকুলের মধ্যে শুদ্ধি অভিযান চালানোর পাশাপাশি গভর্নর ক্লাইভ বাংলার নবাব (বলাবাহুল্য ইনি তখন আর কোম্পানির জন্যে আদৌ মাথা ব্যথার কারণ ছিলেন না, বরং তারা তাঁকে পুরোপুরিই কব্জা করে ফেলেছিল), দিল্লির ক্ষীয়মাণ মোগল শক্তির প্রতিভূ বাদশাহ দ্বিতীয় শাহআলম ও অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলা-র সঙ্গে কলকাতা কাউন্সিলের সম্মানজনক সম্প্রীতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় কোম্পানির অবস্থান সুদৃঢ়করণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা জরুরি যে, ক্লাইভের আগমনের অনেক আগে থেকেই ভ্যান্সিটার্ট প্রমুখ কোম্পানির উচ্চপদস্থ তথা স্থানীয় নীতিনির্ধারকরা চাইছিল দিল্লির সম্রাটের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাঁর কাছ থেকে এককভাবে নিজেদের স্বার্থানুকূল ফরমান নিয়ে এ অঞ্চলে কোম্পানির কায়-কারবার চালিয়ে যেতে। এ জন্য সম্রাটের কাছে ভ্যান্সিটার্ট এই মর্মে অঙ্গীকারও করেছিলেন যে, অযোধ্যা বিজিত হলে কোম্পানি তা সম্রাটকে প্রদান করবে।[১৩]

কিন্তু ক্লাইভের দুরভিসন্ধি ছিল অন্যরকম। তিনি ভ্যান্সিটার্টের অঙ্গীকারের বিপরীতে এলাহাবাদে গিয়ে অযোধ্যার নবাব-উজির শুজাউদ্দৌলার সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন (১৬ই আগস্ট, ১৭৬৫)। যা হোক, সংক্ষেপে এই চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদের কয়েকটি, যথা:-

১. নবাব, এলাহাবাদ ও কোরা দিল্লির সম্রাটকে প্রত্যার্পণ করবেন;
২. যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ তিনি কোম্পানিকে এককালীন ৫০ লক্ষ টাকা দিবেন;
৩. অযোধ্যায় কোম্পানি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে পারবে; এবং
৪. বক্সারের যুদ্ধে নবাবের আত্মীয়-স্বজন, পারিষদ ও অনুচরবর্গের এবং যে সব প্রজা ইংরেজদের পক্ষ হয়ে সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে তিনি কোন প্রকার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না।[১৪]

অধিকন্তু, 'the Nawab entered into an offensive and defensive treaty with the Company binding him to render gratuitous military help to the Company in time of need and the Company to help the Nawab with troops for the defence of his frontier on the latter agreeing to pay the

১২. The Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire, Vol. II., pp. 480.
১৩. An Advanced History of India, pp. 665.
১৪. দেখুন, How the British Occupied Bengal, pp. 348-349.

cost of its maintenance."[১৫]

বস্তুত এখানে এ বিষয়টি এতো বিশদভাবে তুলে ধরার কারণ, আমরা মূলত দেখাতে চাচ্ছি এই যে, এ সময় শুধু বাংলার ক্ষেত্রেই নয়, বরঞ্চ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও যেখানেই ইংরেজরা সামান্যতম অনুপ্রবেশের সুযোগ পাচ্ছিল, সেখানে তারা একদিকে যেমন সংশ্লিষ্টদের স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারটুকু নিংড়ে নিচ্ছিল, ছলে-বলে-কৌশলে (বলপ্রয়োগে বলাই শ্রেয়) এদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বা প্রতিরক্ষার অজুহাতে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল, তেমনি·অন্যদিকে অনুপ্রোবিষ্ট অঞ্চলসমূহে বিনা শুল্কে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করার বিঘ্নবিহীন পথও তারা তৈরি করে চলেছিল অবধারিতভাবে।

ইতোমধ্যে অবশ্য মুর্শিদাবাদের শাসন ব্যবস্থায় ক্লাইভ তাৎক্ষণিকভাবে কিছু রদ-বদল করতে তরুণ নবাবকে বাধ্য করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খানের 'নায়েব-ই-নাজিম' পদের বিলুপ্তি।[১৬] কারণ সিলেক্ট কমিটি-র সদস্যরা ভয় পাচ্ছিল যে, যেভাবে রেজা খান রাজস্ব আয়-ব্যয়ের প্রতিটা খুঁটিনাটি বিষয়ে চুলচেরা হিসাব রাখছিলেন ও তদারকি করছিলেন; তাতে করে নবাব যেমন বিরক্ত হচ্ছিলেন, এবং এর ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ও অভিযোগ -- দুই-ই বাড়ছিল, তেমনি অন্যদিকে রেজা খানের প্রায় একক হাতে বিপুল ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়ায় এক হিসেবে তা ইংরেজদের ভবিষ্যতের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তাই, 'to retrench his authority partly, as they said, in order to 'remove the Nabob's jealousies' and partly 'to prevent the necessity of future revolutions' by removing the possibility of a great danger 'that may arise to the stability of the present establishment from suffering the whole power and absolute management of the three provinces to rest in a single person'."[১৭]; এরই সূত্র ধরে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করলেন নিম্নরূপভাবে:-

নবাব নাজিমউদ্দৌলা: মির নাজিমউদ্দিন আলি খান বাহাদুর	নবাব-নাজিম
নবাব মুইনউদ্দৌলা: সাইয়্যিদ মুহম্মদ রেজা খান বাহাদুর	নায়েব
মহারাজা দুর্লভ রাম বাহাদুর	দিওয়ান
জগৎ শেঠ খোশালচন্দ্র ও মহারাজা উদয় চাঁদ	বাণিজ্য-প্রধান

সিলেক্ট কমিটি অতঃপর বেশ কিছু নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করে উপর্যুক্ত তথাকথিত রথি-মহারথিদের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র এমনভাবে বেঁধে দিয়েছিল যে, ড. আবদুল মাজেদ খানের ভাষায় বলতে হয়, 'The Committee then adopted a number of regulations

---

১৫. A New Look on Modern Indian History: From 1707 to the Present Day, Dr. B. L. Grover, pp. 91.

১৬ Dr. C. S. Srinivasachari in The Maratha Supremacy: The History and Culture of the Indian People, Vol. VIII, Ed. by Dr. R. C. Majumdar, pp. 351.

১৭. The Transition in Bengal, pp. 96.

which further reduced the power of the Nawab, who was rendered a real cypher, besides making Reza Khan perhaps no more powerful and responsible than the other two ministers. The new regulation also laid down that the Nawab's treasury should have three keys, one with each of the three executive officers, further extending the Company's authority by arranging that a servant of the Company, of Councillor's rank, posted at Murshidabad and *maintained at the expense of the Nawab's government, should keep a check on the accounts of the Nawab's government. The ministers would be required to submit their accounts to him each month.*"[১৮]

এক্ষেত্রে বক্রাংশ লক্ষ্য করলেই প্রতীয়মান হবে, বাংলার নবাব এ সময়ে কতোটা ঠুটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছিলেন যে, তাঁরই কোষাগারের ওপর নজরদারি করবে তাঁরই অর্থে প্রতিপালিত কোম্পানির একজন সামান্য পোষ্য, এবং তার কাছেই নবাবের উজির-নাজিরদেরকে মাসে মাসে রাজস্ব আয়ব্যয়ের ফিরিস্তি দাখিল করতে হবে। এর চেয়ে লজ্জার, অপমানের কী থাকতে পারে! যা হোক এ রকম এক প্রেক্ষাপটেই ক্লাইভ নজর দিয়েছিলেন দিল্লির দিকে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলায় ইংরেজরা প্রকাশ্যে না চাইলেও প্রতিমুহূর্তে পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা তাদের বলয়ে তথা হাতে চলে আসছিল। এ অবস্থায় সুচতুর রায় দুর্লভ তাদের বুদ্ধি দিলেন দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে লিখিতভাবে অর্থাৎ কাগজে-পত্রে ভূমিরাজস্ব আদায়াধিকার হাসিল করতে।[১৯]

এর ফলে কোম্পানির নতুন ভূমিকা যেমন রাজনৈতিক বৈধতা পাবে, তেমনি তা স্থানীয় অভিজাতবর্গ, জমিদার-তালুকদারশ্রেণী ও আপামর জনমণ্ডলীর মধ্যেও তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে নিঃসন্দেহে। ফলত রায় দুর্লভের এই 'দুর্লভ' পরামর্শ পেয়ে ২৫শে জুন, ১৭৬৫ নাগাদ ক্লাইভ দলে-বলে এলাহাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন বাদশাহ শাহআলমের সঙ্গে দেখা করার মানসে। ৯ই আগস্ট তারা শাহআলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দ্বিতীয় শাহআলম হাজার হলেও তখন দিল্লির প্রবল-প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের প্রতিভূ। আগের শক্তি-প্রাচুর্য ও শান-শওকতের অনেক কিছুই তাঁর না থাকলেও তখনও তাঁর রাজকীয় স্বীকৃতির ছিল এক অভাবনীয় আশ্চর্য মহিমা। ইংরেজ বণিক কোম্পানির জন্যে তাঁর লিখিত স্বীকৃতির গুরুত্ব ছিল আরও বেশি। কারণ তারা শুধু ভারতেই বাণিজ্য করতো না। ভারতের বাইরেও ছিল তাদের ব্যবসায়িক প্রসার। বাংলার নবাবদের দুর্বলতার কারণে এদেশে তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পেলেও মূলত স্থানীয় অপরাপর বণিকগোষ্ঠীর কাছে তাদের সেই ভূমিকার কোন নৈতিক ভিত্তি ছিল না। তাছাড়া অন্যান্য বণিকগোষ্ঠীর তুলনায় ভারতে তারা ছিল অপেক্ষাকৃত নবীন। ফলে বাংলার বাইরে কোম্পানির এহেন অন্যায় উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগে ওলন্দাজ, ফরাসি প্রভৃতি বণিকগোষ্ঠী যাতে করে তাদের ভূমিকার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে না পারে, এবং ইংল্যান্ডের রাজার কাছে এ সম্পর্কিত নালিশ না যায়, সে জন্য ক্লাইভ ও কলকাতা কাউন্সিলের কাছে দিল্লির সম্রাটের ফরমান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।

১৮. The Transition in Bengal, pp. 97.

১৯. History of the Muslims of Bengal, Vol. II A., pp. 33.

অন্যদিকে বাদশাহ নিজেই ছিলেন এ সময় বেশ নাজুক অবস্থায়। তাঁর না ছিল রাজনৈতিক মিত্রবলয় ও সামরিক শক্তি, না আর্থিক বল ও প্রভাব-প্রতিপত্তি। সবই তিনি খুইয়ে ছিলেন বক্সারে। নিজেও অযোধ্যার নবাবের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন যত্রতত্র।
ক্লাইভ মৌখিক আলোচনায় তাঁকে আশ্বাস দিলেন সৈন্যসামন্ত দিয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে দিল্লির মসনদে ফের বসানোর এবং সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। ক্লাইভ সরাসরি তাঁকে প্রস্তাব দেন ২৮ লক্ষ টাকার রাজস্ব আয়-ক্ষম এলাহাবাদ ও কোরা প্রত্যর্পণের এবং তৎসহ দিল্লির সম্রাটের 'পেশকাশ'স্বরূপ বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা নিয়মিতভাবে প্রদানের।
শক্তিশালী ইংরেজদের পক্ষে ক্লাইভের এই বরাভয় তাৎক্ষণিকভাবে হলেও বাদশাহকে নতুনভাবে জেগে ওঠার শক্তি ও অনুপ্রেরণা জোগালো। সুযোগ বুঝে ক্লাইভও তখন তার আসল মতলব পেশ করলেন বাদশাহ সমীপে। তার আর্জির মধ্যে ছিল, এক. কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশা-র রাজস্ব আদায়াধিকার তথা দিওয়ানি ক্ষমতা দিয়ে ভূষিত করা; এবং দুই. তরুণ নবাব নাজিমউদ্দৌলা বাহাদুরের নবাবির স্বীকৃতি তথা তার দৃঢ় ও স্থায়ীকরণ (Confirmation)।[২০]

যা হোক, অতঃপর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই আগস্টে বাদশাহ কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানি দিয়ে এক নতুন ফরমান জারি করলেন।[২১] দীর্ঘ হলেও আমরা এখানে ফরমানটির প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরছি এ কারণে যে, এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, সনদের কার্যকারিতা ও অধিক্ষেত্র।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের দিওয়ানিসংক্রান্ত বাদশাহি ফরমানের ইংরেজি ভাষ্য

'At this happy time our royal *Firman*, indispensably requiring obedience, is issued; that whereas, in consideration of the attachment and services of the high and mighty, the noblest of exalted nobles, the chief of illustrious warriors, our faithful servants and *sincere well-wishers*, worthy of our royal favours, the English Company, we have granted them the Diwany of the Provinces of Bengal, Behar and Orissa .... as a free gift and altamagau, without the association of any other person ... it is requisite that the said Company engage to be security for the sum of twenty-six lacs of Rupees a year, for our royal revenue, which sum has been appointed from the Nawab Najm-ud-daula Bahadur, and regularly remit the same to the royal *Sarkar*; and in this case, as the said Company are obliged to keep up a large Army, for the protection of the Provinces of Bengal, etc., we have granted to them whatsoever may remain out of the revenues of the

২০. How the British Occupied Bengal, pp. 345.
২১. এই ৩টি প্রদেশের সাথে সম্ভবত মাদ্রাজের উত্তরাংশের একটি সরকারও কোম্পানিকে দেয়া হয়েছিল। দেখুন, The Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire, Vol. II., pp. 480.

said Provinces, after remitting the sum of twenty-six lacs of Rupees to the royal *Sarkar*, and providing for the expenses of the *Nizamat*. It is requisite that our royal descendants, the Viziers, the bestowers of dignity, the *Omras* high in rank, the great officers, etc. .... leave the said office in possession of the said Company, from generation to generation, for ever and ever. Looking upon them to be assured from dismissal or removal, they must, on no account whatsoever, give them any interruption, and they must regard them as excused and exempted from the payment of all the customs of the Diwani and royal demands. Knowing our orders on the subject to be most strict and positive, let them not deviate therefrom."[২২]

এখানে বাদশাহকর্তৃক দিওয়ানি ফরমানের অধিক্ষেত্র, এর সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব এবং ইতোমধ্যে কোম্পানিকর্তৃক অধিগ্রহণকৃত (রাজস্ব আদায়াধিকার) অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে ফরমানের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

মূলত তখন পর্যন্ত বাংলার নবাবের এই ৩টি প্রদেশের (ওড়িশার অনেকাংশই মারাঠাদের দখলে ছিল সেটা আগেই বলা হয়েছে) যে সব অঞ্চলে কমবেশি শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ছিল, সে প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, নিম্নবর্ণিত জেলা বা সরকার বা চাকলা, জমিদারি বা অঞ্চলগুলিই বাদশাহি ঘোষণায় দিওয়ানির আওতাভুক্ত হয়েছিল।[২৩]

১.	ঢাকা	২.	বীরভূম
৩.	রাজশাহি	৪.	পূর্ণিয়া
৫.	দিনাজপুর	৬.	নদীয়া
৭.	রংপুর	৮.	হিজলি
৯.	সিলেট	১০.	রাজমহল
১১.	যশোহর	১২.	পাচেত বা পঞ্চকোট
১৩.	মাহমুদশাহি	১৪.	চুনাখালি বা চুনখালি
১৫.	লস্করপুর	১৬.	বিষ্ণুপুর
১৭.	রোকনপুর	১৮.	ত্রিপুরা (কুমিল্লা)
১৯.	ইদ্রাকপুর	২০.	শীলবাড়ি বা শালবুড়ি
২১.	ইছানগর বা জাহাঙ্গিরপুর	২২.	ফতেহসিংহপুর
২৩.	মামুদ মোমিনপুর	২৪.	খুরদিহ জমিদারি

২২. C. U. Aitchison, A Collection of Treaties, Engagements and Sanads relating to India and Neighbouring Countries, Vol. I., pp. 225, quoted from, How the British Occupied Bengal, pp. 346-47.

২৩. James Grant in Analysis of the Finances of Bengal, quoted from The Fifth Report, pp. 464.

তবে যেহেতু কলকাতা বা ২৪-পরগণা জমিদারি, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান অঞ্চল কোম্পানি নবাব মিরকাশিমের মাধ্যমে 'হস্তান্তরিত ভূখণ্ড বা অঞ্চল'স্বরূপ পেয়েছিল এবং আগেই দেখিয়েছি, বাদশাহ শাহআলমের পূর্ববর্তী একটি ফরমান বলে কোম্পানি এগুলির ভূমিরাজস্ব আদায়ের বৈধাধিকার হাসিল করেছিল, সুতরাং ১২ই আগস্টের ফরমানের গুরুত্ব এগুলির বেলায় তেমন ছিল না।[২৪] বরঞ্চ এখানে প্রত্যেকটিতে আগে থেকে যেমন একজন করে 'রেসিডেন্ট' বা 'চীফ' নিযুক্ত ছিল, এখনও সেটিই বহাল থাকলো। তবে অবশ্যই স্বীকার্য যে, নতুন এই ফরমান এই ভূখণ্ডগুলি থেকে কোম্পানির রাজস্ব আদায়াধিকার সর্বৈব চূড়ান্ত করেছিল, এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতাও বহুলাংশে বাড়িয়েছিল।
এক্ষণে সামগ্রিকার্থে ১২ই আগস্ট, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের দিওয়ানি ফরমানের সুদূরবিস্তৃত গুরুত্ব এবং এটি জারির ফলে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বাংলার নবাবের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে গুণগত ও মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করার আগে এ সম্পর্কিত দু-একজন প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও আধুনিক ইতিহাসবেত্তার বক্তব্য তুলে ধরবো।

ড. ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, 'The grant of the diwani regularized the revenue settlement with Najm-ud-daula, and marked the first great step towards the direct administration of Bengal by the Company.'[২৫]
আর ডব্লিউ ফ্রেজার বলেন, 'By this arrangement Bengal, Behar, and Orissa virtually became the property of the Company -- a property likely, in the opinion of Clive, to yield a yearly revenue of two millions sterling. The acquisition, in fact, exceeded everything that could have been conceived by the wildest imagination of Dupleix ... .'[২৬]
আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্বনামখ্যাত ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, 'The importance of the grant of Dewani lay in the fact that Shah Alam was theoretically and legally the Emperor and this gave a colour to the Company's

২৪ The Fifth Report, pp. 463.
২৫. The Oxford History of India, pp. 476; The Oxford History of Modern India, Dr. Percival Spear, pp. 32.
বিখ্যাত ইংরেজ লেখক P. E. Roberts-ও ঠিক অনুরূপ ভাষায় বলেন, 'The famous acquisition of the Diwani of Bengal was the first great step by the Company towards territorial dominion.' (History of British India under the Company and the Crown, pp. 158).
২৬. British India, R. W. Frazer, pp. 114.
আগে এদেশে যেখানে কোম্পানির মূল আয়-উপার্জন ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য-নির্ভর, এখন থেকে সেটা হয়ে দাঁড়ালো এদেশ থেকেই উসুলকৃত ভূমিরাজস্ব-আয়-নির্ভর। ড. ইরফান হাবিব-এর ভাষায় বলা যায়, 'The source of the conquerors' profits, however, lay not in commerce, but in land revenue.' (Essays in Indian History: Towards a Marxist Perception, pp. 300).

transactions."[২৭]

সামগ্রিক প্রেক্ষাপটটি আরও চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন ড. মুহম্মদ মোহর আলি। তাঁর ভাষায়, 'By these arrangements the process of transposition of the British rule over Bengal, Bihar and Orissa was completed.... The acquisition of the *diwani* secured for the English a recognized and constitutional position in the three provinces over which they had already established their complete military and practical control . .. They were now the masters of the three provinces in fact as well as in theory."[২৮]

ঐতিহ্যগতভাবে ও আইনত মোগল ও নবাবি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রাদেশিক শাসনকর্তা তথা সুবাদার বা নাজিম ছিলেন সাধারণ প্রশাসনের (নিজামত) প্রধান। তিনি প্রদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, সৈন্যবাহিনী পরিচালনা ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাসহ দিওয়ানি ব্যতীত যাবতীয় কিছু দেখাশুনা ও নিয়ন্ত্রণ করতেন। অন্যদিকে প্রাদেশিক দিওয়ান ছিলেন প্রথমত রাজস্ব প্রশাসনের মুখ্যাধিকারিক ও দ্বিতীয়ত দেওয়ানি বিচার বিভাগের অধিকর্তা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জ্যেষ্ঠ মোগলদের সময়ে আগাগোড়া সুবাগুলিতে মোটামুটি এই প্রশাসনিক বিন্যাস অক্ষুণ্ন থাকলেও সম্রাট আওরঙ্গজেব-উত্তর পর্বে বাংলার নবাবদের বেলায় এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছিল।

নবাব মুর্শিদকুলি জাফর খানের সময় থেকে সুবাদার ও দিওয়ান, -- বাংলা, বিহার ও ওড়িশা -- এই ৩টি প্রদেশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল নবাব-সুবাদার বা নবাব-নাজিম হিশেবে তিনিই প্রথম প্রদেশের যাবতীয় ক্ষমতা নিজ হস্তে কুক্ষিগত ও কেন্দ্রীভূত করেছিলেন, যা অতঃপর অব্যাহত ছিল।

এই প্রেক্ষিতে ক্লাইভের অধিনায়কত্বে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিল্লির বাদশাহকর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে দিওয়ানি লাভের অর্থ, সহজ সরল ভাষায়, প্রদেশগুলির যাবতীয় রাজস্ব আদায়াধিকার ও দিওয়ানি বিচারের প্রকৃত ভাব বৈধ পথে কোম্পানির হাতে চলে আসা। অন্যদিকে আইনত বাংলার তরুণ নবাব তখনও যেহেতু নিজামতের দায়িত্বে ছিলেন অর্থাৎ সাধারণ প্রশাসন ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ছিল তাঁর হাতে, এবং বলাবাহুল্য ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৫-এর চুক্তি বলে অন্তরালে থেকে হলেও ক্লাইভ ও সিলেক্ট কমিটি তথা ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ সেটিরও নিয়ন্ত্রণ ভার একপ্রকার গ্রহণ করেছিলেন, সুতরায় বলা যেতে পারে যে, কাগজে-পত্রে কোম্পানি ১২ই আগস্টের ফরমান বলে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানি লাভ করলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তারা এক্ষণে -- মধ্য-অষ্টাদশ শতকের বাংলার নবাব-নাজিমের ক্ষমতাই অর্জন করেছিল। তবে কাগজে-পত্রে ফাঁক যেহেতু একটু ছিলই, সুচতুর ক্লাইভ এবার সেটাও বন্ধ করায় ব্রতী হলেন। তিনি নবাব নাজিমউদ্দৌলাকে চাপ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে আর একটি ফরমান আদায় করলেন। উল্লেখ্য, পরবর্তী আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বিধায় এর পুরোটাই এখানে তুলে ধরা হলো।

"The King (*Emperor Shah Alam II*) having been graciously pleased

২৭. Modern India, quoted from, Constitutional History of India and National Movement, Dr. R. C. Aggarwala, pp. 6.

২৮. History of the Muslims of Bengal, Vol. II A., pp. 33-34.

to grant to the English Company the *Diwani* of Bengal, Behar, and Orissa, with the revenues thereof, as a free gift for ever, on certain conditions, whereof one is that there shall be a sufficient allowance out of the said revenues for supporting the expenses of the Nizamat: be it known to all whom it may concern that I do now agree to accept of the annual sum of *Sicca* Rupees 53,86,131-9, as an adequate allowance for the support of the Nizamat, which is to be regularly paid as follows, viz. the sum of Rupees 17,78,854-1, for all my household expenses, servants, etc., and the remaining sum of Rupees 36,07,277-8, for the maintenance of such horses, sepoys, peons, etc., as may be thought necessary... but on no account ever to exceed that amount... This agreement (by the blessing of God) I hope will be inviolably observed, as long as the English Company's factories continue in Bengal."[২৯]

বাদশাহ্ শাহআলমের ফরমানের ভাষাও এই সঙ্গে লক্ষ্যণীয়। বস্তুত এভাবেই পূর্ণ হলো বাংলার নবাবদের দিওয়ানি বা যাবতীয় রাজস্বসংক্রান্ত ক্ষমতা স্থায়ী অবলোপের ষোল কলা।

দিওয়ানি লাভের পর বাংলার গভর্নর ও সিলেক্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট হিশেবে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর চিন্তা করলেন। অবশ্য তাকে এই কাজ যে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে করতে হচ্ছিল, তা বলাইবাহুল্য। কেননা বাদশাহের কাছ থেকে এভাবে দিওয়ানি ফরমান গ্রহণের মাধ্যমে একটি বৈদেশিক বণিক কোম্পানি হিশেবে একযোগে তিনটি প্রদেশের ভূমিরাজস্ব আদায়াধিকার অর্জনকে তার সহযোগীদের অনেকেই মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। অবশ্য তাদের দিকেও কিছু সঙ্গত যুক্তি ছিল।

অপরাপর ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো (ওলন্দাজ, ফরাসি প্রভৃতি) ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখনও ছিল একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীই বটে। ইতোপূর্বে তাবা কলকাতা জমিদারিসহ কয়েকটি চাকলার ভূমিরাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করলেও সত্য বলতে তাদের লোকবল ও এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা তখনও বিশেষ ছিল না। ফলে হঠাৎ করে তিনটি প্রদেশের দিওয়ানি ক্ষমতা গ্রহণ করে ক্লাইভ নিঃসন্দেহে যে বড় রকমের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তা অস্বীকার করা যায় না। কেননা কোম্পানির মূল নিয়ন্তাগোষ্ঠী, ইংল্যান্ডের 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণ তখনও জানতো যে, এরা ভারত ও বাংলায় মূলত ব্যবসায়-বাণিজ্য করছে। কোনরূপ রাষ্ট্রীয় কাজে-কর্মে জড়িয়ে পড়ে তাদেব সে ব্যবসায়িক স্বার্থে বিঘ্ন ঘটুক বা হানি হোক, সেটা তারা কখনই চাইতেন না। সত্যি বলতে তেমনটা ঘটলে এই অপকর্মের হোতা 'জুয়াড়ি'দের তারা কোন অবস্থাতেই রেহাই দিতেন না। ক্লাইভ নিজেও এই পরিণামের কথা স্বীকার করেছেন এই বলে যে, 'To go further is, in my opinion, a scheme so extravagantly ambitious, that no Governor and Council in their senses can accept it unless the

২৯. C. U. Aitchison, A Collection of Treaties, Engagements and Sanads relating to India and Neighbouring Countries, Vol. I., pp. 229, quoted from, How the British Occupied Bengal, pp. 347.

whole system of the Company's interests be first entirely new remodelled."[৩০]

অতঃপর সর্বক্ষমতাময় ক্লাইভ বাংলা, বিহার ও ওড়িশার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে যেভাবেই 'remodelled' করুন না কেন, এবং তার তথাকথিত এই মারাত্মক ঝুঁকির যতো সমালোচনাই করা হোক না, বস্তুত দু'টি বিষয়ে যে তার নেতৃত্বে দিওয়ানি ক্ষমতা অর্জন কোম্পানির জন্য আশু লাভজনক বিবেচিত হয়েছিল, তা ঐতিহাসিক Henry Beveridge যথার্থই বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, এক. 'At last, after long hesitation, it had been resolved to accept of the diwani of the three provinces of Bengal, Bihar, and Orissa, and thus by transferring the collection of the revenues as well as the military defence of the country to the Company, put an end to the possibility of future collision with the nabob."[৩১] এবং দুই. 'When, the grant of the *diwani* was obtained, the general belief was that the Company had obtained a clear addition to their income of at least a million sterling. As a necessary consequence the value of their stock rose rapidly in the market, and with it the expectation of a largely-increased dividend."[৩২]

তবে কোম্পানির সামগ্রিক মঙ্গল ও অস্তিত্বের নিরিখে এবং একইভাবে এর কর্মচারীকুলের ভবিষ্যত দুর্নীতির জড় উৎপাটনে দিওয়ানি কোম্পানির জন্যে এক রকম আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল, এ কথা না বললেই নয়।

ড. বি. বি. মিশ্র বলেন, 'The *Diwani* was, therefore, designed to secure the stability of the Company's interest by putting an end to the rapacity and corruption of its servants, who used to draw heavily upon the Nawab as long as the provinces belonged of right to them. They could no longer do it on their being transfered to the legal control of the Company."[৩৩] নিজের ঘরে যেমন কেউ সিঁদ খুঁড়তে পারে না, তেমনি কোম্পানির কর্মচারীরা এখন বাংলার নবাবের বদলে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেতনভোগী কর্মচারী, কাগজে-পত্রে এবং বাস্তবে, হওয়ায় তাদের বাছবিচারশূন্য দুর্নীতির পথ অতঃপর অনেকখানিই রুদ্ধ হয়ে ছিল এ কথা অনুমান করতে দোষ নেই।

আইনত ও কার্যত ৩টি প্রদেশের ভূমিরাজস্ব আদায়াধিকার লাভ করলেও বুদ্ধিমান ক্লাইভ তন্মুহূর্তে অর্থাৎ দিওয়ানি লাভের অব্যবহিত পরেপরেই *প্রত্যক্ষভাবে* বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ থেকে বিরত থাকলেন, বা ইংরেজ কোন কর্মচারীর হাতেও তা

---

৩০. British India, pp. 114.

৩১. A Comprehensive History of India, Vol. I., pp. 880.

৩২. A Comprehensive History of India, Vol. II., Henry Beveridge (Senior), pp. 367-68.

৩৩. The Judicial Administration of the East India Company in Bengal (1765-1782), pp. 25.

অর্পণ তিনি সমীচীন মনে করেননি। কারণ কোম্পানির তখনও জনবল কাঠামো তেমন ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য ছিল না, এবং তার চেয়েও বড় কথা রাজস্ব আদায়সংক্রান্ত কাজেকর্মে তাদের কর্মচারীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল নিতান্তই সীমিত। ফলে ক্লাইভ চাইলেন মোটামুটি স্থিতাবস্থা বহাল রাখতে। এ সংক্রান্ত তার যে বক্তব্য আমরা পাই তা খুবই স্পষ্ট ও বুদ্ধিদীপ্ত। তার ভাষায়, 'In the infancy of the acquisition (*of the diwani*), we were under the necessity of confiding in the old officers of the government from whom we were to derive our knowledge, and whom we therefore endeavoured to attract to our service by the ties of interest, until experience should render their assistance less necessary. Policy required we should pursue every step likely to conciliate the natives to our Government.'[৩৪]

তারপরও কিছুটা পরিবর্তন ক্লাইভ আনলেন। যেমন, আগে মুহম্মদ রেজা খান ছিলেন রাজস্ব বিভাগীয় প্রধান, তাঁর দায়বদ্ধতা ছিল মুখ্যত বাংলার নবাবের কাছে, যদিও নবাব তাঁকে কোম্পানির অনুমতি ছাড়া পদচ্যুত করতে পারতেন না। কিন্তু এবার তাঁকে দিওয়ানি পদে রাখা হলেও, শুধু বাংলার ক্ষেত্রে, এবং এ পর্যায়ে তাঁর পদবি হলো 'নায়েব-ই দিওয়ান' বা 'Diwan to the Company'[৩৫], অর্থাৎ কোম্পানিই এখন হলো খানের একক নিয়োগকর্তা, তাদের কাছেই ছিল তাঁর চূড়ান্ত জবাবদিহিতা।

ফলত সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খানের এই নিযুক্তিই আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলায় স্বাধীন নবাবি শাসনের যবনিকা ঘটিয়েছিল।[৩৬] উল্লেখ্য রেজা খানের পাশাপাশি রায় দুর্লভ ও সেতাব রায়-কে

৩৪. Clive to Court of Directors, 29 September, 1765, quoted from Land Revenue in India: Historical Studies, Ed. by Dr Ram Sharan Sharma, pp. 55

৩৫. The Fifth Report, pp. 464.

৩৬. Dr. Smith বলেন, 'The council ... strengthened their hold by stipulating that the government should be carried on by a deputy of their own choosing. His name was Muhammad Reza Khan; his appointment marked the virtual end of independent Indian rule in Bengal. (The Oxford History of India, pp. 472).

ড. Percival Spear-ও বলেন, 'But this arrangement (*appointing Muhammad Reza Khan as deputy-nawab*) made the Company the virtual ruler of Bengal since it already possessed decisive military power. ... The machine of administration remained Indian, with Mughal trappings and titles, but the control was that of the Company.' (A History of India, Vol. 2., pp. 86).

৩৭. তবে কোম্পানির রেজা খানের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় যে যথেষ্ট আস্থা ছিল তার প্রমাণ, তাঁকে প্রদত্ত বেতন-ভাতার বহর। রায় দুর্লভ ও সেতাব রায় যেখানে বছরে যথাক্রমে ২ লক্ষ ও ৯৯,৯৯৬ টাকার (শেষোক্ত জন এ ছাড়া মাসিক প্রায় ২৫,০০০ টাকার ভাতাও পেতেন) নির্দিষ্ট বেতন পেতেন, সেখানে খানের বার্ষিক বেতন ছিল ৯ লক্ষের মতো। দেখুন, The Fifth Report, 464.

কোম্পানি যথাক্রমে ওড়িশা ও বিহারের দিওয়ান নিযুক্ত করেছিল।[৩৭] আর এঁদের সামগ্রিক কাজ-কারবার প্রত্যক্ষভাবে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে একজন সার্বক্ষণিক ব্রিটিশ 'রেসিডেন্ট' রাখা হলো। অবশ্য এখানে আগে থেকেই একজন রেসিডেন্ট ছিল[৩৮], তবে ১২ই আগস্টের পর এর পদের মর্যাদা ও কাজের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল তা বলাইবাহুল্য। 'The Fifth Report'-এর ভাষায় বলা যায়, 'There had previously been Residents at the Durbar but, after the acquisition of the Diwani, such importance was added to the post that it practically became a new one, and was assigned to one of the most senior of the Company's servants.'[৩৯]

নতুনভাবে 'রেসিডেন্ট'-এর দায়িত্ব-কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছিল যা সংক্ষেপে এ রকম:

১. ভূমিরাজস্বসহ যাবতীয় কর যেমন সায়রাত থেকে আয়, পণ্য শুল্ক প্রভৃতির ধার্য ও আদায় কার্য 'সরকারি'ভাবে দেখভাল ও নিয়ন্ত্রণ;

২. কোম্পানির কর্মচারী বা তাদের এজেন্টদের সঙ্গে নবাবি প্রশাসনের কোনরূপ বিরোধ বা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিক মধ্যস্থতাকারী হিশেবে কর্তব্য পালন এবং রায়তদের ওপর কোন প্রকার উৎপীড়ন বা অন্যায় আচরণ হলে তার প্রতিকারকরণ;

৩. সিলেক্ট কমিটির প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে কমিটির কাছে নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট-রিটার্ন প্রেরণ এবং তৎসহ যথোপযুক্ত সংযোজনী সহকারে প্রতিবেদনের অনুলিপি 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণের নিকট যথাসময়ে উপস্থাপন বা প্রেরণ।

এখানে প্রসঙ্গত কলকাতা ও ২৪-পরগণা জমিদারি, চাকলা চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান 'হস্তান্তরিত অঞ্চল' সমূহের ভূমিরাজস্ব আদায়াধিকার সম্বন্ধে একটু বলা দরকার।

বস্তুত এই জেলাগুলির 'রেসিডেন্ট' বা 'চীফ'গণ আগে 'কমিটি অফ ল্যান্ডস'-এর অধীনে কাজ করলেও ১২ই আগস্ট-পরবর্তীকাল অর্থাৎ নভেম্বর, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে এরা একজন 'কালেক্টর জেনারেল'-এর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণভুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে তথা ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস-এর সময়ে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত 'কালেক্টর জেনারেল'ও আবার দায়বদ্ধ ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ বা গভর্নর (প্রেসিডেন্ট) ও কাউন্সিলের কাছে।[৪০]

৩৮ · বিখ্যাত 'A History of Bengal: Before and After the Plassey (1739-1758)' গ্রন্থের লেখক Luke Scrafton ছিলেন এই সময় মুর্শিদাবাদ দরবারে 'রেসিডেন্ট'। তিনি ১৭৫৭-পরবর্তী কাল থেকেই এখানে নিয়োজিত ছিলেন। যা হোক, দরবারের আগাগোড়া রেসিডেন্টদের সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, British Residents at the Darbar of Bengal Nawabs at Murshidabad (1757-1772), Dr. Subhas Chandra Mukhopadhyay

৩৯. pp. 464-65.

৪০ Land Revenue in India · Historical Studies, pp. 55.

যা হোক এ পর্যায়ে আমরা বাংলার এই পর্বের শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং অবশ্যই বিতর্কিত -- ক্লাইভের 'দ্বৈত শাসন' ব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

দ্বৈত শাসনব্যবস্থা (The Dual Government of Bengal)

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই আগস্টের বাদশাহি ফরমান বলে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানি তথা ভূমিরাজস্বসহ সকল প্রকারের কর বা শুল্ক ধার্য ও আদায়াধিকার অর্জন করলেও কাগজে-পত্রে এবং বাস্তবে তখনও পর্যন্ত নিজামত ছিল তরুণ নবাব নাজিমউদ্দৌলা মির নাজিমউদ্দিন আলি খান বাহাদুরের দখলে। বলাবাহুল্য তাঁর হুকুমে ও সীল মোহরাঙ্কিত হয়ে নবাবি আদেশ-নিষেধ কার্যকর হতো। তবে আগেই দেখিয়েছি যে, শুধু বাদশাহের ফরমান বলেই নয়, স্বয়ং নবাব নিজেও এক ফরমান জারি করে (সেপ্টেম্বর ৩০, ১৭৬৫) তাঁব বাৎসরিক আয় যথা নবাবি সাধারণ প্রশাসনযন্ত্রের ব্যয় ভার, সৈন্যদের বেতন, দরবার ও প্রাসাদের বিলাস-ব্যসনের খরচ প্রভৃতি এককালীন সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। কোম্পানি চুক্তি মোতাবেক প্রতিবছর তা তাঁকে দিতে বাধ্য ছিল।

উল্লেখ করা দরকার যে, মোগল শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজামতের অন্তর্ভুক্ত ছিল ফৌজদারি বিচারব্যবস্থাও; সুতরাং এক্ষণে নিজামতের বিশাল দায়িত্ব পালন নবাব-নাজিমকে ঐ সুনির্দিষ্ট ও পরিমিত আয়ের মধ্যেই সম্পন্ন করতে বাধ্য হতে হলো। এর অতিরিক্ত ব্যয় কিছুতেই তাঁর করার সুযোগ বা ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে দিওয়ান হিশেবে দিল্লির বাদশাহের বাৎসরিক ২৬ লক্ষ ও বাংলার নবাবকে ৫৩ লক্ষ টাকা দিতে পারলেই কোম্পানির দায়িত্ব-কর্তব্য শেষ হতো। বাদশাহ ও নবাবের পূর্বালোচিত দু'টি ফরমান থেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি, অতঃপর যতো টাকা বা রাজস্ব আয়-ই কোম্পানি করুক না কেন, তার একক ভোগ-ব্যবহারকারী ছিল তারাই। এ বিষয়ে বাদশাহ ও নবাবের কিছুই করার ছিল না।

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে যেটা তাৎপর্যপূর্ণ ও ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিলো, তা দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার ব্যয় বরাদ্দকরণে নবাবের চরম সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতা। ঠিক অনুরূপভাবে কোম্পানির আয় প্রচুর হলেও এবং তাদের হাতে অঢেল অর্থসম্পদ জমা থাকলেও প্রশাসনের কোন জরুরি প্রয়োজনে তা ব্যয়ে তাদের কোন দায়বদ্ধতা বা প্রশাসনিক চাপ ছিল না। অথচ জনসাধারণের কাছে প্রশাসনিক বিষয়ে জবাবদিহিতা ছিল একান্তই নবাবের। অবশ্য তাঁর হয়ে এ সময় মুর্শিদাবাদে রাজা নন্দকুমার ও ঢাকায় যশোরত খান 'নায়েব-ই নাজিম' হিশেবে কাজ করতেন। অন্যভাবে বলতে পারি যে, কাগজে-পত্রে নবাবের ক্ষমতা ছিল অসীম, কিন্তু তাঁর আয় ছিল সসীম ও অপ্রতুল। একদিকে নবাবের স্কন্দে সুবিশাল দায়িত্ব কিন্তু তা প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁর ছিল না; অন্যদিকে কোম্পানির হস্তে পর্যাপ্ত অর্থ থাকলেও তাদের না ছিল দায়িত্ব, না কারো কাছে জবাবদিহিতা। এ ছিল বিচিত্র এক অবস্থা! ফলে এর পরিণতি যা হওয়ার তাই-ই হয়েছিল।

নবাব, ক্লাইভের ভাষায় 'Name and Shadow of Authority' নিয়ে দিন-কে দিন শুধু প্রকৃত ক্ষমতা-বঞ্চিত ও অথর্ব এবং কাষ্ঠ-পুত্তলিই বিবেচিত হলেন না, সরকারি কর্মচারীদের কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ন্যূনতম পর্যায়ে এসে পৌঁছুলো। অন্যদিকে দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে

যেনতেন প্রকারে রায়ত শোষণের মাধ্যমে কোম্পানির রাজস্ব চোষণ যে তাদের শান-শওকত ও আর্থিক ঔজ্জ্বল্যকে আকাশচুম্বী করে তুলেছিল, তা বলাইবাহুল্য। তবে যেটাই হোক, দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বা সমান্তরালে প্রবহমাণ দু'টি সরকার ব্যবস্থাপনা যে বাংলার জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর বিবেচিত হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অত্যল্পকালের মধ্যে (১৭৬৯-১৭৭০) এ অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ও বিষময় ছোবল (যথাস্থানে আলোচিত)। তাই নিরপেক্ষ ইংরেজ ঐতিহাসিক মাত্রই এই দ্বৈত-ব্যবস্থার কঠোর নিন্দা করেছেন। এখানে শুধু Sir Lewis-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হলো। তাঁর ভাষায়, 'No civilised Government ever existed on the face of this earth which was more corrupt, more perfidious and more rapacious than the Government of East India Company from 1765 to 1772."[৪১] ঐতিহাসিকের এ বিরল মন্তব্যের পর এ বিষয়ে আর অধিক বলা অবান্তর। এখন এ সময়কার বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হলো।

আগেই বলেছি, দিওয়ানি লাভের পর কোম্পানি সরাসরি ভূমিরাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেনি। মোগল-নবাবি আমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাই কমবেশি বহাল ছিল।

প্রাক-আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি (এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে) যে, মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মূল প্রকৃতি অনুযায়ী ভূমির মালিকান-স্বত্ব ছিল রাষ্ট্রের।[৪২] জমিদার-তালুকদার প্রভৃতি ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহকগণ ছিল রাষ্ট্রের পক্ষে খাজনা আদায়ের এজেন্ট মাত্র, তারা এ কাজের জন্য কমিশন পেতো। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারী যেমন আমিল, করোড়ি, আমিন, কানুনগো, মুৎসুদ্দি, চৌধুরি প্রভৃতির মাধ্যমেও সরাসরি রায়তদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় করা হতো। এক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসলে রাষ্ট্র ও রায়তের হিস্যা ছিল পূর্বনির্দিষ্ট; স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এর ইতর বিশেষ হতে পারতো, তবে সত্যি বলতে নবাবি আমলে বিশেষত নবাব মুর্শিদকুলির সময় থেকে ভূমিরাজস্বের অতিরিক্ত কর ('আবওয়াব' হিশেবে পরিচিত) ধার্যের ফলে এই খাতে রায়তের দেয়-এর পরিমাণ বেশ বেড়েছিল। রাজস্বের মূল খাত তখন ছিল ৩টি।[৪৩] যথা:-

এক. 'মাল'-- এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ভূমিরাজস্ব ও লবণ থেকে আয়;
দুই. 'সাইর' -- এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বহিঃশুল্ক, টোল, ফেরি প্রভৃতি; এবং
তিন. 'বাজে জমা' -- 'মাল' ও 'সাইর'-বহির্ভূত আয় যেমন জরিমানা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় কর, আন্তঃশুল্ক প্রভৃতি।

এর মধ্যে 'মাল'-ই ছিল বরাবরের ন্যায় রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রথম ও প্রধান খাত বা উৎস।

৪১. Quoted from, Constitutional History of India and National Movement, pp. 10-11.
৪২. A Comprehensive History of India, Vol. IX., pp. 695.
৪৩. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 409.
মূল এই ৩টি উৎসকেই অনেকে আবার ৪টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন ড. নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'The source of the diwani revenue may be classified under four heads: (1) land revenue, (2) duties and customs, (3) farms of trade privileges, and (4) fines and forfeitures.' (A Comprehensive History of India, Vol. IX., pp. 695-96).

উল্লেখ্য যে, মোগলামলীয় এই রাজস্ব খাতসমূহ বহাল থাকলেও দিওয়ানি-উত্তর পর্বে এগুলি ধার্য ও আদায়করণে যে নতুন সমস্যাটির উদ্ভব হলো তা কোম্পানির রাজস্বের সর্বাধিকরণ বা সর্বোচ্চকরণ নীতি (Policy of grasping all revenues by hook or by crook)-র অনিবার্য ফল বা প্রতিক্রিয়া। কেননা একজন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ রাজস্ববিশেষজ্ঞ বা কর্মচারী হিশেবে কোম্পানি মুহম্মদ রেজা খান-কে নিয়োগই করেছিল রাজস্বের যেখানে যে উৎস বা সামান্য সূত্র আছে, সেখান থেকে সেটা যেনতেন প্রকারে চুষে, নিংড়ে বের করে আনতে সহযোগিতা করার জন্যই। বলতে দ্বিধা নেই, বশংবদ রেজা খান সে চেষ্টাই করেছিলেন। যদিও তাঁর পক্ষেও এর শেষ ধরে রাখা সম্ভব হয়নি বা ছিল না।

আগে যেখানে এলাকা বিশেষের জন্য বাৎসরিক 'হস্ত-বুদ' তৈরি করে সে অনুসারে রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীরা সরেজমিনে গিয়ে ফসলের মৌসুমে ভূমিরাজস্ব আদায় করতো। আবার অনেক ক্ষেত্রে রায়ত নিজেই এসে 'সদর-কাছারি' বা পূর্ব থেকে নির্দিষ্টকৃত স্থানে খাজনা দিতে পারতো। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় 'নায়েব-ই দিওয়ান' মুহম্মদ রেজা খানের অধস্তনদের ('আমিল' প্রভৃতি) কাছে এই ধরনের কোন 'হস্ত-বুদ' থাকতো না। এর ফলে তারা ইচ্ছে মতো ভূমিরাজস্ব ধার্য করতো। ড. ননীগোপাল চৌধুরি বলেন, 'As there was no fixed *hast-o-bud* by which the *Amils* were to collect revenue and the *ryots* to pay it, the *Amils* rack-rented the *ryots*.'[৪৪]

আমিলরা জন্ম বা বসবাস সূত্রে যে এলাকার লোক হতো তাদের পদায়ন (posting) বা বদলি হতো তা থেকে ভিন্ন এলাকায়। একজন সরকারি কর্মচারীর জন্য এটাই ছিল স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল গোড়াতেই। মোগল ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে সেখানেও এদের পদায়ন ও বদলি একইভাবে হতো, কিন্তু তখন রাষ্ট্র বা সরকারের প্রতি আমিলদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা থাকতো। ইচ্ছে করলেই তারা যা কিছু করতে পারতো না। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রেরই (এখানে কোম্পানি) যেখানে প্রধান লক্ষ্য ছিল যেনতেন প্রকারে রায়ত চোষণ ও শোষণ, সেখানে আমিলরাও স্বাভাবিক কারণে তাদের কাজেকর্মে কোম্পানির সেই ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটাতো মাত্র। অন্যদিকে যে সমস্ত ক্ষেত্রে জমিদার-তালুকদার খাজনা আদায় করতো এবং বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষত 'পুণ্যাহ' উৎসবের সময় সরকারি কোষাগারে তা জমা দিতো; এদের কাছে ভূমিরাজস্ব বকেয়া পড়লে আমিলেরাই তা সংগ্রহের জন্য ধর্না দিতো, কখনও কখনও তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি করে ভূমিরাজস্ব উসুল করতো। তবে এক্ষেত্রে যেটা লক্ষ্যণীয় ছিল তা এখানে তুলে ধরা জরুরি। মূলত এটি ছিল দিওয়ানি-পূর্ব ও দিওয়ানি-উত্তর ভূমিরাজস্ব আদায় ব্যবস্থার মধ্যে একটা মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য। মোগল ব্যবস্থায় জমিদাররা মূলত রাষ্ট্রের পক্ষে ভূমিরাজস্ব আদায়কারী এজেন্ট হলেও যেহেতু তারা ছিলেন স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল ও অভিজাত শ্রেণীর লোক, স্বভাবতই এলাকার সার্বিক কল্যাণ ও জনস্বার্থের দিকটিও তাদেরকে দেখতে হতো। ফলে অনেক সময় রায়তের কাছ থেকে তারা যথাসময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায়ে সমর্থ না হলেও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার্থে বা সরকারের লাঞ্ছনার ভয়ে তারা 'Shroffs', 'Money-lender' প্রভৃতির কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়ে রাষ্ট্রীয় পাওনা পরিশোধ করতেন, এবং পরে

৪৪. Cartier: Governor of Bengal (1769-1772), Dr. Nani Gopal Chaudhuri, pp. 21.

সময় মতো তা রায়তের কাছ থেকে এককালীন বা কিস্তিতে উসুল করে নিতো। কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ থাকলো না। আমিলেরা তাদের নিজস্ব এলাকায় পছন্দসই লোকদের রায়তের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দিতো (এক ধরনের 'sub-contract'-এর মতো); এরা খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কোন রকম নিয়ম-নীতি, শ্রেণী-পাত্র, আর্থিক সঙ্গতি বা প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকের খেয়াল করতো না। ফলে এদের হাতে পড়ে রায়তের নাভিশ্বাস উঠার উপক্রম হয়েছিল। এর ওপর ছিল কোম্পানির 'গোমস্তা'দের অত্যাচার-অনাচাব।
এরা রায়তকে বাধ্য করতো তাদের উৎপাদিত শস্য কম মূল্যে তাদের কাছে বিক্রি করতে, যা পরে তারা অন্যত্র বা সেই অঞ্চলেরই অন্য কোন হাটে-বাজারে নিয়ে রায়তদেরই কাছে অপেক্ষাকৃত উচ্চ দামে বিক্রি করতো।[৪৫]

যা হোক বাংলা, বিহার ও ওড়িশার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনকে এমনি একটি অবস্থায় নিপতিত করে ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারিতে বন্ধু ও সহকর্মী হ্যারি ভেরেলস্টের (২৯শে জানুয়ারি, ১৭৬৭ থেকে ২৫শে ডিসেম্বর, ১৭৬৯) কাছে বাংলার গভর্নর, সিলেক্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট ও কোম্পানির প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব ভার অর্পণ করে নাটের গুরু ক্লাইভ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ব্রিটানিয়া জাহাজে চড়ে স্বদেশের পথে রওনা হয়েছিলেন।[৪৬] স্বভাবতই বোধগম্য যে একটা বেশ জটিল, সঙ্কটসঙ্কুল পরিস্থিতিতেই হ্যারি ভেরেলস্টকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানির কার্যভার গ্রহণ করতে হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ক্লাইভের প্রত্যাবর্তনের পর ভূমিরাজস্ব বিষয়ে একক ক্ষমতাধর[৪৭] সিলেক্ট কমিটি নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল।

হ্যারি ভেরেলস্ট	প্রেসিডেন্ট
জন কার্টিয়ার	সদস্য, ২য়
কর্নেল রিচার্ড স্মিথ	সদস্য, ৩য়
ফ্রান্সিস সাইক্স	সদস্য, ৪র্থ
রিচার্ড বেচার	সদস্য, ৫ম

ইতোমধ্যে (ক্লাইভ থাকতে থাকতেই) মুর্শিদাবাদের নবাবি মঞ্চেও কিছু পরিবর্তন এসেছিল। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল, মুর্শিদাবাদের মোতিঝিল প্রাসাদের প্রকাশ্য দরবারে নবাব নাজিমউদ্দৌলা বাহাদুর ও নবীন দিওয়ান ক্লাইভের উপস্থিতিতে 'পুণ্যাহ' উৎসবের কিয়ৎকাল

---

৪৫. Cartier: Governor of Bengal, pp. 22.

৪৬. Lord Clive, pp. 159.

৪৭. The Fifth Report-এর ভাষ্য থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে:
'It may be observed that the Select Committee, and not the Council, represent the Company's supreme authority in matters of revenue.' (pp. 467).

পরেই নবাব নাজিমউদ্দৌল্লা মৃত্যুবরণ করেন (৮ই মে)।[৪৮] পরে তাঁরই ভ্রাতা, ১৬ বছর বয়স্ক সাইফউদ্দৌলা নবাবি মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনিও বছর দু'য়েকের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারলেন না। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে কিছুদিন বসন্ত রোগে ভুগে তাঁর মৃত্যু হলে[৪৯] আরেক দফা মুর্শিদাবাদের নবাবি তখ্‌তে পরিবর্তন সূচিত হলো।

এবার নবাব হলেন মিরজাফর আলি খানেরই আরেক পুত্র মুবারকউদ্দৌলা। তবে এঁর বয়েস ছিল আরও কম, মাত্র বছর বারো। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালো যে, এই দু'টি মৃত্যু তথা ক্ষমতার মসনদের আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন কোম্পানির জন্য আশীর্বাদ বলেই বিবেচিত হয়েছিল। কেননা এক-একটা মৃত্যুর পরে তারা নবাবকে প্রদত্ত বাৎসরিক 'পেনশান' বা বৃত্তি কমিয়ে দিতো। নবাব নাজিমউদ্দৌলার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির বদৌলতে তারা তাঁকে বার্ষিক ৫৩,০০,০০০ 'সিক্কা' টাকা দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর ফলে পরবর্তী দু'টি চুক্তিব বলে নবাব সাইফউদ্দৌলার বার্ষিক বৃত্তি তারা ৪১,৮৬,১৩১-৯ 'সিক্কা' টাকায় (এর মধ্যে নবাবের ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস, চাকর-নফরদের বেতন ও অন্যান্য অবশ্যম্ভাবী খয়-খরচ বাবদ বরাদ্দ ছিল ১৭,৭৮,৮৫৪-১ টাকা এবং অবশিষ্ট ২৪,০৭,২৭৭-৮ টাকা সিপাহি, পাইক-পেয়াদা, বরকন্দাজদের জন্য ব্যয়) এবং নবাব মুবারকউদ্দৌলার ৩১,৮১,৯৯১ 'সিক্কা' টাকায় (তন্মধ্যে নবাবের ব্যক্তিগত ব্যয়বাবদ ১৫,৮১,৯৯১-৯ টাকা এবং নিজামতের জন্যে ১৬,০০,০০০ টাকা) সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল।[৫০] বস্তুত এ থেকেই প্রতীয়মান হবে কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ছিল নবাবের আর্থিক ক্ষমতা ক্রম-সঙ্কুচিত করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পুরোপুরি তাদের ওপর নির্ভরশীল ও প্রশাসনিক ব্যাপারে অকার্যকর করে তোলা, যাতে করে একদিন নবাব-নাজিমের পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাই নিঃশেষিত হয়ে যায়।

গভর্নর হ্যারি ভেরেলস্টের সময়ে বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় যে সামান্য রদবদল[৫১] হয়েছিল (এগুলির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ছিল অনেক) তা নিচে আলোচনা করা হলো।

---

৪৮ তাঁর অকাল মৃত্যু নিয়ে ক্লাইভ ও রেজা খানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। 'পুণ্যাহ' উৎসব শেষে ঐ দিনই প্রাসাদের 'সাদিকবাগে' যাবার পর এবং সেখানে ক্লাইভ ও রেজা খানের সঙ্গে পানাহারে কিছু সময় কাটিয়ে প্রাসাদে ফিরেই তিনি অসুস্থ বোধ করেন। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু অভিযুক্তদের (ক্লাইভ, রেজা খান প্রমুখ) বিরুদ্ধে লোকজনের সন্দেহ ঘনীভূত করেছিল। জনসাধারণের মধ্যে সংবাদ বা গুজব রটেছিল যে তারা তাঁকে খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছিল।

৪৯. A Statistical Account of Bengal: Murshidabad and Pabna, Vol IX., pp. 193.
ড. ননী গোপাল চৌধুরি এঁর মৃত্যুর তারিখ নির্ধারণ করেন, মার্চ, ১৭৭০। দেখুন, Cartier. Governor of Bengal, pp. 97.

৫০. Cartier: Governor of Bengal, pp. 96-97.

৫১. ব্যক্তিগতভাবে হ্যারি ভেরেলস্ট ছিলেন অনেকটা ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ; মানসিক দৃঢ়তা ও কোন বিষয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে মনোঃসংযোগের তাঁর যথেষ্ট অভাব ছিল। স্বভাবতই, 'He assumed for himself the role of a minor reformer, hoping that petty repairs would obviate the need for any structural alteration.' (The Agrarian System of Bengal, Vol. I., Dr. Anil Chandra Banerjee, pp. 111).

তার আগে এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে যে, ক্লাইভ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে ফোর্ট উইলিয়ামে কলকাতা কাউন্সিলে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করে গিয়েছিলেন, 'To appoint the Company's servants. to the offices of the collector, or indeed to do any act by an exertion of the English power, which can be equally done by the Nabob at our instance, would be throwing off the mask, would be declaring the Company subah of the provinces. Foreign nations would immediately take umbrage and complaints preferred to the British Court might have very embarrassing consequences."[৫২]
তাঁর এই দূরদর্শী সতর্ক বাণীকে সামনে রেখে সিলেক্ট কমিটির প্রাজ্ঞ সদস্যবর্গ তখন পর্যন্ত তিনটি প্রদেশের ভূমিরাজস্ব নিরূপণ ও আদায়ের কাজ প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করার বিরোধী ছিল। কিন্তু বলাবাহুল্য যে এ সময় 'নায়েব-ই দিওয়ান' রেজা খানের অধীনে আমিল ও কোম্পানির গোমস্তারা যেভাবে স্বেচ্ছাচারী উপায়ে ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায় করছিল, এবং এর ফলে আপামর রায়তসাধারণের ওপর যে অপরিসীম ও অকথ্য নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু হয়েছিল (তাঁতীদের ওপরে এর প্রকোপ ছিল আরও মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী), এবং তার চেয়েও বড় কথা, তাদের এই জঘন্য কীর্তিকলাপে বাংলা ও বিহারের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় স্মরণাতীতকালের মধ্যে যে বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষের অশনি সঙ্কেত শোনা যাচ্ছিল, তাতে করে কোম্পানির মুর্শিদাবাদ দরবারের রেসিডেন্টের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সব কিছু তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কেননা দরবারের 'রেসিডেন্ট'কে তখন কাশিমবাজারের 'চীফ'-এর দায়িত্বও নির্বাহ করতে হতো। যদিও স্বীকার্য যে, এই পদটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও 'লোভনীয়'[৫৩], কিন্তু এবার 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণ, এই দু'টি পদ-কে (রেসিডেন্ট ও চীফ) একাধিক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করতে মনস্থ করলেন।

৫২. Quoted from, The Maratha Supremacy, pp. 354.
তাঁর আগে কোম্পানির ইংল্যান্ডস্থ 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণও একই বক্তব্য পোষণ করেছিলেন। তাঁদের ১৭ই মে, ১৭৬৬ তারিখের পত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল: 'We conceive the office of the *Diwan* should be exercised only in superintending the collection and disposal of the revenues; which office, though vested in the Compnay, should officially be exercised by our Resident at the Durbar, under the control of the Governor and Select Committee, the only bounds of which control should extend to nothing beyond superintending the collection of the revenues and receiving the money from the Nawab's treasury to that of the *Dewannah* or the Company ..... This we conceive to be the whole office of the *Dewanny*. The administration of justice, the appointment to the offices or *Zemindaries*, in short, whatever comes under the denomination of civil administration we understand is to remain in the hands of the Nawab or his ministers.' (Quoted from, The Maratha Supremacy, pp. 354).

৫৩. The Fifth Report, pp. 465.

এ ব্যাপারে নভেম্বর ২০, ১৭৬৭ তারিখের পত্রে তাঁরা ঘোষণা করেন, 'Being convinced that the employments of Resident at the Durbar and Chief of Cassimbazar cannot from the importance and extent of the business of each department, be properly executed by one person, we, therefore, direct that they be from this time forward separated, and that some other member of Council be appointed to the said chiefship.'[৫৪]
এ সময় এই উভয় পদে মিস্টার ফ্রান্সিস সাইক্স (সিলেক্ট কমিটির অন্যতম সদস্য) ছিলেন অধিষ্ঠিত। 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণের এই আদেশের পর তাকে এবার কাশিমবাজারের চীফ-এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।[৫৫] বলাবাহুল্য এটি ছিল ভেরেলস্টের সময়কার রাজস্বসম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। কারণ আমরা আগাগোড়া আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে এদেশে কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যই ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য করা, কিন্তু যেইমাত্র তারা মুর্শিদাবাদের মসনদের আশেপাশে থেকে এর রাজনীতির কলকাঠি নাড়াবার সুযোগ পেলো এবং দিওয়ানি লাভের পূর্ব পর্যন্ত (দিওয়ানি লাভের পরেও কিছুকাল) যেখানে এর কর্মচারী নির্বিশেষে সকলেরই এক পর্যায়ে একটি মাত্র অভীষ্টই সৃষ্টি হয়েছিল অর্থাৎ ছলে-বলে-কৌশলে ব্যক্তিগতভাবে পয়সা হাসিল ও আত্ম-সমৃদ্ধি, সেখানে মুর্শিদাবাদ দরবারের রেসিডেন্ট ও কাশিমবাজারের চীফ-এর ন্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, স্পর্শকাতর ও লোভনীয় পদাধিকারীকে সরিয়ে দেয়া নিঃসন্দেহে ছিল বেশ সাহসী একটি পদক্ষেপ।
দিওয়ানি অধিকারভুক্ত অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য কর নিরূপণ ও আদায়ের ব্যাপারে দরবারের রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বিশাল, এবং সত্যি বলতে নবাব নাজিমউদ্দৌলার মৃত্যুর পর থেকেই নানা বোধগম্য কারণে রেসিডেন্টের এই কর্তব্যের পরিধি বেড়েছিল[৫৬]। সুতরাং এ পর্যায়ে গভর্নর হ্যারি ভেরেলস্টের যুগীয় বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনের আলোচনার পাশাপাশি আমরা মুর্শিদাবাদের দরবারস্থ রেসিডেন্টগণের ভূমিকাও এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

কোম্পানির পক্ষ থেকে এ সময় নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল, মুর্শিদাবাদস্থ নবাবের দরবারে রায়ত বা অন্য যে কোন তরফ থেকে যে কোন ধরনেরই দরখাস্ত করা হোক না কেন, তা প্রথমে 'রেসিডেন্ট'-এর কাছে যাবে, সেখান থেকে 'চেক' হয়ে তা নবাবের কাছে নীত হবে।[৫৭]
এর পাশাপাশি 'রেসিডেন্ট'-কে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল তিনি তার অধীন লোকদের 'দস্তক' দিতে

৫৪. The Fifth Report, pp. 465.
৫৫. কাশিমবাজার কুঠি বা ফ্যাক্টরি-র 'চীফ'-এর দায়িত্ব-ভার লাভ করেছিলেন উইলিয়াম অ্যালডারসে (William Aldersay).
৫৬. ড. সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে বলেন, 'After the death of Najmuddaulah, the English Residents at Murshidabad took up in a more vigorous manner than before various measures for the administration of revenue in the Bengal *subah*.' (British Residents at the Darbar of Bengal Nawabs at Murshidabad, pp. 315).
৫৭. British Residents at the Darbar of Bengal Nawabs at Murshidabad, pp. 330-31.

পারবেন। কিন্তু সত্যি বলতে 'রেসিডেন্ট' ফ্রান্সিস সাইক্স এই দায়িত্বগুলি মোটামুটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেও এই সময় ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী বিশেষ করে আমিল, কানুনগো ও কোম্পানির গোমস্তাদের দুর্নীতি ও দৌরাত্ম্য এতো দুর্বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তার একার পক্ষে সব কিছু সঠিকভাবে দেখভাল ও নিয়ন্ত্রণ করা আদৌ সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি কর্মচারীদের কাছ থেকে দেশের প্রকৃত অবস্থা ও চালচিত্রের যথাযথ খবরাখবর পেতেন না। তাছাড়া অসৎ ও দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের মাধ্যমে তার কাছে যে সংবাদ পৌঁছুতো সেগুলিরও সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা তেমন ছিল না। ফলে এই সঙ্কটময় মুহূর্তে 'রেসিডেন্ট'-কে কাজ করতে হচ্ছিল অনেকটা তোপের মুখে থেকে। যে কোন সময় ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যাবার আশঙ্কা ছিল।

বস্তুত 'রেসিডেন্ট'-এর দায়িত্ব পালনের চাপ কমাতে এবং 'নায়েব-ই দিওয়ান'-এর কাজেকর্মে আরও গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে মাসিক ৭,০০০ টাকা বেতনে একজন সহকারি 'নায়েব-ই দিওয়ান' নিয়োগ করা হলো। তবে এতেও কাজের কাজ কিছুই হলো না -- 'Corruption and oppression, however, do not appear to have been affected by this arrangement (*costly measure*).'[৫৮]

অন্যদিকে প্রদেশগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থা দিন-কে দিন যেভাবে চরম অবনতির দিকে দ্রুত ধাবিত হয়ে চলেছিল তার ফলে কোম্পানির ইংল্যান্ডস্থ 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণ এই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটতে পারে, এবং এতে করে এদেশে বড় রকমের গণ-বিদ্রোহ দেখা দিয়ে আখেরে কোম্পানির সার্বিক স্বার্থই ক্ষুণ্ন হয় এই আশঙ্কায় ৩০শে জুন, ১৭৬৯ তারিখের পত্র মারফত এক বড় ধরনের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন। তাদের নতুন সিদ্ধান্তের মূল কথা ছিল, দিওয়ানি অধিকারভুক্ত অঞ্চলের ভূমিরাজস্বসহ যাবতীয় কর নিরূপণ ও আদায়, এককথায় রাজস্বসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা মূলত দু'টি কমিটি --'The Comptrolling Council of Revenue'র মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে: এর একটি থাকবে রাজধানী মুর্শিদাবাদে (বাংলার জন্য) ও অন্যটি পাটনায় (বিহার প্রদেশের জন্য)। কমিটি সদস্যবর্গের সাধারণ পরিচিতি হবে 'Comptroller for the management of the Duannee revenue' নামে।[৫৯]

এই কমিটিগুলির কাজের পরিধিও বেঁধে দেয়া হয়েছিল। ভূমিরাজস্ববিষয়ক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে গিয়ে প্রথমেই এদেরকে জানতে হবে প্রদেশের বিভিন্ন অংশে বা স্থানে সংবছর যে রাজস্ব সংগ্রহীত হয় তার প্রকৃত হাল-হকিকত; এই সঙ্গে --

১. চলতি সময়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে রায়তদের দেয় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ;
২. একইভাবে বিগত সময়ে (বছরগুলিতে) তাদের দেয়-এর পরিমাণ;
৩. চাষাবাদের বর্তমান পরিস্থিতি;
৪ প্রতিটি জেলা বা অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন ফসলের তালিকা;
৫. উপরিউক্ত অবস্থায় এর সামগ্রিক উন্নয়নের সম্ভাবনা।

এ ছাড়াও, 'They are next to inform themselves of the amount of the

---

৫৮. The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 115.
৫৯. The Fifth Report, pp 474.

charges of collection for some years past, in as particular a manner as possible; and ... then to judge how many of the aumils and other officers, among whom those immense sums have been divided, may be spared."[৬০]
'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলী আরও সতর্ক করে দিলেন, কলকাতা কাউন্সিল ও সিলেক্ট কমিটি এই কাজ করতে গিয়ে আমিল প্রমুখ কর্মচারীদের যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অন্যায়ের নিদর্শন পাবে, তার নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা যেন সংশ্লিষ্টদের কঠোর শাস্তি দানের পরিবর্তে ভবিষ্যত অপকর্ম ও দুর্নীতি বন্ধের দিকেই বেশি নজর দেন। অধিকন্তু বাংলার 'নায়েব-ই দিওয়ান' মুহম্মদ রেজা খান ও বিহারের 'নায়েব' সিতাব রায়-কে তাঁদের স্বপদে ও স্বমর্যাদায় বহাল রেখে তাঁদের সীল-স্বাক্ষরেই যেন 'কন্ট্রোলিং কাউন্সিল' পরোক্ষে ভূমিরাজস্ব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করে সে বিষয়ে খেয়াল রাখার নির্দেশনাও প্রদান করলেন। ফলত কোর্ট তাঁদের পরিকল্পনার দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য ৩-সদস্যবিশিষ্ট একটি 'কমিশন'ও নিয়োগ করে পাঠালো, যার সদস্যবর্গের নাম -- স্বনামখ্যাত হেনরি ভ্যান্সিটার্ট ও লিউক স্ক্রাফটন এবং ফ্রান্সিস ফোর্ড। উল্লেখ্য এদেরকে এমন ব্যাপক অধিক্ষেত্র দেয়া হলো যে, এঁরা যে ক্ষমতা নির্বাহ করবেন, সংশ্লিষ্টরা ধরে নেবেন যে তা 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীই প্রয়োগ করছেন। এ সম্পর্কে কোর্টের ভাষ্য ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক -- 'the Commissioners have a superintending and controlling power over the whole in like manner as if we the Court of Directors were ourselves present upon the spot; and they are to proceed from Presidency to Presidency to make the desired Orders and Regulations."[৬১]
'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের এই নির্দেশনার পরে হ্যারি ভেরেলস্ট তার গভর্নরকালীন মাঠ পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন। এই উদ্যোগ গ্রহণের পশ্চাতে অবশ্য তাকে ও সিলেক্ট কমিটিকে 'হস্তান্তরিত ভূখণ্ড' অঞ্চলে তাদের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালনের কিছু সফলতা প্রেরণা দেখিয়েছিল।[৬২] এছাড়া ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের জুনে গভর্নর ভেরেলস্ট যখন রাজধানী মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে ছিলেন, তখন পূর্ণিয়া জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত জর্জ (জেরার্ড) গুস্তাভস ডুকারেল-এর সফল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার কথা তৎকালীন 'রেসিডেন্ট' রিচার্ড বেচার-এর (ফ্রান্সিস সাইক্স ৪ঠা জানুয়ারি, ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে পদত্যাগ করেন) কাছ থেকে জানতে পেরে ভেরেলস্ট পরে সিলেক্ট কমিটির অন্যান্য সদস্যদের কাছে ইংরেজ কর্মচারীদের 'সুপারভাইজর' নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন (৮ই জুলাই)।
কমিটির বিজ্ঞ সদস্যরাও মনে করেছিলেন, দিওয়ানি অধিকারভুক্ত অঞ্চলের ভূমিরাজস্বের এই চরম অবনতিশীল পরিস্থিতির উত্তরণে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তাদের অর্থাৎ কোম্পানির অভিজ্ঞ ইংরেজ কর্মচারীদের সরাসরি অংশ গ্রহণ সম্ভবত ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে, যদি আগেই জানিয়েছি যে, 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণ তখনও এখানকার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার সঙ্গে

---

৬০. The Fifth Report, pp. 474.
৬১ Ibid., pp. 477.
৬২. The Judicial Administration of the East India Company in Bengal (1765-1782), pp. 31.

কোম্পানির নিজস্ব ইংরেজ কর্মচারীদের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করার পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনার পূর্বে এখানে এটিও জানিয়ে রাখা দরকার যে, ব্যাপক পরিসরে এই প্রথম এদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনাসহ মোটামুটি সার্বিক প্রশাসনের কাজ-কারবারের সঙ্গে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার স্বভূমের (ইংরেজ) কর্মচারীদেরকে জড়িয়ে ফেলেছিল। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদ টমাস ব্যাবিংটন মেকলে বলেন, 'The great events which had taken place in India had called into existence a new class of Englishmen, to whom their countrymen gave them the name of Nabobs. These persons had generally sprung from familise neither ancient nor opulent; they had generally been sent at an early age to the East; and they had there acquired large fortunes, which they had brought back to their native land.'[৬৩]

উল্লেখ্য তাঁর এ চমৎকার উক্তিটিকে মনে রেখে যদি আমরা পরবর্তী আলোচনায় ব্রতী হই তবে সুপারভাইজরদের ভূমিকা ও তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া বুঝা আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

হ্যারি ভেরেলস্টের কর্মকালের শেষ দিকে (এর পরে তিনি আর মাস চারেকের মতো গভর্নর ছিলেন) ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট (১৪ই সেপ্টেম্বর?) সিলেক্ট কমিটি তাঁর প্রস্তাব বা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, এবং প্রাথমিকভাবে বাংলা ও বিহারে নিম্নোক্ত কর্মচারীদের তাদের নামের পাশে বর্ণিত জেলা/অঞ্চলগুলিতে 'সুপারভাইজর' বা 'সুপরাভাইজর' ('Supravisor') নিয়োগ দিয়ে পাঠিয়েছিল। তবে 'কমিটি', তৎকালীন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জেলা যেমন চুনাখালি, রোকনপুর, ফতেহসিংহ, লস্করপুর, জাহাঙ্গিরপুরে কোন সুপারভাইজর নিয়োগ না করে এগুলি সরাসরি 'রেসিডেন্ট'-এর নিয়ন্ত্রণে রেখে দিতে মনস্থ করেছিল।

বাংলা (প্রশাসনের মূল কেন্দ্রবিন্দু মুর্শিদাবাদ)	
জেলা বা অঞ্চল	সুপারভাইজর
ঢাকা ও সিলেট	টমাস কেলসাল[৬৪]
দিনাজপুর	জর্জ ভ্যান্সিটার্ট[৬৫]
রাজশাহি ও নাটোর	চার্লস উইলিয়াম বাউটন রাউস[৬৬]
যশোহর	রবার্ট উইলমট[৬৭]
রংপুর	জন গ্রুজ[৬৮]
ত্রিপুরা (কুমিল্লা)	ওয়াল্টার উইলকিন্‌স[৬৯]
বীরভূম, বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট	চার্লস স্টুয়ার্ট[৭০]
হুগলি	উইলিয়াম লুসিংটন[৭১]
নদীয়া	জ্যাকব রাইডার[৭২]
রাজমহল ও ভাগলপুর	উইলিয়াম হারউড[৭৩]
পূর্ণিয়া	জর্জ (জেরার্ড) গুস্তাভস ডুকারেল[৭৪]

৬৩. Lord Clive, in Critical and Historical Essays, pp. 537.

৬৪. ফোর্ট উইলিয়ামে সিলেক্ট কমিটির ইনি ছিলেন একজন সদস্য, ফলে স্বভাবত ছিলেন যথেষ্ট

এ পর্যায়ে বিহারের সুপারভাইজরদের নামোল্লেখের আগে এখানে জানিয়ে রাখা যেতে পারে যে, এরা বাংলায় নিযুক্ত সুপারভাইজরদের বেশ কিছু পরে নিযুক্তি লাভ করেছিলেন।

সিলেক্ট কমিটি ৯ই জুন, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে এদের নামের তালিকা (প্রস্তাব) প্রেরণের পরে কাউন্সিল তা ২রা আগস্ট, ১৭৭০ সালে অনুমোদন করে। তবে কাউন্সিল নিজস্ব উদ্যোগে এক্ষেত্রে পঞ্চম একজন সুপারভাইজরের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ততোদিনে অবশ্য গভর্নর হিশেবে জন কার্টিয়ার-এর কার্যকাল শুরু হয়েছিল।

প্রভাবশালী। একজন 'চীফ' হিশেবে 'রেসিডেন্ট' রিচার্ড বেচার-এর প্রায় সমকক্ষ ছিল তার ক্ষমতা। যা হোক, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১ সালে ইনি জে. হ্যারিস-এর কাছে দায়িত্ব ভার অর্পণ করেন; হ্যারিস ২৮শে মার্চ, ১৭৭২ পর্যন্ত সুপারভাইজর হিশেবে দায়িত্ব পালন শেষে একই বছরের মে মাসে প্রথম কালেক্টর ডব্লিউ. ল্যামবার্ট-এর কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেছিলেন।

৬৫. ইনি ছিলেন বাংলাব সাবেক গভর্নর হেনরি ভ্যান্সিটার্ট-এর ভাই। এর পরে ১৭৭০ সালের অক্টোবরে এইচ. কট্রেল হন সুপারভাইজর হয়েছিলেন। ১৭৭২ সালের মে মাসে উইলিয়াম ম্যারিয়ট কালেক্টর নিযুক্ত হওয়ার আগে ১৭৭১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত কট্রেল কার্য নির্বাহ করেছিলেন।

৬৬. ১৭৭২ সালের মে মাসে কালেক্টর হওয়ার আগ পর্যন্ত ইনি সুপারভাইজর পদে বহাল ছিলেন।

৬৭. ১৭৭০ সনের নভেম্বরে এর মৃত্যু হয়। এর স্থলে তদীয় অধস্তন সহকর্মী জে. শেক্সপীয়ার কিছুকাল দায়িত্ব নির্বাহ করে পরে উইলিয়াম রুক-এর কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ইনি এই পদে ১৭৭২ এর মে মাস অবধি ছিলেন।

৬৮. ১৭৭১ সালের মে মাসে আকস্মিক মৃত্যু অবধি ইনি এই পদে ছিলেন। অতঃপর চার্লস পার্লিং হন সুপারভাইজর এবং পরে ইনিই কালেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

৬৯. ইনি ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কালেক্টর নিযুক্তির পূর্ববর্তী মাস তথা ১৭৭২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সুপারভাইজর ছিলেন। পরে একই মাসের ২৮ তারিখে সুপ্রিম বোর্ডের আদেশে ডব্লিউ. বার্টন সুপারভাইজর হলেও পরের মাসেই তিনি (বার্টন) কালেক্টর পদে যোগদান করেন।

৭০. পরবর্তী সুপারভাইজর আলেকজান্ডার হিগিনসন আগস্ট, ১৭৭০ সালে এর কাছ থেকে দায়িত্ব নেন এবং ১৪ই মে, ১৭৭২ পর্যন্ত সুপারভাইজর হিশেবে কাজ করেন। অতঃপর একই মাসে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জন সামনার হন কালেক্টর।

৭১. সুপারভাইজর হিশেবে এর কার্যকাল ১৭৭২ সালের মে পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। পরে ইনিই হন হুগলি জেলার প্রথম কালেক্টর।

৭২. একইভাবে ইনিও সুপারভাইজর পদের মেয়াদ শেষে নদীয়া জেলার প্রথম কালেক্টর হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

৭৩. ইনিও সুপারভাইজর পদের মেয়াদ শেষে রাজমহল-ভাগলপুরের প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

৭৪. বস্তুত পূর্ণিয়ায় এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আপাত সাফল্য ভেরেলস্ট প্রমুখকে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের কায়-কারবারে সরাসরি নিয়ন্তা-র ভূমিকায় ইংরেজ সুপারভাইজর নিয়োগ দানে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। ফলে পূর্ণিয়ায় ডুকারেল একটানা সুপারভাইজরের দায়িত্ব পালন শেষে পরে এখানকারই প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন।

বিহার (প্রশাসনের মূল কেন্দ্রবিন্দু পাটনা[৭৫])		
জেলা	সদর দপ্তর	সুপারভাইজর
সারণ ও চম্পারণ	চাপরা	এডওয়ার্ড গোল্ডিং
শাহাবাদ	আরা	চার্লস লয়েড
তিরহুত বা ত্রিহুত	দ্বারভাঙ্গা	জেমস আইংলিশ কেইলি
রোহ্টাস	সাসারাম	হ্যাবি পাল্মার
মুঙ্গের	মুঙ্গের	ন্যাথানিয়েল বেইটম্যান

জেলায় জেলায় সুপারভাইজর নিয়োগের সময়ই ভেরেলস্ট এদের দায়িত্ব-কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, যা নিম্নরূপ (ভূমিরাজস্বের সঙ্গে সম্পর্কিতগুলিই উল্লেখ করা হলো):-

১. যে জেলায় সুপারভাইজর নিযুক্ত হবেন সেখানকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহার্থ (মোটামুটি নবাব শুজাউদ্দিনের সময় পর্যন্ত হলেই যথেষ্ট) যাতে বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে বিগত ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র প্রতিফলিত হবে, এবং সেই সঙ্গে জেলার সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের সংযোগ ও তাদের এ যাবৎ ভোগকৃত সুযোগ-সুবিধা, ও তৎপবিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে এর পরিবর্তনের সূচক;

২. সুপারভাইজর সরেজমিনে গিয়ে প্রকৃত কাগজ-পত্র যাচাই-বাছাই ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে জেলার ভূমিরূপের অবস্থা, উৎপন্ন ফসলের বিবরণ ও ভূমির উৎপাদনের ক্ষমতা ইত্যাদির নিরিখে ও প্রচলিত 'হস্ত-বুদ'-এর সমন্বয়ে সম্ভাব্য ভূমিরাজস্বের বিস্তৃত পরিসংখ্যান তৈরি করবেন;

৩. নবাব সরকার, জমিদার, আমিল প্রমুখ রায়তদের কাছ থেকে যে পরিমাণে ও পদ্ধতিতে ভূমিরাজস্ব ও আবওয়াব আদায় করে, সুপারভাইজর সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হবেন এবং জ্ঞাত হবেন সেখানকার বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে;

৪. ভূমিরাজস্বের কাজ-কারবার তদারকির পাশাপাশি জেলার বিচার প্রশাসনের বিশেষত সম্পত্তিসংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি ও জরিমানা আরোপের ক্ষমতা সুপারভাইজরকে দেয়া হলেও মূলত তাকে এ-ও জানিয়ে দেয়া হয় যে, 'In revenue matters again, the Supravisors were, not merely to report but, to take immediate action whenever their inquiries resulted in a detection of frauds.'[৭৬]

বাহ্যত যদিও মূলত ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ অর্থাৎ ভূমিরাজস্ব আয় বাড়ানো ও তা আদায়ের কাজ নিয়মিত ও নির্বিঘ্ন করাই ছিল জেলায় জেলায় ইংরেজ সুপারভাইজর নিয়োগের মৌল প্রেরণা, তথাপি এর মাধ্যমে 'আমিলদার, জমিদার ও তালুকদারদের গোপন, দুর্নীতিমূলক ও বেআইনি কাজ কর্ম বন্ধ করে রায়তদের রক্ষা করা'[৭৭]-ও

৭৫. মুর্শিদাবাদ 'রেসিডেন্ট'-এর ন্যায় পাটনা ছিল আজিমাবাদ 'চীফ'-এর নিয়ন্ত্রণাধীন।
৭৬. The Fifth Report, pp. 487.
৭৭. বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), ড. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২২।

যে এর সঙ্গে কিছুটা প্রচ্ছন্ন ছিল না তা বলা যাবে না, কেননা ততোদিনে রায়তদের অবস্থা প্রকৃতই রসাতলে চলে গিয়েছিল। তাই বলা যায় এই পদক্ষেপ ছিল এ থেকে রায়তদের টেনে তুলবার 'আইওয়াশ' জাতীয় একটা প্রচেষ্টা মাত্র। তবে সেই লক্ষ্য কতোটুকু পূরণ হয়েছিল সেটাই মূলত দেখার বিষয়।

সুপারভাইজর নিয়োগের আগে গভর্নর ও তাঁর 'কমিটি'র সদস্যরা ধরেই নিয়েছিলেন, যেহেতু জাতিগতভাবে এরা তাদের স্বদেশীয়, শ্বেত চামড়ার অধিকারী এবং কোম্পানির যারপরনাই বশংবদ, সেহেতু সুপারভাইজররা ব্যক্তিগতভাবেও হবেন প্রত্যেকে সৎ, পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান। এদের নিয়োগে এবং এদের তীক্ষ্ণ নজরদারির ফলে আর যাই হোক, অন্তত অসৎ ও দুর্নীতিবাজ আমিল ও কোম্পানির 'মুৎসুদ্দি', গোমস্তাদের দৌরাত্ম্য নির্মূল হবে। ঠিক অনুরূপভাবে রায়তকুলের ওপর থেকে হ্রাস পাবে অত্যাচার-নিপীড়নের মাত্রা।

'কমিটি', সুপারভাইজরদেরকে প্রশাসনিক কাজে-কর্মে অধিক নিবেদিত ও দুর্নীতি মুক্ত রাখার জন্যে প্রথমত এদের বেতন-ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন মাসিক ১,০০০ টাকা। তখনকার প্রেক্ষাপটে এই পরিমাণ বেতন-ভাতা অত্যন্ত উঁচুই ছিল বলতে হবে। ফলে এদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় পরিচালনা থেকে নিবৃত্তির আদেশ দেয়া হয়েছিল। এক স্থানে বেশিদিন থেকে স্থানীয় প্রভাবশালী ও সুযোগসন্ধানী লোকদের পাল্লায় পড়ে এরা যাতে করে দুর্নীতির গড্ডালিকা প্রবাহে গা এলিয়ে দিতে না পারে সে জন্যও স্বাভাবিকভাবে এদেরকে প্রতি ২-বছর অন্তর অন্তর বদলির ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

কিন্তু সত্যি বলতে তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক অধঃপতনের সূচক এতো গভীরে অনুপ্রোবিষ্ট হয়েছিল যে, কর্তৃপক্ষের এই পতন রোধমূলক প্রতি-ব্যবস্থা কোন কাজেই আসেনি বা কাজ করেনি। উইলিয়াম উইলসন হান্টার বলেন, 'In short, the supervisors were expected to do more than they could possibly accomplish, and the result was that they did less than they might have done.'[৭৮]

যে সকল কারণে সুপারভাইজরবা তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অকৃতকার্য হয়েছিলেন, এবং বাংলার দৈন্য আরও মন্দীভূত ও সংক্রামিত করেছিলেন, মোটা দাগে সেগুলি এ রকম:-

এক, বলাবাহুল্য এদেরকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার (মে, ১৭৭২) করার পূর্বেই বাংলার স্মরণকালের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক লোকক্ষয়কারী 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১৭৬৯-৭০) ছোবল হেনেছিল এ অঞ্চলে। ফলত যে দুর্গতির বীজ ক্রমান্বয়ে রোপিত হয়েছিল, এবং আপাদমস্তক প্রশাসনিক ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ছাড়া যা থেকে উত্তরণ ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব, সে জন্য শুধু একজন ইংরেজ সুপারভাইজরকে প্রশাসনের শীর্ষে বসিয়ে তা দূরীভূত করা ছিল এক অলীক চিন্তা। ব্যক্তিগতভাবে একজন সুপারভাইজর যতো সৎ, বিবেকবান ও কর্ম-নিবেদিত-প্রাণই হোন না কেন (অধিকাংশই তা ছিলেন না), তার একার পক্ষে এই পরিস্থিতিতে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। অধিকন্তু সত্যি বলতে মন্বন্তরের আগে-পরের যে চরম অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল, সেখানে কাজ করাই ছিল প্রতিনিয়ত এক মানসিক নিপীড়নের মধ্যে কালাতিপাত করার শামিল (প্রকৃত সৎ প্রশাসকদের জন্য তা ছিল আরও মর্মান্তিক);

৭৮ The Annals of Rural Bengal. W. W. Hunter. pp. 264.

দুই. সুপারভাইজরদের কাজের যে দীর্ঘ ফিরিস্তির উল্লেখ আগে করেছি (যদিও শুধুই ভূমিরাজস্ববিষয়ক) তা থেকে প্রতীয়মান হবে নতুন প্রশাসকদের একার জন্য সেই জটিল কর্মযজ্ঞ অর্থাৎ ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়কারী, বিচারক, ইতিহাস ও তথ্যপঞ্জি সংগ্রাহক ও লিপিবদ্ধকারী, মুখ্য-বণিক এবং সর্বোপরি আমিল-মুৎসুদ্দি-গোমস্তা প্রভৃতির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপক -- এতো কিছু সুষ্ঠ ও সুচারুভাবে পালন করা নিঃসন্দেহে একেবারে কঠিন না হলেও তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সম্ভবপর ছিল না আদৌ। সত্যি বলতে নিয়োজিত সুপারভাইজরগণ তা পারেনওনি;

তিন. এর চেয়েও বড় কথা হলো, যৌথভাবে বাংলা ও বিহারের মতো এতো বিশাল ভূখণ্ডে (কলকাতা ও ২৪-পরগণা জমিদারি ও চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান অঞ্চল ব্যতীত) মাত্র ১৬ জন সুপারভাইজর নিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র ও বিশালতা (যেমন ঢাকা জেলার কথা বলা যায়। এটি তখন আকারে বর্তমান ঢাকা বিভাগের চেয়েও বড় ছিল। তথাপি এর সঙ্গে সিলেট জেলাও যুক্ত হয়েছিল। ঢাকাস্থ কোম্পানির বাণিজ্য-কুঠির দায়িত্বও ছিল এখানকার সুপারভাইজরের ওপর) বিবেচনায় এই সংখ্যা একদিকে যেমন ছিল খুবই অপ্রতুল ও নগণ্য, তেমনি অন্যদিকে যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল তাদের সিংহ ভাগই ছিলেন 'কোম্পানি জুনিয়র কর্মচারী, অনভিজ্ঞ এবং বয়েসে তরুণ'। এদের কাজের গড় অভিজ্ঞতা ছিল ৫ থেকে ১০ বছর (এমন কি কারও কারও ৩/৪ বছরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা মাত্র ছিল), যে কারণে পরবর্তীকালে ওয়ারেন হেস্টিংস এদেরকে হাস্যোচ্ছলে নিতান্ত 'বালক' বলেও অভিহিত করেছিলেন।[৭৯] পরন্তু এতো বড় একটি দায়িত্ব পালনের জন্য তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণও দেয়া হয়নি -- 'the Supervisors, ... lacked in sufficient special training for the work entrusted to them.'

চার. এক বছর পরে (১লা এপ্রিল, ১৭৭১) সুপারভাইজরদের মাসিক বেতন ১,০০০ থেকে কমিয়ে মাত্র ১৫০ (বাৎসরিক ১,৮০০) টাকা করা হয়েছিল। এদেশে অবস্থিত বিদেশিদের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও পরিবেশ বিবেচনায় এটি অবশ্যই কম ছিল। এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল অচিরেই। সুপারভাইজররা আবার তাদের সাবেক বেআইনি পেশা অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কোম্পানিরও এ বিষয়ে সায় ছিল। যা হোক এ কাজে এদের সহযোগী ছিল দেশি বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দি-গোমস্তারা। বলাবাহুল্য যাদের অপকর্ম নিরোধের জন্য এদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল, এখন তারাই হলো তাদের মুখ্য সহকর্মী। ফলে অবস্থা যা হওয়ার তাই-ই হলো। ড. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায়, 'সুপারভাইজররা নামেমাত্র প্রভু হলেন আর আসল প্রভু হলেন তাঁদের গোমস্তা ও বেনিয়ানরা (lords of supervisorships)। সুপারভাইজরদের নানারকম দুর্নীতি, অপকর্ম ও ব্যর্থতার জন্যে এঁরা অনেকখানি দায়ী।'[৮০]

পাঁচ. সুপারভাইজরদের কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল স্থানীয় আমিল, জমিদার-তালুকদার, ইজারাদার, কানুনগো, চৌধুরি প্রভৃতির কাছ থেকে তাদের দপ্তরে বা চৌহদ্দিতে রক্ষিত পুরোনো কাগজপত্র, দলিল-খতিয়ান ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভূমিরাজস্বের পূর্বাপর একটা তুলনামূলক পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা। এই কাজ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্টদের এ যাবৎ উদ্দেশ্যমূলকভাবে লুক্কায়িত অনেক প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসছিল। ফলে এতে করে আমিল,

---

৭৯. দেখুন, বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ২৩।
৮০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩।

জমিদার প্রভৃতি শঙ্কিত হচ্ছিলেন যে, সুপারভাইজরদের এই আনুসন্ধানিক তৎপরতা তাদের ভবিষ্যত ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই কারণে এরা সুপারভাইজরদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান পারতপক্ষে বন্ধ বা কমিয়ে দিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে এটিও ছিল সুপারভাইজরদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

ছয়. সুপারভাইজরদের কাজকর্ম যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি-না, তা দেখাশুনা ও তদারকির ভার ছিল এদের অব্যবহিত উর্ধতন কর্তৃপক্ষ হিশেবে মুর্শিদাবাদের 'রেসিডেন্ট' ও পাটনার 'চীফ'-এর ওপর। কিন্তু এরা নিজেরাই ছিলেন মুর্শিদাবাদ ও পাটনার নিকটবর্তী কয়েকটি জেলা বা জেলার অংশবিশেষ ও তালুকের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে। সেগুলির দেখভাল ও তাদের নিজস্ব দাপ্তরিক কাজকর্ম সমাপনান্তে 'সুপারভাইজর'দের কর্মকাণ্ড তদারকি ও খবরদারি নিষ্ঠার সঙ্গে করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। আর এই অপারগতা তাই আখেরে সুপারভাইজরদের কর্তব্যে ঢিলেমি ও সামগ্রিক ব্যবস্থার অধোঃগতির কারণ হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

উপর্যুক্ত কারণগুলি ছাড়াও গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো এ সময় কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ তথা কাউন্সিল ও সিলেক্ট কমিটির মধ্যে একটি বিষয়ে মতান্তর ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টির ফলে সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সুপারভাইজরদের ওপর তদারকি অনেকটা শিথিল করে ফেলেছিল। ফলে সুপারভাইজররা হয়ে পড়েছিল লাগামহীন উদ্দাম তরুণ অশ্বের ন্যায়, যা খুশি তাই করলেও তা প্রতিরোধের কেউ ছিল না।

তবে দিওয়ানি অধিকারভুক্ত জেলায় জেলায় ইংরেজ সুপারভাইজর নিয়োগের এই প্রাথমিক উদ্যোগ নানা বোধগম্য কারণে ব্যর্থ হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা কোম্পানির ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ফলপ্রসূ বিবেচিত হয়েছিল, এ কথা স্বীকার করতে হবে।

প্রথমত কলকাতা ও ২৪-পরগণা জমিদারি ও 'হস্তান্তরিত তিনটি জেলা বা ভূখণ্ড'র বাইরে এই প্রথম কোম্পানি, এদেশের এক ব্যাপক এলাকায় ভূমিরাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গ্রহণে তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বদেশি ইংরেজ কর্মচারী নিয়োজিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এরা প্রত্যাশিত কাজেকর্মে ব্যর্থ হলেও এদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কোম্পানির ভবিষ্যত নীতি ও কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে যথেষ্ট সহায়ক গণ্য হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত দিওয়ানি অঞ্চলে তখন পর্যন্ত মূলত একসনা ইজারা বা বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু সুপারভাইজরদের সুপারিশ থেকে কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারেন, এটি বাৎসরিক না হয়ে দীর্ঘমেয়াদি হলে তা কোম্পানির জন্যে লাভজনক হবে।

তৃতীয়ত এদেশে বাণিজ্য করতে এসে এক পর্যায়ে স্থানীয় ক্ষমতাসীনদের দুর্বলতার সুযোগে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের যে, যেখানে, যেভাবে পেরেছিল, ব্যক্তিগত আখের তারা ঠিকই গুছিয়ে নিয়েছিল ও নিচ্ছিল। এদেশে বিত্ত-বৈভব সৃজনের পাশাপাশি স্বদেশেও এদের ঐশ্বর্য ও প্রভাব বাড়ছিল। এখানে অর্জিত ধনৈশ্বর্যের কারণে স্বদেশে এদের পরিচিতি হয়ে গিয়েছিল নতুন 'নবাব'রূপে। এই খেতাব এদের স্বদেশবাসী ব্যঙ্গার্থেও দিতে পারে, আবার সদর্থেও। কিন্তু সেটা যেভাবেই তারা দি'ক না কেন, কোম্পানির শীর্ষস্থানীয় মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চাভিলাষীদের সমকাতারে, হ্যারি ভেরেলস্টের তথাকথিত এই সুপারভাইজরদের নিয়োগ যে সেই মুষ্টিমেয়দের সংখ্যাধিক্যই কেবল ঘটিয়েছিল, এবং স্বদেশে নতুন অভিজাতদের পরিমণ্ডলে আরও কিছু সংযোজন করেছিল, এ কথা না বললেও চলে।

মূলত বাংলার আপামর মানুষের রক্ত-মাংস, মজ্জা-স্বেদ চুষে, ছিবড়ে এই নতুন 'নবাব'দের উত্থান সম্ভব হয়েছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক তাই যথার্থই বলেন, 'The Nabobs soon became a most unpopular class of men. Some of them had in the East displayed eminent talents, and rendered great services to the state; but at home their talents were not shown to advantage, and their services were little known. That they had sprung from obscurity, that they had acquired great wealth, that they exhibited it insolently, that they spent it extravagantly, that they raised the price of everything in their neighbourhood, from fresh eggs to rotten boroughs, that their liveries outshone those of dukes, that their coaches were finer than that of the Lord Mayor, that the examples of their large and ill-governed households corrupted half the servants in the country, that some of them, with all their magnificence, could not catch the tone of good society, but, in spite of the stud and the crowd of menials, of the plate and the Dresden china, of the vension and the Burgundy, were still low men; these were things which excited, both in the class from which they had sprung and in the class into which they attempted to force themselves, the bitter aversion which is the effect of mingled envy and contempt."[৮১]
ঐতিহাসিকের এ মন্তব্য দীর্ঘ হলেও সর্বৈব সত্য এই কারণে যে, মহাকলঙ্কিত পলাশির দুরাচারী কুশীলব ও তাদের উত্তরসূরী সুপারভাইজররূপী 'savage.. Nabob'রা এদেশে এসেই ছিল, 'with an immense fortune, a tawny complexion, a bad liver, and a worse heart."[৮২]

১৭৬৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর গভর্নর হ্যারি ভেরেলস্ট ব্যক্তিগত কারণে আকস্মিকভাবে পদত্যাগ করেন; সম্ভবত বাংলা ও বিহারের অর্থনৈতিক দৈন্যদশার অভাবনীয় পতনশীল অবস্থা ও দুর্ভিক্ষের আগাম পদধ্বনি তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। তাকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না স্বপদে বহাল থাকতে। ফলে তার ইস্তফা পত্র গৃহীত হলে একই মাসে বাংলার নতুন গভর্নর পদে বরিত হলেন আরেক কোমল হৃদয় মানুষ[৮৩] জন কার্টিয়ার (কর্মকাল

৮১. Macaulay's Lord Clive in Critical and Historical Essays, pp 537-38.

৮২. Ibid., pp. 539.

৮৩. এর সম্বন্ধে সমকালীন একজন বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিকের মন্তব্য এখানে স্মর্তব্য। কর্নেল থমাস ডীন পিয়ার্স, জন কার্টিয়ার-কে 'a man of good character, and amiable in the extreme;' বলে উল্লেখ করলেও একই সঙ্গে তিনি এটিও উল্লেখ করতে ভুল করেননি যে, 'there never was a governor less capable, less active, less resolute.' (Memoirs of Colonel T. D. Pearse, quoted from, The Fifth Report, pp. 503).

২৬শে ডিসেম্বর, ১৭৬৯ থেকে ১৩ই এপ্রিল, ১৭৭২)। সিলেক্ট কমিটিতেও এই সময় কিছু রদবদল হয়েছিল। নতুন কমিটিতে ছিলেন --

জন কার্টিয়ার	প্রেসিডেন্ট
রিচার্ড বেচার	সদস্য
ক্লদ রাসেল	”
চার্লস ফ্লয়ার	”
আলেকজান্ডার	

মোটামুটি বাংলায় সুপারভাইজর নিয়োগের কাজ পূর্ববর্তী গভর্নর ভেরেলস্টের সময়ে সম্পন্ন হলেও বিহারে এদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল তার পদত্যাগের পরে; তবে উভয় স্থানেই সুপারভাইজররা বাস্তবে ক্ষমতা নির্বাহ করতে শুরু করেছিলেন জন কার্টিয়ার-এর সময়ে, বা আরও নিশ্চিত করে বললে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ থেকে।"[৮৪]

'রেসিডেন্ট' রিচার্ড বেচার-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল নবনিযুক্ত সুপারভাইজরদের ওপর তদারকি করার। বেচার বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় এবং 'নায়েব-ই দিওয়ান' রেজা খানের যুক্তিসঙ্গত পরামর্শে এদেরকে সেই মুহূর্তে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী ও স্বার্থান্বেষী বনেদি গোষ্ঠী (আমিল-ইজারাদার, জমিদার-তালুকদার, মুৎসুদ্দি-গোমস্তা প্রভৃতি)-র ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিপক্ষে ছিলেন এই অজুহাতে যে, তা বাংলার ঐ পতনোন্মুখ অর্থনীতির আরও অবনতি ঘটাবে। কারণ বিদ্যমান অবস্থায় রাজস্ব বিভাগে যুগ যুগ ধরে কাজ করে আসা এই সব কায়েমী চক্র মাথার ওপর ইংরেজ প্রভুর এই হঠাৎ ছড়ি ঘুরানো তাৎক্ষণিকভাবে মেনে না-ও নিতে পারে; এর ফলে তারা অলক্ষ্যে হলেও অসহযোগিতা করবে এটিই ছিল তার ধারণা। অধিকন্তু এই সময় বাংলা-বিহারব্যাপী ফসলের অফলন, ও তজ্জাত ভূমিরাজস্ব আদায়-হারের ক্রম-নিম্নমুখিনতা ও অকুলান, চলতি বছরে সুপারভাইজরদের ভূমিরাজস্ব আদায়ের কাজটিকেই দুরূহ করে তুলবে। ড. নন্দলাল চ্যাটার্জি বলেন, 'Both Becher and Muhammad Reza Khan, however, counselled delay in the execution of the plan on the ground that immediate appointment of supervisors would prove detrimental to the current year's collections. Becher pointed out that the arrival of the supervisors 'in the height of collections' would create a divided power, and provide the artful people with a good opportunity of evading payment of the revenues by preferring numberless complaints, the justless or impropriety of which the inexperienced supervisors would be unable to judge."[৮৫]

রিচার্ড বেচার, সুপারভাইজরদেরকে মুর্শিদাবাদের দিওয়ানি দপ্তরে রক্ষিত নথিপত্র ও খতিয়ানের ভিত্তিতে ন্যূনতম প্রাথমিক একটা প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে নতুন কর্মস্থলে প্রেরণের জন্যও

৮৪. The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 126.
৮৫. A Comprehensive History of India, Vol. Nine, pp. 704.

কলকাতায় সিলেক্ট কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।"[৮৬]

প্রধানত বেচার-এর এই পরামর্শেই এবং নিযুক্ত সুপারভাইজরদের অনভিজ্ঞতা ও সরকারি কোষাগারের অর্থ-সংকটের কথা বিবেচনা করে প্রাথমিক পর্যায়ে ৪/৫টি জেলায় সুপারভাইজরদের সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ করতে পাঠানো হয়েছিল।[৮৭] পরে মুর্শিদাবাদে 'কন্ট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু' গঠিত হলে, এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে অবশিষ্ট ১১ জেলায়ও সুপারভাইজরদের দায়িত্ব নিতে বলা হলো (অক্টোবর, ১৭৭০)।

এক্ষণে পূর্বোল্লিখিত ১৬টি জেলায় সুপারভাইজরদেব দায়িত্ব গ্রহণের ফলে এখানে কর্মরত নবাবি কর্মচারী যেমন আমিল প্রমুখকে প্রত্যাহার করা হলো। তবে হুগলি ও অন্য কয়েকটি জেলায় যেখানে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলির কুঠির অস্তিত্ব ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার তখনও ছিল, কৌশলগত কারণেই অর্থাৎ দৃশ্যত নবাবি প্রশাসনের কায়-কারবার তখনও অব্যাহত আছে প্রমাণার্থ এগুলি থেকে আমিলদের প্রত্যাহার আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছিল।[৮৮]

সুপারভাইজরদের নিয়োগের সময়ই অধিক্ষেত্র জেলাগুলি থেকে তাদেরকে কী পরিমাণ ভূমিরাজস্ব আদায় করতে হবে তা বলে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তী আলোচনার সুবিধার্থে এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। বলাবাহুল্য দুর্ভিক্ষের আসন্ন পদধ্বনি যখন তীব্রভাবে শোনা যাচ্ছে তখন এই নিরিখ যে ক্ষমতাসীনদের কতো লোলুপ ও নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির পরিচায়ক তা যথাসময়ে আলোচনাকালে দেখানোর চেষ্টা করা হবে।

জেলার নাম	নির্দিষ্টকৃত ভূমিরাজস্ব (টাকায়)
ঢাকা ও সিলেট	২৪,১২,৫১১-৪-১০-২
দিনাজপুর (জাহাঙ্গিরপুরসহ)	২০,৩৮,৯০০-১৩-১৫-২
রাজশাহি (গঙ্গাব পূর্বতীর)	২০,৩৮,৯০০-১৩-১৫-২
রংপুর (ইদ্রাকপুর, রাঙ্গামাটি, বাহারবন্দ প্রভৃতিসহ)	৯,২৩,০৫২-৫-২-৩
যশোহর	১,৩৩,০০০
রাজমহল	৩,৭৪,০২৯-০-৯-৩
বিষ্ণুপুর, বীরভূম ও পঞ্চকোট	১০,৪৫,৫০১-১১
হুগলি	১০,২৯,৪৫১-৯-১৮-১

উল্লেখ করা দরকার যে, জন কার্টিয়ার-এর সময়ে ভূমিরাজস্ব বিষয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক কাজ করা হয়েছিল। অবশ্য এ জন্য 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণের আগেই নির্দেশ ছিল। তবে সেই নির্দেশের দ্রুত বাস্তবায়ন নিয়ে কাউন্সিল ও কমিটির মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিরোধ দেখা দিয়েছিল সেটা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

বস্তুত আমরা আগেই দেখিয়েছি ইংল্যান্ডস্থ 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণ মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দু'টি

---

৮৬. A Comprehensive History of India, Vol. Nine, pp. 704.

৮৭. The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 126.

৮৮. Ibid., pp. 126.

'কন্ট্রোলিং কাউন্সিল' গঠন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি (যা তাঁদের পত্রে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল) যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় কি-না তা দেখার জন্য হেনরি ভ্যান্সিটার্ট, লিউক ক্রাফটন ও ফ্রান্সিস ফোর্ড-কে 'বোর্ড' বা 'কমিশন' নিযুক্ত করেছিলেন। এরা লন্ডন থেকে 'অরোরা' নামক জাহাজে রওনা হয়ে (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬৯) সম্ভবত ভারতের উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত এসেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৭৬৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ এদের এই স্থান অতিক্রমণের খবর পাওয়া গেলেও পরবর্তীতে তাদের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। সম্ভবত কোন কারণে সমুদ্রে এদের সলিল সমাধি হয়ে থাকবে।"[৮৯] যা হোক 'কমিশন' ইংল্যান্ড থেকে না আসায় (এ ব্যাপারে পরে আর নতুন কাউকে প্রেরণ করা হয়নি) 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের পূর্ব সিদ্ধান্তের দ্রুত, এমন কি আদৌ বাস্তবায়ন করা নিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ফোর্ট উইলিয়ামস্থ কাউন্সিল ও ভূমিরাজস্ব বিষয়ে প্রায়-একক ক্ষমতাধর সিলেক্ট কমিটির ভিতর প্রবল মত বিরোধের সৃষ্টি হলো। কাউন্সিল (সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কার্টিয়ার, রাসেল, রীড, হেয়ার, জেকিল, লেন ও বারওয়েল; ফ্লয়ার অসুস্থ থাকায় অনুপস্থিত ও বেচার ছিলেন মুর্শিদাবাদে) তাদের এক নিয়মিত বৈঠকে (জুন ১৯, ১৭৭০) এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিলো যে, যেহেতু ইংল্যান্ড থেকে যথাসময়ে রওনা হয়েও এতো দিন পর্যন্ত 'কমিশন' ভারত তথা বাংলায় এসে পৌঁছুলো না এবং তদাবধি তাদের কোন খোঁজখবরও পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের পত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় যতো শীঘ্রই সম্ভব দু'টি 'কন্ট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু' প্রতিষ্ঠা করার, সুতরাং 'কমিশন'-এর আগমন ছাড়াই কাউন্সিল তা বাস্তবায়নের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ নেবে। কিন্তু তাদের এই মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান নিলো সিলেক্ট কমিটি। তারা কাউন্সিলকে জানালো, 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, এই মতবিরোধ থেকে উভয়পক্ষের সামনে একটা পুরোনো ও জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয়ে এখন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় চলে এসেছিল, 'The Fifth Report'-এর ভাষায় যা এ রকম, 'The resolution of the Council to take the Orders of the Directors into consideration thus gave rise to a protracted debate as to where "the supervising power in the Government was palced."'[৯০] যা হোক এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতা কাউন্সিলই জয়ী হয়েছিল। 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের পরবর্তী পত্রের কঠোর ভাষা ও অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গিই এর বড় প্রমাণ।

'কন্ট্রোলিং কাউন্সিল' গঠন নিয়ে কাউন্সিল ও সিলেক্ট কমিটির মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বের কথা যখন ইংল্যান্ডে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণের কাছে পৌঁছায় তখন তাদের মধ্যে এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা-প্রতি আলোচনান্তে 'কোর্ট' শেষ পর্যন্ত নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষার্থেই (তাঁদের অনেক আদেশ-নির্দেশ ইতোপূর্বেও কলকাতা কাউন্সিল ও সিলেক্ট কমিটি অনেক ক্ষেত্রে যথাসময়ে পালন করেনি) পূর্ব সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে কলকাতা কাউন্সিলের পক্ষ নিলো। ২৫শে এপ্রিল, ১৭৭১ তারিখের পত্রে তাঁরা কলকাতা কাউন্সিলকে সুস্পষ্টভাবে জানালো, 'Since closing our letter of the 10th instant, we have more fully considered the conduct of our Governor and Council and Select

৮৯. A Comprehensive History of India, Vol. Nine, pp. 707.
৯০. The Fifth Report, pp. 501.

Committee at Bengal, and we entirely disapprove the opposition given by our Select Committee to a measure, which was positively ordered by the Court of Directors; and for the speedy accomplishment whereof the *Lapwing* Packet was despatched expressly to Your Presidency."[৯১]

'কোর্ট' সেই সঙ্গে এটিও জানিয়ে দিলো যে, যেহেতু সিলেক্ট কমিটির বিজ্ঞ সদস্যরা কর্তৃপক্ষীয় আদেশ মানতে শুধু বিলম্ব-ই নয়, বরঞ্চ বিরোধিতাও করেছে, সেহেতু কোম্পানির প্রতি এ যাবৎ তাদের যতো অবদান-ই থাকুক না কেন, তাদের উপযুক্ত শাস্তি পাওয়া উচিত। তাঁরা সিলেক্ট কমিটির তৎকালীন সদস্য ও মুর্শিদাবাদের 'রেসিডেন্ট' রিচার্ড বেচার-কে (পত্র প্রেরণকালীন ইনি কলকাতা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন) কাউন্সিল থেকে অপসারণ ও চাকুরি থেকে বরখাস্ত[৯২], কমিটির অন্যতম সদস্য ক্লদ রাসেল ও চার্লস ফ্লয়ার-কে 'বেঙ্গল সার্ভিস' থেকে প্রত্যাহার করে তাদের পূর্বের কর্মস্থলে একই পদে মাদ্রাজে ফেরৎ পাঠাতে নির্দেশ দিলেন।[৯৩] তবে কমিটির প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর জন কার্টিয়ার, কোম্পানির দুর্দিনে, ও সুদিন প্রতিষ্ঠায় তার দীর্ঘ অবদানের কথা স্মরণে রেখে তার জন্য শাস্তি এটুকুই করা হয়েছিল যে, 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের মনোনীত ও প্রেরিতব্য পরবর্তী গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলায় এসে তার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে না নেয়া পর্যন্ত তিনি স্বপদে বহাল থাকবেন।[৯৪]

বস্তুত এখানে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীর গৃহীত পদক্ষেপ কতোটুকু যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগ ছিল সেটা যতোটা না বিচার্য, তার চেয়েও এটা দেখাই উত্তম যে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষীয় আদেশ পালন সকল অধস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য যে জরুরি, এবং সেটা না হলে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তা তাদের এই আশু পদক্ষেপেই প্রমাণিত। ফলত এই নিরিখ থেকে বিচারে তা যতো কঠোর ও অকৃতজ্ঞতাসুলভই হোক না কেন, অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, তা সঠিকই ছিল।

সিলেক্ট কমিটির সঙ্গে এই বাদানুবাদ ও এর পরবর্তী কার্যক্রমের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই কলকাতা কাউন্সিল ১লা সেপ্টেম্বর, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের নির্দেশানুসরণে বাংলার মুর্শিদাবাদে ও বিহারের পাটনায় দু'টি 'কন্ট্রোলিং বা কম্পট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু' প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই দুই কাউন্সিলে যাদের নিয়োগ দেয়া হয় তারা হলেন (মুর্শিদাবাদের অধীনে বড় এলাকা ছিল বলে এখানে দেয়া হয় ৪জন (পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) :-

---

৯১. The Fifth Report, pp. 501.

৯২. 'কোর্ট'-এর এই অপমানকর পত্র বাংলায় আসার আগেই রিচার্ড বেচার ১৭৭১ সালের জানুয়ারিতে কোম্পানির চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন। তার এই অপমানিত বোধ করার সঙ্গত কারণও ছিল। কারণ 'কোর্ট'-এরই পূর্ববর্তী (মার্চ ২৩, ১৭৭০) এক সিদ্ধান্তে বেচার-এর বাংলার কার্টিয়ার-পরবর্তী গভর্নর হওয়ার কথা ছিল। অথচ সামান্য এক ভুলে 'কোর্ট'-এর কঠোর সিদ্ধান্তে সেই বিরল সৌভাগ্য থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন।

৯৩ ক্লদ রাসেল ও চার্লস ফ্লয়ার-কে এক সময় (১৭৬৫) ক্লাইভ-ই মাদ্রাজ থেকে 'বেঙ্গল সার্ভিসে' এনেছিলেন। রাসেল, 'কোর্টে'র আদেশ বাংলায় পৌঁছুনোর আগেই পূর্ববর্তী কর্মস্থলে একই পদে ফিরে যান। অন্যদিকে ফ্লয়ার, মাদ্রাজে ফিরে যাওয়ার গ্লানি ভোগ করার চেয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়াকে প্রাধান্য দেন। যদিও পরবর্তীকালে (১৭৭৫) তিনি মাদ্রাজ 'প্রেসিডেন্সি'তে ফিরেছিলেন মুসলিপট্টমের 'চীফ'-এর দায়িত্ব নিয়ে।

৯৪. The Fifth Report, pp. 502.

কন্ট্রোলিং বা কম্‌প্‌ট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু ঃ মুর্শিদাবাদ	
রিচার্ড বেচার	চীফ
জন রীড	দ্বিতীয়
জেমস লরেল	তৃতীয়
জন গ্রাহাম	চতুর্থ

পাটনার জন্য ৩জন।

কন্ট্রোলিং বা কম্‌প্‌ট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু ঃ পাটনা	
জেমস আলেকজান্ডার	চীফ
জর্জ ভ্যান্সিটার্ট	দ্বিতীয়
রবার্ট পাল্‌ক	তৃতীয়

যা হোক, কাউন্সিল তাদের এই সমুদয় কার্যাবলির একটি লিখিত বিবরণ অবিলম্বে ইংল্যান্ডে প্রেরণের ব্যবস্থা করলো, এবং এই সঙ্গে তারা 'কোর্ট'কে এ-ও জানিয়ে দিলো যে, মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় 'কনট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু' গঠনের ব্যাপারে যা কিছু তারা করেছে তার সবই সম্পন্ন হয়েছে 'কোর্টে'র পূর্ববর্তী পত্রের সূত্র ও নির্দেশনা মোতাবেক। অন্যদিকে সিলেক্ট কমিটির ক্ষুব্ধ সদস্যবর্গও 'কোর্টে'র কাছে এই মর্মে তাদের প্রতিক্রিয়া লিখে পাঠালো যে, কলকাতা কাউন্সিলের এই তথাকথিত অসঙ্গত ও অনধিকারমূলক কাজে দিওয়ানি অধিকারভুক্ত অঞ্চলের ভূমিরাজস্বের দেখভাল ও তত্ত্বাবধান তথা এককথায় রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনায় তাদের ক্ষমতা শুধু খর্ব-ই করা হয়নি, বরং 'The Fifth Report' ভাষায়, 'that they had been robbed by the Council of their right to supervise the revenues.'[৯৫]

কলকাতা কাউন্সিল ও সিলেক্ট কমিটির ক্ষমতার যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলের জয় হলেও এই লড়াই থেকে যেটা বস্তুত প্রথমবারের মতো প্রমাণিত ও স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হলো তা এই যে, এদেশে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ দেখাশুনা ও ভূমিরাজস্ব বিষয়ে যে কোন প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্তিয়ার, 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে, কলকাতা প্রেসিডেন্সি তথা কাউন্সিল বা ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের, এটা যেমন বোঝা গেল, তেমনি সেই কর্তৃত্ব এদেশে অবস্থিত কোম্পানির অন্য কোন এজেন্সি বা কমিটি বা কাউন্সিলের যে নেই (তা সেটি যতোই ক্ষমতাশালী হোক না কেন), সেটাও দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো। অবশ্য সিলেক্ট কমিটির ক্ষমতা যে ইতোমধ্যে বেশ খানিকটা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল সেটা কার্টিয়ার-এর পূর্ববর্তী গভর্নর ভেরেলস্টের বিদায়ী ভাষণ থেকেই জানা গিয়েছিল। সেই ভাষণে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, যেহেতু বর্তমানে (তার সময়ে) এদেশের ভূমিরাজস্ব বিষয়ে কোম্পানির পক্ষে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতা নির্বাহ করে মূলত দু'টি কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা, যথা, কাউন্সিল ও সিলেক্ট কমিটি; এদের ক্ষমতার বিভাজন এতো সূক্ষ্ম ও অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যত প্রায়-

৯৫. pp. 501.

অনির্ণেয় এবং কখনও কখনও তা সমান্তরালও বটে, সেক্ষেত্রে কোম্পানির বৃহত্তর মঙ্গল ও সংশ্লিষ্টদের কাজের স্বার্থেই এই ক্ষমতার স্পষ্টত নির্দিষ্টকরণ প্রয়োজন। তিনি এ বিষয়ে আরও একটু এগিয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন এভাবে, 'It is well worth your consideration, Gentlemen, to adopt some better plan for the administration and for the despatch of business. This can only be done by dividing the burden, which now rests upon a single body, amongst the separate departments, and bringing each object of deliberation into a compact compass.'[৯৬]
কার্টিয়ার-এর সময়ে এটি আরও নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ভূমিরাজস্ববিষয়ক মূল ক্ষমতা কোথায় এবং তাদের পক্ষে কে বা কারা তা নির্বাহ করবে। তবে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় ভূমিরাজস্ব বিষয়ক দু'টি নিয়ন্ত্রক-কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গভর্নরের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার যেমন কিছুটা অবনয়ন ঘটেছিল[৯৭], তেমনি মার্চ, ১৭৭১ সালের দিকে বাংলা (কলকাতায়) ও বিহারে কোম্পানির সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব (Accounts) ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একইভাবে আরও দু'টি নিয়ন্ত্রক সংস্থা (কন্ট্রোলিং কমিটি অফ অ্যাকাউন্টস ও কন্ট্রোলিং কমিটি অফ কমার্স) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেই ক্ষমতার আরও কিছু বিকেন্দ্রীভবন ঘটেছিল।[৯৮]

যা হোক, জন কার্টিয়ার-এর যুগের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক এই দু'টি আপাত দৃশ্যমান উল্লেখযোগ্য সংস্কার সত্ত্বেও (একদিক থেকে এই সংস্কার অবশ্যই ইতিবাচক ছিল[৯৯]) তার কাল আক্ষরিক ও প্রকৃত অর্থেই বাংলা ও বিহারের জন্য দুঃসময় বহন করে এনেছিল। 'The Fifth Report'-এর ভাষায় বলা যায়, 'Cartier's administration is signalised by the incidence of the terrible famine and disasters... .'[১০০] তবে এ জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে যতোটা না দায়ী ছিলেন, তার চেয়েও বেশি ছিল তার পূর্বসূরীদের প্রণীত বিশেষত ক্লাইভের দ্বৈত শাসনের অনিবার্য ফল ও তার স্বদেশি শ্বেত চর্মাধিকারী কর্মচারীদের অসৎ বৃত্তি ও নিন্দনীয় কার্যকলাপ। বলা যায়, বাংলার স্মরণকালের সর্বব্যাপক ও সর্বগ্রাসী মম্বন্তরের সূত্রপাত হয়েছিল অনেক আগেই, দুর্বল প্রশাসক হিসেবে জন কেবল তার চরম অবস্থারই মোকাবিলা করেছিলেন মাত্র।

এ পর্যায়ে আমরা ১৭৬৯-৭০ সনের 'দুর্ভিক্ষ' নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবো, এবং সেক্ষেত্রে

৯৬. The Fifth Report, pp. 503.
৯৭. Ibid., pp. 503.
৯৮. Ibid., pp. 504.
৯৯. ইতিবাচক এ অর্থে যে, মুর্শিদাবাদে 'কন্ট্রোলিং কমিটি অফ রেভেন্যু' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কলকাতা ও ২৪-পরগণ, জমিদারি, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধানের যে দায়িত্ব এ যাবৎ কালেক্টর জেনারেল-এর ওপর ছিল তা প্রত্যাহৃত হয়ে নবগঠিত কমিটির ওপর ন্যাস্ত হয়। এর ফলে, বাংলার সমস্ত ভূমিরাজস্ব প্রশাসন একটি একক কর্তৃপক্ষ বা স্থান থেকে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা শুরু হয়েছিল।
১০০. The Fifth Report, pp. 503.

আমাদের দেখানোর মূল 'ফোকাস' বা বিষয় হবে কোম্পানির ভূমিরাজস্ববিষয়ক তৎকালীন নীতি-ব্যবস্থা এর জন্য কতোখানি দায়ী ছিল, তা নির্ধারণ।

দুর্ভিক্ষ (১৭৬৯-১৭৭০) বা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'[১০১]

এই মহাদুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আলোচনার প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি এ বিষয়ে গভীরভাবে নিবদ্ধ করার মানসে আমরা দু'জন ইংরেজ ঐতিহাসিকের এসংক্রান্ত মন্তব্য উল্লেখ করে নিতে চাই। এঁরা হলেন উইলিয়াম উইলসন হান্টার ও অন্যজন মনীষী গারহাম ডি. স্যান্ডারসন।

হান্টার 'The Annals of Rural Bengal' গ্রন্থে বলেন, 'All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandmen sold their cattle; they sold their implements of agriculture; they devoured their seed-grain; they sold their sons and daughters, till at length no buyer of children could be found; they eat the leaves of trees and the grass of the field; and in June 1770 the Resident at the Durbar affirmed that the living were feeding on the dead.'[১০২]

অন্যদিকে স্যান্ডারসন আরও ভয়ঙ্কর কিন্তু কঠোর সত্য উক্তি করেন এই বলে যে, 'British Imperialism exhibited its true colours when engaged in the collection of revenue in a conquered district. Let us follow British Imperialism to Bengal. The Province of Bengal, until the advent of the British, was undoubtedly the richest land in the world. No famine was ever recorded by history to have entered the rich and populous area. For

১০১. খ্রিস্টিয় ১৭৬৯-১৭৭০ মোতাবেক বাংলা ১১৭৬ সনে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে একে সর্বসাধারণ্যে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'ও বলা হয়ে থাকে।

১০২. pp. 26. ঐতিহাসিক টমাস মেকলে-র লেখায়ও ঠিক অনুরূপ চিত্র লভ্য। তাঁর ভাষায়, 'In the summer of 1770, the rains failed; the earth was parched up; the tanks were empty; the rivers shrank within their beds; and a famine, such as is known only in countries where every household depends for support on its own little patch of cultivation, filled the whole valley of the Ganges with misery and death. Tender and delicate women, whose veils had never been lifted before the public gaze, came forth from the inner chambers in which Eastern jealousy had kept watch over their beauty, threw themselves on the earth before the passers-by, and, with loud wailings, implored a handful of rice for their children The Hoogley every day rooled down thousands of corpes close to the porticoes and gardens of the English conquerors. The very streets of Calcutta were blocked up by the dying and the dead.' (Lord Clive, pp. 540-4).
এ থেকেই অন্যান্য জেলাগুলির অবস্থা অনুমেয়।

millennia, Bengal has been famous for its continuous and abundant prosperity. British Imperialism needed only thirteen years to bring destruction, death and famine to the Province of Bengal."[১০৩]
অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত তথা বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক, সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী পরিণামবহ মহাবিপর্যয় ছিল 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'।[১০৪] বাংলা, বিহার ও ওড়িশা (ওড়িশা বলতে তখন মেদিনীপুরই শুধু বাংলার সঙ্গে ছিল)-র বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে এই দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হওয়ার পিছনে মূলত দু'ধরনের কারণ ছিল বলে সমকালীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন -- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। তবে এখানে আগেই জানিয়ে রাখা ভালো যে, পরোক্ষ কারণই ছিল আসল, যা বস্তুত মানব-সৃষ্ট এবং সংশ্লিষ্টদের অত্যন্ত জঘন্য মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক, এবং আমাদের বিবেচনায় এগুলি যদি নিরোধ করা সম্ভব হতো (সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেটি আদৌ অসম্ভব ছিল না), বা অন্য কথায় যারা এর পশ্চাতে ছিল তারা যদি তা থেকে নিজেদের বিরত রাখতো, তা হলে এই দুর্ভিক্ষ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না বলে মনে করা যেতে পারে। অন্যদিকে প্রত্যক্ষ কারণ ছিল এ অঞ্চলে অনেকটা নৈমিত্তিক।

ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার বলেন, 'The famine of 1770 was therefore a one year's famine, caused by the general failure of the December harvest in 1769, and intensified by a partial failure of the crops of the previous year and the following spring."[১০৫]

১০৩. Quoted from, Constitutional History of India and National Movement, pp. 7-8.
এই প্রসঙ্গে ইংরেজ মনীষী ফিলিপ ফ্রান্সিস-এর বক্তব্যও সমান প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন. 'কোম্পানির দেওয়ানিব গ্রহণেব পর হইতেই এদেশের লোকেব অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে-- এ কথা মনে করিতেও ইংরেজের মনে দুঃখ হয়। কিন্তু তবু আমাব বিশ্বাস -- এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় নাই। এ অবস্থা নিম্নলিখিত কারণগুলি হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করি-- কোম্পানির দাদন পূর্ণ করিবার পদ্ধতি; বহুল পরিমাণে আমদানির পরিবর্তে প্রতি বৎসর টাকার রপ্তানি; খাজনা আদায় সম্বন্ধে কড়াকড় ব্যবস্থা; বাহবা লাভের জন্য স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকাকালে ভবিষ্যতে খাজনা বৃদ্ধিব ফল কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা না করিয়াও কর্মচারীদের দ্বারা খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা; যে উপায়ে খাজনা আদায় করা হয় তাহার ভিতরে, বিশেষভাবে 'আমিন'দের নিয়োগ ব্যাপারে যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি আছে তাহা। আমার মতে এই সমস্তই প্রধান কারণ যাহার জন্য অত্যন্ত খামখেয়ালি শাসনেও যে দেশের সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল সেই সুন্দর দেশটি নষ্ট হইতে বসিয়াছে এবং নষ্ট হইতে বসিয়াছে তখনই যখন প্রকৃতপক্ষে তাহার শাসনের বেশির ভাগই ইংরেজের হাতে ন্যস্ত।' (উদ্ধৃতি সংগ্রহ 'রিক্ত ভারত', হেমেন্দ্রলাল রায়, ইংরেজ শাসনে বাজেয়াপ্ত বই, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা বিষ্ণু বসু ও অশোককুমার, পৃষ্ঠা ৫১৪)।

১০৪. ড অতুল সুরও বলেন, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত মর্মান্তিক ঘটনা, আর দ্বিতীয় ঘটেনি।' দেখুন, আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৬৫।

১০৫ The Annals of Rural Bengal, pp. 31.
ব্রিটিশ-ভারতীয় অর্থনীতি ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একজন প্রখ্যাত ভারতীয় সমালোচক ও ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের প্রথিতযশা সিনিয়র কর্মকর্তা রমেশচন্দ্র দত্ত, সি.আই.ই. মহাশয়ও

সত্যসন্ধানী হান্টার আরও জানিয়েছেন, এর আগের বছর অর্থাৎ ১৭৬৮-৬৯ সালে বাজারে দ্রব্য মূল্য যদিও স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা বেশি ছিল কিন্তু তাতে দুর্ভিক্ষ হওয়ার মতো যেমন কোন সম্ভাবনা ছিল না, তেমনি এই বছরের নিয়মিত শস্যোৎপাদনের ঘাটতি ভূমিরাজস্ব আদায়েও কোন বিঘ্ন ঘটাতে সক্ষম হয়নি।[১০৬] কিন্তু বিরূপ প্রকৃতির রুদ্র মূর্তি ধরা পড়লো অব্যবহিত পরবর্তী বছরেই। একদিকে অনাবৃষ্টি, সমকালীন সাহিত্যেও যার নিদর্শন রয়েছে:-

নদ নদী খাল বিল সব শুকাইল।
অন্নাভাবে লোকসব যমালয়ে গেল।।[১০৭]

নিম্নবঙ্গে কমবেশি বছরে মোট ৩টি ফসল[১০৮] হয়; তবে আউশ এবং আমন ধান-ই মূলত আবহমান বাংলার প্রধান ফসল। কিন্তু সেই শস্য দু'টিই ১৭৬৮ সালের আগস্ট থেকে ১৭৬৯ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী অনাবৃষ্টিজনিত এক 'শুকা'-খরায় (বিহারে আবার অতিবৃষ্টিজনিত প্লাবনে) পুরোপুরি মার গেলো বা নষ্ট হলো। এর পরেও খরা প্রায় ৫/৬ মাস চললো। স্বাভাবিকভাবে এতে 'চৈত্র বৈশাখ মাসে সংগ্রহযোগ্য চৈতালি ফসলও নষ্ট' হলো। ফলে পর-পর একটি নয়, দু'টি নয়, তিনটি ফসল নষ্ট হলে আপামর রায়তসাধারণসহ বাংলার কৃষিনির্ভর অর্থনীতির কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বলাবাহুল্য যে, এটি ছিল নদ-নদী, বারিবহুল ও খরাকাতর বাংলার কৃষি সমাজের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। এ অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষেরা প্রতি বছর কোথাও না কোথাও প্রকৃতির এই বিরূপ আচরণের মোকাবিলা করে, করে আসছে।

তবে এবার এটি আরও প্রকট আকার ধারণ করলো এই কারণে যে, পর-পর একাধিক তথা ৩টি ফসল নষ্ট হওয়ার ঘটনা স্মরণকালের মধ্যে এই অঞ্চলে এই প্রথম ঘটেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এ সময় মানুষের মধ্যে দেখা দিলো প্রচণ্ড অন্নাভাব, শুরু হলো অস্থিরতা ও হাহাকার এবং পরিণতিতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু মৃত্যু। কিন্তু মানুষের এই ঘোর দুর্দিনে খাদ্যাভাবকে যারা ব্যবসায়িক পুঁজির হাতিয়ার বানালো, অধিক মুনাফা লুটতে চাল, ডাল, নুন, তেল, মরিচ প্রভৃতির মজুতদারি-কালোবাজারি শুরু করলো, -- আশ্চর্য হলেও সত্য যে এরা ছিল ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী (দেশি-বিদেশি নির্বিশেষে) ও তাদের আনুকূল্যপুষ্ট এক শ্রেণীর অর্থ-লোলুপ,

বলেন, 'Famines in India are directly due to a deficiency in the annual rainfall; but the intensity of such famines and the loss of lives caused by them are largely due to the chronic poverty of the people.' (The Economic History of India, pp. 36).
সত্য যে উপর্যুপরি ফসল না ফলায় প্রাথমিক অবস্থায় সেটিই ঘটেছিল এ ক্ষেত্রে।

১০৬. The Annals of Rural Bengal, pp. 31.

১০৭. সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, পৃষ্ঠা ৮৬; উদ্ধৃতি সংগ্রহ 'বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৫৫।

১০৮. 'Lower Bengal has three harvest each year: a scanty pulse crop in spring: a more important rice crop in autumn; and the great rice crop, the harvest of the year, in December.' (The Annals of Rural Bengal, pp. 20).

অতিশয় দুরাচারী ও মানুষ নামের নর্দমার কীট। মূলত তৎকালীন লুটেরা অর্থনীতিতে এদেরই পিচাশ বৃত্তি প্রবল খরাজনিত তথাকথিত 'দুর্ভিক্ষ' (আমরা মনে করি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে সম্পন্ন এটি ছিল এক ধরনের গণহত্যা)-কে মানবেতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও কলঙ্কজনক অধ্যায়গুলির একটিতে পরিণত করেছিল। বলাবাহুল্য এর কথা মনে হলে আজও এ অঞ্চলের মানুষের আপাদমস্তক শিউরে ওঠে।

যা হোক এ পর্যায়ে আমরা এই মহাদুর্ভিক্ষের পিছনে সমকালীন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা বা নীতি ও এর সঙ্গে ক্ষমতাসীন শাসকচক্রের অন্দর ও বাহির মহলের সংযোগ কতোখানি ছিল তা নির্ণয়ের চেষ্টা করবো।

বাংলা ও বিহারে অনাবৃষ্টিজনিত দীর্ঘস্থায়ী খরাব ফলে ফসলোৎপাদন যে কম হচ্ছে বা আদৌ হচ্ছে না, এবং এর ফলে প্রজারা খাজনা দিতে অক্ষম হবে এবং তা আখেরে সরকারের ভূমিরাজস্বজাত আয় কমিয়ে দেবে -- এ বিষয়টি মুর্শিদাবাদের 'নায়েব-ই দিওয়ান' হিশেবে রেজা খান আগেই কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন (১৭৬৮)। তাঁব বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, প্রকৃতির এই বিরূপ অবস্থায় রায়তরা যেখানে দিনান্তে দু'মুঠো অন্ন জোটানোর কাজেই প্রাণাতিপাত করছে এবং সেটিও তাদের পক্ষে যোগাড় করা সম্ভবপর হচ্ছে না, এবং অন্যদিকে সরকারি খাজনা পরিশোধের সঙ্গতি যেখানে তাদের শূন্যের কোঠায় (অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নদের কথা আলাদা), সেখানে তা আদায়ে অন্তত কড়াকড়ি প্রত্যাহার করা হোক। আসন্ন দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় কৃষকদেরকেও তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শুষ্ক মৌসুমের যাবতীয় ফসল অধিক ফলানোর আহ্বান জানিয়ে।[১০৯]

কিন্তু প্রথম অবস্থায় কলকাতার কাউন্সিল ও সিলেক্ট কমিটির সদস্যরা তা কানেই তুললো না। ঐতিহাসিক হান্টার নিজেও এ কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'It was not till the second week of May (1770) that the Council suddenly awoke to find itself in the midst of universal and irremediable starvation.'[১১০] কিন্তু মে, ১৭৭০ আসার আগেরই প্রেক্ষাপট ছিল এমন যে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনরূপ চাপ বা সতর্ক সঙ্কেত না পেয়ে আমিল, মুৎসুদ্দি, গোমস্তা প্রভৃতি ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহক ও সহযোগীরা বরাবরের মতো তাদের কাজ পুরোদমে চালিয়ে গেল।

অন্যদিকে বাজারে চালের দুষ্প্রাপ্যতা ও প্রতিনিয়ত আকাশচুম্বী মূল্য বৃদ্ধিতে এই সময় মজুতদারি-কালোবাজারিতে বিপুল মুনাফার গন্ধ পেয়ে নবাব সরকারের ও কোম্পানির প্রায় সকল স্তরের কর্মচারী এই অবৈধ ব্যবসায়ে নেমে পড়েছিল।[১১১] পরবর্তীকালে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণের এক পত্র থেকে জানা যায়, এই মানব-সংহারক কালো ব্যবসায় (এরা যে যেখানে পেরেছিল বাজার থেকে অধিক পরিমাণ খাদ্য-শস্য কিনে ব্যক্তিগত গুদামে মজুত করেছিল এবং পরে অত্যন্ত চড়া মূল্যে একই বাজারে বিক্রি করেছিল) কোম্পানির শীর্ষস্থানীয়দেরও কেউ

---

১০৯. পলাশী-উত্তর বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শামসুল হুদা, পৃষ্ঠা ৮।

১১০. Quoted from, Cartier: Governor of Bengal, pp. 47.

১১১. উইলিয়াম হান্টার মন্তব্য করেন, 'The whole administration was accused of dealing in grain for their private advantage.' (The Annals of Rural Bengal, pp. 38).

কেউ[১১২], এমন কি স্বয়ং রেজা খান পর্যন্ত[১১৩] লিপ্ত হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। অধিকন্তু এর ওপর ছিল সরকারের নিজস্ব প্রয়োজনে বিশেষ করে সৈন্যবাহিনী ও ইউরোপীয় জনমণ্ডলীর, নবাব সরকারের আমলা-কর্মচারী, এবং ধনী ও বণিকশ্রেণীর বিপুল পরিমাণে বাজার থেকে অগ্রিম খাদ্য-শস্য সংগ্রহের চেষ্টা।[১১৪] ফল হয়েছিল এমন যে, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এবাব স্বয়ং ইংরেজ সুপারভাইজররাই কলকাতায় কর্তৃপক্ষের কাছে অর্থনীতির চরম অবনতিশীল অবস্থা ও জনসাধারণের অমানবিক জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরে প্রতিবেদন পাঠাতে শুরু করেছিলেন। এ সম্পর্কিত কয়েকজনের প্রেরিত প্রতিবেদনের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধবা হলো; এ থেকে প্রতীয়মান হবে এই মহাদুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কব ছোবল বাংলা ও বিহাবেব মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কতো গভীবে আঘাত হেনেছিল।[১১৫]

পূর্ববঙ্গের রাজশাহি ও নাটোর জেলার সুপারভাইজর মিস্টার চার্লস উইলিযাম বাউটন রাউস-এর এক প্রতিবেদনের অংশবিশেষ ছিল এ রকম (৩১শে ডিসেম্বর, ১৭৭০) : 'I cannot give a

১১২ 'কোর্ট অফ ডিরেক্টব'দের লিখিত ২৮শে আগস্ট, ১৭৭১ সালের এক পত্র থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, 'As part of the charge sets forth that the ryots were compelled to sell their rice to those monopolizing Europeans, we have reason to suspect that they could be no other than persons of some rank in our service,.' (সংগৃহীত, The Annals of Rural Bengal, pp 421).

১১৩ রেজা খানেব বিরুদ্ধে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দেব এ বিষয়ে অভিযোগ ছিল (তাঁদের ২৮শে আগস্ট, ১৭৭১ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য), দুর্ভিক্ষেব এই চরম দুঃসময়ে তিনি ব্যক্তিগতভাকে লবণ ও চালেব একচেটিয়া ব্যবসায় পরিচালনায় সুযোগসন্ধানীদেব সহযোগিতা ও বিশেষত মুর্শিদাবাদমুখী ব্যবসায়ীদের চাল-ভর্তি নৌকা আটকে বেখে টাকা প্রতি ২৫/৩০ সের তাঁর কাছে বিক্রি কবতে বাধ্য কবেছিলেন, এবং অনুরূপভাবে সেই চাল পরে বাজারে টাকায় ৩/৪ সের বিক্রি করেছিলেন বা করায় সহযোগিতা করেছিলেন বলে 'কোর্ট' স্থানীয় সূত্রে জানতে পেরেছিল। অবশ্য এই অভিযোগের সবটুকু যে সত্য ছিল না তা বলাইবাহুল্য। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানাব জন্য দেখুন, The Transition in Bengal, pp 305-311.

১১৪. পূর্ণিয়ার সুপারভাইজব জর্জ ডুকারেল তার ১০ই অক্টোবব, ১৭৭১ তারিখের এক পত্রে কর্তৃপক্ষেব কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এই মর্মে যে, জনৈক কর্নেল চ্যাম্পিয়নের সৈন্যবা নিজেদেব খাদ্য সংগ্রহ ও মজুদের অভিপ্রায়ে মুঙ্গের থেকে এসে তার এলাকায় খাদ্য-শস্য ক্রয় করছে, অথচ তখনকাব অবস্থায় এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় খাদ্য-শস্য রপ্তানি তথা ক্রয় ছিল নিষিদ্ধ। তিনি কর্তৃপক্ষেব কাছে এ-ও জোরালোভাবে অনুরোধ করেছিলেন, (সমকালীন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদনের ভাষায় হান্টার যা উল্লেখ করেছেন), 'At the present time of distress and failure of the August crops, he (Ducarel) hopes that the supplies for Monghyr may be obtained in the ordinary way through the ordinary merchants, not by armed troops ' (The Annals of Rural Bengal, pp 410).

১১৫. এ বিষয়ে বিশদ জানাব জন্য দেখুন, The Annals of Rural Bengal, (pp. 421)এব বিভিন্ন অধ্যায় ও সংযোজনী।

more striking proof of deficiency of the August harvest, than by mentioning a circumstance probably never before known, that the consumption of grain in these parts is now supplied by importation from the northern districts and the precincts of Moorshedabad; and that at Natore, situate in the heart of a rice country, grain sells at 18 seers per rupee, whilst at Moorshedabad it is above 30 seers of the same species of weight."[১১৬]

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম থেকে সুপারভাইজর মিস্টার আলেকজান্ডার হিগিনসন-এর প্রতিবেদনের অংশ ছিল (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১) : 'Truly concerned am I to acquaint you that the bad effects of the last famine appear in these places beyond description dreadful. Many hundreds of villages are entirely depopulated; and even in the large towns there are not a fourth part of the houses inhabited. For want of ryuts to cultivate the ground, there are immense tracts of a fine open country which remain wholly waste and unimproved."[১১৭]

বলাবাহুল্য এ ছিল বাংলার দুই অংশের দু'টি প্রতিনিধিত্বশীল জেলার দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থার প্রতিবেদন যা ক্ষমতাসীনদেরই চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি।

এবার বিহারের প্রধান শহর পাটনার অবস্থা সম্বন্ধে সুপারভাইজর আলেকজান্ডার জানান (২৮শে জানুয়ারি, ১৭৭০) : 'To judge from the city of Patna, the interior of the country must be in a deplorable condition. From fifty to sixty people have died of absolute hunger on the streets every day for these ten days past. Above 8000 beggars were still in the place; and if the rajah were to attempt to relieve them in a public manner, the number would still increase from every village about Patna."[১১৮]

এবার খোদ রাজধানী মুর্শিদাবাদের অবস্থা কেমন ছিল সেটা দেখা যাক 'রেসিডেন্ট' রিচার্ড বেচার-এর জবানি থেকে (১৯শে জুলাই, ১৭৭০) : "Previous representations' are 'faint in comparison to the miseries now endured. Within 30 miles round the city, rice sells at only 3 seers for a rupee; other grain in proportion; and even at those exorbitant prices there is not nearly sufficient for the daily supply of half the inhabitants, so that in the city of Moorshedabad alone it is calculated that more than five hundred are starved daily, and in the villages and country adjacent the numbers said to perish exceed belief.' 'Every endeavour of the (native) Ministers and myself has been exerted to lessen this

১১৬. The Annals of Rural Bengal, pp. 412.

১১৭. Ibid., pp. 414.

১১৮. Ibid., pp. 415.

dreadful calamity."[১১৯]
আগেই বলেছি এ সবই ছিল ইংরেজ সুপারভাইজরদের প্রেরিত প্রতিবেদনের অংশবিশেষ। স্থানাভাবে এর বিস্তারিত এখানে তুলে ধরা গেল না, এবং তা ততো প্রাসঙ্গিকও নয়। তবে এর বাইরে নবাব সরকারের বা নিজামতের কর্মচারীরাও যে দুর্ভিক্ষের খয-খবর, প্রতিবেদন যথারীতি কেন্দ্রে পাঠিয়ে চলেছিল, তারও দু'একটি নিচে তুলে ধরা দরকার।

পূর্ণিয়ার ফৌজদার মুহম্মদ আলি খান জানিয়েছিলেন (২৮শে এপ্রিল, ১৭৭০) : "Hardly a day passes without thirty or forty people dying.' 'Multitudes already have, and continue to perish of hunger.' "[১২০]
স্বয়ং 'নায়েব-ই দিওয়ান' সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খান চরম হতাশ ও নিরুপায় হয়ে গভর্নর জন কার্টিয়ার-কে সব কিছু জানিয়ে যে পত্র লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ ছিল এমন : 'If the scarcity of grain and want of rain were confined to one part of the country, some remedy for the alleviation of the distress could be found. But when the whole country is in the grip of famine, the only remedy lies in the mercy of God. The Almighty alone can deliver the people from such distress."[১২১]
কিন্তু মানব সৃষ্ট যে অভিশাপ তা থেকে রেহাই দেয়ার কোন সুযোগ সম্ভবত স্বয়ং সৃষ্টিকর্তারও ছিল না। কারণ এর আগেও আমরা দেখেছি বাংলা, বিহার তথা এ অঞ্চলে অনাবৃষ্টি বা খরা, অতিবৃষ্টি বা প্লাবন প্রভৃতির কারণে অজন্মায় ও ফসল হানিতে সাময়িক ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। মানুষ হন্যে হয়ে ছুটেছে দিগ্বিদিক। তবে অবস্থা যতো সঙ্কটজনক-ই হোক না কেন, ক্ষমতাসীন শাসককুল তখন দ্রব্য মূল্য স্থিতিশীল বা খুব বেশি হলে কিছুটা উর্ধ মূল্যে হলেও সর্বসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য একদিকে যেমন স্থানীয়ভাবে শস্য রপ্তানি বন্ধ বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে, প্রয়োজনে সরকারিভাবে অন্য জেলা থেকে দুর্গত অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করেছে, এবং তার চেয়েও বড় কথা, রাষ্ট্র এ সকল ক্ষেত্রে রায়তের দেয় খাজনা আংশিক বা পুরোপুরি বা আনুপাতিক হারে মওকুফ করেছে এবং তৎসহ প্রয়োজনে ক্ষতিগ্রস্তদের পিঠ-দাঁড়া সোজা করে ফের উঠে দাঁড়াবার জন্য 'তাকাবি' (তাকাভি) ঋণ দিয়ে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে। ফলে এক্ষেত্রে পাইকারি হিশেবে মানুষ মৃত্যুর ঘটনা কখনই এদেশে ঘটেনি বা আরও নিশ্চিত করে বললে ঘটতে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ

---

১১৯ The Annals of Rural Bengal, pp 419
অথচ ইংরেজরা যখন রাজধানী মুর্শিদাবাদে পদার্পণ করে, দুর্ভিক্ষের কিছুকাল আগে পর্যন্তও এই শহরের অবস্থা কেমন ছিল তা জানা যেতে পারে স্বয়ং ক্লাইভ-এর মুখ থেকে। 'শহরটি (মুর্শিদাবাদ) লন্ডনের মতোই প্রকাণ্ড, জনবহুল এবং সম্পদশালী। প্রভেদ এই-- মুর্শিদাবাদে এমন সব ধনী আছেন যাঁহাদের ধনসম্পদের পরিমাণ লন্ডনের ধনীদের সম্পদ অপেক্ষা বহু গুণে বেশি।' (বিক্ত ভারত, পৃষ্ঠা ৫১৩)। ভাবতে অবাক লাগে, সেই শহরটিকেই কোম্পানির লুটেরাগণ মাত্র এক যুগেরও কম সময়ে শ্মশানে পরিণত করে ছেড়েছিল।

১২০ The Annals of Rural Bengal, pp 417.

১২১ Quoted from, The Transition in Bengal, pp 220

এর অর্থ, রাষ্ট্র বা শাসকশ্রেণী (যতো স্বৈরতান্ত্রিক-ই হোক না কেন) এক্ষেত্রে একটা প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং তা ছিল রায়তের কল্যাণমুখিন এক মহতী উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা। কিন্তু দিওয়ানি লাভের পরে, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা যখন প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই পরিচালিত হচ্ছিল একটা বৈদেশিক বণিকগোষ্ঠী কর্তৃক, তখন এই প্রথমবার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখা গেল, রাষ্ট্রযন্ত্র এ রকম ক্ষেত্রে তার চিরাচরিত চরিত্র পরিবর্তন করেছে, এবং রায়তকেই শুধু নয়, এবার তারা আপামর জনগোষ্ঠীকেই ভুখা-নাঙ্গা, অনিকেত পরিস্থিতি ও নিষ্ঠুর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তথাকথিত এই দুর্ভিক্ষ যে সাধারণ কৃষক-প্রজার বাইরে সমাজের উঁচুশ্রেণীর মানুষ যেমন জমিদার, তালুকদার প্রভৃতিকেও প্রবলভাবে আক্রান্ত করেছিল, তার প্রমাণ রাজমহলের সুপারভাইজর মিস্টার উইলিয়াম হারউডের প্রতিবেদনের নিচের অংশবিশেষেই পাওয়া যাবে বলে মনে করি। হারউড লিখেছিলেন, '... the zameendars are ruined, the lands not having yielded half produce for the last twelve months.'[১২২]

বাংলার পূর্ববর্তী দুর্ভিক্ষগুলির ইতিহাসে কোন জমিদার বা তালুকদার কখনও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ এবার সেটিই ঘটলো। তা-ও কী নিদারুণভাবে, -- এককালের বিপুল ঐশ্বর্য ও মহাপ্রতিপত্তিশালী এই কুলপতিগণ সমাজের সর্বোচ্চ স্থান থেকে দুর্ভিক্ষের এক ধাক্কায় সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে আপামর নিরন্ন মানুষের কাতারে এসে শামিল হয়েছিল সেই চিত্রও এখানে তুলে ধরা দরকার, না হলে তথাকথিত এই মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ও তাণ্ডব অনুধাবন করা প্রকৃতই দুষ্কর হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৭৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার যে সকল জেলা বা তার অংশ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেগুলি হলো পূর্ণিয়া, নদীয়া, রাজশাহি, বীরভূম, পাচেট বা পঞ্চকোট (রাণীগঞ্জ), বর্ধমানের উত্তর ও পশ্চিম বিভাগ, ভাগলপুর, রাজমহল, হুগলি, যশোহর, মালদহ ও ২৪-পরগণা জমিদারি।[১২৩] এ সমস্ত এলাকার কৃষি প্রজা ও সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকেদের অবস্থাও এমন হয়েছিল যে, বর্ধমান-রাজ, রাজশাহি-নাটোর, নদীয়া, বিষ্ণুপুর, বীরভূম প্রভৃতি বড় বড় জমিদারির রাজা-মহারাজারা পর্যন্ত কোম্পানি সরকারের ভূমিরাজস্ব পরিশোধের জন্য 'ব্যাঙ্কার'দের কাছ থেকে অত্যন্ত চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবস্থার এখানেই শেষ ছিল না. দারিদ্র্যের কশাঘাত এতো নির্মম ছিল যে তাদেরকে পর্যন্ত থালা-বাসন, অলঙ্কারাদি, গবাদি পশু বিক্রি করতে হয়েছিল, তারপরও তারা ঋণ মুক্ত হতে পারেননি।[১২৪] বলাবাহুল্য এই শ্রেণীর মানুষ, এঁরা আগে কোনদিন এমন ঘোরতর দুর্বিপাক মোকাবিলা করেনি। এক দৃষ্টিকোণ থেকে তাই বলা যায়, ছিয়াত্তরের 'মন্বন্তরে সবচেয়ে বেশী বিপর্যস্ত হয়েছিল জমিদাররা।'[১২৫]

---

১২২. The Annals of Rural Bengal, pp. 417.

১২৩. বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৬১-৬২।

১২৪. পলাশী-উত্তর বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পৃষ্ঠা ১০।

১২৫. আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৬৭।

হান্টার-এর ভাষ্যে পাওয়া যায়, 'Before the commencement of 1771, one-third of a generation of peasants had been swept from the face of the earth and a whole generation of once rich families had been reduced to indigence . .. From the year 1770 the ruin of two-thirds

আসলে জমিদারদের বিপর্যস্ত হওয়ার কোন কারণ থাকতো না যদি না এই সময়ে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের কাজ আমিল, শিকদার, মুৎসুদ্দি, গোমস্তারা স্বাভাবিক সময়ের মতোই পুরোদমে চালিয়ে যেতো। বলা যায় এটি নিবাবণ করে, অন্যত্র থেকে হলেও বাজারে খাদ্য-শস্য সরবরাহ ও তার মজুতদারি-কালোবাজারি বন্ধ কবা গেলে এবং কৃষকদেব মধ্যে উপযুক্ত হারে 'তাকাবি' দেওয়া ও সঠিকভাবে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা কবা গেলে সম্ভবত তথাকথিত এই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কবা সম্ভব হতো বলে মনে কবাব যথেষ্ট কারণ বয়েছে।
এ পর্যায়ে আমরা দুর্ভিক্ষের আগে-পরের কয়েক বছরেব কোম্পানি সবকাবের ভূমিরাজস্ব আদায় কার্যক্রম, এবং তৎসহ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় গৃহীত ত্রাণ তৎপরতা ও 'তাকাবি' ঋণ প্রদানসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবো। বলাবাহুল্য এই অনুষঙ্গগুলি আবহমান বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

হ্যারি ভেরেলস্ট ও জন কার্টিয়ার-এর সময়ে আদায়কৃত ভূমিরাজস্ব[১২৬]

খ্রিস্টিয় বছর	বাংলা বছর	ভূমিরাজস্ব (টাকায়)
১৭৬৮-৬৯	১১৭৫	১,৫২,৫৪,৮৫৬-৯-৪-৩
১৭৬৯-৭০	১১৭৬	১,৩১,৪৯,১৪৮-৬-৩-২
১৭৭০-৭১	১১৭৭	১,৪০,০৬,০৩০-৭-১৩-২
১৭৭১-৭২	১১৭৮	১,৫৩.৩৩.৬৬০-১৪-৯-২

উপরিউক্ত ছকের দিকে একপলক দৃষ্টি দিলে এটা স্পষ্ট হবে যে, দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত আগের বছব (আর্থিক বছব) অর্থাৎ ১৭৬৯-৭০ (এব মধ্যে '৭০-এব অর্ধেক মাত্র বিবেচ্য) সনে কোম্পানিব সরকার যে পরিমাণ ভূমিরাজস্ব আদায় কবেছিল, দুর্ভিক্ষ ও এব অব্যবহিত পরের বছরে তা আবও বেশি আদায় করেছে, অর্থাৎ আদায় উপর্যুপবি বেড়েছে বৈ কমেনি। এমন কি সেটা মহাদুর্ভিক্ষের বছবেও। এই আদায়ের অমানবিক দিকটি কার্টিয়ার-পরবর্তী বাংলার প্রথম শক্তিশালী গভর্নব-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর দৃষ্টিতেও অত্যন্ত ভয়াবহরূপে ধবা পড়েছিল যা তিনি ও তার অপর ৬ জন সঙ্গী মিলে লিখে যৌথ প্রতিবেদনাকারে (এর প্রধান অংশ গভর্নর-জেনারেল স্বয়ং লিখেছিলেন) ৩রা নভেম্বব, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে অনারেবল 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আমরা এখানে এটিব প্রাসঙ্গিক অংশেব বঙ্গানুবাদ স্বনামধন্য বামপন্থী লেখক ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর-এর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক' নামক গ্রন্থ থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি: "প্রদেশের (বাঙলার) সমগ্র লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু এবং তাহার ফলস্বরূপ চাষের চবম অবনতি সত্ত্বেও ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে নীট বাজস্ব আদায় এমন কি ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের রাজস্ব অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে। যে কোনো লোকের পক্ষে ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, এইরূপ একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মধ্যে রাজস্ব অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তাহা না হইবার কারণ এই যে, সকল শক্তি দিয়া রাজস্ব আদায় করা

of the old aristoctacy of Lower Bengal dates.' (The Annals of Rural Bengal, pp. 56-57).

১২৬. The Fifth Report, pp 509.

হইয়াছে।"[১২৭]

এই সর্বশক্তি কি রূপে ও কতোখানি প্রযুক্ত হয়েছিল তার কিছুটা নমুনা পাওয়া যাবে তৎকালীন একজন সুপারভাইজর-এর প্রেরিত প্রতিবেদন থেকে। এ বিষয়ে জানার জন্য এই একটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট বলে মনে করি।

'২০শে, ১৭৭০ সনের কনসাল্টেশান' পেপারে উদ্ধৃত হয়েছিল, 'Letter from Mr. Reed of Moorshedabad states that in Dacca, Poorneah, and Hooghly, collections are regularly kept up, and some of them paid in advance! The rest of the supervisors give reason to expect that the revenue of the province in general will be duly collected, 'excepting in some few places'"[১২৮]

দেশব্যাপী মহা আকালের সময়ে যেখানে ভূমিরাজস্ব শুধু কড়ায়-গণ্ডায়-ই আদায় হয় না, উপরন্তু ক্ষমতা-মদমত্ত শাসকশ্রেণী তা অগ্রিমও উসুল করে সেখানে ভূমিরাজস্ব প্রদাতৃশ্রেণীর অবস্থা কী হতে পারে তা এ থেকেই সহজে বোধগম্য।

এখন দেখা যাক এ সময় সরকারি ত্রাণ কার্যক্রম কতোটুকু পরিচালিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলমান শাসনামলে বিশেষত সুলতান ও মোগলদের সময়ে এই ধরনের দুর্বিপাকে সরকারি ত্রাণ কাজের পাশাপাশি স্থানীয় অবস্থাপন্ন ভূস্বামীশ্রেণী যেমন জমিদার-তালুকদার ও রাজন্যবর্গও ব্যাপকাকারে দুর্গত জনসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসতো। কিন্তু এবার এই অভিজাতশ্রেণীটি নিজেরাই উপদ্রুতদের শেষ কাতারে শ্রেণীবদ্ধ

---

১২৭ পৃষ্ঠা ১৯, মূল প্রতিবেদন দেখুন, The Annals of Rural Bengal, Appendix A, pp 379-98.
ড. ইরফান হাবিব এর ভাষায়, "বাংলায় 'দেওয়ানী জমি' থেকে রাজস্ব সংগ্রহের প্রকৃত পরিমাণ, 'নিজামত'-এর শাসনে ১৭৬২-৬৩ সালে যা ছিলো ৬৪.৩ লাখ টাকা তার থেকে ঠেলে বাড়িয়ে কোম্পানির 'দেওয়ানী'-র প্রথম বছরেই, ১৭৬৫-৬৬ সালে করা হয়েছিলো ১৪৭.০ লক্ষ টাকা। এবং আর এক গ্রন্থ সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে, বাংলার রাজস্ব ১৭৬৫-৬৬ সালের ২.২৬ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৭৮-৭৯ সালে হয়েছিলো ৩.৭ কোটি টাকা। এমনই সে চাপ যে, ১৭৬৯-৭০ সালের মন্বন্তরে যখন বাংলার কৃষককুলের এক-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেলো তখনো রাজস্ব-নির্ধারণে কোনো মন্দার কারণ ঘটলো না।' (ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ : মার্কসীয় চেতনার আলোকে, পৃষ্ঠা ২৫৭)।

১২৮ The Annals of Rural Bengal, pp 411-12.
কাগজে-পত্রে কোম্পানি দুর্ভিক্ষের বছরে মোট ধার্যকৃত ভূমিরাজস্বের ৫-৬% মওকুফ করেছিল। কিন্তু তা ছিল এক ধরনের 'আই-ওয়াশ' মাত্র। কারণ পরের বছরেই তা সুদে-আসলে উসুল করে নিয়েছিল তারা। হান্টার নিজেই বলেছেন, 'Remissions of the land-tax and advances to the husbandmen, although constantly urged by the local officials, received little practical effect. In a year when thirty-five per cent of the whole population and fifty per cent of the cultivators perished, not five per cent. of the land-tax was remitted, and ten per cent. was added to it for the ensuing year (1770-71)' (Ibid., pp 39).

হয়েছিল। ফলে সঙ্গতি না থাকায় এ ব্যাপারে তাদের কিছুই করার ছিল না। সুতরাং অনুমেয় সরকারি ত্রাণ কার্যক্রম কী ব্যাপক ও নিবিড়ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল।

বিভিন্ন সূত্রে বিশেষ করে উইলিয়াম হান্টার-এর দেয়া তথ্য-পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় বাংলা, বিহার ও মেদিনীপুরের প্রায় ৩ কোটি দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধাকাতর মানুষের ত্রাণের জন্যে নবাব ও কোম্পানির সরকার অল্পাধিক পৌণে দু'লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিল। এতে সংশ্লিষ্টদের অনুদান বা অর্থ-সহায়তা ছিল নিম্নরূপ:-

দাতা	টাকা	আনা	পাই
নবাব মুবারকউদ্দৌলা	২৬,৮৯৩	০	০
ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি	১,২৪,৫০৬	১৩	১১
নায়েব-দিওয়ান মুহম্মদ রেজা খান	১৯,৫০৭	০	০
মহারাজা দুর্লভরাম (রায় দুর্লভ)	৬,০০০	০	০
জগৎ শেঠ	৬,৩৭৫	১২	০
সর্বমোট	**১,৮৩,২৮২**	**১০**	**৫**

উপরিউক্ত ত্রাণ-মঞ্জুরির মধ্যে খোদ রাজধানী মুর্শিদাবাদের জন্যই (১লা মার্চ থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৭৭০ পর্যন্ত) বরাদ্দ হয়েছিল ১,৫২,৪৪৩ টাকা[১২৯], এবং অবশিষ্ট অর্থ নিম্নবর্ণিত জেলাগুলিতে প্রদর্শিত বিভাজনে ব্যয়িত হয়েছিল।[১৩০]

জেলার নাম	টাকা	আনা	পাই
হুগলি	৪,৪৭৬	০	০
পূর্ণিয়া	১৭,২৯৪	১১	০
বীরভূম	২,৯৪০	১৫	০
ইউসুফপুর (যশোহর)	১,০৬২	০	০
ভাগলপুর	৫,০৬৫	১১	০
সর্বমোট	**৩০,৮৩৯**	**৫**	**০**

এর বাইরেও স্থানীয়ভাবে কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী যেমন চাল প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার লঙ্গরখানায় বিতরণ করা হয়েছিল। তবে সেগুলি যে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল ও হাস্যকর ছিল তা রংপুরের সুপারভাইজর জন গ্রুজের প্রেরিত নিচের প্রতিবেদনাংশ থেকে বুঝা যায়।

> The distresses of the poor continue very great. A number of miserable objects daily apply for relief Five rupees' worth of rice are daily distributed amongst the most needy. Ten rupees' worth had been previously distributed. The Provincial

১২৯ Cartier. Governor of Bengal. pp. 60.

১৩০ Ibid . pp. 60.

Council sanctions this expenditure. [Ten shillings a-day among 400,000 starving beings !][১৩১]

একইভাবে রায়তদের মধ্যে 'তাকাবি' ঋণও বিতরণ করা হয়েছিল খুব অল্প ও সীমিতাকারে। তবে এক্ষেত্রে ঘটনা যা ঘটেছিল তা আরও আশ্চর্যজনক। আগেই উল্লেখ করেছি ইতোপূর্বে সরকারি ত্রাণ কার্যক্রমেব পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে জমিদার প্রমুখও ক্ষতিগ্রস্ত রায়তদের কমবেশি সাহায্য-সহযোগিতা কবতো, ঋণ দিতো। তবে কখনও তারা সরকারি ত্রাণ নিজেরা আত্মসাৎ করতো না, বা করেনি। কিন্তু প্রথমবারের মতো এবার সেটিও ঘটলো। সরকারিভাবে যে ঋণ বিতরণের জন্য তাদের হাওলায় দেয়া হয়েছিল অনেক জমিদার তা দুর্গতদের না দিয়ে নিজেরাই আত্মসাৎ করেছিল। তবে নিরপেক্ষ বিচারে তাদেরকে এ জন্য দোষ দেয়া অনুচিত। কারণ এই আমলে, দুর্ভিক্ষে তারা নিজেরাও ছিল বিপর্যস্ত ও প্রবল অন্নক্লিষ্ট।
১৭৬৯-৭০ অর্থ বছরের শেষ দিকে দুর্ভিক্ষের সময়ে মুর্শিদাবাদ রাজকোষ থেকে পরবর্তী অর্থ বছর -- ১৭৭০-৭১-এ বাংলার মোট ১১টি জেলার ক্ষতিগ্রস্ত রায়তদের মধ্যে বিতরণোপলক্ষ্যে সর্বমোট ২,৭৬,৫৪৭-১০ টাকা ছাড় করা হয়েছিল। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলা হিশেবে নিম্নবর্ণিত ৬টি জেলা প্রদর্শিত হারে 'তাকাবি' ঋণ বরাদ্দ পেয়েছিল, তবে শর্ত ছিল সংশ্লিষ্টদেব তা ১২.৫০% হারে বা টাকায় ২-আনা সুদে গ্রহণ করতে হবে।[১৩২]

জেলার নাম	বরাদ্দ (টাকায়)
বাজশাহি	৫০,০০০
দিনাজপুব	৪৫,০০০
বংপুর	৩৫,০০০
পূর্ণিয়া	৬৯,০৪৭-১০
বীরভূম	২০,০০০
নদীয়া	৩০,০০০
সর্বমোট	২,৪৯,০৪৭-১০

এমনিতেই এই বরাদ্দ ছিল অপ্রতুল; তারপব সেটা যদি সঠিকভাবে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিতরণ করা যেতো তাতেও হয় তো কিছু লোকের খানিকটা হলেও উপকার হতো। কিন্তু দেখা গেল, ড নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় ভাষায়, 'But it is doubtful whether the sums advanced as Taqavi from the Treasury of Murshidabad reached those persons for whom they were meant.'[১৩৩] উদাহবণস্বরূপ বলা যায় নদীয়া-রাজ, ঐতিহাসিক হান্টার যাঁকে 'another powerful nobleman of the last century'[১৩৪] বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, তিনি তাঁর প্রজাদের মধ্যে ৩০,০০০ টাকা বিতরণের জন্য 'তাকাবি' গ্রহণ

১৩১. The Annals of Rural Bengal, pp. 410.
১৩২ Cartier: Governor of Bengal, pp. 66.
১৩৩. Ibid. pp. 67
১৩৪ The Annals of Rural Bengal, pp. 57.

করেছিলেন; কিন্তু নদীয়া জেলার সুপারভাইজর জ্যাকব রাইডার, তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা সূত্রে জেনেছিলেন, রাজা গৃহীত অর্থের একটি টাকাও প্রজাদের মধ্যে বিলি করেননি।[১৩৫] বস্তুত এ থেকে একটি সিদ্ধান্তই সিদ্ধ, আর তা হলো, করাল দুর্ভিক্ষ 'powerful nobleman'-দের চরিত্রও 'noble' রাখেনি বা থাকতে দেয়নি, এটাই ছিল বাস্তবতা।

অন্যদিকে রায়ত সাধারণকে যৎসামান্য যা দেয়া হয়েছিল, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা যেমন আর সরকার ফেরত পায়নি -- এটা সত্য, তেমনি অনেকে পরবর্তীকালে আর ফেরত দেয়ার মতো সুযোগও পায়নি -- সেটাও ততোধিক সত্য। কারণ তখন আর তারা ইহজগতে বেঁচে ছিল না। দুর্ভিক্ষ-উত্তর সময়ে পূর্ণিয়ার সুপারভাইজর মিস্টার ডুকারেল একবার মুর্শিদাবাদস্থ 'কনট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু'-কে পত্র লিখে জানিয়েছিলেন, ' . in one village where thirty rupees were advanced, there was none alive from whom the dues could be realised.''[১৩৬]

যা হোক উপরের এই দীর্ঘ আলোচনা শেষে আমরা এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, 'তৎকালীন ইংরেজ শাসকরা এই মহাদুর্ভিক্ষের জন্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে দায়ী করলেও প্রকৃতপক্ষে তার সাথে অনাবৃষ্টি অথবা ঐ ধরনের কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিলো না।'[১৩৭] দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত দীর্ঘ খরা ও কোথাও কোথাও অতিবৃষ্টিজনিত প্লাবন থেকে হলেও বস্তুত তাকে গভীর, দীর্ঘ ও মহাসঙ্কটপূর্ণ করেছিল ক্ষমতাসীন শাসকমহলের আশ্চর্য নিষ্ক্রিয়তা ও মুনাফাখোরি দুষ্কর্ম। এক কথায় তাই বলতে গেলে, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' ছিল বৃটিশ শাসনের বিশেষ করে ক্লাইভের দ্বৈত শাসনের[১৩৮] অনিবার্য ও বিষময় পরিণতি।[১৩৯]

১৭৬৯-৭০ সালের তথাকথিত এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে আমরা এখানে এতো বিশদভাবে আলোচনা করলাম এ জন্য যে, বস্তুত এ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে বাংলার এই পর্বের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ভিত্তিপাত-ই হয়েছিল মূলত লাগামহীন শোষণ, সীমাহীন লুণ্ঠন আর নিশ্ছিদ্র পাচারের মধ্য দিয়ে, যা এদেশে ইংরেজ শাসনের আগাগোড়া অব্যাহত ছিল। বলাবাহুল্য আমাদের পরবর্তী আলোচনায় সেটিই ক্রমশ প্রতিফলিত হবে।

এখন নিচে দিওয়ানি পর্বে গভর্নর হ্যারি ভেরেলস্ট থেকে জন কার্টিয়ার-এর যুগ পর্যন্ত বাংলার ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা অবকাঠামো (কোম্পানির দিকের) সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবো।

---

১৩৫ Cartier: Governor of Bengal, pp. 67.

১৩৬. Ibid., pp. 67.

১৩৭. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা ১৮।

১৩৮. টমাস মেকলে যথার্থই বলেছেন, 'In the meantime, the impulse Clive had given to the administration of Bengal was constantly becoming fainter and fainter. His policy was to a great extent abandoned, the abuses which he had suppressed began to revive; and at length the evils which a bad government had engendered were aggravated by one of those fearful visitations which the best government cannot avert. ' (Lord Clive, pp. 540)

১৩৯. বাংলাদেশ : সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা, অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৬।

কলকাতা কাউন্সিল বা ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ

মাদ্রাজ (ফোর্ট সেন্ট জর্জ কর্তৃপক্ষ) ও বোম্বে 'প্রেসিডেন্সি'র মতো 'বাংলা প্রেসিডেন্সি' তথা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামস্থ 'কাউন্সিল' ছিল এদেশে ব্রিটিশ ঈস্ট কোম্পানির ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ যাবতীয় কায়-কারবার দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত মূল কর্তৃপক্ষ। কোম্পানির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিটা 'প্রেসিডেন্সি' গঠিত হতো একজন প্রেসিডেন্ট (সাধারণত 'প্রেসিডেন্ট অফ দ্য কাউন্সিল' বলে অভিহিত হতেন) ও ৮ থেকে ১৫ বা কখনও কখনও ১৬ জন[১৪০] সম পর্যায়ের সদস্য সমন্বয়ে। প্রেসিডেন্টের পদবি হতো গভর্নর ('গভর্নর অফ দ্য প্রেসিডেন্সি')। সকল ক্ষেত্রেই গভর্নর নিযুক্ত হতেন 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের সিদ্ধান্তে অর্থাৎ তাদের মনোনয়নে এবং কোম্পানির ঊর্ধতন সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্য থেকে (মূলত)।[১৪১] এটাই ছিল সাধারণ প্রথা। ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে গভর্নরের ক্ষমতা ছিল যদিও খুব ব্যাপক ও বিস্তৃত, এবং প্রাথমিক অবস্থা থেকে যা উত্তরোত্তর বেড়েছিল বৈ কমেনি, তবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো 'কাউন্সিলে'র নিয়মিত ও জরুরি সভা আহ্বানের মাধ্যমে। সকল সদস্যকে আগেভাগে জানিয়ে সভা আহ্বান করাই ছিল নিয়ম, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হতো উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে। উল্লেখ্য যে, পদ ও অবস্থানের দিক দিয়ে 'কাউন্সিলে' গভর্নর এক নম্বর ব্যক্তি বিবেচিত হলেও এবং আগেই বলেছি, অন্যরা ছিল তারই মতো প্রায় সম-পর্যায়ের সিভিল সার্ভেন্ট, কিন্তু গভর্নর-এর হাতে ছিল সামরিক বাহিনী পরিচালনার ভার ও দেশীয় বিভিন্ন ছোট-বড় শাসক ও রাজ-রাজড়াদের সঙ্গে যোগাযোগের আসল ক্ষমতা।[১৪২] বস্তুত এই দু'টি বিশেষ ক্ষমতা গভর্নরকে 'কাউন্সিলে'র অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তার অবস্থানগত পার্থক্য ও বৈভব সুস্পষ্ট করেছিল। বিভিন্ন সময়ে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণ তাকে যে সব ক্ষমতায় ভূষিত করেছিল তা থেকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় তার অবস্থান চিহ্নিত হয়েছিল অনেকটা এ রকম, যেমন তিনি ছিলেন, 'the supreme Magistrate in Military as well as in Civil Affairs', 'General Inspector and Supervisor of the whole machine', 'Supervisor General' প্রভৃতি।

তাছাড়া এদেশে নিযুক্ত কোম্পানির সকল কর্মচারী ছিল বস্তুত তারই আজ্ঞাবহ এবং তার কাছেই ছিল তাদের যে কোন ধরনের কাজের জবাবদিহিতা। কোম্পানির প্রত্যক্ষ কর্মচারী নয়, অথচ এদেশে বাণিজ্যরত এমন যে কোন ইংরেজ কর্মচারীকেও তিনি স্বদেশে ফেরত পাঠাতে পারতেন। সত্যি বলতে এটি ছিল একটি অনধিকার চর্চা, কিন্তু ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির

১৪০ The Maratha Supremacy, pp. 582.

১৪১ Ibid., pp. 582 & Analytical History of India, pp. 84.

১৪২. সামরিক বাহিনীর ওপর তার নিয়ন্ত্রণ কতোটা ব্যাপক ছিল সে সম্পর্কে জানা যাবে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণের একটি পত্রের (৩০শে জুন, ১৭৬৯) এই ভাষ্য থেকে: '... our Governor is to all intents and purposes the Commander in Chief of our Forces and whatever orders he sends to any officer, must be obeyed.' (Quoted from, The Maratha Supremacy, pp. 583).
এই ক্ষমতা প্রয়োগে তার অধিকার ছিল অনেকটা একক; শুধু 'কোর্ট'-এর কাছেই ছিল তার জবাবদিহিতা।

ব্যবসায়িক স্বার্থে তার স্বদেশবাসী কর্তৃপক্ষ তাকে এরূপ একটি অসঙ্গত ক্ষমতায় ভূষিত করতে কার্পণ্য করেনি। যা হোক, ১৭৫৬ থেকে ১৭৭১-৭২ পর্যন্ত সময়-পর্বে কলকাতা 'কাউন্সিলে'র বাইরে ভূমিরাজস্ব বিষয়ে প্রায় একক ক্ষমতা প্রয়োগে সিলেক্ট কমিটি নামে একটি 'বডি' (Body) যেহেতু ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং 'কাউন্সিল' নিয়ে এখানে আর বিশদ আলোচনা অনুচিত মনে করি।

সিলেক্ট কমিটি

সিলেক্ট কমিটির উদ্ভব হয়েছিল ১৭৫৬ সালে।[১৪৩] প্রধানত প্রশাসনিক বিষয়ে বিশেষ করে ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও অন্যান্য ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই 'কমিটি'র ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। অনেকক্ষেত্রে চূড়ান্ত বললেও ভুল হয় না। 'কমিটি'র মোট সদস্য ছিল ৫ জন। তবে কখনও কখনও এর কমবেশিও হতো।[১৪৪] তন্মধ্যে 'কাউন্সিলে'র প্রেসিডেন্ট তথা 'গভর্নর অফ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' পদাধিকার বলে হতেন সভাপতি। বলাবাহুল্য বর্তমান যুগের ব্রিটিশ সরকারে কেবিনেট ও মিনিস্ট্রি'র যে অবস্থান, জন কোম্পানির যুগে সিলেক্ট কমিটি ও কলকাতা 'কাউন্সিলে'র মধ্যেও ছিল প্রায় একই সম্পর্ক। অর্থাৎ সিলেক্ট কমিটি ছিল ক্ষমতাধরদের মধ্যেই ক্ষমতাধর একটি কর্তৃপক্ষ।

এর সদস্যরা 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের মাধ্যমে মনোনীত বা নির্বাচিত হতেন। তবে কোন কারণে যেমন সদস্যদের মৃত্যু, পদত্যাগ প্রভৃতির ফলে পদ শূন্য হলে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় কর্মচারীদের মধ্য থেকে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে তা পূরণ করা যেতো। সাধারণত ৩ জন উপস্থিত হলেই সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় 'কোরাম' পূর্ণ হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এদেশে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনায় 'কাউন্সিল' যদি হয় 'মেশিন', তবে সিলেক্ট কমিটি ছিল সেই সরকাররূপী মেশিনের, স্যার জন ম্যালকম-এর ভাষায়, 'the real engine of Government.'[১৪৫] মুখ্যত ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত ও প্রাসঙ্গিক অন্য দু'একটি ব্যাপারে সিলেক্ট কমিটি বাংলা ও বিহারে যে ক্ষমতা নির্বাহ করতো তা নিচে আলোচনা করা হলো।

এক দেশীয় শাসক ও রাজন্যবর্গের সঙ্গে কোম্পানির রাজনৈতিক সংযোগ নির্মাণে, এবং প্রয়োজনে স্থানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কিত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতো সিলেক্ট কমিটি। স্বভাবতই এটি ছিল 'কাউন্সিলে'র মধ্যেই আর একটি শক্তিশালী কাউন্সিল।

দুই. স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তিবলয়ের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি সম্পাদন ব্যতীত যে কোন আলাপ-আলোচনা চালানোর অধিকার ছিল এর এক্তিয়ারে। তবে দেশীয় শক্তিগুলির সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য বা রাজনৈতিক মৈত্রীবিষয়ক চুক্তি সম্পাদনের বেলায় একে 'কাউন্সিলে'র প্রাগানুমোদন নিতে হতো।[১৪৬]

১৪৩. Cartier: Governor of Bengal, pp 155.

১৪৪. ঊর্ধপক্ষে এই সংখ্যা কখনও ৬-এ গিয়েও দাঁড়াতো। আবার নিম্নে ৪ বা ৩ পর্যন্ত হওয়ার নজিরও রয়েছে।

১৪৫. The Life of Robert Lord Clive, Sir John Malcolm, Vol. III., pp. 152

তিন. কলকাতা ও ২৪-পরগণা জমিদারি, হস্তান্তরিত ভূখণ্ড চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান-এর ভূমিরাজস্ব পরিচালনা ব্যতীত (এগুলি দেখতো কলকাতা 'কাউন্সিল') 'দিওয়ানি' ভূখণ্ডের ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসন পরিচালনার দায়-দায়িত্ব ছিল সিলেক্ট কমিটির ওপর। তবে সিলেক্ট কমিটির এই ক্ষমতা ২১শে মার্চ, ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় 'কনট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল। পরে তা এ দু'টি নতুন কাউন্সিলের ওপর অর্পিত হয়।

সিলেক্ট কমিটির ক্ষমতা অতঃপর মূলত রাজনৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

কনট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু

আলোচনা প্রসঙ্গে আগেই দেখানো হয়েছে কী পরিস্থিতিতে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় এই দু'টি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সুতরাং এখানে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলা নিষ্প্রয়োজন। 'দিওয়ানি' পর্বে বাংলা ও বিহারের ভূমিরাজস্বসম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে 'কনট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু' ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সংস্থা। মুর্শিদাবাদ কমিটিতে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ জন ও পাটনায় ৪ জন। এর কার্য-পরিধি আলোচনা করতে গেলে বলা যায় যে, ইতোপূর্বেকার অন্য কমিটিগুলি যেমন কমিটি অফ নিউ ল্যান্ডস, 'কাউন্সিল' বা সিলেক্ট কমিটি অপেক্ষা তা ছিল বেশ ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর আগে কলকাতা ও ২৪-পরগণা জমিদারির দেখভালের দায়িত্ব ছিল যেখানে কলকাতা 'কাউন্সিল'-এর ওপর এবং অনুরূপভাবে হস্তান্তরিত ভূখণ্ড (চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান)-এর জমিদারি দেখাশুনা করতো সিলেক্ট কমিটি, সেখানে এই প্রথমবারের মতো তা অর্পিত হয়েছিল 'কনট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু'-এর মতো একটি একক ও প্রায়-স্বাধীন (প্রতিটি সুবা'র ক্ষেত্রে) সংস্থার ওপর। এর কার্যকাল শুরু হওয়ার পর (এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১লা এপ্রিল, ১৭৭১) বাংলা ও বিহারের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় এ যাবৎ যে দ্বৈতাবস্থা বিরাজ করছিল অর্থাৎ এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকম নিয়ম-নীতির অবস্থিতি, তা অনেকখানি দূরীভূত হয়েছিল এবং একটি একক ও অবিভাজ্য ব্যবস্থা প্রচলনের পথ সুগম হয়েছিল।

এখানে 'কনট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু'-এর কার্য-পরিধি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

এক. 'দিওয়ানি' অধিকারভুক্ত ও হস্তান্তরিত ভূখণ্ড এবং কলকাতা জমিদারির ভূমিরাজস্ববিষয়ক যাবতীয় কায়-কারবার নির্বাহ ও এগুলির আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

---

১৪৬ সিলেক্ট কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্বন্ধীয় 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের ২৩শে মার্চ, ১৭৭০ সালের পত্রের অংশবিশেষ ছিল এরূপ: 'The Select Committee (is) to make regulations respecting peace and war, and negotiate with the country powers, but not finally to conclude any treaty until terms and conditions of such treaty shall have been first approved by our Governor and Council.' (সংগৃহীত, Cartier, Governor of Bengal, pp. 156-57)

দুই. নানা প্রকারের কর যেমন অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন আদায় (ফেরী, টোল প্রভৃতি), অন্তঃশুল্ক ও বহিঃশুল্ক ইত্যাদি দেখাশুনা ও নিয়ন্ত্রণ;

তিন. ভূমিরাজস্ব প্রদাতৃশ্রেণীর ওপর রাজস্ব আদায়ে কর্মচারীদের যে কোন ধরনের জোর-জুলুম ও অন্যায়ের প্রাথমিক শুনানি গ্রহণ ও প্রতিকার।

এ পর্যায়ে বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক উত্থান থেকে শুরু করে প্রত্যক্ষ শাসন ক্ষমতা গ্রহণ অবধি মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে নিয়োজিত 'রেসিডেন্ট'দের নাম-তালিকা উল্লেখপূর্বক এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করবো।[১৪৭]

১৭৫৭ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ দরবারে নিযুক্ত 'রেসিডেন্ট'গণ	
নাম	**কর্মকাল**
উইলিয়াম ওয়াট্স	ফেব্রুয়ারি ৯, ১৭৫৭ - জুন ১৪, ১৭৫৭
লিউক স্ক্রাফটন	জুলাই ১৭৫৭ - আগস্ট ১৭৫৮
ওয়ারেন হেস্টিংস	আগস্ট ১৭৫৮ - ফেব্রুয়ারি ১৭৬১
টমাস এমক্রেট	এপ্রিল ১৭৬৩ - জুন ১৭৬৩ (প্রস্তাবিত)
উইলিয়াম ওয়াট্স (২য়)	অক্টোবর ১৭৬৩ - মে ১৭৬৪ (অনুপস্থিত)
স্ট্যানলেইক বেটসন	মে ১৭৬৪ - আগস্ট ১৭৬৪
স্যামুয়েল মিডলটন	নভেম্বর ১৭৬৪ - আগস্ট ১৭৬৫
ফ্রান্সিস সাইক্স	আগস্ট ১৭৬৫ - জানুয়ারি ১৭৬৯
রিচার্ড বেচার	জানুয়ারি ১৭৬৯ - জানুয়ারি ১৭৭১
স্যামুয়েল মিডলটন (২য়)	সেপ্টেম্বর ১৭৭২ - ১৭৭৪

১৪৭ এদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, British Residents at the Darbar of Bengal Nawabs at Murshidabad, 1757-72

তৃতীয় অধ্যায়

কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসন ও ওয়ারেন হেস্টিংস

দিওয়ানি-উত্তর সময়ে বাংলা ও বিহারে কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড বিশেষত ১৭৬৯-৭০ সালের তথাকথিত দুর্ভিক্ষের আগেপরের বছরগুলিতে দ্বৈতশাসনের সুযোগে নবাবি ও কোম্পানির কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি, এবং তজ্জাত স্মরণকালের ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষে বাংলা ও বিহারের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক মানুষের মৃত্যু; সেই সঙ্গে সামগ্রিক শাসন-ব্যবস্থার অব্যবস্থাপনা ইংল্যান্ডের 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণের ক্ষোভ চরমে নিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য কোম্পানির কাজেকর্মে তারা আগে থেকেই ছিলেন যথেষ্ট অসন্তুষ্ট। ফলে এবার তারা এখানকার প্রশাসনিক বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। ঐতিহাসিক Meadows Taylor বলেন, 'The mischiefs of the double government, coupled with the famine, roused the directors to action."[১] অবশ্য 'ডিরেক্টর'দের হস্তক্ষেপ না করেও উপায় ছিল না। ১৭৬৯-৭০ সালের মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে বাংলা ও বিহারের কৃষককুলের অর্ধেকাংশই শুধু মৃত্যু মুখে পতিত হয়নি, বরং তার চেয়েও বড় কথা, জীবিত কৃষিজীবী শ্রেণীর দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া ও শহরে এসে তাদের আশ্রয় গ্রহণ এবং এর ফলে এলাকার পর এলাকা বিরাণ ভূমিতে পরিণত হওয়া[২]-- এই চিত্র দেশের ভবিষ্যত অর্থনীতির জন্য ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। মৌলত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিশেবে কোম্পানির জন্য তা ছিল আরও আশঙ্কাজনক ও দুশ্চিন্তার বিষয়। সাধারণ মানুষ না থাকলে তারা যেমন ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রি করতে পারবে না বা এদেশবাসীর উৎপন্ন দ্রব্যাদি কিনে অন্যত্র নিয়ে যেতে সক্ষম হবে না, তেমনি কৃষক যদি চাষাবাদই না করতে পারে তবে কোম্পানির ভূমিরাজস্বজাত আয়ও সঙ্গত কারণে হ্রাস পাবে, 'ডিরেক্টর'রা তা ভালো করেই জানতেন। আর অচিরে সেটাই ঘটলো। কোম্পানিকে ঋণের জন্য হাত পাততে হলো স্বদেশে সরকারের কাছে। অথচ কোম্পানির ছদ্মাবরণে এর বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগোষ্ঠী তাদের বৈধ-অবৈধ আয়-রোজগার তখনও যথাপূর্বং-ই চালিয়ে যাচ্ছিল। ড. তারা চাঁদ বলেন, 'But the strange fact was that although the servants of the Company accumulated riches, the Company itself was faced with serious financial difficulties."[৩]

---

১. A Student's Manual of the History of India, pp. 482.

২. দুর্ভিক্ষের পর বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমি পতিত হয়ে পড়েছিল। দেখুন, The Annals of Rural Bengal, pp. 60-61; The Oxford History of India, Vincent A. Smith, pp. 500.

৩. History of Freedom Movement in India, Vol. I., pp. 240.

সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হলেও এখানে এটা উল্লেখ করা দরকার যে, কোম্পানিকে এই সময় বার্ষিক প্রায় ৬,০০,০০০ পাউন্ড-স্টার্লিং দায় শোধ করতে হতো। এর মধ্যে স্বদেশে, প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বৃটিশ সরকারকে দিতে হতো ৪,০০,০০০ পাউন্ড। অন্যদিকে মোগল সম্রাট, বাংলার নবাব ও স্থানীয় বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে দেয়-এর পরিমাণ ছিল প্রায় ১,০০,০০০ পাউন্ডের মতো। সেই সঙ্গে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানির কুঠি, দুর্গ প্রভৃতি স্থাপনা রক্ষার্থ ৩০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনীও তাদেরকে প্রতিপালন করতে হতো। এখানে এ-ও উল্লেখ্য যে দিওয়ানি পর্বে কোম্পানির 'স্বত্বাধিকারী'গণও[৪] তাদের 'ডিভিডেন্ড'-এর পরিমাণ হঠাৎ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আগে যেখানে ৬% ডিভিডেন্ড দেয়ার চল ছিল, ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্বত্বাধিকারীগণ দাবি করেন ১০%, এবং পরে ১৭৭২ সালে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল সাড়ে ১২%। এ থেকেই বোধগম্য কোম্পানির আর্থিক অবস্থা এই সময় কতো নাজুক ছিল। বস্তুত এই অবস্থা মোকাবিলায় 'ডিরেক্টর'গণ সরকারের প্রতিশ্রুত বার্ষিক ৪,০০,০০০ পাউন্ড তো দিতে পারলেন-ই না, উপরন্তু তারা বৃটিশ সরকারের কাছে উল্টো বিপুল পরিমাণ ঋণ চেয়ে বসলেন। এটি ছিল বাংলার দুর্ভিক্ষকালীন সময়কার কথা। ফলে, 'This naturally raised an alarm and when the stories of the gruesome disaster of 1769-70 arrived in England, it became imperative to take immediate steps to put the Company's affairs in order.'[৫]

'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণ এবার সেদিকেই নজর দিলেন। 'কোর্ট' তাদের ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে আগস্ট তারিখের এক পত্র বলে কলকাতা কাউন্সিলকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলো, '*to stand forth as Diwan* and by the agency of the Company's servants to take upon themselves the entire care and management of the revenues.'[৬] দিওয়ান হিশেবে ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়বিষয়ক কাজকর্ম কোম্পানি ১২ই আগস্টের ফরমান বলে আগেই বৈধভাবে শুরু করেছিল। যদিও সেটি তারা প্রত্যক্ষভাবে না করে মূল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রেখেছিল মুহম্মদ রেজা খান (বাংলায়) ও সিতাব রায়-কে (বিহারে)। অন্যদিকে সাধারণ দৈনন্দিন প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা যদিও কাগজে-পত্রে ছিল তরুণ নবাবের হাতে, কিন্তু তারও কলকাঠি অন্তরালে থেকে তারাই নাড়ছিল। সুতরাং কার্যত সাধারণ ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসন -- উভয়ই পরিচালিত হচ্ছিল তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-উত্তর ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা তথা ক্লাইভের বহুলকথিত দ্বৈতশাসন ও সামগ্রিক অব্যবস্থাপনা নিরোধে কোম্পানি, এই প্রথমবার, 'কোর্টে'র নির্দেশ মূলে বাধ্য হলো সব কিছু সরাসরি নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করতে। এই আদেশ যখন জারি হলো তখন জন কার্টিয়ার ছিলেন

---

৪ স্বত্বাধিকারী (Proprietors) বলতে কোম্পানির সকল স্তরের চাঁদা-দাতা অংশীদার বা শেয়ার-হোলডারদের বুঝাতো। এদের ন্যূনতম চাঁদার পরিমাণ ছিল ৫০০ পাউন্ড। তবে 'কোর্ট অফ প্রোপ্রাইটর'দের সভাগুলিতে এরা অংশ গ্রহণ করতে পারলেও কোন ভোটাধিকার তাদের ছিল না। উল্লেখ্য ১,০০০ পাউন্ড চাঁদা-দাতাদের ভোট ছিল একটি, ৩,০০০-অলাদের দু'টি, ৬,০০০-অলাদের তিনটি, এবং ১০,০০০ ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ-ধারীদের চারটি। দেখুন, Analytical History of India, pp. 80.

৫ History of Freedom Movement in India, Vol. I., pp. 241

৬ Quoted from, The Fifth Report , pp. 520.

বাংলার গভর্নর। আগেই জানিয়েছি 'কনট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু' প্রতিষ্ঠা নিয়ে 'কাউন্সিল' ও সিলেক্ট কমিটির দ্বন্দ্বে কিছুটা অপমানিত হয়ে তাকে পদচ্যুত ও পরবর্তী গভর্নর (ওয়ারেন হেস্টিংস) না আসা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিল 'কোর্ট'।

যা হোক নতুন গভর্নর হিশেবে ওয়ারেন হেস্টিংস[৭] কলকাতায় পদার্পণ করেন ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৭২ সালে। তিনি দাযিত্ব গ্রহণ করেন ১৩ই এপ্রিলে।[৮] সামগ্রিক প্রশাসন কোম্পানির নিজ হস্তে গ্রহণ করার পূর্বোক্ত নির্দেশ তিনি পান পবের দিনই (১৪ই এপ্রিল)।[৯] সুতরাং বলা যায় কার্যারম্ভের প্রথম দিন থেকেই হেস্টিংস-এর কাঁধে বর্তেছিল সব কিছু ঢেলে সাজাবার এক বিশাল ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব।

এখানে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর শাসনকালীন বাংলা সম্বন্ধে আলোচনার আগে প্রসঙ্গত ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করে নিতে চাই। তিনি বলেন, 'বাংলায় ইংরেজী আমলের ইতিহাসে দুইটি কারণে হেস্টিংসের শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ এই সময়েই ইংরেজ কোম্পানি নিজের হাতে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ বাংলার বাহিরে যে সমুদয় স্বাধীন রাজ্য ছিল তাহাদের সহিত মিত্রতা ও সংঘর্ষের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের অন্যতম প্রধান রাজশক্তিতে পরিণত হয়।'[১০]

বলাবাহুল্য এ অধ্যায়ের আলোচনা আমরা বস্তুত হেস্টিংস-এর সময়কার বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ রাখবো। তবে যে পরিস্থিতিতে বাংলার প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে বিভিন্ন প্রদেশের প্রশাসনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল, সে সময়ের বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আভাস না দিলে সম্ভবত তার গৃহীত বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও সংস্কারের গুরুত্ব বুঝা দুষ্কর হবে। ফলে এখানে সেই আলোচনাও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করতে হবে।

---

৭. হেস্টিংস-এর জন্ম ৬ই ডিসেম্বর, ১৭৩২ সালে (দেখুন, Warren Hastings, Thomas B. Macaulay, Critical and Historical Essays, Vol. One, pp. 551; Life and Times of Warren Hastings: Maker of British India, pp. 7)। স্বভাবতই এ সময় তার বয়েস ৪০-এরও কম ছিল। তবে কোম্পানির বিভিন্ন স্তরে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাব প্রচুর ছিল। বর্তমান নিযুক্তির ২২ বছর পূর্বে তিনি এদেশে কোম্পানির একজন 'রাইটার' (সর্বনিম্ন পদ) হিশেবে এসেছিলেন। পরে বাংলা ও মাদ্রাজে 'এজেন্ট', 'জুনিয়াব মার্চেন্ট', 'সিনিয়াব মার্চেন্ট' (অব্যবহিত ধাবাবাহিক পদসমূহ), 'বেসিডেন্ট' ইত্যাদি অবস্থানে ক্লাইভ, ভ্যান্সিটার্ট প্রমুখেব সঙ্গে কাজ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ১৭৬৪ সালের নভেম্বরে তিনি কোম্পানির চাকুরি পরিত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কবেন (ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৫)। পরে ১৭৬৯ সালে তিনি মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন।

৮. মূলত কার্টিয়ারের কারণে তার দায়িত্ব গ্রহণে বিলম্ব হয়। কার্টিয়ার অবশ্য দায়িত্ব হস্তান্তরের পরেও ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক কারণে কিছুকাল (১৭৭২-এর শেষাব্দি) এদেশে থেকে গিয়েছিলেন।

৯ মারভিন ডেভিস পত্রটি ৬ই আগস্ট, ১৭৭২ তারিখে বাংলায় পৌঁছুনোর কথা বলেছেন। দেখুন, Life and Times of Warren Hastings: Maker of British India, A Mervyn Davies, pp 82.

১০. বাংলা দেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ, পৃষ্ঠা ৫।

এ সম্বন্ধে তার অন্যতম জীবনীকার A. Mervyn Davies-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তাঁর ভাষায়, বাংলার তখনকার অবস্থা ছিল এ রকম: 'The chief result of the Dual System was to let loose a horde of minor officials to prey on the peasants. The minister (Mohamed Reza Khan) was helpless as he could not enforce his authority, and the English were largely indifferent. The few who were sympathetic had not the necessary knowledge, experience or power to intervene effectively. There inevitably followed a rapid increase in internal disorder Crime, dacoity, vagabondage grew by leaps and bounds. The oppression of the peasants led to decrease in cultivation, and that to a loss of revenue as peasants left their land in despair. Thus the famine was not the only cause of the return of jungle. Incursions of bands of roving robbers and beggars and of neighbouring wild tribes grew yearly more serious. And in a very short time Bengal was reduced to a pitiable state.'[১১] শুধু তাই নয়, ভূমিরাজস্বের অবস্থাও যে তখন অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল সেটাও লেখক বর্ণনা করেন এভাবে: '... there could be no hope of revenue from a ruined land.'[১২] বলা যায় এটিই ছিল -- 'Such was the state of Bengal as Hastings found it.'[১৩]

যা হোক 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের পূর্বোক্ত পত্রের আদেশের ভিত্তিতে হেস্টিংস-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা ও বিহারের প্রত্যক্ষ দিওয়ানি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলো ১১ই মে, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে।[১৪] এ ছিল তাদের এক নতুন অভিজ্ঞতা। কারণ আগে তারা প্রথমে নবাব ও পরে 'নায়েব-ই দিওয়ান'-এর ছদ্মাবরণে (তাদেরকে শিখণ্ডী করে) রাজধানী মুর্শিদাবাদে অবস্থান নিয়ে তিনটি প্রদেশ শাসনে ভূমিকা রাখলেও এই প্রথম কোনরূপ ছদ্মবেশ ছাড়াই, বরং প্রকাশ্যে ক্ষমতার মসনদে আবির্ভূত হলো কোম্পানি ও এর স্থানীয় প্রশাসকবৃন্দ। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, কোম্পানির এই প্রত্যক্ষ শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ ছিল বাংলার ভূ-রাজস্ব ও আর্থনীতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ডেভিস যথার্থই বলেছেন, 'This was an epoch-making decision. It meant the scrapping of Clive's Dual

---

১১. Life and Times of Warren Hastings, pp. 74

১২. Ibid., pp. 74.

১৩. Ibid., pp. 74.

১৪. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 414; Land Revenue in India. Historical Studies, pp. 57.
কিন্তু উইলিয়াম হান্টার বলেন ৪ঠা মে-র কথা। তাঁর ভাষায়, 'The new President boldly accepted. the responsibilities of empire, and on the 4th of May the East India Company, by a solemn act, stood forth as the visible governors of Bengal' (The Annals of Rural Bengal, pp. 265).

System and the assumption by the Company of the undivided responsibility for the administration of the provinces that it had for so long refused. For it was but a short and immediate step from management of the revenues to management of the whole machinery of government, ... at one stroke a company of merchants transformed itself into a company of imperial administrators, and from it dates the establishment of British rule in India."[১৫]

বলাবাহুল্য ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই আগস্টের পরে এটি ছিল শুধু বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নয়, গোটা ভারতেরই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সুতরাং এ পর্যায়ে আমরা যে আলোচনা করবো সেটিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই গ্রহণ করলে পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সহায়ক হবে বলে মনে করি।

কোম্পানির দিওয়ানি গ্রহণের ফলে সঙ্গত কারণে প্রকাশ্যে 'নায়েব-ই দিওয়ান' মুহম্মদ রেজা খান ও সিতাব রায় দু'টি প্রদেশের ক্ষমতার মসনদ থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। রেজা খানকে হেস্টিংস-এর দায়িত্ব গ্রহণের কিছু দিনের মধ্যেই বিভিন্ন অভিযোগে[১৬] গ্রেপ্তার করা হয়েছিল (২৭শে এপ্রিল, ১৭৭২)। অবশ্য 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের নির্দেশেই হেস্টিংস বাধ্য হয়েছিলেন তাঁকে বন্দি করতে। উল্লেখ্য যে, ১৭৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষের অন্যতম হোতা হিশেবে 'কোর্ট' তৎকালীন বাংলার ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের প্রধান হিশেবে তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল।[১৭] কোম্পানির

---

১৫ Life and Times of Warren Hastings, pp 82

১৬. রেজা খানের বিরুদ্ধে 'কাউন্সিল' তাদের ১৬ই মে, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের পত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে যে ৫টি অভিযোগ আনয়ন করেছিল, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, The Transition in Bengal, pp. 330. যদিও এগুলি থেকে পরবর্তীকালে তাঁকে বে-কসুর খালাস দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এ থেকেই বুঝা যায়, মূলত সাধারণ জনগণের চোখে প্রকাশ্যে ক্ষমতা গ্রহণ যেন কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে না পারে, সে জন্য তাঁকে (রেজা খান) ও সিতাব রায়-কে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার করাই ছিল গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর মূল উদ্দেশ্য।

১৭. 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণ, 'কাউন্সিল'কে লিখিত তাদের ২৯শে আগস্ট, ১৭৭১ সালের পত্রে স্পষ্ট অভিযোগ জানিয়েছিল রেজা খানের বিরুদ্ধে, যা এ রকম: 'Notwithstanding we observe that Mahomed Reza complained of a monopoly of rice being carried on by other persons, we have received information that he himself, in the very height of the famine, has been guilty of great oppressions; that he has been guilty of stopping the merchants' boats loaded with rice and other provisions intended for the supply of Muxadabad (Murshidabad), and has forcibly compelled owners to sell their rice to him at a price so cheap as 25 to 30 seers per rupee, and resold it afterwards at the rate of 3 to 4 seers per rupee, and all other eatables in proportion, and that, although it is affirmed this conduct of Mahomed Reza Khan has operated in the destruction of many thousands of people, yet it has

ইংল্যান্ডীয় কর্তৃপক্ষের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্য বাংলার অত্যন্ত প্রভাবশালী 'নায়েব-ই দিওয়ান' হিশেবে রেজা খানের যে যথেষ্ট দায় ছিল তা কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করা যায় না।

যা হোক গভর্নর হেস্টিংস-কে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানি ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিলেও বস্তুত সেই ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি কিভাবে চলবেন অর্থাৎ তার প্রশাসনিক নীতি-পদ্ধতি কি হবে সে সম্বন্ধে তারা কিছুই বিশদভাবে জানায়নি। হেস্টিংসও তাই কিভাবে এবং কোথা থেকে তার কর্মযজ্ঞ শুরু করবেন, সে সম্পর্কে খুব একটা নিশ্চিত ছিলেন না। তবে সব কিছু বাদ দিয়ে হলেও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আশু সংস্কার করে তাতে যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করা দরকার, সে ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন, এ কথা না বললেও চলে।[১৮]

ফলে হেস্টিংস প্রথম থেকেই একটি শক্ত ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর কাজ করার মানসে বাংলার অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপকভিত্তিক সংস্কার সাধনের লক্ষ্য সামনে রেখে ১৪ই মে, ১৭৭২ সালে আপাত গ্রহণযোগ্য কিছু পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন, যেগুলি নিম্নরূপ:-

১. প্রকাশ্য নিলামেব মাধ্যমে ৫-বছব মেয়াদে ভূমি/ ভূমিবাজস্ব ইজারা বা বন্দোবস্ত প্রদান;

২ ৫-সদস্যবিশিষ্ট একটি 'কমিটি অফ সার্কিট' (যার প্রধান থাকবেন গভর্নব) গঠন। কমিটি তৎকালীন প্রধান প্রধান জেলাগুলি ব্যাপকহারে ঘুরে সেখানকার সামগ্রিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখবেন এবং পরে এর প্রতিবেদনেব ভিত্তিতে উপবিউক্ত বন্দোবস্ত-সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

৩. কোম্পানিব নিজস্ব (স্বদেশি) কর্মচারী যাবা বিভিন্ন জেলায় তত্ত্বাবধায়ক হিশেবে ইতোমধ্যে কর্মরত, তাদের বর্তমান পদবি 'সুপাবভাইজর' পবিবর্তন কবে তদস্থলে 'কালেক্টব' নাম প্রতিস্থাপন;

---

been overlooked by those in power, who ought to have prevented him from acting in a manner so inhumane, and so very unworthy the station which he fills as Naib Dewan of the Province of Bengal.' (The Fifth Report, pp 500).
এই অভিযোগের অনেকখানিই ছিল একতরফা ও ভিত্তিহীন। কিন্তু তাঁকে সরাতে সেটিকেই এবার হেস্টিংস সুযোগ মতো কাজে লাগালেন।

১৮. 'কমিটি অফ সার্কিট'-এর ২৮শে জুলাই, ১৭৭২ তারিখের কার্য-বিবরণীতে এর স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। এর অংশ ছিল এরূপ: 'The Revenue is beyond all question the first object of Government.' (দেখুন, The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 415).

৪. কালেক্টরদের সহযোগী হিশেবে এদেশীয়দের নিয়োগ, এদের পদবি হবে 'দিওয়ান'; এরা কালেক্টরদের কাজের স্বেচ্ছাচারিতা কিছুটা হলেও রোধ ('check') করতে ও তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত রাখতে ও পরামর্শ দিতে পারবেন;

৫. কোম্পানির কোন স্তরের কর্মচারীকেই ব্যক্তিগত ব্যবসায় বা ভূমিবাজস্ব বন্দোবস্ত ডাকে অংশ গ্রহণের সুযোগ না দেয়া;

৬. জমিদার-তালুকদার প্রভৃতি কর্তৃক কালেক্টরদের পুরস্কাব বা উপঢৌকন প্রদান নিষিদ্ধকরণ, এবং একইভাবে রায়তদের কাছ থেকে জমিদারদের কোনরূপ 'ভেট' বা উপহার গ্রহণ বন্ধ;

৭ কালেক্টর ও তাদের অধীন 'বেনিয়ান'গণ কর্তৃক রায়তদেরকে যে কোন অজুহাতে অর্থ দাদন নিষিদ্ধকরণ।

'কমিটি অফ সার্কিট' (Committee of Circuit) গঠিত হয়েছিল পাঁচ জন সদস্য সমন্বয়ে। বাংলার গভর্নর ও 'কাউন্সিলে'র প্রেসিডেন্ট হিশেবে হেস্টিংস নিজেও এর মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অন্যরা তথা পূর্ণাঙ্গ কমিটি নিম্নরূপ:-

গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস	প্রেসিডেন্ট
স্যামুয়েল মিডলটন[১৯]	সদস্য
জেমস লবেল	"
জন গ্রাহাম	"
ফিলিপ মিল্নার ড্যাক্রিস	"

কমিটির সদস্যদের নিযে হেস্টিংস বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জেলা সরেজমিনে পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে জুন মাসেই (তার নিজের ভাষ্য থেকে জানা যায় তা ছিল ৩রা জুন) ব্যাপকায়োজনে বেরিযে পড়লেন।

প্রথমে তারা নদীয়া জেলায় (মূলত কৃষ্ণনগরে) যান। সেখানে প্রকাশ্য নিলামে ইজারাদারদেব সঙ্গে ৫-বছর মেয়াদে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত বা ইজারা চুক্তি সম্পাদন করেন। সেখান থেকে তারা গেলেন রাজধানী মুর্শিদাবাদ (মূলত কাশিমবাজারে)। জুন মাসের শেষ দিকে এখানে পৌঁছুলেও তিনি বিভিন্ন কাজে মুর্শিদাবাদে প্রায় আড়াই মাস অবস্থান করেছিলেন। এখানেও বিভিন্ন ইজারাদারদের সঙ্গে ৫-বছরের রাজস্ব বন্দোবস্ত চুক্তি সম্পন্ন করেন; সেই সঙ্গে তৎকালীন নবাব

১৯ বিচার্ড বেচার-এর পরে স্যামুয়েল মিডলটন মুর্শিদাবাদের 'রেসিডেন্ট' পদে বরিত হয়েছিলেন। 'কমিটি অফ সার্কিট'-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় এর অতিরিক্ত তিনি ছিলেন গ্রেপ্তারকৃত 'নায়েব-ই দিওয়ান' রেজা খানের স্থলাভিষিক্ত।

পরিবারের বাস্তব অবস্থা সন্দর্শনে নবাবকে এ যাবৎ প্রদত্ত 'পেনশন'-এর ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের 'কনট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেন্যু' বিলুপ্ত করে[২০] এর বদলে কলকাতা কাউন্সিলের সকল সদস্য সমন্বয়ে একটি ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' গঠনের চিন্তা করেন।

এছাড়া 'খালসা' প্রশাসনেব কেন্দ্রবিন্দু মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে কলকাতায় আনয়নের বিষয়েও সদস্যদের সঙ্গে আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত নেন (উল্লেখ্য, ১৫ আগস্ট তারিখে 'কমিটি অফ সার্কিট' কাশিমবাজারে বসে প্রায় ৩৭টির মতো অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, যেগুলি 'কাউন্সিলে' গৃহীত হয়েছিল ২১শে আগস্ট, ১৭৭২)। যা হোক, এভাবে বিভিন্ন জেলা পবিদর্শন (তার সহযোগীরাও বিভিন্ন জেলায় গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে ৫-বছরের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন[২১]) শেষে হেস্টিংস ১৫ই সেপ্টেম্বর কলকাতার উদ্দেশ্যে কাশিমবাজার ত্যাগ করেন। পরে অক্টোবরে (১৩ই) নবগঠিত 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' কলকাতা কাউন্সিলে প্রথমবাবের মতো বৈঠকে বসেছিল। অবশ্য ইতোমধ্যে গ্রাহাম, লরেল প্রমুখের প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত হেস্টিংস 'কাউন্সিল'-এর অন্য সদস্যদের দাযিত্ব দিয়েছিলেন যশোহর, কলকাতা, হুগলি, বীরভূম ও মেদিনীপুবের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত সম্পন্ন করতে। পরে তারা চুক্তি সম্পাদন শেষে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ কলকাতা ফিরে এলে[২২]

২০ 'কনট্রোলিং কাউন্সিল অফ বেভেন্যু'-এব সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১০ই অক্টোবর, ১৭৭২ সালে। দেখুন, The Fifth Report, pp 505.

২১. মিডলটন মুর্শিদাবাদেই থেকে গিয়েছিলেন দরবারের নতুন 'রেসিডেন্ট' পদে যোগ দিতে। তাকে 'রেসিডেন্ট'-এর অতিরিক্ত কাশিমবাজার কুঠিব 'চীফ' ও বাজশাহির 'কালেক্টব'-এর দায়িত্বও দেয়া হয়েছিল যাতে কবে স্থানীয়ভাবে ৫-বছর মেযাদি ভূমিবাজস্ব বন্দোবস্ত করতে পাবেন। 'কমিটি'ব অন্য সদস্যগণ অর্থাৎ লবেল, গ্রাহাম ও ড্যাক্রিস বিভিন্ন জেলায ঘুরে ঘুরে ৫-বছর মেয়াদি বন্দোবস্তেব কাজ চালাতে লাগলেন। তন্মধ্যে ঢাকায় (১লা অক্টোবব থেকে ২৭শে নভেম্বর, ১৭৭২), বংপুরে (৩০শে ডিসেম্বর), দিনাজপুরে (২৬শে জানুয়ারি, ১৭৭২), পূর্ণিয়ায় (ফেব্রুয়ারি ২ থেকে ৯, ১৭৭৩ খ্রিঃ) এবং রাজমহলে (১৮ই ফেব্রুয়াবি) স্থানীয়দের সঙ্গে প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত চুক্তি করেন।

২২ 'কমিটি অফ সার্কিট'-এব সদস্যমণ্ডলী কোম্পানির রাজস্ব আয়ের স্বার্থে ও বাংলার ভূমিবাজস্ব ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে এই সময় গোটা বাংলা পরিভ্রমণের মতো দুরূহ কার্যে যে কী কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তাব একটি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলো হান্টারের 'The Annals of Rural Bengal' (pp.265) থেকে, যেখানে ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন, 'Committees of circuit, composed of the ablest men in the Council, journeyed from district to district, careless of the deadly heat of summer and the more deadly malaria of the rains investigated the capabilities and necessities of each division on the spot, adjusted the revenues, and righted ancient wrongs with a strong hand .'

আসলে যে কোন সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষকে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করতে হয় এবং এ জন্য অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ও কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করে নিতে হয় তাদের এই পরিভ্রমণ থেকে সেটাই ফুটে উঠেছিল।

হেস্টিংস, 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর সভায় বাংলার ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছিলেন (এর পিছনে তার মোটামুটি ৭টি মূল লক্ষ্য ছিল), সেগুলি নিচে উল্লেখ করা হলো।[২৩]

১ এদেশে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব বা আধিপত্য এবং বৃটিশ সরকারের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা,

২ সকল ধরনের গোপন তৎপরতা ও প্রভাব নির্মূলান্তে কোম্পানির সরকারের হাতে প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব ন্যস্তকরণ বা গ্রহণ;

৩ জনসাধারণ বিশেষত ভূমিরাজস্ব প্রদাতৃশ্রেণী যাতে করে তাদের যে কোন ধরনের অভাব-অভিযোগ নিয়ে প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলের দোরগোড়ায় সরাসরি আসতে পারে এমন অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি;

৪ রায়ত সাধারণকে উৎপীড়ন-ধর্মী করের হাত থেকে রক্ষা,

৫. একটি সংগঠিত ও নিয়মিত বিচার ব্যবস্থার প্রচলন;

৬ একটি সমন্বিত ও যুগোপযোগী রাজস্ব ব্যবস্থার অনুসরণের মধ্য দিয়ে কোম্পানির বিপুল দায়-দেনা পরিশোধান্তে রাজস্ব উদ্বৃত্ত সৃষ্টি বা সঞ্চয় ও বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধি; এবং

৭ কোম্পানির রাজনৈতিক প্রতিপত্তি তথা স্থিত প্রভাব-বলয় সম্প্রসারণ।

বলাবাহুল্য এর মধ্যে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক সংস্কার জড়িত বিষয়গুলিই এখন বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

নবাবি প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংস্কার

এক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রশাসনিক ব্যয় সঙ্কোচনের লক্ষ্যে হেস্টিংস প্রথমেই নজর দিলেন নবাবকে প্রদত্ত বার্ষিক 'পেনশন'-এর ব্যয় বরাদ্দ হ্রাসের দিকে। অবশ্য তার ক্ষমতা গ্রহণের আগেই এর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।[২৪] হেস্টিংস সেটিকে আরও সঙ্কুচিত ও নিয়মিত করেন এই যা। উল্লেখ্য,

on the spot, adjusted the revenues, and righted ancient wrongs with a strong hand.'
আসলে যে কোন সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষকে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করতে হয় এবং এ জন্য অত্যন্ত নিবেদিত-প্রাণ ও কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করে নিতে হয় তাদের এই পরিভ্রমণ থেকে সেটাই ফুটে উঠেছিল।

২৩ Monckton-Jones in Warren Hastings in Bengal, 1772-1774, pp 121, quoted from, Life and Times of Warren Hastings, pp 85-86

২৪ হেস্টিংস-এর দায়িত্ব লাভের আগেই ১৭৭২ সাল (জানুয়ারি) থেকে নবাবের 'পেনশন' কমিয়ে দেয়া হয়েছিল। দেখুন, A Statistical Account of Bengal, Vol. IX, pp 193

এ সময় মিরজাফবের তরুণ পুত্র মুবারকউদ্দৌলার নামে মুর্শিদাবাদের নবাবি তখত পরিচালিত হলেও নানা কারণে নবাব পরিবাব তখন ছিল ঘরোয়া রাজনীতি ও দলাদলিতে বিভক্ত। ফলে সুযোগ বুঝে কোম্পানি নবাবেব বাৎসরিক 'পেনশন' ৩২ লক্ষ থেকে কমিয়ে ১৬ লক্ষে স্থিব করলো[২৫]। নবাবেবও তা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। অধিকন্তু হেস্টিংস, মিবজাফবেব বৃদ্ধা মহিয়সী মুন্নি বেগমকে আনুষ্ঠানিকভাবে[২৬] নবাবের দেখাশুনার দায়িত্বে নিযুক্ত কবে নবাবকে

---

২৫. অধিকাংশ ঐতিহাসিকই নবাবের বাৎসবিক 'পেনশন' ৩২ লক্ষ থেকে কমিয়ে ১৬ লক্ষ কবা হয়েছিল বলে উল্লেখ কবেছেন (দ্রষ্টব্য, The Cambridge History of India, Vol V, pp. 210, A Statistical Account of Bengal, Vol IX, pp 193, A Constitutional History of India, 1600-1935, Dr Arthur Berriedale Keith, pp 60, History of the Muslims of Bengal, Vol IIA, pp 50, History of British India under the Company and the Crown, pp 172 প্রভৃতি)।

কিন্তু অনেকে আবাব যেমন ভিনসেন্ট এ স্মিথ (The Oxford History of India, pp. 503), ড. পারসিভ্যাল স্পীয়াব (The Oxford History of Modern India, pp. 59), ড মুহম্মদ আবদুব রহিম (A Short History of Pakistan, Book Four, pp 68), অতুল সুব (আঠাবো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৭১) বলেন তা ১৫ লক্ষে নামিয়ে আনা হয়েছিল। উল্লেখ্য ড. স্মিথ ও ড স্পীয়াব সূত্রে আর একটি তথ্য জানা যায় যে নবাবের বার্ষিক 'পেনশন' ইতোপূর্বেই অর্থাৎ ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে ৫৩ থেকে ৪১ লক্ষ এবং পরের বছব (১৭৬৭) ৪১ থেকে ৩২ লক্ষ কবা হয়েছিল।

২৬. মিরজাফবের এই বিধবা পত্নীকে আনুষ্ঠানিকভাবে নবাবেব অভিভাবক নিযুক্ত কবায় 'কমিটি অফ সার্কিট'-এব সকল সদস্যেব সমর্থন ছিল। এঁকে নবাবের অভিভাবকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত কবাব জন্যে সংশ্লিষ্টরা বিশেষ করে হেস্টিংস গতানুগতিক নিয়মানুযায়ী তাঁব কাছ থেকে আনন্দ-স্ফূর্তিব খরচ বাবদ ১৫,০০০ পাউন্ড আদায় কবেছিলেন। অন্যদের জন্য উপঢৌকন গ্রহণ নিষিদ্ধ হলেও তাব জন্যে সেটি তখনও বৈধ ছিল (?), দেখুন, The Agrarian Policy of the British in Bengal, pp 164 এই ছিল তৎকালীন প্রশাসনের নৈতিকতা। ড. অতুল সুব, মহারাজা নন্দকুমাবের সূত্রে জানান, রাজা, হেস্টিংস-এব বিরুদ্ধে মুন্নি বেগমেব কাছ থেকে এই পদায়ন বাবদ ৩,৫৪,১০৫ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছিলেন। (আঠাবো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৭৩)। যা হোক, বয়েসী ও বিধবা মুন্নি বেগমকে নিয়োগেব পিছনে তাদের দুর্বভিসন্ধি যে ছিল সেটা স্পষ্ট। ড ইন্দ্রানী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'In 1772, Warren Hastings' restoration of Manni to the principal position in the Mahalsarai was tied up with the commercial interests of the East India Company, whose representatives from 1770 had been pressing the Naib Nazim, Reza Khan, to curtail the expenditure of the Nizamat and divert the funds towards maintaining some battalions of English troops Ousting Reza Khan, who had championed a geneaological mother's claim, and appointing Manni Begam to the Regency was significant because the latter had been privileged on grounds of her current *childlessness*: . ' (Gender, Slavery and Law in Colonial India, Dr. Indrani Chatterjee, pp. 61)

যেমন একদিকে আরও ঠুঁটো জগন্নাথ করে ছাড়লেন, তেমনি সেই সঙ্গে নবাবের পালক-মাতাকে (নবাবের আপন গর্ভধারিণীর নাম ছিল বাব্বু বেগম) তাঁর (নবাবের) প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে খাড়া করলেন। অর্থাৎ চিরাচরিত অভ্যন্তরীণ রাজনীতির খেলা ভালোই জমে উঠেছিল। কারণ পালক-মাতা হোক আর যাই হোক, ক্ষমতার ভাগাভাগি কেউই চায় না। তরুণ মুবারকউদ্দৌলাও তা চাইতেন না তা বলাবাহুল্য। অন্যদিকে হেস্টিংস, নবাবের ব্যয় অর্ধেকে হ্রাস করলেও দিল্লির বাদশাহকে প্রতিশ্রুত বাৎসরিক দেয় একেবারে বন্ধ করে দিলেন।[২৭] তাঁর কাছ থেকে কোরা ও এলাহাবাদ কেড়ে নিয়ে অযোধ্যা (Oudh) -এর নবাবকে দিলেন ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে।[২৮] উল্লেখ্য যে 'নায়েব-ই নাজিম' (দিওয়ান)-এর পদ এই সময় প্রায় খালিই ছিল অর্থাৎ স্যামুয়েল মিডলটন এই পদে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন; কিন্তু যেহেতু একই সঙ্গে তাকে কাশিমবাজার কুঠির 'চীফ' ও রাজশাহির 'কালেক্টরে'র কাজও করে যেতে হচ্ছিল, সেহেতু এবার তাকে সহযোগিতা করার জন্যে 'রায়-রায়ান' পদবি দিয়ে একজন এদেশীয়কে নিয়োগ করা হলো। নতুন ব্যবস্থায় এর কাজের দায়িত্ব ছিল অত্যধিক। ঐতিহাসিক R.B.Ramsbotham বলেন, '... the rai raian, .. was a most important person; his duties included the supervision of all the provincial diwans attached to the various collectorships.'[২৯] এর মাসিক বেতন ছিল ৫,০০০ টাকা। প্রথম 'রায়-রায়ান' নিযুক্ত হলেন বিখ্যাত নন্দকুমারের ছেলে রাজা গুরুদাস এবং তার সহযোগী হিশেবে তদীয় ভগ্নিপতি জগৎ চন্দ্র। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, মুহম্মদ রেজা খান ও নন্দকুমার -- দু'জনই স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথেষ্ট কীর্তিমান ও প্রভাবশালী, এবং মারভিন ডেভিস-এর ভাষায়, 'most prominent and wealthy noblemen of Bengal of their day'[৩০] হওয়া সত্ত্বেও, হেস্টিংস চেয়েছিলেন গুরুদাস-কে নিয়োগ করে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে। একদিকে রেজা খানকে গ্রেপ্তার করে তিনি যেমন প্রশাসনে মুসলমান অংশীদারিত্ব ও প্রভাব খর্ব করতে চেয়েছিলেন[৩১], অন্যদিকে তেমনি মহারাজা নন্দকুমারের সঙ্গে তার যে ব্যক্তিগত বিরোধ বা শত্রুতা ছিল (যে কারণে তিনি তাকে ফাঁসিতে পর্যন্ত লটকিয়েছিলেন) এবং তাকে হয়রানি করার ফলে হিন্দু জনসমাজের মধ্যেও তার প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্ম হচ্ছিল, 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের পরামর্শে সেটিকে তিনি প্রশমিত করেন মূলত মুন্নি বেগম ও গুরুদাসের নিয়োগের মাধ্যমে।

২৭ A History of India: From the Earliest Times to the Present Day, Michael Edwardes, pp 198.

২৮ History of British India, P.E. Roberts, pp. 173; A New Look on Modern Indian History, pp 100.

২৯ The Cambridge History of India, Vol. V., pp 416

৩০ Life and Times of Warren Hastings, pp. 92.

৩১ ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম বলেন, 'In 1772 Warren Hastings dismissed Muhammad Raza Khan from the office of **naib diwan** and assumed the direct responsibility of the Diwani administration. As a result of this step, a large number of Muslims holding high posts in the diwani office were dispossessed of their jobs.' (The Muslim Society and Politics in Bengal, pp 44).

এ পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে হেস্টিংস সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সুদূরপ্রসারী গুরুত্ববহ ও বিশেষত বাংলার এ অঞ্চলের আপামর সাধারণ মানুষের পক্ষে সুবিধাজনক যে পদক্ষেপটি গ্রহণ করলেন তা 'খালসা'সহ অপরাপর সরকারি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি বাংলার তৎকালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় আনয়ন।[৩২] অবশ্য তিনি এটি করেছিলেন কোম্পানির স্বার্থে। অধ্যাপক জগন্নাথ পাটনায়েক বলেন, 'With a view to establishing the supremacy of the Governor and his Council over financial matters, the Treasury was shifted from Murshidabad to Calcutta, which was the Headquarters of the Company.'[৩৩] বলাবাহুল্য, 'This resulted in a more direct and more effective control over, and supervision of, the treasury.'[৩৪]

পরবর্তীকালে সদর দিওয়ানি আদালত ও সদর ফৌজদারি আদালত প্রভৃতি এখানে (কলকাতা) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই সময় কলকাতার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, মোগল আমলে যে কলকাতা ছিল হুগলি নদী-তীরবর্তী একটি নিতান্ত গণ্ডগ্রাম বা অজ পাড়া গাঁ মাত্র, এবং ইংরেজ-বণিক জব চার্নকের কৃপায় (২৪শে আগস্ট, ১৬৯০) একটি ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি ও পরবর্তীকালে একে (সুতানটি ও গোবিন্দপুরসহ) কেন্দ্র করে এখানে মোটামুটি একটি সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠলেও কলকাতা কখনই বাংলার তৎকালীন বড় বড় নাম-করা নগরগুলির (যেমন মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, হুগলি বা পাটনা, চট্টগ্রাম) মতো ছিল না। বরং হেস্টিংস কর্তৃক মুর্শিদাবাদ থেকে 'খালসা'সহ অন্যান্য সরকারি দপ্তর স্থানান্তরের আগ পর্যন্ত যা মূলত বরাবরই ছিল একটি অন্যতম বাণিজ্য-কেন্দ্র[৩৬], এবার সেটিই হয়ে দাঁড়ালো -- 'Calcutta

৩২. ঐতিহাসিক কুমুদনাথ মল্লিক অবশ্য ১৮৪৬ সালের 'কলকাতা রিভিউ' (৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪১০) এর বরাতে লিপিবদ্ধ করেছেন, 'হেষ্টীংস সাহেব .. মুরসিদাবাদ হইতে খাজনা-দপ্তর নদীয়ান্তর্গত "সুখসাগরে" এবং অন্যান্য যাবতীয় সরকারী কার্য্যালয় মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিলেন।' (দেখুন, নদীয়া কাহিনী, পৃষ্ঠা ৩৬)।
তবে তাঁর এ বক্তব্যের সমর্থনে অন্য কোন ঐতিহাসিকের মন্তব্য পাওয়া যায় না।

৩৩ British Rule in India: A Select Study, Jagannath Patnaik, pp 57-8

৩৪. Ibid., pp. 58.

৩৫ মুর্শিদাবাদস্থ 'খালসা' ভূমিরাজস্ব দপ্তর ও আদালতগুলি মূলত কোম্পানির জুনিয়র সদস্যরাই দেখাশুনা করতো। এখন সেটা কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত ঊর্ধতন ও অভিজ্ঞ কর্মচারীদের দ্বারা তা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবার পথ সুগম হলো।
ড. স্মিথের ভাষায়, '... Murshidabad, where it had been controlled by juniors, to Calcutta, where it could be supervised by senior servants ' (The Oxford History of India, pp 503).

৩৬. ড. পারসিভ্যাল স্পীয়ার বলেন, 'Calcutta was never anything else but a commercial centre.' অবশ্য পরে এটিই '..steadily established its claim to the title of 'City of Palaces ' (The Nabobs. A Study of the Social Life of the English in Eighteenth Century India, Dr Percival Spear, pp 25)

was now the real capital of the country."[৩৭]

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসন সংস্কার

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনসম্পর্কিত আলোচনায় গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কার্যকালকে আমরা প্রধানত দু'টি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। স্বনামধন্য ইংরেজ ঐতিহাসিক P.E.Roberts বলেন, 'The administration of Warren Hastings falls into two unequal divisions -- the first from April 13, 1772, to October 19, 1774, when he was Governor of Fort William in Bengal; and the second from October 20, 1774, to February 8, 1785, when he became 'Governor-General of the Presidency of Fort William in Bengal', under the constitution set up by the Regulating Act.'[৩৮]

এখানে আগেই জানিয়ে রাখা ভালো যে, বাংলার গভর্নর হিসেবে হেস্টিংস রাজস্ববিষয়ক যে সব সংস্কার, ব্যবস্থা-পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন এর কিছুটা ছিল ইংল্যান্ডের 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের লিখিত পরামর্শে বা তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে, কিন্তু স্থানীয়ভাবে কখনও সম্পূর্ণ একক সিদ্ধান্তে ও 'কাউন্সিলর'দের সঙ্গে মিলে, যৌথ সিদ্ধান্তক্রমে। 'কোর্ট' যখন তাকে গভর্নর পদে প্রথম নিয়োগ করে তখনই তাকে তারা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অনুমতি ও ক্ষমতা দিয়েছিল যে, সংস্কারমূলক কাজে বিশেষত ভূমিরাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। তাদের ভাষায়, 'We now arm you with our full powers to make a complete reformation.'[৩৯] 'কাউন্সিলে'র ৯-জন সদস্যের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন, যদিও পদের দিক দিয়ে প্রথম ও প্রধান কিন্তু ভোটাভুটির ক্ষেত্রে তার অতিরিক্ত ক্ষমতা ছিল শুধু 'কাস্টিং' ভোট প্রদানের। স্বভাবতই অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হতো। যে কারণে অনেক ঐতিহাসিকই তার এই অবস্থানিক দুর্বলতায় পীড়িত হয়েছেন। তার অন্যতম জীবনীকার ডেভিস তো বলেই ফেলেছেন, 'Hastings was the chosen agent of reform to save Bengal and the Company from ruin, but the difficulties with which he was faced in attempting to carry out

---

৩৭ A Constitutional History of India, Dr Keith, pp 60
সত্য কথা বলতে এরপর থেকেই এই ঐতিহাসিক নগরী -- 'The city attracted Europeans in and out of the Company's service and a rich Indian community of merchants, zamindars living in their town houses, and professional people Above all, Calcutta was becoming a magnet for migratory labour, not only from Bengal but from all parts of eastern India.' (Professor P J. Marshall in History of Bangladesh 1704-1971, Vol. Two, pp 79).

৩৮ History of British India, pp 170.

৩৯ Quoted from, Life and Times of Warren Hastings, pp. 78, Indian Land-System: Ancient, Mediaeval and Modern. Dr. Radha Kumud Mookerji, pp. 192-93.

this mission were great enough to daunt even the most courageous ... He lacked power, the autocratic kind of power that is needed to enforce a scheme of radical reform against the opposition of vested interests. ... In other words, notwithstanding their high-sounding declaration, the Directors armed him with no increase of authority: the same powers that had proved inadequate to his predecessors were still to be his."[৪০] ডেভিস-এর এ বক্তব্য অবশ্য পুরোপুরি সঠিক নয়। তবে এখানে তা উল্লেখ করার কারণ হলো, যে পরিস্থিতিতে হেস্টিংস তার আমলীয় সংস্কারসমূহ করেছিলেন, সেই সময় ও পরিবেশ যদি ডেভিসের ভাষ্য মতে এতোই তার জন্য প্রতিকূল হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী আলোচনায় আমরা ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত (প্রসঙ্গত দিওয়ানি বিচার ব্যবস্থাও) যে সব কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে দেখতে পাবো[৪১], সেগুলি করতে পারা তার জন্য নিশ্চয়ই যথেষ্ট শক্তি, সাহস ও নিজের প্রতি অবিচল আস্থার পরিচায়ক ছিল, তা স্বীকার করতে হবে। কেননা পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বাংলায় সূচিত তার আমলীয় প্রশাসনিক অবকাঠামোই পরবর্তী সময়ে গোটা ভারতের জন্য একটি সুদূরবিস্তৃত প্রশাসনযন্ত্রের সূচনা করেছিল, এবং সেই প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত ও অনুসৃত ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে কোম্পানি, বৃটিশ সরকার ও জনগণের জন্য অর্থনৈতিকভাবে সুফলদায়ক বিবেচিত হয়েছিল (যদিও বাংলার জন্য তা ছিল খুবই ক্ষতিকর)। বলাবাহুল্য যে, 'কাউন্সিলে' হেস্টিংস একেবারে, যতোটা ডেভিস বলেছেন, ততোটা ক্ষমতাহীন ও নির্বীর্য ছিলেন না ; বরং তার প্রবল ব্যক্তিত্ব ও মোহনীয় ক্ষমতার আকর্ষণ কখনও কখনও এতো বেশি দূর সম্প্রসারিত হয়েছিল, বিশেষ করে ক্লেভারিং প্রমুখ বৈরী কাউন্সিলরদের অনুপস্থিতিকালে, তখন নিতান্তই সন্দেহ হতো যে সম্ভবত 'কাউন্সিলে' তার অপ্রতিহত প্রতিপত্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির বুঝি কেউ নেই। T B.Macaulay-এর কথায়, 'The English council which represented the Company at Calcutta .... At present the Governor is, as to all executive measures, absolute. He can declare war, conclude peace, appoint public functionaries or remove them, in opposition to the unanimous sense of those who sit with him in council. They are, indeed, entitled to know all that is done, to discuss all that is done, to advise, to remonstrate, to send protests to England. But it is with the Governor that the supreme

৪০. Life and Times of Warren Hastings, pp. 78.

৪১. ভূমিরাজস্ব ও জমাজমিসংক্রান্ত তথা দিওয়ানি বিচার ব্যবস্থায় তিনি যে সংস্কার কার্য করেছিলেন, ড সিরাজুল ইসলাম তার অনেকগুলিকেই শুধু সংস্কার বলতে নারাজ। হেস্টিংস-এর ১৭৭২ সালের বিচারশাসন-পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, 'সাধারণ পাঠ্যপুস্তকে ইহা হেস্টিংসের শাসনসংস্কার নামে পরিচিত। কিন্তু ইহা কোন পূর্ব ব্যবস্থার সংশোধন বা সংস্কার নয়। ব্যবস্থা হিসেবে ইহা সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা। একে সংস্কার বলা ভুল।' (বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ১১২)। আমরাও ড ইসলামের এই ধারণার সঙ্গে একমত।

power resides, and on him that the whole responsibility rests."[৪২]

প্রাথমিক অবস্থায় স্থানীয়ভাবে অনুসরণীয় কোন সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক নীতিমালা বা 'গাইড-লাইন'-এর অভাবে হেস্টিংস তার এই স্বাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ মূলত করতে পেরেছিলেন ১৩ই এপ্রিল, ১৭৭২ (ক্ষমতারোহণের কাল) থেকে ১৯শে অক্টোবর, ১৭৭৪ সন পর্যন্ত। অতঃপর ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' পাশ হওয়ার পর অর্থাৎ ২০শে অক্টোবর, ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'গভর্নর-জেনারেল' নিযুক্তি থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৫ তারিখে পদত্যাগ পর্যন্ত যে তাকে একটি সুনির্দিষ্ট পথ ও নিগড়ে চলতে হয়েছিল। অবশ্য শেষের ৫/৬ বছর আবার তিনি স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করতে পেরেছিলেন।
এ পর্যায়ে তার গভর্নরকালীন গৃহীত ব্যবস্থাদি আলোচনা করা হলো :

পাঁচসালা বন্দোবস্ত

আগেই দেখিয়েছি, ১৪ই মে, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস যে পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন তাতে বাংলা ও বিহারের (ওড়িশান্তর্গত হুগলির আংশিক ও মেদিনীপুরও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত) সমুদয় ভূমিখণ্ড প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ক্রেতার মধ্যে ৫-বছর মেয়াদে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এ জন্য তিনি নিজে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে গিয়ে প্রকাশ্য নিলাম ডাকের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে লিখিত চুক্তি করেন। তার অপরাপর সহযোগীরাও বিভিন্ন জেলাগুলির বন্দোবস্ত কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু এই পাঁচসালা বন্দোবস্ত প্রথায় তারা যে সকল বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন সেগুলি এখানে বিশদভাবে তুলে ধরা জরুরি এই জন্য যে, এতে করে এই পর্বে কোম্পানির সরকারের অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে।
এক. কোম্পানির সরকার প্রধানত জমিদার বা তালুকদার ও ইজারাদারদেরকে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানালে যে সর্বোচ্চ ডাক দিতে সমর্থ হলো তার সঙ্গেই বস্তুত সরকারের ৫-বছরের রাজস্ব চুক্তি বা 'আমিলনামা' সম্পাদিত হয়েছিল (৫-বছরের সাধারণ মেয়াদকাল ধরা হয়েছিল ১০ই এপ্রিল, ১৭৭২ থেকে ১০ই এপ্রিল, ১৭৭৭ সাল পর্যন্ত)। সরকার নিলাম ডাকের আগেই দিওয়ান-আমিল, মুৎসুদ্দি প্রভৃতির দপ্তরে রক্ষিত কাগজ-পত্র, খতিয়ান, দলিল-দস্তাবেজের নিরিখে পরগণাভিত্তিক একটি আপাতগ্রাহ্য 'হস্তবুদ' (মোটামুটি সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকার 'জমা'কে প্রাথমিক ভিত্তি হিশেবে ধরা হয়েছিল) প্রস্তুত করেছিল। এতে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ, রায়তদের দেয় খাজনার বর্ণনা, আবওয়াব ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। একার্থে নতুন ডাক-গ্রহীতাগণ এরই ভিত্তিতে স্ব স্ব এলাকায় আগামী ৫-বছরের জন্য ক্রম-বর্ধিত হারে ভূমিরাজস্ব প্রদানের শর্তে স্বীয় অধিক্ষেত্রের খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করেছিলেন মাত্র। তবে উল্লেখ্য যে, প্রকাশ্য নিলাম ডাকে কাঁচা পয়সার মালিক নব্য ধনী ও বণিকশ্রেণী বিশেষত কলকাতা 'বেনিয়ান'দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী ও বংশানুক্রমিক জমিদার-তালুকদারশ্রেণী ও প্রভাবশালী অবস্থাপন্নরা অনেক ক্ষেত্রেই টিকতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য ঐতিহাসিকভাবে বাংলায় জমিদারি-তালুকদারি ছিল সামাজিকতা ও আভিজাত্যের

৪২. Warren Hastings, in Critical and Historical Essays, Vol. One, pp 560

প্রতীক। ফলে হঠাৎ ভুইফোঁড়দের অর্থ-প্রতিপ্রত্তির কাছে এই শ্রেণীর পরাজয়ে এদের নিজেদের বংশ মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান যেমন নড়বড়ে হয়ে গেলো, অন্যদিকে তেমনি এই অবস্থান-চ্যুতি আবহমান সামাজিক স্তর বা অবকাঠামোয় আনলো আকস্মিক ধ্বস ও ভারসাম্যহীনতা। কারণ এই প্রভাবশালী সামাজিকগোষ্ঠী একটি সংগঠিত নিয়ামক (factor) হিশেবে মোগল আমলের প্রায় গোড়া থেকেই সরকারি নিয়মিত প্রশাসনযন্ত্রের পাশাপাশি এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থানীয় শালিশ-বিচার ও আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পক্ষে কাজ করতো। কিন্তু এবার তাদের সেই বনেদি অবস্থান হাত ছাড়া হওয়ায় তা সমষ্টিগত স্থিতিশীলতার জন্য প্রচণ্ড হুমকির সৃষ্টি করলো। অন্যদিকে উঠতি ধনিক-বণিকশ্রেণী তাদের গতানুগতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে জড়িত থাকলেও এই প্রথম আভিজাত্যের নতুন অভিধায় অভিষিক্ত হওয়ার মানসে কাগজে-পত্রে শুধু ভূমির সঙ্গেই সম্পৃক্ত হলো মাত্র, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের মূল লক্ষ্য হলো নিয়োজিত মূলধন যতো দ্রুত সম্ভব রায়তদের কাছ থেকে সুদে-আসলে উসুল করে নেয়া, তাতে ভূমিরাজস্ব প্রদাতৃশ্রেণীর সুখ-দুঃখ দেখা বা এদের অভাব-অভিযোগ শোনার তাদের কোন দায় বা চিন্তা ছিল না। বিশেষত কলকাতা ও ২৪-পরগণা জমিদারি নিলামের সময় থেকেই কোম্পানির নীতি-নির্ধারকদের এই জাতীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফলে এবার শুরুতেই এই উভয়কূল রক্ষার জন্য হেস্টিংস নতুন একটি চাল চাললেন যাতে ইজারা-গ্রহীতাগণ ভূমিরাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করলেও যেমন ভূমির স্বত্ব-মালিকানা কার হবে, এটা যেমন তাদের কাছে স্পষ্ট করা হলো না (এর ফলে জমি নিয়ে তাদের খুব একটা উচ্চবাচ্য করার সুযোগ থাকলো না); তেমনি মোগল ও নবাবি আমলব্যাপী এ যাবৎ চলে আসা কার্যত খাজনা আদায়ের এজেন্ট জমিদার-জায়গিরদার প্রভৃতি খাজনা আদায়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এক ধরনের ভাসমান অবস্থায় এরা রায়তদের প্রতি চিরাচরিত জনহিতকর ও দাতব্য কর্তব্যে বিরত থাকতে পারে, এই সম্ভাবনায় হেস্টিংস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাইলেন বংশানুক্রমিক ভূম্যধিকারীগণের সঙ্গে ৫-বছর মেয়াদি চুক্তি সম্পাদন করতে।[৪৩] উইলিয়াম হান্টার বলেন, "The Huzoor Zillahs, and the inferior Zemindaries and Talookdaries bordering on Moorshedabad and Rajshahy, were also settled on the same Plan, a Preference being always given to the Offers of the Hereditary Possessors as before observed."[৪৪] এছাড়া 'হুজুর-জিলা'র[৪৫] বাইরেও

৪৩ এক্ষেত্রে হেস্টিংস-এর সামনে মূলত দু'টি পথ খোলা ছিল। তার ভাষায়, "1. "To let the lands to farm; to put the renters in entire possession and authority over them, obliging them to pay each zemindar or talukdar a certain allowance or percentage for the subsistence of himself and family". 2. "To settle with the zemindars themselves on the footing of farmers, obliging them first to enter into all the conditions of a farmer's lease, .. . " (Quoted from, The Fifth Report, pp. 524-25). তার (হেস্টিংস) সমর্থন ছিল শেষোক্তটির প্রতি।

৪৪. The Annals of Rural Bengal, pp 391.

৪৫. সাধারণত রাজধানী মুর্শিদাবাদ-সংলগ্ন ও এর আশেপাশের জেলাগুলিকে 'হুজুর-জেলা' বলা হতো। সম্ভবত নবাব বা 'হুজুরে'র (পরে 'রেসিডেন্টে'র) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নজরদারির মধ্যে থাকতো বলে এগুলির অভিধা 'হুজুর-জিলা' হয়ে থাকবে।

সংশ্লিষ্টদেরকে কমবেশি এই অগ্রাধিকার প্রদান করা হলো। তবে যাদেরকে তা দেয়া যায়নি বা দেয়া সম্ভব ছিল না তাদেবকে জীবিকা-ভাতা[৪৬] বা বাৎসরিক বৃত্তি[৪৭] দেয়া হয়েছিল।

দুই. নতুন ব্যবস্থায় কোন বকম নতুন কর বা আবওয়াব মাথোট ধার্য নিষিদ্ধ করা হলো। স্থিত করের কোনটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও রায়তসাধারণের জন্য আপত্তিকর বা উৎপীড়ন-ধর্মী প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট কালেক্টরকে তা বাতিলের ক্ষমতা দেয়া হলো।

তিন. ইজারা-গ্রহীতাদের কাছ থেকে যেমন প্রদেয় ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের 'জামিন' নেয়া হলো[৪৮], তেমনি তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো রায়তদের দখলি জমির বর্ণনা, খাজনাব হার ও দেয়-এর পবিমাণ নির্দিষ্ট করে রায়তদেরকে 'পাট্টা' দিতে।[৪৮] এছাড়া ইজারাদারদের প্রতি নির্দেশ ছিল প্রয়োজনে তারা রায়তকে 'তাকাবি' ঋণ প্রদান করবে। (তবে শেষোক্ত এই নির্দেশ অনেকটা কাগজে-পত্রেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল তা বলা যায়)।

চার. হেস্টিংস সুপারভাইজবদের পদবি করেছিলেন 'কালেক্টর'।[৪৯] নতুন এই অভিধা শুধু সংশ্লিষ্টদের নাম পরিবর্তনেই সীমিত থাকলো না, বরং 'কালেক্টর'দের কার্য-ধারায়ও কিছু গুণগত পবিবর্তন আনা হলো। আগে সুপারভাইজররা যেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনায় সরাসরি জড়িত হতে পারতেন, তাদের বেতন কমে যাওয়ায় যে কাজে তারা আরও উৎসাহী ও নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন (অনেকটা সরকারিভাবেই তখন তাদেরকে এই সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল), হেস্টিংস সেই ধারা রহিত করে দিলেন। তিনি সরাসরি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে,

৪৬. হান্টার বলেন, 'When zamindars were thus ousted, a subsistence allowance was granted to them out of the revenue.' (Bengal MS. Records, Vol I., W W Hunter, pp.18).
প্রধান ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে কোম্পানির কাছ থেকে নদীয়াবাজ ২লক্ষ, রাজশাহিব মহাবাণী ও দিনাজপুবেব জমিদাব বাহাদুব প্রত্যেকে আড়াই লক্ষ টাকা করে 'মোশায়রা' বা খোরাকি ভাতা লাভ করেছিলেন। এইভাবে সরকারকে প্রায় ২১,২৮,৬৬৬ টাকা 'গোণাগাবি' গুণতে হয়েছিল। দেখুন, The History of Bengal (1757-1905), pp 90

৪৭. বিহারের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছিল। জে. রেজিন্যাল্ড বা রেগিন্যাল্ড হ্যান্ড বলেন, 'The zamindars themselves received an annuity of ten per cent. on the collections made by the renters, called malikana; and they were also allowed to take certain fees, called "dusturats", from holders of rent-free lands ' (Early English Administration of Bihar, 1781-1785, J. Reginald Hand, pp. 29).

৪৮. বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ২৪।

৪৯. The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 139.
প্রাথমিক অবস্থায় হেস্টিংস-এব অধীনে মোট ১৪টি জেলা (British Collectorship) সৃষ্টি করা হয় যার প্রত্যেকটিতে একজন করে ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত 'কালেক্টর' নিয়োগ করা হয়েছিল। দেখুন, Imperial Gazetteer of India. Provincial Series: Bengal, Vol. I., pp 29.

তারা কোনরূপ ব্যবসায় পরিচালনা বা তার অংশীদার হতে, জমিদার ও রায়তদের কাছ থেকে 'ভেট', নজর বা সেলামি গ্রহণ করতে পারবে না। এমনকি তাদের অধীন 'বেনিয়ান'[৫১], 'পেশকার'বাও এগুলি গ্রহণ থেকে সর্বাংশে বিরত থাকবে। সবকারি কাজে-কর্মে কালেক্টরদের তাদের ব্যক্তি-নামের সীল-মোহর ব্যবহার করতেও নিষেধ কবা হয়েছিল। উল্লেখ কবা যায় যে, সকল জেলার জন্য এ ব্যাপারে একটি একক ও সমভাবে ব্যবহার্য 'Company as Diwan of the provinces' শিবোনামের সীল তৈবি করে তা ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হলো।

পাঁচ. প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হতো 'কিস্তি'তে -- ফসলোৎপাদনের মৌসুমে। ফলে প্রত্যেক ইজারাদারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল -- স্ব স্ব এলাকাব জন্য অন্তত একজন করে 'মুহ্‌রি' বা 'মুহাররর্‌' প্রতিপালনের, যারা রায়তের দেয়-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখিত হিসাব রাখবে, এবং মাসে মাসে তার প্রতিবেদন কালেক্টর-এর দপ্তরে প্রেরণ করবে। এই সঙ্গে, রায়তরা অহেতুক হয়রানির শিকার না-হয় সেজন্য খাজনা আদায়েব ব্যাপারে নিতান্ত জরুরি মনে না হলে ইজারাদারদের সিপাহি-বরকন্দাজ ব্যবহার কবতেও নিষেধ কবা হয়েছিল। যা হোক উপর্যুক্ত এই পদক্ষেপগুলি ছিল বস্তুত ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়বিষয়ক।

হেস্টিংস ভূমিরাজস্ব ছাড়াও বাজস্বের অন্যান্য খাত যেমন অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন টোল, ফি, আন্তঃ ও বহিঃশুল্ক প্রভৃতির জন্যেও কিছু কিছু সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, দেশি ও বিদেশি -- উভয়শ্রেণীর ব্যবসায়ীবা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ও দু'মুখো নীতির শিকার না হয় সেজন্য বিভিন্ন জমিদাবির মধ্যে অবস্থিত 'কাস্টমস চৌকি'গুলি তুলে দিলেন। এর পরিবর্তে বাংলা ও বিহারের ৫টি প্রধান শহর বা অঞ্চলে 'কাস্টমস হাউস' স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। নতুন চৌকি স্থাপিত হয়েছিল -- (১) মুর্শিদাবাদ, (২) ঢাকা, (৩) কলকাতা, (৪) হুগলি ও (৫) পাটনায় (বিহার)। হেস্টিংস কোম্পানির নিজস্ব তথা স্বদেশি কর্মচারীদের জন্য বহুলকথিত 'দস্তক' প্রথারও অবসান ঘটান। তবে তা কার্যকর হয়েছিল ১৭৭৩ বা ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে। সত্যি বলতে এটা ছিল হেস্টিংস-এর অত্যন্ত সাহসী ও যুগোপযোগী একটি পদক্ষেপ। অবশ্য নতুন ব্যবস্থায় হেস্টিংস-এর তা না করেও উপায় ছিল না। কারণ 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের তার কাছে প্রত্যাশা ছিল সম্পূর্ণ নতুন কিছু সংস্কারের (তাদের পত্রোল্লিখিত 'complete reformation' শব্দযুগল স্মর্তব্য), যেটা তাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূল হবে। আগে দেখা গেছে 'দস্তক' যে

---

৫১. কালেক্টর-এর ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত কর্তব্য-কর্মে সহযোগিতা দান এবং প্রশাসনে গতি ও দায়িত্বশীলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলায় কালেক্টর-এর অধীন একজন এদেশীয় 'দিওয়ান'-এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ইংরেজদের প্রাথমিক অজ্ঞতার কারণে হোক, কি কিছুটা তুচ্ছ বা ব্যঙ্গার্থেই হোক, তারা একে 'বেনিয়ান' বলতো।

যা হোক, কালেক্টরের দিওয়ানের মুখ্য কাজ ছিল, 'He was to required to keep separate accounts of the Collections and countersign all orders to the mufassil, all receipts granted to the farmers and all invoices and accounts transmitted to the Sadar. The Collector and the Diwan were thus individually responsible to the Board They are to act within the jurisdiction specified to each.' (The Judicial Administration of the East India Company in Bengal, pp. 165-66).

কারণে চালু করা হয়েছিল তার অবৈধ সুযোগ নিতো কোম্পানির সকল স্তরের কর্মচারীকুল। যে কারণে কোম্পানির আদত লাভ কিছুই হতো না। অথচ তা দেশীয় বণিকদের অসন্তোষ সৃষ্টি করতো। হেস্টিংস-এর সামনে তাই সুযোগ ছিল উভয়পক্ষের প্রকৃত স্বার্থ সংরক্ষণের। তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ফলে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অজুহাত ছিল না। অন্যদিকে 'দস্তক' রহিত হওয়ায় দেশি ব্যবসায়ীগোষ্ঠীও সরকারের প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ হলো। বাণিজ্যিক ব্যাপারে তারা হেস্টিংস ও তার সহযোগীদেরকে আন্তরিক মনে করে সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলো।

অধিকন্তু হেস্টিংস লবণ, সুপোরি ও তামাক -- এই ৩টি দ্রব্য (আগে থেকেই এগুলির ওপর কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার চলে আসছিল[৫২]) ব্যতীত সকল পণ্যের ওপর থেকে প্রচলিত বিভিন্ন শুল্ক-হার তুলে দিয়ে তদস্থলে দেশি-বিদেশি, ইউরোপীয়-ভারতীয় ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সমান হারে (flat rate) শতকরা আড়াই ভাগ শুল্ক বা করারোপ করলেন। সুতরাং Dr. Vincent Smith-এর ভাষায় যথার্থই বলা যায়, 'By these measures trade was encouraged, unfair competition prevented, and extortion reduced.'[৫৩] ড. অতুল সুরও অবলীলায় স্বীকার করেন, হেস্টিংস-এর 'এই সকল সংস্কারের ফলে পণ্যদ্রব্যসমূহ বিনা নিগ্রহে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাতায়াত করতে থাকে।'[৫৪] সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, হেস্টিংস-এর এই পদক্ষেপ দেশের ভবিষ্যত ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য সহায়ক ও ইতিবাচক ছিল, যদিও তা শেষ পর্যন্ত নানা কারণে সুফল দিতে ব্যর্থ হয়েছিল তা বলাইবাহুল্য।

এ কথা সত্য যে, যে কোন যুগের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের সঙ্গে সমকালীন দিওয়ানি বিচার ব্যবস্থার যোগ অত্যন্ত নিবিড় ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ দিওয়ানি বিচারের সূত্র ধরেই মূলত ভূমি ও ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় মামলা-মোকদ্দমা ও জটিলতা নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং এই আমলের দিওয়ানি বিচার ব্যবস্থাও খানিকটা এখানে আলোচনা করা দরকার। এটি আরও প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, বস্তুত তার সময় থেকেই এদেশে আধুনিক দিওয়ানি বিচার ব্যবস্থার প্রাথমিক সূত্রপাত হয়েছিল, যা কালে সংশোধিত, সংস্কৃত ('reformed' অর্থে) ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক এ ব্যাপারে হেস্টিংস-এর নেতৃত্বে 'কমিটি অফ সার্কিট' (এর ১৫ই আগস্ট, ১৭৭২ সালের কার্য-বিবরণীতে 'A Plan for the Administration of Justice' শিরোনামে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল) তৎকালে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় প্রচলিত দিওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আশু সংস্কারে বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছিলেন। সমগ্র বাংলাকে তারা ১৪টি জেলায় বা অংশে বিভক্ত করেছিল এবং আগেই বলেছি যে এগুলির

৫২. The Oxford History of India, pp. 503; The Oxford History of Modern India, pp. 59.

৫৩. The Oxford History of India, pp. 503, The Oxford History of Modern India, pp. 59.

৫৪. আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৭১।

প্রত্যেকটিতে একজন করে ইংরেজ শাসক[৫৫] বা 'কালেক্টর' নিযুক্ত করা হয়েছিল যার প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব সংগ্রহ (collections of the revenues)।[৫৬] মূলত এই ভূমিরাজস্ব-সংগ্রাহক বা 'কালেক্টর'কে কেন্দ্র করেই প্রতিটি জেলায় (নতুন ব্যবস্থায় কলকাতা যেহেতু প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল, সে জন্য জেলাগুলিকে তখন মফস্বল ধরা হতো) দিওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার কার্যক্রম নির্বাহের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি আদালত প্রতিষ্ঠা করা হলো। এগুলির নাম দেয়া হয়েছিল।[৫৭]

মফস্বল বা প্রাদেশিক দিওয়ানি আদালত
মফস্বল বা প্রাদেশিক ফৌজদারি আদালত

উভয় আদালতের কার্য-পরিধি ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ভিন্ন হলেও গঠন-কাঠামোর দিক দিয়ে এগুলির একটি বিষয়ে চমৎকার মিল ছিল আর তা হলো দু'টি আদালতেরই প্রধান ব্যক্তিত্ব বা শীর্ষ বিচারক ছিলেন ইংরেজ কালেক্টর স্বয়ং।

মফস্বল বা প্রাদেশিক দিওয়ানি আদালত

বাংলা ও বিহারের মোটামুটি সবগুলি প্রধান জেলায় যেখানে যেখানে ইতোপূর্বে সুপারভাইজর নিযুক্ত করা হয়েছিল সেগুলিতে এই 'মফস্বল বা প্রাদেশিক দিওয়ানি আদালত' গঠন করা হয়। এর মধ্যে ছিল তৎকালীন বাংলার ১০টি ও বিহারের ৪টি জেলা, যথা (পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য):-

---

৫৫ ওয়ারেন হেস্টিংস, তৎকালীন সুপারভাইজর-কালেক্টরদের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও দৌরাত্ম্য দৃষ্টে এ-ও পর্যন্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এরা ছিল, "heavy rulers of the peolpe", enjoying "more trust, dignity and consequence than the Governor of Bengal" " কী ভয়াবহ উক্তি' (Quoted from, The Judicial Administration of the East India Company in Bengal, pp. 163).

৫৬ 'Under this plan ... His primary duty was to control the collection of revenue' (Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, Dr. V. D Kulshrestha, pp. 78).

৫৭ প্রধানত অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আমরা এখানে এই আমলের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকবো। তবে অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায় যে, সকল যুগেই যেহেতু রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে পুলিশি সহযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, অন্তত বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের বেলায় যা আরও সত্য, সেহেতু এই পুলিশি ও ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রয়োগে কালেক্টরদেরকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল সে সম্বন্ধে এখানে শুধু এটুকুই উল্লেখ করা হলো যে, 'In the sphere of criminal justice, the plan provided for the establishment of a Moffussil Faujdari Adalat in each district for the trial of all crimes and misdemeanours under the Collector of the district ... In each district, a *Qazi* and a *Mufti* with the help of two *Maulvies*, who were appointed to expound the law, were to hold trials for all criminal cases. The Collector was authorised to supervise the working of the court. ' (Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 79).

১.	বৃহত্তর ঢাকা	২.	দিনাজপুর
৩.	বৃহত্তর রাজশাহি	৪.	যশোহর
৫.	রংপুর বা বঙ্গপুর	৬.	পূর্ণিয়া
৭.	বীরভূম (বিষ্ণুপর ও পাচেটসহ)	৮.	হুগলি
৯.	নদীয়া	১০.	রাজমহল
১১.	সারণ (চম্পারণসহ)	১২.	মুঙ্গের
১৩	ত্রিহুত বা তিরহুত	১৪	রোহ্‌টাস

উল্লেখ্য ত্রিপুরা-কুমিল্লা ১৭৭২ সালের নভেম্বরে[৫৮] চট্টগ্রামের সাথে পুনরেকত্রিকৃত হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই এখানে কোনরূপ মফস্বল আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কুমিল্লা, চট্টগ্রাম বা ইসলামাবাদের তৎকালীন 'চীফ'-এর অধীনে চলে গিয়েছিল, যেমনটা ছিল বর্ধমান ও মেদিনীপুর -- সেখানকার 'রেসিডেন্ট'দের নিয়ন্ত্রণে।[৫৯] অবশ্য মুর্শিদাবাদ ও পূর্ববঙ্গে হেস্টিংস নতুন ৫টি জেলা,-- চুনাখালি (মুর্শিদাবাদ), জাহাঙ্গিরপুর (ঢাকা), লস্করপুর (রাজশাহি), মাহমুদশাহি (ময়মনসিংহ) ও রোকনপুর (যশোহর) -- সৃষ্টি করায় (১৭৭২) এগুলিতেও মফস্বল দিওয়ানি আদালত গঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা জেলা গণ্য হলেও প্রচলিত 'কালেক্টরে'র পরিবর্তে প্রথমটি নিয়ন্ত্রণ করতেন সরাসরি দরবারের 'রেসিডেন্ট', এবং দ্বিতীয়টির (কলকাতাস্থ 'কালেক্টরশিপ', ২৪শে নভেম্বর, ১৭৭২ সালের এক কর্তৃপক্ষীয় আদেশ বলে প্রত্যাহৃত হয়) বিচার প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব 'ফোর্ট উইলিয়াম' কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আবর্তনশীল-প্রক্রিয়ায় একজন 'কাউন্সিল' সদস্যকে দেয়া হয়েছিল। আবার কখনও কখনও পুরো 'কাউন্সিল'ই সেটি দেখাশুনা করতো। বিহারের শাহাবাদ জেলার সুপারভাইজর-এর বিরুদ্ধে প্রভূত অনিয়ম ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকায় তাকে প্রত্যাহার করে (সেপ্টেম্বর, ১৭৭২) জেলাটিকে সরাসরি পাটনাস্থ কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়েছিল। ফলে এখানেও কোনরূপ মফস্বল আদালত গঠিত হয়নি। প্রতিটি মফস্বল বা প্রাদেশিক দিওয়ানি আদালতে প্রধান বিচারক হিশেবে কালেক্টরকে দায়িত্ব দেয়া হলেও তাকে সহযোগিতা করার জন্য তার দিওয়ান ('প্রাদেশিক দিওয়ান' নামে সাধারণ্যে পরিচিত হতো) এবং কাছারির অন্যান্য কর্মচারী যেমন ১জন পেশকার ও ৩জন মুহাররর থাকতো।[৬০]

মফস্বল দিওয়ানি আদালতের কাজের পরিধি ছিল বেশ ব্যাপক, বিশেষ করে জমাজমিসংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি ও ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়জাত সমস্যা নিরসনে। এককথায়, 'The Mofassil Diwani Adalat of the district was to take cognizance of all

৫৮. 'কমিটি অফ সার্কিট'-এর ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২৭শে নভেম্বর, ১৭৭২ সালের সভার কার্য-বিবরণী দ্রষ্টব্য।

৫৯. দেখুন, The Judicial Administration of the East India Company in Bengal, pp. 168.

৬০ 'কমিটি অফ সার্কিট'-এর কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত ২৯শে আগস্ট, ১৭৭২ সালের সভার কার্য-বিবরণী থেকে জানা যায়, আদালতের পেশকার-এর মাসিক বেতন ছিল ২৫ টাকা, এবং ১ম দু'জন মুহাররর-এর ১৫ ও শেষোক্ত জনের ১০ টাকা। স্থানবিশেষে মুহাররর নিযুক্ত হতো বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের থেকে। তবে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একজন ফারসি জানা মুহাররর থাকা ছিল নিয়ম। কারণ তখনও ফারসিই ছিল সরকারি বা রাজভাষা।

disputes of property, whether real or personal, all causes of inheritance, marriage and caste, all claims of debt, disputed accounts, contracts, partnerships and demands of rent (revenue)."[৬১]
৫০০-টাকা পর্যন্ত আর্থিক মামলায় প্রাদেশিক দিওয়ানি আদালতের রায়ে বিচারকের আদেশ ছিল চূড়ান্ত অর্থাৎ এর ওপর উচ্চাদালতে কোনরূপ আপিল চলতো না। তবে ৫০০-টাকার উর্ধের মামলাগুলির আপিল দায়ের করা হতো কোম্পানির সরকারের নতুন কর্ম-কেন্দ্র কলকাতাস্থ সদর দিওয়ানি আদালতে।[৬২] এখানে জানিয়ে রাখা ভালো যে, 'Questions of successions to the zemindaries and talukdaries formed an exclusive jurisdiction of the President and Council at Fort William."[৬৩]
মফস্বল বা প্রাদেশিক দিওয়ানি আদালতের কার্যক্রম পরিচালিত হতো সনাতন পদ্ধতিতে[৬৪]

৬১ The Judicial Administration of the East India Company in Bengal, pp 169-70.
আরও দেখুন, Selections from the State Papers of Governor-General Warren Hastings, Vol. II., pp. 371-72, G.W Forrest, The Administration of Justice under the East India Company in Bengal, Bihar and Orissa, pp 52, Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp 79

৬২ মফস্বল আদালতগুলির (দিওয়ানি ও ফৌজদারি) আপিল শুনানি ও মামলা নিষ্পত্তি এবং নিজস্ব এক্তিয়ার প্রয়োগের জন্য কলকাতায় 'সদর দিওয়ানি আদালত' ও 'সদর ফৌজদারি আদালত' নামে 'ফোর্ট উইলিয়াম' কর্তৃপক্ষের সরাসরি তত্ত্বাবধানে দু'টি কেন্দ্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। (জেলাগুলির ন্যায় দু'টি অধস্তন আদালত আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে তাতে ব্যতিক্রমধর্মীভাবে 'কাউন্সিলে'র একজন করে সদস্য পর্যায়ক্রমে মুখ্য বিচারকের ভূমিকা পালন বা আসন গ্রহণ করতেন)। সদর দিওয়ানি আদালতের অবকাঠামো তৈরি হয়েছিল 'কাউন্সিলে'র প্রেসিডেন্ট ও ২জন সিনিয়র সদস্য সমন্বয়ে। কোন কারণে প্রেসিডেন্ট অনুপস্থিত থাকলে অপর একজন সদস্য এর অন্তর্ভুক্ত হতেন, অর্থাৎ বিচারক হিশেবে কমপক্ষে ৩জনকে থাকতেই হতো। তবে 'কাউন্সিল' চাইলে পুরো 'কাউন্সিলে'র সদস্যবর্গই আদালতে আসন গ্রহণ করতে পারতেন। (Rule I of August 21, 1772)। মফস্বল দিওয়ানি আদালতের ন্যায় এদের সহযোগী হিশেবে উপস্থিত থাকতেন 'রায়-রায়ান' (কেন্দ্রীয় 'খালসা'র তত্ত্বাবধায়ক), প্রধান 'কানুনগো' ও ১জন পেশকার এবং ১জন ফারসি-ভাষী ও ২জন বাংলা-ভাষী মুহাররির। তখন পর্যন্ত এটি ছিল বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সর্বোচ্চ আদালত। ফলে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত আপিল মামলার শুনানি শেষে এই আদালত থেকে যে আদেশ বা রায় ঘোষিত হতো, তা-ই হতো চূড়ান্ত (final)।

৬৩ The Judicial Administration of the East India Company in Bengal, pp. 170.. আরও দেখুন, The Administration of Justice under the East India Company in Bengal, Bihar and Orissa, pp. 53.

৬৪ হেনরি বেভারিজ বলেন, 'In all these courts the proceedings were conducted in accordance with the forms in use before the British supremacy was established.' (A Comprehensive History of India, Vol 2, pp 405).

দেশি আইন-কানুন -- হিন্দুদের জন্য বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থাদি ও মুসলমানদের জন্য প্রধানত কুরআন, সুন্নাহ ও 'ফতোয়ায়ে আলমগিরি'র ভিত্তিতে।[৬৫] এক্ষেত্রে এই আমলের বিশেষত্ব বলতে উল্লেখযোগ্য হলো, আদালতের কার্য-ধারা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিত নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন।[৬৬] যেমন প্রথমত বাদিপক্ষ দিওয়ানি প্রকৃতির কোন মামলা দায়ের করলে তার দরখাস্ত নথিভুক্ত করা হতো এবং আদালত তা পড়ে দেখতো; অতঃপর আদালত সন্তুষ্ট হলে সে অনুযায়ী বিবাদিপক্ষকে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে সমন করা হতো। সেই সময়ের মধ্যে বিবাদির লিখিত বক্তব্য পাওয়া গেলে সেটিও নথিভুক্ত ও আদালতের গোচরীভূত হতো; তৃতীয়ত উভয়পক্ষকে প্রকাশ্যে শুনানি, তাদের উপস্থাপিত সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রদর্শিত কাগজ-পত্র ও সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা শেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে কালেক্টর রায় বা আদেশ ঘোষণা করতেন। তবে এখানে স্মর্তব্য যে মামলা চলাকালীন বিশেষ করে ভূমির স্বত্ব-মালিকানা, দখল, বাড়ির সীমানা চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি মোকদ্দমায় বাদি-বিবাদি ইচ্ছে করলে আদালতে তাদের পছন্দসই তথা উভয়পক্ষের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য একজন 'আমিন' নিয়োগের প্রার্থনা জানাতে পারতো যিনি সরেজমিনে গিয়ে বাস্তব অবস্থা অবলোকন, মাপজোখ পরীক্ষা ও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আদালতের গোচরীভূত করতেন। আবার উভয়পক্ষ স্ব স্ব আমিনও নিযুক্ত করতে পারতো। মোটামুটি এই ছিল ১৭৭২ সাল-পর্বে কালেক্টর-এর অভিভাবকত্বে পরিচালিত দিওয়ানি আদালতের কাজের ধারা বা পদ্ধতি।[৬৭] আদালত সপ্তাহে অন্তত ২দিন (প্রতি সোম ও বৃহস্পতি)

৬৫. দেখুন, A Dissertation on the Administration of Justice of Muslim Law, Dr. Mahomedullah Ibn S. Jung, pp 91
প্রাথমিকভাবে উভয় আদালতে হেস্টিংস স্থানীয় প্রচলিত আইন-কানুন, বিধি, অনুশাসন প্রভৃতি অনুসরণের জন্য কালেক্টরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদিও এ জন্য স্বদেশে পরিচালকদের কেউ কেউ, এবং এদেশে তাঁর সহযোগীদের মধ্যে অনেকেই এর বিরোধী ছিলেন। তারা চেয়েছিলেন কোম্পানির কার্যকালের শুরু থেকেই ইংল্যান্ডে প্রচলিত আইন-কানুন এদেশেও অনুসৃত হোক। কিন্তু হেস্টিংস সেটি না করে প্রকৃতই প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বস্তুত তদাবস্থায় সেটি করা তাঁদের জন্য হতো মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ও আত্মহত্যার শামিল। কারণ এমনিতেই কোম্পানির শাসনের প্রতি এদেশীয়রা বিশেষ করে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত মুসলমান সমাজ ছিল যারপরনাই বিরূপ ও ক্ষুব্ধ; তার ওপর আবার তাদের চিরাচরিত আইন-কানুন, রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ হলে তা সহজে কেউ মেনে নিতো বলে মনে হয় না। সুতরাং আধুনিক ঐতিহাসিক ও আইনজ্ঞগণ তাই যথার্থই বলেছেন, "It is, therefore, clear that by safeguarding the personal laws of the natives of India, Warren Hastings showed his far-sightedness and the legal historians considered it, "one of the wisest steps ever taken by Warren Hastings" " (Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 80)

৬৬ The Judicial Administration of the East India Company in Bengal, pp 170.

৬৭. কালেক্টর-এর স্থানীয় প্রয়োজনানুপাতে বিশেষত বিচার ত্বরান্বিতকরণ ও বিচার-প্রার্থীদের কল্যাণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাকে উপ-বিধি (sub-rules) প্রণয়নেরও ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। দেখুন, The Administration of Justice under the East India Company in Bengal, Bihar and Orissa, pp. 53.

নিয়মিত বসতো, এবং যা কিছু শুনানি ও আদেশ-নির্দেশ বিচারককে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করতে হতো, এটি ছিল অনেকটা বাধ্যতামূলক।[৬৮] কালেক্টরকে বিচারপ্রার্থী মানুষের আদালতের সহজ আশ্রয় গ্রহণের সুবিধার্থে প্রতিটি আদালতের দরোজার সামনে একটি মুখ-বন্ধ বাক্স (এর চাবি থাকতো তার নিজের জিম্মায়) রাখতে হতো যাতে করে বিচারপ্রার্থীরা এর মধ্যে তাদের দরখাস্তাদি নির্বিঘ্নে ফেলতে পারে। সে অনুযায়ী প্রতি কার্য-দিবসে কালেক্টর স্বয়ং সেটি খুলতেন বা তার উপস্থিতিতে তা খোলা হতো ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হতো, -- 'This device was calculated to counteract the designs of the officers and servants of the Court, who, from motives of interests or resentment, often prevented these complaints from being entertained'[৬৯] দিওয়ানি বিচারে দীর্ঘসূত্রতা ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণোপলক্ষ্যে দু'টি জিনিসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছিল।

এক. ১২-বছরের অধিক পুরোনো মামলা আদালতে রুজু করতে দেয়া হতো না.

দুই. যদি জানা যেতো যে শুধুমাত্র প্রতিপক্ষকে হয়রানি করার মানসেই একপক্ষ একই মামলার বিষয় নিয়ে (উপর্যুপরি বিপক্ষে রায় পাওয়া সত্ত্বেও) একের পর এক আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছে, এবং আদালতগুলির মূল্যবান সময় ক্ষেপণের চেষ্টায় রত, সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো।

মফস্বল দিওয়ানি আদালত পরিচালনাকালে কর্তৃপক্ষ 'কালেক্টর'দের একটি বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছিল, ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত মামলায় 'কালেক্টর'কে যদি বা কখনও রাজস্ব কর্মচারীদের শুনানি গ্রহণের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ তাদের প্রতি সমন জারি করতে হয়, তবে একান্ত বাধ্য বা অপরিহার্য না হলে, যেন কোন অবস্থাতেই ভূমিরাজস্ব আদায়ের মৌসুমে -- ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে না করা হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছিল।

এ আমলে মফস্বল বা প্রাদেশিক দিওয়ানি আদালতের কার্য-সীমার বাইরে গ্রাম-আদালতধর্মী স্থানীয় ছোট ছোট আদালতও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এগুলিতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন পরগণার প্রধান মোড়ল বা মুখিয়া-জাতীয়গণ। অনূর্ধ ১০-টাকা মূল্যমানের সম্পত্তিসংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ছিল এদের অধিভুক্ত।[৭০]

মোটকথা ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা গ্রহণের পরেপরেই হেস্টিংস-এর দিওয়ানি বিচার ব্যবস্থা সংস্কারে এ ছিল একটি প্রাথমিক উদ্যোগ। এই উদ্যোগে ও প্রক্রিয়ায় কার্যত প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার ত্রুটিহীনতা দূরীকরণের চেয়ে বরং তার মূল অভীষ্ট ছিল দেশীয় আচার-অনুষ্ঠান ও স্থিত বিচার-প্রণালীর মধ্যে থেকে আপাত সাফল্য অর্জন করা। ড. বি. বি. মিশ্রের ভাষায়, 'Thus the first plan for the administration of justice was drawn out to secure the ends of justice within the framework of the country courts of judicature, not to impart to it the quality of legal perfection.'[৭১]

৬৮. The Judicial Administration of the East India Company..., pp. 170.

৬৯. Ibid., pp 171.

৭০ Ibid., pp. 172-73.

৭১ Ibid., pp. 173.

হেস্টিংস-এর এ লক্ষ্য কিছুটা হলেও অর্জিত হয়েছিল। কারণ, 'The diwani adalats relieved the sombre colours of the picture, and in them the cultivator found a real protection and assistance at the hands of those collectors whose work received such scanty acknowledgement; ..'[৭২]

তবে এর পরেই সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর জন্য 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'রা পত্র লিখলেন বাংলার গভর্নরকে। কারণ যে উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করা হয়েছিল, এবং বংশানুক্রমিক জমিদার-তালুকদার প্রভৃতি প্রভাবশালী সামাজিকশ্রেণীকে বাদ দিয়ে ও প্রচলিত মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে এটি বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিল হেস্টিংস-এর সরকার, বছর না ঘুরতেই দেখা গেল বিভিন্ন জেলা থেকে কালেক্টররা লিখে পাঠাচ্ছেন -- ধার্য রাজস্ব অত্যধিক চড়া হয়েছে, যা ইজারাদারদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আদায় তো করাই যাচ্ছে না, উপরন্তু কালেক্টরদের পীড়াপীড়ির কারণে মেয়াদকালের মধ্যে নিয়োজিত মূলধন ও তদাতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় তারা খাজনা সংগ্রহের নামে রায়তদের উপর অকথ্য জোর-জুলুম করছে।

কিন্তু কলকাতার 'বোর্ড অফ রেভেন্যু', কালেক্টরদের প্রেরিত প্রতিবেদনের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। তারা বরং উল্টো নির্দেশ দিয়েছিল ইজারাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া প্রাপ্য যে করেই হোক উসুল করতে। ফলত কালেক্টরদের সামনে তখন একটাই মাত্র পথ খোলা থাকলো বা ছিল --'This was done with undoubted harshness, for the collectors had no option but to carry out their (*Board of Revenue*) orders. Confinement of zamindars and farmers was freely used, but without any result except that of adding to the confusion:..'[৭৩]

অবস্থা এমন শোচনীয় পর্যায়ে গেল যে, ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, 'ইজারাদারেরা তাঁহাদের মেয়াদের কালের মধ্যে প্রজাদের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল প্রজার উৎপীড়ন, চাষের অবনতি, জমিদারী প্রথার ধ্বংস এবং সরকারের বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ হ্রাস।'[৭৪]

একপর্যায়ে দেশের এই দুরবস্থার কথা ইংল্যান্ডের 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীর কাছেও পৌছুলো। তারা বিষয়টির গুরুত্ব ও পরিণাম অনুধাবন করে ৭ই (নাকি ১৬ই?) এপ্রিল, ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট ও কলকাতা কাউন্সিলকে বেশ কিছু জরুরি নির্দেশাবলি সম্বলিত এক পত্র লিখলেন।

এরই সূত্র ধরে 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'র সদস্যবর্গ ঐ বছরের ২৩শে নভেম্বর এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হলেন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন[৭৫], এবং আপাত-গ্রহণযোগ্য বিবেচনায় অস্থায়ী

৭২. Ramsbotham in, The Cambridge History of India, Vol.V., pp. 418
৭৩. Ibid , pp 417.
৭৪ বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ড রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা ৬।
৭৫ তাদের পরিকল্পনা ছিল দীর্ঘমেয়াদি অর্থাৎ 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের অনুমতি সাপেক্ষে যা ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করার ইচ্ছা ছিল 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর সদস্যদের। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, The Fifth Report, pp. 539 40.

ভিত্তিতে[৭৬] তারা নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলেন। যা হোক, সিদ্ধান্তের মোদ্দা বিষয়গুলি নিম্নরূপ:-

১ বাংলা, বিহার ও ওড়িশা -- এই ৩টি মোগল সুবা'কে ৫টি প্রাদেশিক কাউন্সিলে বিভক্ত করে প্রতিটি কাউন্সিলের নেতৃত্ব ভার অর্পণ করা হবে একজন অধ্যক্ষ বা 'চীফ'-এর ওপর, এবং তার সঙ্গে থাকবে কোম্পানির ৪জন জ্যেষ্ঠ (senior) কর্মচারী, ১জন ফারসি অনুবাদক, প্রয়োজনীয় সংখ্যক হিসাবরক্ষক ও সহকারি এবং ১জন দিওয়ান;

২ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হবে একটি 'কমিটি অফ রেভেন্যু' -- যাতে থাকবে 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'র ২জন সদস্য, কোম্পানির ৩জন জ্যেষ্ঠ কর্মচারী, সচিব, ফারসি অনুবাদক, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারি ও কেন্দ্রীয় দিওয়ান হিশেবে 'রায়-রায়ান'; এরা মোটামুটি প্রতিদিনই বৈঠকে বসার চেষ্টা করবেন এবং বিবিধ বিষয়াদি বিশেষত রাজস্ব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন,

৩. প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি সরাসরি প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে 'গভর্নর ও কাউন্সিলে'র সঙ্গে। একইভাবে প্রাদেশিক দিওয়ানেরা যোগাযোগ রক্ষা করবে 'রায়-রায়ানে'র মাধ্যমে;

৪ জেলাগুলি (মূলত প্রচলিত 'কালেক্টরশিপ') থেকে সত্বর কালেক্টরদের প্রত্যাহার করে (চলতি বছরান্তে) তদস্থলে এদেশীয়দের মধ্য থেকে 'আমিল' 'দিওয়ান' প্রভৃতিকে নিয়োগ দেয়া হবে যাদের পদবি হবে প্রধানত 'নায়েব'। এরা ২১শে আগস্ট, ১৭৭২ সালে প্রণীত 'রেগুলেশনস'-এর অনুসরণে দিওয়ানি আদালতগুলিতে বিচারক হিশেবে দায়িত্ব পালন করবেন;

৫ তবে যে সকল ক্ষেত্রে একটি গোটা জেলা একজন জমিদারকে বন্দোবস্ত বা ইজারা প্রদান করা হয়েছে বা হবে, সেগুলিতে কোন নায়েব নিযুক্ত না করে সংশ্লিষ্ট জমিদারকেই সেখানকার দায়িত্বে নিয়োজিত রাখা হবে[৭৭];

৬ 'বোর্ড' কর্তৃক নিযুক্ত ফারসি জানা অভিজ্ঞ ও ধীর-স্থির প্রকৃতির 'কমিশনার'দের দ্বারা সময়ে সময়ে প্রাদেশিক দপ্তরগুলির ভূমিরাজস্ব বিষয়ক হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করা হবে, এবং

৭ প্রাদেশিক কাউন্সিলের 'চীফ'রা যাতে করে ব্যক্তিগত ব্যবসায়-বাণিজ্যে জড়িত হয়ে না পড়ে সে লক্ষ্যে তাদের মাসিক বেতন ধার্য করা হবে ৩,০০০ 'সিক্কা রুপি' এবং এ জন্য তাদেরকে 'শপথ' গ্রহণ করতে হবে।'

---

৭৬ এই পরিকল্পনা যে পরীক্ষামূলক অর্থাৎ অস্থায়ী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐতিহাসিক আর বি. র‍্যামসবোথাম-এর উক্তিতে।
বোথাম বলেন, 'It will be remembered that the plan drawn up by the Board of Revenue in 1773, placing the collections under six provincial councils of revenue, was expressly declared by the governor and council to be temporary.' (The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 426).

৭৭ The Cambridge History of India, Vol V , pp. 418

এ পর্যায়ে কলকাতা ও অপরাপর প্রাদেশিক কাউন্সিল[৮১] ও তাদের অধীনে পুনর্বিন্যস্ত জেলাগুলির বিস্তারিত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো।

প্রাদেশিক কাউন্সিল বা বিভাগ	অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ
কলকাতা (প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু)	কলকাতার পরগণাসমূহ, হুগলি, হিজলি, মহিষাদল, তমলুক, নদীয়া, যশোহর, মাহমুদশাহি, তালুক কান্তনগর ও স্থানীয় অধিবাসীদের দখলি ভূমিখণ্ড।
মুর্শিদাবাদ	রাজশাহি (পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল), চুনাখালি, রোকনপুর, লস্করপুর, জাহাঙ্গিরপুর, খাসতালুক, রাজমহল, ভাগলপুর (মুঙ্গেরের অংশবিশেষসহ), কুড়িকপুর, জঙ্গল তেরাই ও ক্যাপ্টেন ব্রুক-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ড।
ঢাকা	ঢাকা, সিলেট, আটিয়া, কাগমারি ও বারবাজু ('আইন-ই-আকবরী'র সরকার বাজুহা) বা ময়মনসিংহ।
দিনাজপুর	দিনাজপুর, শিলাবাড়ি বা শিলবুড়ি, পূর্ণিয়া, রংপুর, ইদ্রাকপুর, বাহারবন্দ, কোচবিহার ও রাঙামটি।
বর্ধমান	বর্ধমান, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট বা পাচেট, বীরভূম, রামগড় ও ক্যাপ্টেন কারন্যাকের ব্যবস্থাপনাধীন ভূখণ্ড।
পাটনা[৮২] (বিহার)	পাটনা, সারণ, চম্পারণ, ত্রিহুত বা তিরহুত, মুঙ্গের (ভাগলপুরভুক্ত অংশ ব্যতীত), রোহতাস বা রোহটাস ও শাহাবাদ।
চট্টগ্রাম[৮৩]	চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা বা কুমিল্লা।

৭৮. কালেক্টরদের জেলাসমূহ থেকে প্রত্যাহার করা হলেও তাদেরকে প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদর দপ্তরে অবস্থান করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। দেখুন, Dr V A. Narain in, Land Revenue in India: Historical Studies, Ed. by Dr Ram Sharan Sharma, pp 58.

৭৯ The Cambridge History of India, Vol. V., pp 418.

৮০ 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'র ১৬ই মার্চ, ১৭৭৪ সালের কার্য-বিবরণী দ্রষ্টব্য।

৮১ এগুলিকে অনায়াসে বর্তমানকালের 'বিভাগ'-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, বরঞ্চ এখনকার বিভাগগুলির চেয়েও তা ছিল আয়তনে বড়।

৮২ সমগ্র বিহার নিয়ে একটি মাত্র প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল। এই কাউন্সিল বা বিভাগটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রযুক্ত হয় পাটনাস্থ চীফ ও কাউন্সিলের ওপর।

৮৩ আলোচিতাকারে চট্টগ্রামকেন্দ্রিক এই সময় কোন প্রাদেশিক কাউন্সিল বা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়নি, বা এর কোন নজির পাওয়া যায় না।

প্রধানত ভূমিরাজস্ব আদায় নির্বিঘ্নকরণ এবং গৌণত প্রজাকল্যাণ -- মূলত এই দ্বিবিধ প্রয়োজনে নতুন প্রশাসনিক বিন্যাস করা হলেও আগেই বলেছি এটি ছিল অস্থায়ী একটি ব্যবস্থা। হেস্টিংস ও তার 'কাউন্সিলে'র লক্ষ্য ছিল স্থানীয়দের সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদি ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত চুক্তি সম্পাদন, যা একদিকে হবে স্থায়ী কিন্তু কোম্পানির পক্ষে সহজ ও লাভজনক, এবং সেটি বলাবাহুল্য, প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ডাককারীকে দিতে হলেও তাতে তার ও কাউন্সিলবৃন্দের আদৌ আপত্তি ছিল না। কারণ এ সম্বন্ধে তিনি 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের সুস্পষ্ট সমর্থন লাভ করেছিলেন।[৮৪] অন্যদিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে বারবার প্রশাসনিক কাটাছেঁড়া ও জটিলতা ও সর্বোপরি প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি এড়ানো ছিল তার জন্য একান্তই জরুরি। কেননা এর ফলে এদেশে এবং স্বদেশে তার বিরূপ সমালোচনা হচ্ছিল। স্বভাবতই সেটা সুচতুর ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আদৌ কাম্য ছিল না।

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, নতুন প্রশাসনিক পুনর্গঠনে যদিও প্রাদেশিক প্রশাসনের বা বিভাগের তথা কেন্দ্রীয় ভূমিরাজস্ব প্রশাসনসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতার কলকাঠি ছিল প্রত্যক্ষত কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের হাতে, কিন্তু এর বাইরে মফস্বল বা জেলাগুলিতে ইংরেজ কালেক্টরের স্থলে আমিল বা নায়েব নিযুক্ত হওয়ায় দিওয়ানি পূর্ব যুগের ন্যায় এগুলির প্রশাসনিক ক্ষমতা আবার এদেশীয়দের হাতেই ফিরে এসেছিল, যা এই ব্যবস্থার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দিক। প্রথমবারের মতো 'প্রশাসক' (স্মর্তব্য, মফস্বল বা জেলাগুলিতে আগে একজন করে দেশীয় দিওয়ান নিযুক্ত থাকলেও বস্তুত তার হাতে কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না) হিশেবে এটি ছিল ইংরেজ ও বাঙালি (ব্যাপকার্থে) কর্মচারীদের এক অভূতপূর্ব সম্মিলন।

ড মাজহারুল হকের কথায়, 'As the Provincial Councils were stationed at the headquarters of the divisions native naibs were appointed to the outlying districts. The administrative machinery was, therefore, obviously a combination of English and native officers, one to serve as a check upon the other.'[৮৫] তারপরও স্বীকার করতে হবে যে, মফস্বলের স্থানীয় প্রশাসক হিশেবে একজন আমিল বা নায়েবের যতো টাটবাটই থাকুক না কেন, আদতে তিনি ছিলেন কোম্পানির নিয়োজিত ও প্রাদেশিক কাউন্সিলকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বেতনভোগী একজন সামান্য 'গোমস্তা' বা খাজনা আদায়ের এজেন্টই মাত্র; মোগল আমল, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, ১৭৬৫ সাল-পূর্ব দেশি সরকারি আমলাদের মতো তার সেই প্রায়-অপ্রতিহত ক্ষমতা ও

---

৮৪ 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণ হেস্টিংসকৃত ভূমিরাজস্ববিষয়ক ইতোপূর্বেকার সংস্কারগুলি বিশেষত প্রকাশ্যে নিলাম ডাকের মাধ্যমে রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রদান ও নাবালক নবাবের অভিভাবকের দায়িত্বে মুন্নি বেগম-এর নিয়োগকে অন্ধভাবে সমর্থন করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তাদের ১৬ই এপ্রিল, ১৭৭৩ সালের পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ ছিল এ রকম, 'Your attention to the settlement of the revenues, as a primary object, has our entire approbation; and it is with the utmost satisfaction we observe that the farming system will be generally adopted. . . Your choice of the Begum for guardian to the nabob we entirely approve ' (A Comprehensive History of India, Vol 2., pp. 407).

৮৫ The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, pp. 157

শান-শওকত তখন আর ছিল না।"[৮৬]
যা হোক, এই পরিবর্তনও বেশিদিন স্থায়ী হলো না। হেস্টিংস ও কাউন্সিল ভেবেছিলেন নতুন প্রশাসনিক বিন্যাস স্বল্পকালের জন্য ব্যবস্থিত হবে কিন্তু তা যে এতোটা ক্ষণস্থায়ী হবে সম্ভবত এটা তাদের কারোরই চিন্তায় ছিল না। কারণ ততোদিনে শুধু এদেশেই নয়, খোদ ইংল্যান্ডেই ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক টানাপোড়েন অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পাঁচসালা বন্দোবস্তের মেয়াদ ছিল ১৭৭৭ সাল পর্যন্ত। কিন্তু ততো দূর যেতে হলো না। তার আগেই কোম্পানির ভূমিরাজস্ব প্রাপ্তি প্রতি বছরই ক্রমহ্রাস পেতে শুরু করেছিল। আর. বি. র‍্যামসবোথাম বলেন, 'Meanwhile the results of the quinquennial settlement were proving more deplorable each year, and some fresh method was imperatively necessary."[৮৭]
রায়তদের অবস্থা দিনকে-দিন খারাপ হচ্ছিল। এ সংবাদ ইংল্যান্ডস্থ 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীর কর্ণগোচরীভূতও হয়েছিল। তারা সময়ে সময়ে এখানকার নীতিনির্ধারকদের আশু করণীয় সম্বন্ধে কিছু কিছু আদেশ-উপদেশ দিলেও বাস্তবে সে আদেশ পালিত হচ্ছিল কি-না সেটা খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে এ যাবৎ দেখেনি বা দেখার প্রয়োজনও বোধ করেনি। কিন্তু এবারে ঘটনা ছিল ভিন্ন। স্বদেশে কোম্পানির ভাণ্ডার ছিল শূন্য। আগেই জানিয়েছি, বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থ পরিশোধে অঙ্গীকারাবদ্ধ (স্বদেশে বৃটিশ সরকারের বার্ষিক পাওনা বাবদ ৪,০০,০০ পাউন্ড, বাংলা ও অযোধ্যার নবাবের কাছে প্রতিশ্রুত বাৎসরিক দেয়, স্থানীয় বিভিন্ন রাজন্যবর্গের পাওনা ইত্যাদি) ১৭৭২ সালের মার্চের মধ্যনাগাদ (১৭) কোম্পানির 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'বৃন্দ স্বদেশে ও বিদেশে তাদের কোম্পানির রমরমা অবস্থা প্রমাণের জন্য"[৮৮] আকস্মিকভাবে শেয়ারহোল্ডারদেরকে প্রদেয় ডিভিডেন্ডের হার এক লাফে শতকরা সাড়ে ৬ থেকে সাড়ে ১২ পাউন্ডে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এতে করে, ড. অনুপচন্দ্র কাপুর-এর ভাষায়[৮৯], 'Such an unprecedented increase in the dividend and that, too, without any regard to the profits and other financial conditions of the Company created a scramble in the Stock Exchange. Londoners gambled in the East India Stock not only for high dividends , but also for the influence which its possession gave

৮৬ ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেন, 'But these amils under the Provincial Councils were merely *gomastahs* or agents. They were not like those officers who had functioned during the period 1765-1770 or those who had assisted Mughal administration before 1757.' (The History of Bengal, Vol. III., pp. 84).

৮৭ The Cambridge History of India, Vol. V , pp. 423.

৮৮. হেনরি বেভারিজ বলেন, 'So large a dividend was equivalent to an announcement to the public that the affairs of the Company were in a most flourishing condition.' (A Comprehensive History of India, Vol. II., pp. 429).

৮৯ Constitutional History of India (1765-1970), pp. 10.

them "in the disposal the Company's patronage" '
বলাবাহুল্য স্টক এক্সচেঞ্জের এই হঠাৎ উল্লম্ফন বা উর্ধগতি যে সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য আদৌ মঙ্গলজনক নয়, তা ইংল্যান্ডের তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার ঠিকই অনুভব করেছিল। সরকার বাধ্য হলো কোম্পানির দৈশিক ও বিদেশের কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি দিতে, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, হস্তক্ষেপ করতে। কারণ যে কোম্পানির বহির্দেশে বিশেষত বাংলায় নিযুক্ত ছোট-বড় কর্মচারীকুল সামান্য কয়েক বছরের কর্মকালে, বলা যায় প্রায় রাতারাতি ফুটপাতের গরিব থেকে বড়লোক হয়ে যায়[৯০], এমনকি লন্ডনের অর্থ-প্রতিপত্তিশালী অভিজাতদের সমকাতারে এসে দাঁড়াতে পারে, সেই কোম্পানিকে বিভিন্ন পর্যায়ের পাওনা পরিশোধ ও শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড দেয়ার জন্য সরকারি ব্যাঙ্কের কাছে চড়া সুদে ঋণের জন্য হাত পাততে হয়, এটি সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে ১৭৭২ সালেই (১৫ই ও ২৯শে জুলাই) কোম্পানি 'ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডে'র কাছ থেকে যথাক্রমে ৪,০০,০০০ ও ২,০০,০০০ পাউন্ড-স্টার্লিং ঋণ গ্রহণ করেছিল। একই বছরের আগস্ট নাগাদ (১০) 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের শীর্ষ কর্মকর্তারা তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর কাছে নতুনভাবে ১০,০০,০০০ পাউন্ড ঋণ প্রার্থনা করলেন। পরের বছরের মার্চে (৯) ৪% সুদে সরকারের কাছে আরও ১৫,০০,০০০ পাউন্ড ঋণ দাবি করলেন।[৯১]
বস্তুত এই যখন কোম্পানির অবস্থা তখন স্বাভাবিক কারণেই সরকারের চিন্তার কথা। যা হোক এটা ছিল স্বদেশে কোম্পানি ও বৃটিশ সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের একটা দিক। কিন্তু ১৭৬৯-৭০-এর দুর্ভিক্ষ এবং ১৭৭২-উত্তর বাংলার অর্থনীতির ভয়াবহ পরিস্থিতিতে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের আশঙ্কা হচ্ছিল এই ভেবে যে, এভাবে যদি কোম্পানির বহির্দেশিক আয় দিন-দিন হ্রাস পেতে থাকে, তবে একসময় তা শুধু কোম্পানির সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাপনাকেই শঙ্কাগ্রস্ত ও জটিল করে তুলবে না, বরং তা কোম্পানির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে ছাড়বে। ফলে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণ হেস্টিংস-এর কাছে আরও ভালো কিছু আশা করলো।
কিন্তু ততোদিনে স্বদেশের তথা ইংল্যান্ডের সরকার ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোতেই নাক গলানো শুরু করে দিয়েছিল। উল্লেখ্য, সরকার শুধু হস্তক্ষেপই করলো না, বরং বিভিন্ন প্রকারের শর্তের জালে কোম্পানিকে আবদ্ধ করে ফেললো। উদাহরণত বলা যায় সরকার, দেয় ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত কোম্পানির কাছে তার পাওনা স্থগিত রাখলো, এবং কোম্পানিকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলো যে, তারা শেয়ারহোল্ডারদেরকে এই সময়ে ৬% এর বেশি ডিভিডেন্ড এবং সরকারি ঋণ পরিশোধের পরে ৭% এর অধিক ডিভিডেন্ড দিতে পারবে না।[৯২] কারণ ইতোমধ্যে এ বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারদেরকে তারা যে মহাপ্রলুব্ধকর ঘোষণা দিয়েছিল

৯০. ড. কাপুর উল্লেখ করেছেন 'The surprising feature of the situation was that although the servants of the Company amassed wealth, the Company itself was faced with a serious financial crisis. The wreckless policy of the Company's servants and its expanding political commitments in India soon made the Company bankrupt.' (Constitutional History of India, 1765-1970, pp. 10).
৯১ A Comprehensive History of India, Vol. II., pp. 435.
৯২ Ibid., pp 435.

তা শুধু একতরফা ও অযৌক্তিকই ছিল না, সম্পূর্ণ অবৈধ এবং তাদের সামর্থ্যেরও বাইরে।
তবে সরকার যদি শুধু এটুকু করেই ক্ষান্ত থাকতো তাতেও কোম্পানির খুব একটা মাথা ব্যথা হতো না। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থের সরকার বাংলা তথা ভারতস্থ ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মবীক্ষণের জন্য ১৭৭২ সালের নভেম্বরে দু'টি সংসদীয় কমিটি (এর একটি ৩২-সদস্যবিশিষ্ট বহুল আলোচিত 'সিলেক্ট কমিটি' ও অন্যটি ১৩-সদস্যবিশিষ্ট 'কমিটি অফ সিক্রেসি' বা সংক্ষেপে 'সিক্রেট কমিটি') নিয়োগ করলো এবং তাদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছিল অবিলম্বে সেখানকার সামগ্রিক অবস্থা তদন্তক্রমে পার্লামেন্টের কাছে তুলে ধরতে। পরবর্তীকালে পার্লামেন্টে 'সিলেক্ট কমিটি' ১২টি ও 'সিক্রেট কমিটি' ৬টি প্রস্তাব বা সুপারিশ পেশ করেছিল। বস্তুত এই প্রেক্ষিতে সরকারের তরফ থেকে গৃহীত পদক্ষেপটিই ছিল ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মর্যাদা, স্বার্থ ও স্বাধীন অস্তিত্বের জন্যে মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।
প্রধানত কমিটির সুপারিশের আলোকে ও প্রত্যক্ষত সরকারের কাছে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের উপর্যুপরি ঋণ চাওয়ার বিষয় এবং সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোটখাট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যার মধ্যে অন্যতম ছিল নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে পলাশি-নাটকের প্রধান কুশীলব ক্লাইভের বাংলায় কোম্পানির সামান্য চাকুরি থেকে বিভিন্ন অবৈধ পন্থায় আয় ও এর ফলে লন্ডনের শ্রেষ্ঠ ধনীতে পরিণত হওয়ার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনে (এই সময় ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে তার নোংরা ও অবাঞ্ছিত ভূমিকা নিয়ে তদন্ত শুনানি হয়েছিল) সরকারের উদাসীনতা সম্বন্ধে ইংল্যান্ডের জনসমাজ ও স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবিদের প্রচণ্ড সমালোচনা[৯৩], সরকারকে বাধ্য করে কোম্পানির সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আনতে। ফলত সরকার এই লক্ষ্যে পার্লামেন্টে, "An act for establishing certain regulations for the better management of the affairs of the East India Company, as well in India as in Europe" ('The Regulating Act of 1773'[৯৪] নামেই সুপরিচিত) শিরোনামে একটি 'বিল' আনয়ন করেছিল (১৮ই মে, ১৭৭৩) -- 'A bill much more deeply affecting the constitution of the Company, ..'।
বিলের বিরুদ্ধে কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তারা প্রবল আপত্তি উত্থাপন ও সপক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাদের বহির্দেশীয় কর্মচারীকুল বিশেষত বাংলায় কর্মরতদের নানারূপ অবৈধ ও অনৈতিক আচরণ ও কর্মকাণ্ডের সংবাদে স্বদেশবাসী এতোই ত্যক্ত-বিরক্ত ছিল যে সরকারকে

---

৯৩ ড. অনুপচাঁদ কাপুর বলেন, 'The Company's peril of bankruptcy was, no doubt, the immediate cause of Parliament's first intervention, but "a more powerful motive was the growing feeling in England, to which the opulence and arrogance of officials returning from India contributed, that the nation must assert its responsibility for seeing that the new and vast experiment of ruling a distant and alien race was properly conducted".' (Constitutional History of India, 1765-1970, pp. 10).

৯৪ সংক্ষেপে এটিকে 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' বলার অর্থ মূলত এই আইন বলে কোম্পানির স্বদেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কার্যক্রম ও তৎপরতা (the affairs of the Company) নিয়ন্ত্রিত বা 'regulate' হওয়া শুরু হয়েছিল, বিধায় সংশ্লিষ্টগণ এর এই অভিধা দিয়েছিল। একার্থে তা যথার্থই দেয়া হয়েছিল।

এই বিল 'আইনে' পাশ করতে আদৌ বেগ পেতে হলো না (১০ই ও ২১শে জুন, ১৭৭৩)।[৯৫] এ পর্যায়ে 'নিয়ন্ত্রক আইন, ১৭৭৩'-এর যে যে অংশ[৯৬] বাংলায় বৃটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যক্রমকে, বিশেষ করে স্থিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করেছিল সেগুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হলো।

১৭৭৩ সালের নিয়ন্ত্রক বা নিয়ামক আইন

বাংলা ও ভারতে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় বিভিন্ন কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকর্তৃক প্রণীত[৯৭] ১৭৭৩ সালের নিয়ন্ত্রক বা নিয়ামক আইনের মূল বিষয়বস্তু ছিল দু'টি।[৯৮]

১. কোম্পানির স্বদেশস্থ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলী।
২. বহির্বিশ্বে ব্যবসায়-বাণিজ্যরত তাদের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীকুল।

আইনটির বিভিন্ন ধারায় উল্লিখিত দুই ক্ষমতাকেন্দ্রের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন সংযোজিত হয়েছিল, তবে শেষোক্তরাই অর্থাৎ এদেশে কর্মরত ইংরেজ কর্মচারীরাই যে ছিল এর প্রধান লক্ষ্য, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

যা হোক, আলোচনার শুরুতে এককথায় আইনটির প্রেক্ষিত বর্ণনা প্রসঙ্গে ড. Arthur Berriedale Keith-এর মন্তব্যটি উল্লেখ করে নিতে চাই।

---

৯৫. এই বিল পাশ করতে সরকার 'হাউস অফ কমন্সে' পক্ষে ১৩১ ও বিপক্ষে ২১ এবং 'হাউস অফ লর্ডসে' পক্ষে ৭৪ ও বিপক্ষে ১৭ ভোট পেয়েছিল।

৯৬. 'An act for establishing certain regulations for the better management of the affairs of the East India Company, as well in India as in Europe' (Act 13 of George III)-এ মোট ৬৪টি অধ্যায় ছিল।

৯৭. বহির্বিশ্বে বাণিজ্যরত স্বদেশি কোন ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে ইউরোপীয় কোন পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন ছিল এটিই প্রথম। অধ্যাপক শ্রীরাম শর্মা বলেন, 'It was the first measure by which a European government assumed the responsibility for governing territories acquired by it outside Europe and inhabited by civilised people. No other European nation had so far made any such attempt. For the English as well, it was the first measure of its kind.' (Quoted from, Contitutional History of India and National Movement. Prof. R C. Aggarwala, pp. 18)। সেই হিসেবে বলা যায় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৭৭৩ সালের 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' পাশ করে 'পাইওনীয়ার'-এর ভূমিকা পালন করেছিল।

৯৮. ভারতীয় সাংবিধানিক আইনবিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক ভি ডি. কুলশ্রেষ্ঠ বলেন, 'Its three main objects were (i) to reform the constitution of the Company, (ii) to reform the Company's government in India, and (iii) to provide remedies against illegalities and oppressions committed by the servants of the Company in India.' (Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 94).

ঐতিহাসিক কীথ বলেন, '.., the Regulating Act, .. altered the constitution of the Company at home, changed the structure of the government in India, subjected in some degree the whole of the territories to one supreme control in India, and provided in a very inefficient manner for the supervision of the Company by the ministry.'[৯]

এখানে কোম্পানির বাংলায় নিযুক্ত কর্মচারী বিশেষত কলকাতাকেন্দ্রিক গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ও তার 'কাউন্সিলে'র সদস্য ও অন্যদের ক্ষমতা ও কার্যাবলিসম্পর্কিত অনুশাসনগুলিই সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে। পরে সে অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থা ও তার অব্যবহিত ফল আলোচনা করবো। উল্লেখ্য যে বাংলার এই পর্বের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে এর সম্বন্ধ যেহেতু অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য, সুতরাং আমরা মনে করি এগুলি জেনে রাখা বাংলার ভূমিরাজস্বেতিহাসের পাঠকের জন্য খুবই জরুরি।

অনুচ্ছেদ/৭ — ফোর্ট উইলিয়ামস্থ বাংলা প্রদেশ (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি) শাসনের দায়িত্বে ১জন গভর্নর-জেনারেল ও তাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য ৪জন কাউন্সিলর বা উপদেষ্টা থাকবেন। বাংলার সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন এবং বাংলা, বিহার ও ওড়িশার (ইতোমধ্যে) অধিকৃত ভূখণ্ডসমূহ ও তদস্থিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত হবে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওপব;

অনুচ্ছেদ/৮ — সরকার পরিচালনায় যে কোন ধরনের মতভেদের ক্ষেত্রে গভর্নর-জেনাবেল ও কাউন্সিলরগণ উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত গ্রহণে বাধ্য থাকবেন। তবে কোন বিষয়ে সদস্যদের মত তথা ভোট যদি সমান হয়ে পড়ে তবে গভর্নর-জেনারেল বা তার অনুপস্থিতিতে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কাউন্সিলর অতিরিক্ত তথা 'কাস্টিং' ভোট দিতে পারবেন;

অনুচ্ছেদ/৯ — কোম্পানির মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বেঙ্কিউলেনস্থ প্রেসিডেন্সিসমূহের সাধারণ প্রশাসনিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও অতঃপর ন্যস্ত হবে গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলরগণ বা তাদের অধিকাংশের ওপর। আপদকালীন জরুরি অবস্থা ছাড়া এদের অনুমতি না নিয়ে এগুলিতে কর্মরত সরকারসমূহ ভারতীয় রাজন্যবর্গ বা রাজনৈতিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে কোনরূপ যুদ্ধ ঘোষণা বা তাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে না;

অনুচ্ছেদ/১০ — প্রথম গভর্নর-জেনারেল হবেন ওয়ারেন হেস্টিংস (বর্তমান গভর্নর), এবং ৪জন কাউন্সিলর হবেন যথাক্রমে -- (১) লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জন ক্লেভারিং, (২) কর্নেল জর্জ মনসন, (৩) রিচার্ড বারওয়েল ও (৪) ফিলিপ ফ্রান্সিস। এরা ফোর্ট উইলিয়ামে পৌঁছানো-কাল থেকে এই পদে ৫-বছরের জন্য অভিষিক্ত থাকবেন;

অনুচ্ছেদ/১৩ — ফোর্ট উইলিয়ামে তথা কলকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court

of Judicature) স্থাপিত হবে। এটি গঠিত হবে ১জন প্রধান বিচারপতি ও ৩জন 'puisne' বিচারপতি সমন্বয়ে, যাঁদের নিয়োগ দিবেন স্বয়ং ইংল্যান্ডের রাজা বা রাণী। যোগ্যতা হিশেবে এঁদেরকে ইংল্যান্ড বা আয়ারল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টার-এ্যাট ল' পাশ হতে হবে এবং সেই সঙ্গে এঁদের থাকবে আইন পেশায় ন্যূনতম ৫-বছরের অভিজ্ঞতা। সুপ্রিম কোর্ট যে সকল বিষয়ে বিস্তৃত ক্ষমতা তথা অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করবেন তার মধ্যে থাকবে দিওয়ানি, ফৌজদারি, নৌ ও ধর্মীয় বিষয়াদি,

অনুচ্ছেদ/১৪ সুপ্রিম কোর্ট বা আদালতের বিচারাধীন হবে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার এবং অন্য যে কোন রাজ্যের প্রজা যারা কোম্পানির আশ্রিত বা নিরাপত্তার আওতায় বসবাসরত[১০০]।

অনুচ্ছেদ/২১ গভর্নর-জেনারেলের বাৎসরিক বেতন হবে ২৫,০০০ পাউন্ড, এবং অনুরূপভাবে কাউন্সিলর, প্রধান বিচারপতি ও অপরাপর বিচারপতিদের যথাক্রমে ১০, ৮ ও ৬ হাজার পাউন্ড। এই বেতন পরিশোধিত হবে অধিকৃত অঞ্চলসমূহের তথা বাংলার রাজস্ব আয় থেকে[১০১];

অনুচ্ছেদ/৩৬ কোম্পানির স্বার্থে ও দেশের সুশাসনের প্রয়োজনে গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলরগণ ব্রিটিশ আইন-দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইন-বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন, তবে তাতে অবশ্যই 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের অনুমতি থাকতে হবে এবং তা সুপ্রিম কোর্টে নিবন্ধিত হবে। স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ-পত্রের অনুলিপি 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীকে দিতে হবে এবং তারা সেগুলির একটি সারমর্ম পার্লামেন্টের ভারতবিষয়ক কমিটিতে প্রেরণ করবে[১০২];

৯৯ A Constitutional History of India (1600-1935), pp. 70-71.

১০০. অনুচ্ছেদ ১৭-বলে গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলরগণকে, প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের আদালতের যে কোন ধরনের কার্যক্রম ও মামলা প্রভৃতির আওতামুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল।

১০১. তৎকালীন ইংল্যান্ড ও বাংলার দ্রব্য মূল্যের প্রেক্ষিতে এই উচ্চ হারে সংশ্লিষ্টদেরকে বেতন দেয়ার একটি অন্যতম অজুহাত ছিল যাতে করে এরা অন্য কোন পেশা বা ব্যবসায় রত না হতে পারে। ২২ ও ২৩ ধারায় এ নিষেধাজ্ঞা ছিল। এতে বলা হয়েছিল, 'these salaries "shall be in lieu of all fees of office, perquisites, emoluments, and advantages whatsoever", and that none of the persons to whom they are payable "shall, directly or indirectly, by themselves or by any other person or persons, for his or their use, or on his or their behalf, accept, receive, or take, of or from any person or persons, in any manner, or on any account whatsoever, any presen, gift, donation, gratuity, or reward, pecuniary or otherwise".' (A Comprehensive History of India, Vol. II., pp. 448).

উপরিউক্ত বিধিবিধানগুলি ছাড়াও আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা এই আইনে সন্নিবেশিত হয়েছিল যা সরাসরি বাংলার ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহক কর্মচারীদের অপকর্ম-অপতৎপরতার সঙ্গে জড়িত। Henry Beveridge বলেন, 'By another section (*of the Regulating Act*) all supervisors, collectors, and other persons engaged in the collection of the revenue, or the administration of justice within the Bengal presidency, were prohibited from buying or selling goods by way of traffic, and no British subject was to engage in the inland trade in salt, betel-nut, tobacco, or rice.'[১০৩]
এ পর্যায়ে আইনটির গুরুত্ব সম্বন্ধে সমকালীন ও আধুনিক ২/১জন ঐতিহাসিক-পণ্ডিতের মন্তব্য উদ্ধৃত করে এটির বাস্তবায়ন ও তৎপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি (যা মূলত আইনটির অসম্পূর্ণতা ও অস্পষ্টতার ফল) সম্পর্কে আলোচনা করবো।

'নিয়ন্ত্রক আইন, ১৭৭৩' -এর উদ্দেশ্য ও কার্যকরতা সম্পর্কে এর প্রবর্তক, ইংল্যান্ডের সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং Lord North বলেন, 'Every article in it is framed with a view to placing the affairs of the Company on a solid, clear and decisive establishment.'[১০৪]

ঐতিহাসিক Sir Alfred A. Lyall বলেন, 'The system of administration set up by the Act of 1773 embodied the first attempt at giving some definite and recognizable form to the vague and arbitrary rulership that had devolved upon the Company. From that time forward, the outline of the Anglo-Indian Government was gradually filled in.'[১০৫]

---

১০২ এই অনুচ্ছেদটিকে (সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠাসহ) ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডেস আইনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে আখ্যায়িত করেছেন যার মাধ্যমে ভারতে বৃটিশ-রাজের শাসনের সূত্রপাত ঘটেছিল বলা হয়েছে। তাঁর ভাষায়, 'These were the most important clauses of the Act, which was the foundation of British rule in India.' (A History of India, Michael Edwardes, pp. 199)

১০৩. A Comprehensive History of India, Vol II., pp. 448.
উল্লেখ্য পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জন্য একটি চমৎকার বিধান এতে সংযোজিত হয়েছিল, যা তৎকালীন বাংলার জন্যও প্রয়োজনীয় ছিল বলে মনে হয়। উক্ত ধারাটি সম্বন্ধে বেভারিজ বলেন, 'The only other enactments which it seems necessary to mention are, an attempt to regulate the rate of interest, by prohibiting all British subjects in the East Indies from taking more than 12 per cent:... ' (Ibid., pp. 448), কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে তা হয়নি।

১০৪ Quoted from, Advanced Study in the History of Modern India, Vol I., Dr. G. S. Chhabra, pp. 259.

১০৫ Quoted from, British Rule in India and After, Dr. Vidya Dhar Mahajan, pp 253

আধুনিক লেখক-পণ্ডিতদের মধ্যে Dr. Vincent Arthur Smith বলেন, 'The importance of the Regulating Act is that it marks the first assertion of parliamentary control over the Company and registers the first concern of Parliament for the welfare of the people of India. ... (*It*) was the first measure passed in a period of more than twenty years during which Indian affairs were a major topic in the British Parliament.'[১০৬]

১৭৭৩ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে 'নিয়ন্ত্রক আইন' পাশ হলেও এটি এদেশে এসে কার্যকরী হতে বেশ কিছুকাল সময় লেগেছিল। এক্ষেত্রে সময়ের ব্যাপারটি ছিল প্রধান। কারণ ইংল্যান্ডে যে কোন আইন পাশ হলে বা 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের দ্বারা কোন নির্দেশ-নির্দেশনা প্রেরিত হলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সুদীর্ঘ সমুদ্র পথের (তখনকার যুগের একমাত্র পথ) দূরত্ব পেরিয়ে তা ভারত বা বাংলায় এসে পৌঁছুতে বেশ কয়েক মাস সময় লাগতো। যা হোক ইত্যবসরে গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস ১৭৭৩ সালের ২৩শে নভেম্বর যে সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলেন তা, নতুন আইনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা হাতে পাওয়া অবধি কমবেশি মাস ৬ টিকেছিল।[১০৭] অতঃপর 'নিয়ন্ত্রক আইন'-এর অধীনে তিনি পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন।
'নিয়ন্ত্রক আইনে' গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই)-এর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিশেবে শপথ নেন ১৭৭৪ সালে। তার ৪-জন সহযোগী তথা কাউন্সিলরদের মধ্যে রিচার্ড বারওয়েল (Richard Barwell) এদেশেই ছিলেন।[১০৮] অন্যরা,

১০৬ The Oxford History of India, pp 521.
প্রখ্যাত ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক পণ্ডিত জি এন. সিংহও মন্তব্য করেন, 'The Act of 1773 is of great constitutional importance because it definitely recognised the political functions of the Company, because it asserted for the first time the right of the Parliament to dictate the form of government in what were considered till then the private possessions of the Company and because it is the first of a long series of Parliament statutes that altered the form of Government of India.' (Quoted from, Constitutional History of India and National Movement, pp. 18).

১০৭. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 419.

১০৮. বারওয়েল ১৭৫৮ সাল থেকে কোম্পানির চাকুরে হিশেবে ভারতে ছিলেন। ভূমিরাজস্ব বিভাগে তার অভিজ্ঞতা ছিল যথেষ্ট। আর. বি. র‍্যাম্‌সবোথাম তাকে 'regular type of the Indian official of those days' বলে অভিহিত করেছেন (The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 226). বাংলার অঢেল ধনসম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রতি অন্যদের মতো তারও ছিল প্রবল লোভ। ঢাকার 'চীফ'-এর পদ পেতে বার্ষিক ৫,০০০ পাউন্ড ব্যয় করতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না বলে ১৭৬৯ সালে তার বোনকে লিখিত এক পত্র থেকে জানা যায়। বস্তুত এ থেকেই বুঝা যাবে এই সমস্ত মহালোভনীয় পদগুলি থেকে এরা কী বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা লুটপাট করতো এবং পাচার করতো তা স্বদেশে।

জন ক্লেভারিং (Sir John Clavering)[১০৯], কর্নেল জর্জ মনসন (Colonel George Monson)[১১০] ও ফিলিপ ফ্রান্সিস (Philip Francis)[১১১] কলকাতায় এসে পৌঁছোন ১৯শে অক্টোবর, ১৭৭৪ সালে। প্রসঙ্গত আগেই জানিয়ে রাখা ভালো যে, এরা এসেছিলেন মূলত প্রশাসনিক কাজেকর্মে গভর্নর-জেনারেলকে উপযুক্ত পরামর্শ ও কার্যকর সহযোগিতা দিতে, কিন্তু নিতান্ত শুরু থেকেই গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস-এর সঙ্গে তাদের যে মনোমালিন্য ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল, সে সম্পর্কে এখানে কিছুটা আভাস না দিলে বলা যায় এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এদেশে আসার আগে থেকেই কাউন্সিলরদের মধ্যে একটা পূর্ব সংস্কার ছিল এই যে, তারা মনে করতেন, বাংলা ও ভারতে নিযুক্ত কোম্পানির সকল স্তরের কর্মচারিকুল মূলত অসৎ, দুর্নীতিবাজ ও সুযোগসন্ধানী।[১১২] এরা ছলে-বলে-কৌশলে এদেশের সম্পদ দু'হাতে লুণ্ঠন করছে এবং সেই অর্থ স্বদেশে পাচার করে সেখানকার অভিজাতমহলে 'নব্য নবাব' পরিচয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তাদের ধারণা ছিল, স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস ও তার নিকট সহ-জনেরাও এ অন্যায় কাজে শরিক। অবশ্য কাউন্সিলরদের ধারণা যে একেবারে অমূলক ছিল, তা

---

১০৯ সম্ভবত সামরিক ব্যক্তিত্ব বলেই তিনি ছিলেন সৎ ও অনমনীয়। তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক P E. Roberts মন্তব্য করেছেন, তিনি ছিলেন, 'honest, straight-forward man of passionate disposition and mediocre abilities.' (The Cambridge History of India, Vol V., pp 226) হেস্টিংস-এর জীবনীকার মারভিন ডেভিসও তাকে বলেছেন, 'an arrogant, pompous man' (Life and Times of Warren Hastings, pp. 155).

১১০ মনসন ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানির চাকুরিতে দক্ষিণ ভারতে নিযুক্ত ছিলেন। এর সম্বন্ধে সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা বা ইলিজা ইম্পে মন্তব্য করেছিলেন, তিনি ছিলেন -- 'a proud, rash, self-willed man, though easily misled and very greedy for patronage and power.' (The Cambridge History of India, Vol V., pp 226).
উল্লেখ্য যে 'কাউন্সিলে' যদিও হেস্টিংস বিরোধীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জন ক্লেভারিং, কিন্তু এক পর্যায়ে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে তিনিই (মনসন) হয়ে উঠেছিলেন সবচেয়ে বেশি হেস্টিংস-বিরোধী ও একরোখা।

১১১ ঐতিহাসিক মেকলে একে বলেছেন, "The ablest of the new Councillors, beyond all doubt'. (Op. cit., pp 573). কিছুটা কল্পনাবিলাসী হলেও আসলে পরবর্তীকালে তার প্রজ্ঞা ও মনীষার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ইংরেজ আমলে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার চিরস্থায়ী নীতি প্রণয়নে তিনি যে প্রস্তাব বা সুপারিশ পেশ করেছিলেন তার কয়েকটি 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীকর্তৃক গ্রহণে ও এদেশে অনুসরণের মাধ্যমে।

১১২ ড. অনুপচাঁদ কাপুর বলেন, 'Francis, Clavering and Monson were avowedly hostile to the Governor-General, Warren Hastings. They had absolutely no knowledge of the Indian problems and they came to India with prejudiced minds against the Company and its servants. They had their own notions and plans of governance and were pledged to act together and concentrate all power unto themselves.' (Constitutional History of India, pp. 15).

নয়। এর বেশির ভাগই ছিল নির্মম সত্য। যা হোক তাদের এই ধারণার তাৎক্ষণিক ফল এবং পরবর্তী দু'একটি তুচ্ছ ঘটনা কাউন্সিলরদের সঙ্গে হেস্টিংস-এর সম্পর্ক শুরুতেই খুব নাজুক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় যেদিন তারা পৌছান তাদের মনে মনে অভিলাষ ছিল, হেস্টিংস সমুদ্রবন্দরে তথা পোতাশ্রয়ে তাদেরকে সৈন্যদের ২১-বার তোপধ্বনির মাধ্যমে গ্রহণ করবেন।[১১৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এটি তখন ছিল গভর্নরদের অভিনন্দন জানানোর একটি চল। কিন্তু হেস্টিংস-এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে তাদেরকে স্বাগত জানানো হলো মাত্র ১৭-বার তোপধ্বনি দিয়ে।[১১৪] এতে স্বভাবতই এরা নিজেদের বেশ অপমানিত ও ক্ষুদ্র বোধ করলেন এবং এ জন্য ব্যক্তিগতভাবে হেস্টিংসকেই দায়ী ঠাওরালেন। তারা মনে মনে তখন হেস্টিংসকে এক হাত দেখে নেয়ার যোগাড়ে থাকলেন। শুরু হলো টক্কর -- একপক্ষে হেস্টিংস ও বারওয়েল এবং অন্যপক্ষে ক্লেভারিং-এর নেতৃত্বে মনসন ও ফ্রান্সিস। বলাবাহুল্য ফোর্ট উইয়িলামস্থ কাউন্সিলে কোম্পানির শীর্ষস্থানীয় নীতি নির্ধারকদের ব্যক্তিগত মনকষাকষি ও দলাদলি এবং একপক্ষের ওপর অপরপক্ষের সাময়িক বিজয়ই ছিল বাংলার পরবর্তী কয়েক বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসের চালচিত্র।

যা হোক ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসন এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার মানসে হেস্টিংস, কাউন্সিলরদের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে বসেন ২১শে অক্টোবর, ১৭৭৪ সালে। তিনি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় চলতি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও সর্বশেষ রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি, স্থিত প্রশাসনিক বিন্যাস বিশেষত কলকাতা ও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে ৬টি প্রাদেশিক কাউন্সিল বা বিভাগের গঠন ও এদের কার্য-পরিধি ইত্যাদি কাউন্সিলরদের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি কাউন্সিলরদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এই মর্মে যে, যেহেতু চলতি বছরের ভূমিরাজস্ব আদায় মৌসুম সমাগত প্রায়, সেহেতু আপাতত তা বহাল রাখা হোক, না হলে আদায় কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১১৫] বলাবাহুল্য বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিরোধী কাউন্সিলরদের বাস্তব কোন ধারণা ছিল না, সুতরাং তারা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেস্টিংস-এর প্রস্তাব মেনে নিলেন। কিন্তু যেহেতু তাদের মূল অভিসন্ধি ছিল কাউন্সিলে হেস্টিংস-এর যে কোন প্রস্তাব বা সুপারিশের বিরোধিতা করা ও তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা, সেহেতু ভূমিরাজস্ব ব্যতিরেকে অন্য বিষয়ে তারা মনোযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে প্রথমেই তারা যে জিনিসটিকে খুব জোরালোভাবে আলোচনায় টেনে আনলেন তা রোহিলা যুদ্ধপ্রসঙ্গ। P.E. Roberts বলেন, 'The first action of the new Councillors was to condemn the Rohilla war.'[১১৬]
তারা এ পর্যন্ত হেস্টিংস-এর নানা কাজের ফিরিস্তি, রোহিলাযুদ্ধে অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলার

১১৩. Critical and Historical Essays, Vol. One, pp 576.

১১৪. Life and Times of Warren Hastings, pp. 155; Critical and Historical Essays, Vol. One, pp. 576

১১৫. '... he recommended a continuation of the system, at any rate for the present, as the season of year was soon approaching in which the heaviest instalments of the revenue were due for payment' (Ramsbotham in, The Cambridge History of India, Vol.V., p. 420).

১১৬. History of British India, pp. 184-85.

বেগমদের সঙ্গে হেস্টিংস-এর অসদাচরণ ও এর নমুনা হিশেবে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, এবং লক্ষ্ণৌ (লখনউ)-য়ে নিযুক্ত রেসিডেন্ট স্যামুয়েল মিডলটনের সঙ্গে গভর্নরের পত্র যোগাযোগের কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার অজুহাতে দেখতে চাইলেন। শেষোক্ত কাগজগুলির মধ্যে বেশ কিছু ছিল সত্যিই গোপনীয়[১১৭], যা প্রকাশ পেলে কোম্পানির ভাবমূর্তি ও হেস্টিংস-এর অপকর্মের গোমর ফাঁক হয়ে যেতো; স্বভাবতই হেস্টিংস তা দেখতে দিতে অস্বীকার করলেন।
কিন্তু কাউন্সিলে হেস্টিংস-এর বিরোধীদের সংখ্যাই ছিল অধিক এবং যেহেতু ১৭৭৩ সালের 'নিয়ন্ত্রক আইনে'র ৭ ধারার বিধানানুযায়ী কাউন্সিলে যে কোন মতানৈক্যে অধিকাংশের মতই প্রাধান্য পাবে, এবং সেটিই সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হিশেবে সরকারিভাবে ঘোষিত ও কার্যকর হবে, ফলে এক্ষেত্রে হেস্টিংস ও বারওয়েল পরাজিত হলেন।
জন ক্লেভারিং দলের সিদ্ধান্তে লক্ষ্ণৌ থেকে অচিরে মিডলটনকে প্রত্যাহার করা হলো। বিরোধীরা ১৭৭২ সালে অত্যাধিক হারে ভূমিরাজস্ব ধার্যের জন্য হেস্টিংসকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করলেন।[১১৮] সেই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলার নবাবের কর্তৃত্বাধীন নিজামত আদালত কলকাতায় আনয়নেরও প্রবল সমালোচনা করলেন।
বস্তুত বিরোধীদের সিদ্ধান্তেই হেস্টিংসকে নিজামত আদালত পুনরায় মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করতে হলো। এমন কি হেস্টিংসকর্তৃক পদচ্যুত ও বিচারের সম্মুখীন ভূতপূর্ব 'নায়েব-ই নাজিম' মুহম্মদ রেজা খানকে সসম্মানে তাঁর পূর্বপদে ফিরিয়ে নিতে হলো (ডিসেম্বর, ১৭৭৫)।[১১৯] বলা যায় এভাবে তারা হেস্টিংস-এর প্রবর্তিত ও ইতোমধ্যে গৃহীত প্রায় প্রতিটা ছোট-বড় সংস্কার বা প্রকল্পকে হয় পুরোপুরি বাতিল, নতুবা কমবেশি পরিবর্তিত করলেন। হেস্টিংস-এর অবস্থা তখন এমন দাঁড়ালো যে, ড. বিদ্যাধর মহাজনের ভাষায় বলতে হয়, 'The result was that on many occasions Warren Hastings was over-ruled and he was made to do things which he did not approve of at all.'[১২০]
কাগজেপত্রে বাংলা, বিহার, ওড়িশা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রবল প্রতাপান্বিত মহামহিমাধর গভর্নর-জেনারেল হওয়া সত্ত্বেও, কাউন্সিলে, বিরোধীদের যুতবদ্ধ অসহযোগিতা ও উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতার কারণে কোণঠাসা হেস্টিংস-এর ভাবমূর্তি এ সময় সরকারি কর্মচারিদের কাছেই শুধু নয়, স্থানীয় জনমনেও তা অত্যন্ত করুণ ও পতিত আকারে ধরা পড়েছিল।
অন্যদিকে প্রাদেশিক কাউন্সিলের দিওয়ানি আদালতবিষয়ক ক্ষমতা, কালেক্টরদের আইনি ভূমিকা প্রভৃতি নিয়ে নবগঠিত সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গেও এ সময় হেস্টিংস ও তার কাউন্সিলরদের সম্পর্ক

---

১১৭. History of British India, pp. 185.

১১৮. A New Look on Modern Indian History, pp. 104.

১১৯. The History of Bengal, Vol. III., pp. 92; A Dissertation on the Administration of Justice of Muslim Law, pp 93; A New Look on Modern Indian History, pp. 104.

১২০. British Rule in India and After, pp. 57.
মেকলেও এ সময় হেস্টিংস-এর অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরেছেন এভাবে, 'Hastings was now regarded as helpless. The power to make or mar the fortune of every man in Bengal had passed, as it seemed, into the hands of the new Councillors.' (Op. cit., pp. 577)

ভালো যাচ্ছিল না। Dr. Smith যথার্থই বলেছেন, 'The new council was Hastings's major embarrassment, but the Supreme Court was also a cause for anxiety.'[১২১] অবশ্য এ জন্য যে হেস্টিংসপক্ষ দায়ী ছিলেন, তা নয়। বরং এক্ষেত্রেও '১৭৭৩ সনের নিয়ন্ত্রক আইনে'র কিছু কিছু অস্পষ্টতার ফল এই দু'টি শক্তিশালী সংস্থাকে অনেকটা মুখোমুখি দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছিল।

নবগঠিত সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ ১৭৭৪ সালেই ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলেন (১৭ই অক্টোবর)।[১২২] এঁদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য স্যার এলিজা ইম্‌পে (Sir Elijah Impey)[১২৩] -- প্রধান বিচারপতি হিশেবে, তাঁর অন্য ৩ সঙ্গী বিচারপতি এস. সি. লে. মেইস্টার (S. C. Le Maistre), বিচারপতি স্যার রবার্ট চেম্বার্স (Sir Robert Chambers) ও বিচারপতি জন হাইড (John Hyde)।

উল্লেখ্য যে ১৭৭৩ সালের 'নিয়ন্ত্রক আইনে' কলকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও উক্ত আইনে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা ছিল না। ফলে অ-নির্দিষ্ট এক্তিয়ার ও ক্ষমতা প্রদর্শন করতে গিয়ে সূচনাতেই সাধারণ প্রশাসন তথা কলকাতা কাউন্সিলের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বাদানুবাদ দেখা দিয়েছিল। ড. মহাজন বলেন, 'Unfortunately, the powers of the Supreme Court were not clearly defined and that led to a conflict of jurisdiction between the Supreme Court of Calcutta and the courts of the Company. There were frequent tussles between the two authorities.'[১২৪]

আগেই জানিয়েছি হেস্টিংস-এর ১৭৭২ সালের সংস্কারের ফলে বাংলা ও বিহারের ৬টি প্রধান শহর বা বিভাগে প্রাদেশিক কাউন্সিল ও তাদের অধীনে নায়েব-আমিলেরা ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায় এবং দিওয়ানি মামলার বিচারসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতো। কিন্তু এই প্রথম কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কোর্ট এদের দিওয়ানি বিচারবিষয়ক ক্ষমতার

---

১২১. The Oxford History of India, pp. 506.

১২২. এঁদের আগমনের সঠিক তারিখ নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে। ড বি. বি. মিশ্র মনে করেন, বিচারপতিরা, ক্লেভারিং প্রমুখ কাউন্সিলরদের আগমনের তারিখেই কলকাতায় পদার্পণ করেছিলেন। দেখুন, The Judicial Administration of the East India Company in Bengal, pp. 196.

১২৩. স্যার এলিজা ইম্‌পে ইংল্যান্ডের হ্যামারস্মিথে এক মধ্যবিত্ত বণিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন (১৩ই জুন, ১৭৩২)। তাঁর শৈশবের শিক্ষাজীবন ওয়েস্টমিনিস্টার স্কুলে অতিবাহিত হলেও পরবর্তীকালে তিনি কিংস স্কলার হিশেবে ক্যাম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়াশুনা ও লিঙ্কনস ইন্‌ থেকে ব্যারিস্টার অ্যাট-ল ডিগ্রী অর্জন করেন। শৈশবে হেস্টিংস-এর তিনি সহপাঠী ছিলেন (যদিও হেস্টিংস ছিলেন তাঁর চেয়ে কিছুটা ভালো ছাত্র)। কর্মজীবনে কিছুকাল আইন পেশায় নিয়োজিত থাকার পর ১৭৭৩ সালে তিনি তৎকালীন লর্ড চ্যান্সেলর হেনরি বাথহার্স্ট কর্তৃক পার্লামেন্টের অনুমোদনে বাংলার সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন (১৭৯০) এবং এ পদে ১৭৯৬ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১২৪. British Rule in India and After, pp. 57.

বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বসলো। অধিকন্তু সুপ্রিম কোর্ট, কলকাতা কাউন্সিলের দিওয়ানি মামলার আপিল শুনানির অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তুললো। সুপ্রিম কোর্ট এ-ও দাবি করলো, যেহেতু 'নিয়ন্ত্রক আইন'বলে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ফলে এর ওপরই যে কোন ধরনের আপিল শুনানির আদি-অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্পিত, অতএব এখন থেকে তাঁরাই দিওয়ানি মামলার আপিল শুনানি ও নিষ্পত্তি করবে। অন্যদিকে কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলবদের মধ্যে চরম বৈরীভাব বিরাজ করলেও, ক্ষমতা সঙ্কুচিত হওয়ার আশঙ্কায় এই একটি ব্যাপারে তারা উভয়পক্ষই একাট্টা হয়ে গেলেন। তারা সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, যেহেতু 'নিয়ন্ত্রক আইনে' এ বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করে আইন প্রণেতাগণ উল্লেখ করেননি, সুতরাং কোর্টের এ দাবি শুধু অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীনই নয়, উপরন্তু তা অনধিকার চর্চারও শামিল। তারা আরও যুক্তি দিলেন, 'নিয়ন্ত্রক আইনে' মূলত ভারতস্থ 'ব্রিটিশ প্রজাদের' ('British Subjects') ওপরই সুপ্রিম কোর্টকে এক্তিয়ার ফলানোর অধিকার দেয়া হয়েছে, যা প্রচলিত 'মেয়র্স কোর্ট'-এর অনুরূপ[১২৫], ফলে ব্রিটিশ প্রজা ব্যতিরেকে এদেশীয়দের বিশেষত জমিদার-তালুকদার, স্থানীয় রাজন্যবর্গ, ভূম্যধিকারীদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ বা আইনগত অধিকার সুপ্রিম কোর্টের নেই।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ, কাউন্সিলের এ ধরনের যুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। যা হোক এ অবস্থায় উভয়পক্ষের দ্বন্দ্ব কী ভয়াবহ ও সরাসরি সাংঘর্ষিক পর্যায়ে গিয়েছিল, তা নিচের একটি ঘটনা থেকেই সম্যক বুঝা যাবে।

রাজা সুন্দরনারায়ণ ছিলেন মেদিনীপুর জেলার কাশিজুরার জমিদার। মূলত কোম্পানির ভূমিরাজস্ব নিয়মিত পরিশোধের প্রয়োজনে রাজা, কাশীনাথ বাবু নামক জনৈক কুশীদজীবীর কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে উপর্যুপরি তাগিদ সত্ত্বেও রাজা তা পরিশোধ না করায় কাশীনাথ তার বিরুদ্ধে প্রথমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিশেবে 'কালেক্টর' ও পরে কলকাতাস্থ 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর দপ্তরে মামলা করেন। সেখানে ব্যর্থ হয়ে শেষে রাজার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এক 'মানিস্যুট' মোকদ্দমা রুজু করলেন (১৩ই আগস্ট, ১৭৭৭)। কোর্ট, কাশীনাথ বাবুর উকিলের বক্তব্য শুনে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা সুন্দরনারায়ণের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। গ্রেপ্তার এড়াতে রাজা তখন আত্মগোপন করলেন। ইত্যবসরে আনুপূর্বিক ঘটনাটি বিবৃত হয়ে মেদিনীপুরের কালেক্টরের মাধ্যমে কলকাতায় হেস্টিংস তথা কাউন্সিলের কানে গিয়ে পৌঁছুলো। কাউন্সিল, প্রথমে তাদের অ্যাডভোকেট-জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, পরে এই মর্মে এক সাধারণ বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন যে, যারা কোম্পানির প্রত্যক্ষ চাকুরে বা অধীন নয়, অথবা নিজেরা স্বেচ্ছায় আগ্রহী হয়ে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপ্রার্থী হবে না, তারা সুপ্রিম কোর্টের তথাকথিত এই আদেশের প্রতি কর্ণপাত করতে বাধ্য নয়। এদিকে হেস্টিংস গোপনে পলাতক রাজাকেও বরাভয় দিলেন। ফলে রাজাকে গ্রেপ্তার করতে যখন সুপ্রিম কোর্টের শেরিফ এলেন তখন তিনি (রাজা) নিজস্ব বাহিনী দিয়ে তাকে অপমান করে খেদিয়ে দিলেন।

বিষয়টি কানে গেল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের। তাঁরা এবার রাজার বাটির অস্থাবর মালামাল ক্রোকের আদেশ দিলেন (১২ই নভেম্বর, ১৭৭৯)। শেরিফ, প্রায় ৬০/৭০ জনের এক দল নিয়ে

১২৫ 'মেয়র্স কোর্টস অ্যাট ক্যালকাটা' সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, The Administration of Justice under the East-India Company in Bengal, Bihar and Orissa, Chapter II.

সুন্দরনারায়ণের বাড়ি ঘেরাও এবং তাকে বন্দি করলেন। রাজার বন্দি হওয়ার ঘটনা জানতে পেরে গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিল মেদিনীপুরের আর্মি কমান্ডার কর্নেল অ্যামাটি'কে আদেশ দিলেন শেরিফকে আটক ও রাজাকে মুক্ত করতে। যথারীতি কর্নেলের আদেশে লেফটেন্যান্ট ব্যামফোর্ডের নেতৃত্বে ২ কোম্পানি সৈন্য, তৎক্ষণাৎ শেরিফ ও তার দলবলকে পথিমধ্যে আটক করলো (৩রা ডিসেম্বর) এবং ৩-দিন কয়েদ রেখে তাদেরকে কলকাতায় চালান দিলো। পরে হেস্টিংস যদিও শেরিফকে মুক্তি দিলেন কিন্তু কর্নেল অ্যামাটি'কে এক প্রকার স্থায়ী নির্দেশই দিয়ে রাখলেন যে, ভবিষ্যতে যদি রাজাকে শেরিফ বন্দি করতে যায় বা আসে তবে তাকে যেন যে কোন মূল্যে বাধা দেয়া ও আটক করা হয়।

বিফল মনোরথ কাশীনাথ বাবু এবার গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা আনলেন। ক্ষুব্ধ বিচারপতিগণ কাউন্সিলের সদস্যদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করেন। এ পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে হেস্টিংস ও অন্যরা আদালতে হাজির হলেন বটে, কিন্তু যেইমাত্র তারা বুঝতে পারলেন যে, এ যাবৎ তারা যা কিছু করেছেন, তা অফিসিয়াল কর্তৃত্বে অর্থাৎ দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই করেছেন, সেইমাত্র তারা আদালতের হাজিরা থেকে নিজেদের (নাম) প্রত্যাহার করে নিলেন। উপরন্তু ফোর্ট উইলিয়ামে ফিরে গিয়ে তারা আগের মতোই আর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন এই মর্মে যে, কলকাতার খোদ অধিবাসী না হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সুপ্রিম কোর্টের আদেশ বা পরোয়ানার প্রতি গুরুত্ব না দিলেও চলবে, সেক্ষেত্রে কাউন্সিল সংশ্লিষ্টদের সুপ্রিম কোর্টের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে এবং তাদের আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

বিচারপতিগণ এবার আরও তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্‌পে, অন্যান্য বিচারপতিগণের সঙ্গে পরামর্শক্রমে গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস ও রিচার্ড বারওয়েল ব্যতীত অন্যান্য কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলেন। সম্ভবত সুপ্রিম কোর্ট মনে করলেন, যেহেতু জন ক্লেভারিং প্রমুখের সঙ্গে গভর্নর-জেনারেলের বৈরী সম্পর্ক বিদ্যমান, সুতরাং নতুন আদেশ প্রতিহতকরণে হেস্টিংস এবার ততোটা প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা নেবেন না। হেস্টিংস ও বারওয়েলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি না করার কারণ হিশেবে প্রধান বিচারপতি ইম্‌পে এইসময় যে ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি করেছিলেন, সেটি যে কোন যুগের যে কোন দেশের সংশ্লিষ্টদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। এ প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি ছিল খুবই অকাট্য, তাঁর ভাষায়, 'As to the Governor-General and Barwell, we will not include them in the Rule because we will not grant a Rule which we cannot enforce'"[১২৬]

সুপ্রিম কোর্টের এ আদেশ প্রতিপালনেও সেনা কর্মকর্তারা অপারগতা প্রকাশ করলেন। যা হোক পরবর্তীকালে এই বিরোধের স্থায়ী নিষ্পত্তি ঘটেছিল প্রথমত কোম্পানির অ্যাটর্নি-জেনারেল নর্থ নেইলরকে সুপ্রিমকোর্টকর্তৃক 'দৃষ্টান্তস্থাপনমূলক' শাস্তি দান (অনেকটা ঝি মেরে বৌ বুঝানোর মতো) এবং প্রধান বিচারপতি এলিজাকর্তৃক সদর দিওয়ানি আদালতের বিচারকের পদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে (১৮ই অক্টোবর, ১৭৮০)। এই পদের জন্য স্যার এলিজা ইম্‌পে, সুপ্রিমকোর্টের প্রধান

১২৬ উদ্ধৃতি সংগৃহীত, Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 119

বিচারপতির নির্ধারিত বেতন-ভাতার বাইরে অতিরিক্ত বাৎসরিক ৬,০০০ পাউন্ড[১২৭] বা মাসিক ৫,০০০ টাকা[১২৮] পেতেন। উল্লেখ্য যে, বাংলার এ পর্বে ইংরেজদের লুটপাট তথা যেনতেন প্রকারে অর্থ হাসিলের চেষ্টা যে কী নোংরা ও বিবেকবর্জিত পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার প্রমাণ এই ঘটনা। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মতো ন্যায়াদালতের সর্বোচ্চ পদাধিকারীও যে অর্থের লোভ সামলাতে পারেননি তা এ থেকে প্রতীয়মান হবে। পরবর্তীকালে অবশ্য এ জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইম্‌পে-কে জবাবদিহিও করতে হয়েছিল; যদিও সে যাত্রা তাঁর অপরিমেয় মেধা, প্রজ্ঞা আর তুলনাহীন বাগ্মিতা তাঁকে রক্ষা করেছিল চূড়ান্ত অপমানের হাত থেকে।

ব্যাপকার্থে সুপ্রিম কোর্ট, মফস্বল দিওয়ানি আদালতের রায়ের আপিল শুনানির প্রক্রিয়া চালু করায় স্বাভাবিকভাবেই আগে যেখানে, 'Appeal lay from the councils to the Sadr Adalat in matters above 1,000 rupees in value. Complaints against the head farmers, diwans, zamindars, and other chief officers were assigned to the provincial councils with appeal to the council of revenue at Calcutta.'[১২৯] , -- এখন সেগুলি চলে এলো 'সুপ্রিম কোর্ট অফ জুডিকেচার'-এর আওতায়। ইতোমধ্যে অবশ্য প্রাদেশিক কাউন্সিলের ভূমিরাজস্ব ও দিওযানি বিচারসংক্রান্ত কার্যাবলিও পৃথক করা হয়েছিল (১১ই এপ্রিল, ১৭৮০)।[১৩০]

ইম্‌পে-র যোগদানের পর প্রাদেশিক কাউন্সিল শুধু ভূমিরাজস্বের কাজগুলিই দেখাশুনা করতো। পরে জেলাগুলোতে নায়েব-আমিলদের স্থলে ইংরেজ 'কালেক্টরে'রা পুনরায় নিযুক্ত হলে এদের বিচারের রায়ের আপিল নিষ্পত্তির ভারও সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে নেয়।[১৩১]

এদিকে কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস ও বারওয়েল একপ্রকার কোণঠাসা হয়ে পড়লেও সেই অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল কর্নেল মনসনের আকস্মিক মৃত্যুতে (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৭৭৬)। 'কাস্টিং' ভোটাধিকারী গভর্নর-জেনারেলসহ এখন কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো সাকুল্যে ৪ জনে।[১৩২] আগেই জানিয়েছি রিচার্ড বারওয়েল ছিলেন আগাগোড়াই হেস্টিংস-এর পক্ষে। ফলে এ পর্যায়ে কাউন্সিলে যে কোন মতানৈক্যে ভোটাভুটি হলে স্বাভাবিকভাবে কাউন্সিলরগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়তেন -- একপক্ষে হেস্টিংস ও বারওয়েল এবং অন্যপক্ষে জন ক্লেভারিং ও ফিলিপ ফ্রান্সিস। এ অবস্থায় হেস্টিংস নিজস্ব 'কাস্টিং' ভোটের জোরে সিদ্ধান্ত আত্মপক্ষে নিতে সমর্থ হতেন। উল্লেখ্য, পরের বছর বেশ কিছুদিন আমাশয়ে ভুগে হেস্টিংস-এর প্রতিদ্বন্দ্বীদের নেতৃত্ব-দাতা লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জন ক্লেভারিংও মৃত্যুবরণ করলেন (৩০শে আগস্ট, ১৭৭৭)। অনেক পরে এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এসেছিলেন (১৭৭৯) স্যার আয়ার কুট (Sir Eyre Coote)। এখন বিরোধী শিবিরে থাকলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস একাই। হেস্টিংস তাকেও এক ঘরোয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে পিস্তলের গুলিতে শারীরিকভাবে মারাত্মক-আহত ও পরে বাংলা

১২৭. A Dictionary of Indian History, Dr. Sachchidananda Bhattacharyya, pp. 460.

১২৮. বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, আধুনিক যুগ, পৃষ্ঠা ১০।

১২৯. A Constitutional History of India, Dr Keith, pp. 66.

১৩০. Ibid, pp. 87.

১৩১. British Rule in India: A Select Study, pp. 64.

১৩২ মনসনের শূন্য পদ পূরণ করেছিলেন এডওয়ার্ড হুইলার।

ছাড়তে বাধ্য করলেন।[১৩৩]

বলা যায় বিরোধী দল-শূন্য কলকাতা কাউন্সিলে এবার শুরু হলো হেস্টিংস-এর নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও কর্তৃত্ব জাহিরের যুগ।[১৩৪] তবে ইতোমধ্যে তার ও কাউন্সিলবদের বিরোধে প্রায় ৫/৬ বছব কেটেছিল[১৩৫], যা সমকালের জনসমাজের চোখে সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভাবমূর্তিকেই শুধু হেয় করেনি, উপরন্তু, 'This violent and long-drawn struggle in the highest executive had injurious effect on affairs of the Company."[১৩৬]

এখানে এদেশের জনসাধারণের ওপর ১৭৭৩ সনের 'নিয়ন্ত্রক আইনে'র প্রভাব সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এক কথায় বলতে গেলে, তা কোম্পানির সংবিধান ও স্থানীয় প্রশাসনের উচ্চপদস্থদের বদবদল ও সংগঠনে কমবেশি ভূমিকা রাখলেও এবং ক্ষমতাসীনদেব ক্ষমতা ভাগাভাগি ও লড়াইয়েব একটি শক্তিশালী প্রেক্ষিত বা মঞ্চ হিশেবে কাজ করলেও, বাংলা, বিহাব ও ওড়িশার আপামব জনমণ্ডলী বিশেষত সদ্য দুর্ভিক্ষমুক্ত কিন্তু প্রবল দুর্দশাগ্রস্ত রায়তেব কল্যাণ বা ভাগ্য পবিবর্তনে পুরোপুরিই অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল।[১৩৭]

এ পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনেব বাইরে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আলোচনা করবো।

১৭৭২ সালের পাঁচসনা বন্দোবস্তের মেয়াদ ছিল ১০ই এপ্রিল, ১৭৭৭ পর্যন্ত। এই ব্যবস্থা শুরু থেকেই প্রত্যাশিত ফল প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছিল। সুতরাং এর স্থলে ভিন্ন কিছু করার তাগিদ হেস্টিংস ও কাউন্সিলরগণ অনুভব করছিলেন। কিন্তু নতুন ব্যবস্থা যে কী হবে, বা সঠিক কোন্ প্রথা-পদ্ধতি অনুসরণ করলে বাহ্যত রায়তসাধারণের মঙ্গলের পাশাপাশি কোম্পানির ভূমিরাজস্ব আয় যথানুগ ও নিয়মিত হবে, সে বিষয়ে তারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না। ১৭৭৫ সালেব ২১শে মার্চ কাউন্সিলের এক সভায় তাই গভর্নর-জেনারেল এ সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তাভাবনা পেশ করার জন্য কাউন্সিলরদের প্রকাশ্য মত আহ্বান করলেন। ফলত ২২শে এপ্রিল তিনি নিজেই, রিচার্ড বারওয়েলের সঙ্গে যৌথভাবে ১৭টি প্রস্তাবসম্বলিত এক সুপারিশ উপস্থাপন করলেন। তাদের প্রস্তাবের মূল কথা ছিল, এক বা দুই জীবন (পরপর দু'পুরুষ বলাই সঙ্গত) স্বত্বে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত প্রদান ('leases for life or two joint lives')।[১৩৮] অন্যদিকে কাউন্সিলের সবচেয়ে মেধাবী সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিসও এদের ঠিক ৯-মাস পরে ২২শে জানুয়ারি,

---

১৩৩ এই দুঃখজনক কিন্তু হাস্যকব ব্যক্তিগত যুদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Life and Times of Warren Hastings, Chapter VI: The Duel

১৩৪ কযেক বছরের এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে হেস্টিংস যে ভাগ্যের জোরে এবং অনেকটা ব্যক্তিগত মবণপণ তৎপরতায় উদ্ধাব পেয়েছিলেন, তাব হাঁফ ছেড়ে বাঁচাব বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন, '... my antagonists died, sickened and fled away.'

১৩৫. Constitutional History of India and National Movement, pp 15

১৩৬ Ibid. pp. 15.

১৩৭ ড আর. সি. আগরওয়ালা যথার্থই বলেন, যদিও 'নিয়ন্ত্রক আইন' পাশের মাধ্যমে, 'Lord North sought to make changes in the Constitution of the Company but made no attempt to improve the lot of Indians ' (Constitutional History of India and National Movement, pp. 14)

১৩৮ The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 423.

১৭৭৬ সালে পাল্টা সুপারিশ উপস্থাপন করলেন। তার প্রস্তাবের মোদ্দা কথা ছিল, বাংলার পরবর্তী ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত হতে হবে প্রধানত জমিদারদের সঙ্গে এবং স্থায়ী স্বত্বে ('a settlement in perpetuity with the zamindars')।[১৩৯] স্মর্তব্য, তখনও মনসন ও ক্লেভারিং জীবিত এবং কাউন্সিলে বহাল তবিয়তে হেস্টিংস বিরোধিতা করে চলেছিলেন। তাদের উভয় প্রস্তাবই ইংল্যান্ডে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠানো হলো।

হেস্টিংস ও বারওয়েল পরিকল্পনা

২২শে এপ্রিল, ১৭৭৫ সালে 'কাউন্সিল' সভায় ক্লেভারিং প্রমুখের বিরোধিতার মুখে হেস্টিংস ও তদীয় বন্ধু রিচার্ড বারওয়েল যৌথস্বাক্ষরে যে ১৭টি সুপারিশ উপস্থাপন করেছিলেন, তা:-

১. দিওয়ানি অধিগ্রহণ (১৭৬৫)-উত্তর কাল-পরবর্তী সকল ধরনের অতিবিক্ত কর বিলুপ্ত হবে (এর পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকার মতো ছিল);

২. ২৪-পরগণার জমিদারি 'লট'-আকারে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা হবে যার সর্বোচ্চ ভূমিরাজস্ব হবে বাৎসরিক ২০-৩০ হাজার টাকা। নিলাম ডাকে ইউরোপীয়রাও অংশ গ্রহণ করতে পারবে, তবে শর্ত থাকবে তারা স্থানীয়দের জন্য নির্ধারিত দেশি আইন-কানুন মেনে চলবে ও আদালতের আজ্ঞাধীন হবে;

৩. ভূমিরাজস্ব ধার্য হবে পূর্ববর্তী ৩ বছরের 'জমা'র গড়ের ভিত্তিতে, এবং এর অতিরিক্ত ১৫% নেয়া হবে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের 'চার্জ'বাবদ;

৪. ধার্য রাজস্ব একই হারে বন্দোবস্ত প্রাপকের মৃত্যু অবধি বহাল থাকবে। তবে যথাসময়ে নির্দিষ্ট ভূমিরাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে জমিদারির সম্পূর্ণ, বা অংশবিশেষ হারাহারিভাবে বিক্রি করে বকেয়া আদায় করা যাবে;

৫. বন্দোবস্ত গ্রহীতার মৃত্যুতে সংশ্লিষ্ট এস্টেট বৈধ উত্তরাধিকারী/ উত্তরাধিকারীদের বরাতে প্রচলিত হারে বা নতুন 'হস্তবুদ'র ভিত্তিতে বিলি করা যাবে। 'হস্তবুদ' প্রস্তুতের খরচ আধাআধি হারে সরকার ও জমিদারকে বহন করতে হবে;

৬. তবে এ ব্যাপারে যদি মৃতের উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণ পূর্ববর্তী শর্তে বন্দোবস্ত গ্রহণে অনাগ্রহী হয়, তবে সে বা তারা অন্যের কাছে তা বিক্রি করতে পারবে যিনি সরকারি প্রাপ্য দিতে প্রস্তুত থাকবেন। সেটিও সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট এস্টেট আপনাআপনি সরকারে প্রত্যর্পিত হবে;

৭. অধিকন্তু মৃতের উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণ যদি নতুন 'হস্তবুদে'র ভিত্তিতে বন্দোবস্ত গ্রহণে গররাজি হয়, তখন সরকার তা স্বাধীনভাবে বিলিবণ্টন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সরকার তাদেরকে পূর্ববর্তী 'জমা'র ১০% হারে জীবিকা ভাতা দিতে বাধ্য থাকবে;

---

১৩৯. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 423.

৮. যদি মৃতের উত্তরাধিকারী নাবালক হয়, এবং তার জন্য কোন আইনসঙ্গত অভিভাবক মনোনীত না হয়ে থাকে, তবে তার বয়স ১৮ বছর না-হওয়া পর্যন্ত সরকার স্বাধীনভাবে সংশ্লিষ্ট এস্টেটের বিলি ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করবে। এ জন্য নাবালক জমিদার ১০% হারে ভাতা পাবে;

৯ উত্তরাধিকারীর বয়স ১৮ বছর হলে তাকে পূর্ববর্তী হারে ৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হবে। যদি সে তাতে অস্বীকৃত হয় তবে সরকার তা ৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পন্থায় বিলিবণ্টন করবে;

১০. ২৪-পরগণার জমিদারি ব্যতীত বাংলার সকল জেলা বা অঞ্চলের ভূখণ্ড নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে সুবিধাজনক শর্তে গ্রহীতার আজীবন বা দু'পুরুষের জীবনকাল শর্তে বন্দোবস্ত দেয়া হবে;

১১. বন্দোবস্তের শর্তে এটি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকবে যে, দেয় ভূমিরাজস্ব একবার ধার্য করা হলে পরবর্তীতে তা কখনও বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হবে না;

১২. স্থিরীকৃত ভূমিরাজস্ব কোন জমিদার নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার জমিদারি বা এর এক-পঞ্চমাংশ (বকেয়া আদায়ের জন্যে যেটুকু প্রয়োজনীয়) প্রকাশ্য নিলামে অন্যত্র বিক্রি করে সরকার ঘাটতি উসুল করতে পারবে;

১৩ উপরোল্লিখিত ৪ থেকে ৯নং অনুচ্ছেদ মূলত কলকাতা জমিদারির জন্য প্রযোজ্য হবে; তবে এগুলি বাংলার অন্যান্য জেলা এবং তথাকার বন্দোবস্ত গ্রহীতাদের ক্ষেত্রেও প্রতিপাল্য হবে;

১৪ যেক্ষেত্রে জমিদার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জমিদারি স্থানীয়ভাবে বিলিবণ্টন করবে না, সেখানে স্বয়ং সরকার বিলিবণ্টনের উদ্যোগ নেবে এবং সংশ্লিষ্ট জমিদারকে নিরূপিত রাজস্বের ১০% জীবিকা ভাতা দেবে মাত্র;

১৫. প্রতিটা জমিদার মোগল আমলের ন্যায় স্বীয় জমিদারির ফৌজদার হিশেবে দায়িত্ব পালন করবে। তার এলাকায় কোন চুরি-ডাকাতি বা খুন হলে সে জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন;

১৬. এটি বস্তুত লবণ কর সম্পর্কিত; এবং

১৭. (তাদের এই) প্রস্তাবনাগুলি, প্রয়োজনে যথোপযুক্ত সংশোধনীসহ, 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের পর রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন-বিধি আকারে ঘোষিত হবে, এবং শুধু তাই নয়, এগুলি কঠোরভাবে অনুসৃত হতে হবে যাতে করে গভর্নর-জেনারেল বা কাউন্সিলরগণ নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো তা যখন তখন স্থানীয়ভাবে পরিবর্তন করতে না পারেন, এবং সেগুলির একটি সরকারি ভাষ্য ইংরেজি, ফারসি ও বাংলায় (Vernacular) লিখে প্রদেশের সকল কাছারিতে লটকিয়ে টাঙিয়ে দিতে হবে।

ফিলিপ ফ্রান্সিস পরিকল্পনা

বস্তুত হেস্টিংস ও বারওয়েলের পরিকল্পনার অসারত্ব প্রমাণ ও নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাচেতনা প্রকাশের লক্ষ্যেই ফিলিপ ফ্রান্সিস তার পাল্টা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। তার পরিকল্পনার একটা জবরদস্ত নামও দিয়েছিলেন ফিলিপ, যা এ রকম -- 'Plan for a Settlement of the Revenues of Bengal, Bihar and Orissa of 22 January, 1776'।
তার প্রস্তাবগুলি ছিল নিম্নরূপ:-

১ ভূমির ওপর 'জমা' তথা সরকারি পাওনা চিরকালের জন্য স্থায়ী বা স্থির করে দিতে হবে এবং আইন করে ঘোষণা করতে হবে যে, স্থিরীকৃত 'জমা' ভবিষ্যতে কোন অবস্থায়ই আর পরিবর্তন করা হবে না;

২. 'জমা' নিরূপিত হবে সরকারের ব্যয় অর্থাৎ প্রয়োজনের নিরিখে, প্রচলিত ব্যবস্থার ন্যায় ভূমির উৎপাদনের ওপর ভিত্তিমান নয়;

৩ জমিদাররাই জমির মালিক[৮]; ফলে তাদেরকেই রাষ্ট্রীয়ভাবে জমির স্বত্বাধিকারী বা মালিক বলে ঘোষণা করতে হবে এবং 'জমা' নির্ধারণের সময় তাদের আর্থিক সঙ্গতির দিকেও খেয়াল রাখতে হবে;

৪. বিস্তৃত 'হস্তবুদ' তৈরির পরিবর্তে ভূমিরাজস্ব নিরূপিত হবে সংশ্লিষ্ট জমিদারির বিগত ৩-বছরের 'জমা'র গড়ের ভিত্তিতে;

৫. একবার 'জমা' স্থিরীকৃত হওয়ার পর, অতঃপর আর কোন অবস্থাতেই এর অতিরিক্ত কর বা আবওয়াব মাথোট ধার্য ও আদায় করা যাবে না;

৬. জমিদার ধার্য ভূমিরাজস্ব নিয়মিত পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। রাজস্ব বাকি পড়লে তা আদায় করা হবে সংশ্লিষ্ট জমিদারি সম্পূর্ণ বা আংশিক বিক্রি করে;

৭. নাবালক, পাগল বা অন্য কোনভাবে অযোগ্য জমিদারের এস্টেট পরিচালনার জন্য 'কোর্ট অফ ওয়ার্ড' স্থাপন করতে হবে[৯];

৮ বড় জমিদারিগুলি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যতোদূর সম্ভব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে কিন্তু ছোট জমিদারি থাকবে অখণ্ড। এ জন্য প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে;

৯ দত্তক পুত্র গ্রহণের মাধ্যমে নিঃসন্তান জমিদারের উত্তরাধিকারী সৃষ্টির প্রবণতা রোধ করতে হবে;

১০. জমিদার ও রায়তের মধ্যে তাদের অভ্যন্তরীণ ন্যায়সঙ্গত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সরকারের কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বরঞ্চ উভয়ের চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মানুযায়ী তা পরিচালিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে;

১১. জমিদারকর্তৃক রায়তকে 'পাট্টা' প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে, 'পাট্টা'য় উল্লেখ থাকতে হবে -- রায়তের দখলকৃত ভূমির পরিমাণ, প্রদেয় খাজনার হার ও পরিমাণ এবং মেয়াদের শর্ত। এই সঙ্গে খাজনা পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ জমিদারকর্তৃক 'দাখিলা' প্রদানও নিশ্চিত করতে হবে; এবং

১২ স্থিত প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি বিলুপ্ত হবে এবং জেলায় ইংরেজ 'কালেক্টর'দের ফিরিয়ে আনতে হবে।"[১৪২]

উভয় পরিকল্পনাই স্বব্যাখ্যাত। ফলে এর ওপর বিস্তৃত আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। তবে এখানে এটুকুই বলার যে, দু'পক্ষেরই সুপারিশমালায় বাংলার তৎকালীন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিভিন্ন বাস্তব দিক ফুটে উঠেছিল। তার চেয়েও বড় কথা, এতে বস্তুত এর প্রস্তাবকদের চিন্তাভাবনা ও স্বদেশে-বিদেশে তাদের অভিজ্ঞতার ছাপ প্রতিভাত হয়েছিল। হেস্টিংস ও বারওয়েল ছিলেন এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত, সুতরাং তারা বুঝতেন তাদের জীবন-জীবিকা ও রাজস্ব ব্যবস্থার ধরন। অন্যদিকে ফ্রান্সিস ছিলেন সেই তুলনায় এদেশীয় বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ (যদিও ইংল্যান্ড ও সমকালীন ইউরোপের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে তার তাত্ত্বিক জ্ঞান ছিল চমৎকার), ফলে তার প্রস্তাবনায় কল্পনার অনেক ছোঁয়া ছিল। তা সত্ত্বেও বলতে হবে, ভূমির স্বত্বাধিকার প্রশ্নে হেস্টিংস ও বারওয়েল বিশেষ কিছু উল্লেখ না করলেও এই প্রথম একটি ঘোষিত পরিকল্পনাকারে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছিলেন কোম্পানির অত্যন্ত শীর্ষস্থানীয় একজন নীতিনির্ধারক। যদিও সত্য যে, তিনি জমিদারদের মালিকানার স্বপক্ষেই ওকালতি করেছিলেন। ফলত ফিলিপের এই পরিকল্পনা প্রকাশের পর থেকেই এ সম্পর্কে পক্ষে-বিপক্ষে প্রবল আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছিল; এটিই এর তাৎক্ষণিক ইতিবাচক ফল।

আগেই জানিয়েছি হেস্টিংস-বারওয়েল ও ফ্রান্সিস-এর পরিকল্পনা দু'টি কর্তৃপক্ষীয় চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের জন্য ইংল্যান্ডে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এদিকে প্রচলিত পাঁচসনা বন্দোবস্তের মেয়াদও ছিল প্রায় শেষের পথে। স্থিত অবস্থায় নতুন পদ্ধতি

---

১৪০ এ সম্পর্কে ফ্রান্সিস-এর বক্তব্য ছিল খুবই আপত্তিকর এবং বাংলার আবহমান ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা বিষয়ে তার সীমাহীন অজ্ঞতার প্রকাশ। তিনি লিখেছিলেন, 'The State does not consist of nothing but the ruler and the ryot, nor is it true that the ryot is proprietor of the land.' (Quoted from, The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp 165)

১৪১ প্রস্তাবটি হেস্টিংস কার্যকরী করেছিলেন ১৭৮২ সালে 'জমিদারি দপ্তর' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

১৪২ ফ্রান্সিস পরিকল্পনার মূল প্রস্তাবনা অর্থাৎ ভূমিরাজস্বের স্থায়ী বিলিবণ্টন প্রক্রিয়া বেশ কিছু বছর পরে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীকর্তৃক গৃহীত হলেও (১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা স্মর্তব্য) বলা যায় তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল তার দু'টি সুপারিশ মাত্র (তার বাংলা ত্যাগের পরে)। যথা - এক. ১৭৮১ সালে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির বিলোপ ও দুই. জেলাগুলিতে ইংরেজ 'কালেক্টর'দের প্রত্যাবর্তন।

The Fifth Report-এর ভাষায়, 'In 1781 the Provincial Councils were abolished, and the collectors returned to the districts. Thus two steps were taken towards the realisation of Francis' plan.' (pp 611)

গ্রহণের অভিলাষে হেস্টিংস চাইলেন বাংলার ভূমিরাজস্বের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও ভূম্যধিকারীদের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হতে। এ লক্ষ্যে ১৭৭৬ সনের ১লা নভেম্বর গভর্নর-জেনারেল 'আমিনি কমিশন' নামে নতুন একটি কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। উল্লেখ্য, মনসন তখন মৃত। ফলে কাউন্সিলে এই কমিশন গঠনে ক্লেভারিং ও ফ্রান্সিস-এর উত্তুঙ্গ বিরোধিতা থাকলেও হেস্টিংস স্বীয় 'কাস্টিং' ভোটের বদৌলতে একক প্রস্তাবটি সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পরিণত করলেন।
'আমিনি কমিশন' গঠিত হয়েছিল গভর্নর-জেনারেলের মনোনীত ৩-জন উচ্চপদস্থ সদস্য নিয়ে। এরা হলেন -- (১) ডেভিড অ্যান্ডারসন (David Anderson), চেয়ারম্যান (২) জর্জ বোগ্‌ল বা বোগলে[১৪৩] (George Bogle) ও (৩) চার্লস ক্রফটস[১৪৪] (Charles Croftes)। কমিশনকে দাপ্তরিক ও ভাষিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য জনৈক হেনরি ভ্যান্সিটার্ট (ফারসি অনুবাদক হিশেবে) ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (পেশকার পদে) নামক দু'জনকে নিয়োগ দেয়া হলো। মূল সদস্যবর্গ ও সহযোগী মিলিয়ে তৎকালীন সরকারি পরিভাষায় কমিশনের নাম দেয়া হয়েছিল 'আমিনি দপ্তর' (the Amini Office), কালক্রমে ইতিহাসে এটি 'আমিনি কমিশন' (The Amini Commission) নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।
কমিশনের কার্য-পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছিল এভাবে (The Fifth Report-এর ভাষায়)
"This commission was not only to make elaborate inquiries into the value of the lands and the farmers' accounts, but was to give a very special attention to the protection of the ryots – "to secure to the ryots the perpetual and undisturbed possession of their lands, and to guard them against arbitrary exactions."[১৪৫]

এক বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী কমিশন বাংলার বিভিন্ন জেলা ও বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ঘুরে, ব্যাপক পরিদর্শন শেষে, স্থানীয়দের বিশেষ করে জমিদার-তালুকদার ও রায়তসাধারণের মতামত, বক্তব্য প্রভৃতি শুনে অতঃপর ১৭৭৮ সনের ২৫শে মার্চ, গভর্নর-জেনারেল সমীপে তাদের সুবিস্তৃত ও তথ্যবহুল মূল্যবান রিপোর্ট পেশ করেছিল।[১৪৬] রিপোর্টে তারা যে সকল গুরুত্বপূর্ণ

---

১৪৩. বোগ্‌লে ছিলেন একজন তিব্বতীয় পরিব্রাজক।

১৪৪ ইনি ছিলেন 'খালসা' রাজস্ব বিভাগীয় অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল। এই পদটি হেস্টিংস ১৭৭২ সালে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনা সংস্কারকালেই সৃষ্টি করেছিলেন। চার্লস ক্রফটস ছিলেন বাংলার প্রথম অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল।

১৪৫ pp 613.
ড সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় 'আমিনি কমিশনে'র কার্য-তালিকা উল্লেখ করেছেন এভাবে, যথা:- "(ক) বাংলার ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা পরীক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ, (খ) ইজারাদারদের হিসাব পরীক্ষা; (গ) রায়তদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং তাদের স্বার্থরক্ষামূলক ব্যবস্থার সুপারিশ; (ঘ) নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যবস্থার সুপারিশ।" (বাংলার আর্থিক ইতিহাস, অষ্টাদশ শতাব্দী, পৃষ্ঠা ২৮)।

১৪৬ এই রিপোর্টটি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আর. বি. র‍্যাম্সবোথাম মন্তব্য করেছেন, 'perhaps the most valuable contemporary document in the early revenue history of Bengal under the Company's administration.' (The Cambridge History of India, Vol V., pp. 425)

বিষয়ের প্রতি নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সেগুলি ছিল এ রকম:-

১. এতে রাজস্বের প্রকৃত অবস্থা তথা হিসাব, এবং সেগুলির উৎস সম্বন্ধে বর্ণনা ছিল। প্রধান উৎস হিশেবে উল্লিখিত হয়েছিল ৩টি - (ক) মাল, (খ) সায়ের ও (গ) বাজে জমা;

২ বিভিন্ন ধরনের ভূম্যধিকার যেমন জমিদারি, তালুকদারি, চৌধুরিআনা, রায়ত[১৪৭] ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য;

৩ বংশানুক্রমিক ও মৌসুমি বা অস্থায়ী খাজনাসংগ্রাহক ও তাদের আদায় পদ্ধতি সম্বন্ধীয় তথ্য;

৪ উদাহরণস্বরূপ একটি জেলার (মাহমুদশাহি) রাজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাব, প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম-ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি এবং এদের পারস্পরিক নির্ভরতা নিয়ে আলোচনা;

৫ রাজস্ব প্রশাসনের অবক্ষয়, রায়তদের ওপর কর্মচারিদের নৃশংস অত্যাচার ও সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেযার চিরাচরিত প্রবণতা;

৬. জমিদার-তালুকদার প্রভৃতির দখলাধীন লা-খেরাজ (চাকরান প্রভৃতি) ভূমিখণ্ডের বিষয়ে সুপারিশ এবং সেই সঙ্গে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনা দক্ষ, অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত কর্মচারীদের দ্বারা সম্পাদনের সুপারিশ।

'আমিনি কমিশনে'র রিপোর্ট গভর্নর-জেনারেলের হাতে[১৪৮] আসার আগেই ১৭৭৭ সনে চলতি বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হয়েছিল (১০ই এপ্রিল)। পরবর্তী বছর বা বছরগুলিতে সঠিক কী প্রথা-পদ্ধতিতে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত দেয়া হবে সে সম্পর্কে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীর সুস্পষ্ট নির্দেশনা তখনও পাওয়া যায়নি। ফলে পূর্বপ্রেরিত হেস্টিংস-বারওয়েল ও ফ্রান্সিস পরিকল্পনার গ্রহণযোগ্যতা তথা কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তের অভাবে এ সময় বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা যে এক বড় রকমের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল সে কথা অনুমান করা যেতে পারে।

চল্লিশের দশকের বিখ্যাত 'ফ্লাউড কমিশন'-এর রিপোর্টে এই সময়কার বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একটি চমৎকার মন্তব্য পাওয়া যায়।

"The new system (*Short term settlements of Hastings*) proved an absolute failure. .... The result was that at the expiry of the period of settlement the estates were left in an exhausted condition. Arrears accumulated and the decreasing collections of revenue so impressed

---

১৪৭. এরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার আপামর রায়তশ্রেণীকে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, যা সত্যিই চমৎকার ও প্রশংসার্হ। এ বিষয়ে আরও জানাতে দেখুন, Bengal Ryots: Their Rights and Liabilities; বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা, কাবেদুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৯২-৯৮; বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৪৯-৫৪।

১৪৮. 'আমিনি কমিশনে'র রিপোর্ট কাউন্সিলের পরিবর্তে সরাসরি গভর্নর-জেনারেলের কাছে জমা দেয়া হয়েছিল। হেস্টিংস পরে সেটি কাউন্সিল সভায় উপস্থাপন করেন (৩রা এপ্রিল, ১৭৭৮)। এ থেকেই বুঝা যাবে ততোদিনে কাউন্সিলে গভর্নর জেনারেল হিশাবে হেস্টিংস-এর গুরুত্ব ও প্রভাব অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

the authorities in India as well as the Directors at Home, that steps had to be taken to evolve a more satisfactory system."[১৪৯]

এক্ষণে ১৭৭২-৭৭ সাল পর্বে তথা পঞ্চসনা মেয়াদ শেষে বাংলার ভূমিরাজস্ব আদায় পরিস্থিতি খোদ সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকেই কী ভয়াবহ স্তরে নেমে গিয়েছিল তা নিচের পরিসংখ্যানের দিকে একনজর দিলে বুঝা যাবে।[১৫০]

পাঁচসনা বন্দোবস্তের 'জমা' বা ভূমিরাজস্ব ও উসুল বা আদায়		
সন	'জমা'	আদায়
১৭৭২-৭৩	২,৮৫,৬৫,৬২২	২,৭০,৩৫,৬৮১
১৭৭৩-৭৪	২,৯৪,০৩,০০৪	২,৭১,৮০,২৬০
১৭৭৪-৭৫	২,৯২,৭৮,৬৪২	২,৭৮,৭৯,৪৫৯
১৭৭৫-৭৬	২,৮৮,৯৫,২৯৮	২,৭৩,১০,২৭২
১৭৭৬-৭৭	২,৮৭,৩১,৩৩০	২,৬৪,২০,১৪৬

'জমা'-বাকি বা অনাদায় ও মওকুফ বা রেয়াত		
সন	'জমা'-বাকি	মওকুফ বা রেয়াত
১৭৭২-৭৩	১৫,২৯,৯৪১	৬,৬৩,৫০৯
১৭৭৩-৭৪	২২,২২,৭৪৮	৮,৩৩,২৩৪
১৭৭৪-৭৫	১৩,৯৯,১৮৩	৬,৪২,৮৩৬
১৭৭৫-৭৬	১৫,৭৫,৯৮৬	৮,৪৫,৬০৪
১৭৭৬-৭৭	২৩,১১,১৮৪	৫,৮৫,৯০৬

উদ্ধৃত তথ্য-চিত্র দৃষ্টে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, হেস্টিংস-এর আমলের বহুলকথিত পাঁচসনা বন্দোবস্ত পর্বে নিরূপিত ভূমিরাজস্ব প্রতি বছরই আদায়কালে সর্বনিম্ন ১৩ লক্ষ ও সর্বোচ্চ ২২ লক্ষ (গড়ে শতকরা হিশেবে ৫.৩৬ ভাগ) বাকি পড়েছিল। আর এই অনাদায়ী রাজস্বেরই ৩৯% ভাগ (মোট 'জমা'র ২.৩২) একেবারে উসুল-অযোগ্য বিবেচনায় সরকারকে শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে রেয়াত বা মওকুফ করে দিতে হয়েছিল।[১৫১]

বস্তুত এ থেকে বুঝা যায় রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সরকারের সব ধরনের কড়াকড়ি প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও প্রজার অবস্থা যেহেতু ভালো ছিল না, সুতরাং তা উপর্যুপরি বাকিই পড়েছিল; এবং শেষ অবধি নিতান্ত বাধ্য হয়েই সরকারকে তা স্থায়ীভাবে মওকুব করে দিতে হয়েছিল।

ফলত এই অবস্থায় 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তারা হেস্টিংস-কে নির্দেশ দিলেন (২৩শে ডিসেম্বর, ১৭৭৮ সনের পত্র দ্রষ্টব্য) আপাতত বর্ষভিত্তিতে 'জমা' বন্দোবস্ত চালু করতে। একই সঙ্গে তারা হেস্টিংসকর্তৃক 'আমিনি কমিশন' গঠনেরও তীব্র

১৪৯ Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol 1, pp. 13.

১৫০ মূল Sixth Report from the Select Committee, 1782, pp. 35;
সংগৃহীত, বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ২০৮।

১৫১ বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ২০৮।

সমালোচনা করলেন। যা হোক ১৭৭৭-এর এপ্রিল পরবর্তী কয়েক মাস এবং পরের ৩-বছর অর্থাৎ ১৭৭৮, ১৭৭৯ ও ১৭৮০ সালে হেস্টিংস বাৎসরিক (একসনা) ইজারা ব্যবস্থায় ভূমিরাজস্বের বিলিবণ্টন করেছিলেন।[১৫২]

নিচে তৎকালীন একসনা ইজারা পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরা হলো:-

১ আগের মতোই এতে বংশানুক্রমিক জমিদারশ্রেণীকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রবণতা অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছিল। তবে ইউরোপীয় ও তাদের এদেশীয় বেনিয়াদেরকে নিলাম ডাকে অংশ গ্রহণ থেকে বারিত করা হয়।

২ সরকারি দাবি নির্দিষ্ট হয়েছিল বিগত ৩-বছরের 'জমা'র গড়ের ভিত্তিতে। জমিদারদের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল, যদি তারা সময় মতো নির্ধারিত পাওনা পরিশোধ করে তা হলে পরবর্তী বছরের ইজারা চুক্তি সম্পাদনের বেলায় তাদের সঙ্গেই তা করা হবে, অর্থাৎ তারা অগ্রাধিকার পাবে।

৩. জমিদাররা তাদের রায়তদেরকে প্রচলিত মতে 'পাট্টা' প্রদান করবে। সেই সঙ্গে সরকারের কাছে তারা লিখিত মুচলেকা দেবে যে, কোন অবস্থায়ই 'পাট্টা'য় প্রদর্শিত খাজনার অতিরিক্ত কোন কর বা আবওয়াব মাথোট আদায় করবে না।

৪. জমিদারদের বন্দোবস্ত প্রাপ্তির জন্য বরাবরের মতো কোনরূপ 'জামিন' (Surety) রাখা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। তবে তাদের নতুন লা-খেরাজ অধিগ্রহণ থেকে বিরত করা হয়।

৫ জমিদারদের তদীয় এস্টেটের ফৌজদার হিশেবে বহাল রাখা হলেও জমিদারির অন্তর্ভুক্ত নদী-তীর ও বাঁধ সংরক্ষণের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল।

৬ বকেয়া রাজস্বের দায়ে সংশ্লিষ্ট জমিদারির সম্পূর্ণ বা আংশিক ভূখণ্ড প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করে তা উসুলের বিধান জারি রাখা হলো। আর ইজারাদারদের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ব্যবস্থা করা হলো।

অর্থাৎ এককথায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, একসনা পদ্ধতিতেও মূলত পঞ্চসনা বন্দোবস্তেরই বিধিবিধান কমবেশি বহাল ছিল।

বলাবাহুল্য এগুলি ছিল মূলত একসনা বন্দোবস্ত প্রাপক বা গ্রহীতাদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রণীত বিধিবিধান। সৌভাগ্যক্রমে এতে রায়তদেরকে জমিদারকর্তৃক 'পাট্টা' দেয়ার ও নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত কর আদায় নিষিদ্ধের নির্দেশ ছিল। কিন্তু এই নির্দেশ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পালিত হয়নি তা অনস্বীকার্য। ফলে এতে করে একসনা ব্যবস্থার খারাপ দিকগুলিই জনসমক্ষে সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছিল। বাংলার সার্বিক কৃষি-অর্থনীতি ও আপামর রায়তসাধারণের জীবনযাত্রার ওপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল। ড. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে পারি, 'বার্ষিক ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত এদেশের কৃষি-অর্থনীতির উপর কতকগুলি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। (১) সর্বোচ্চ হারে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত ও আদায়ের কোম্পানি আমলের ধারা বার্ষিক বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় অব্যাহত থাকে। (২) জমিদারদের পাশাপাশি ইজারাদাররা রইলেন।

১৫২. The Land-Systems of British India, Vol I., B. H Baden-Powell, pp. 397; The Economic History of India, pp. 43.

ইজারাদাররা মুনাফা-শিকারী, ফাটকাবাজ বণিক ছাড়া আর কেউ নন সেহেতু রায়তদের উপর নানা অজুহাতে বাড়তি রাজস্ব চাপানোর মানসিক প্রবণতা তাঁদের থেকে গেল। (৩) বার্ষিক বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল বাংলার কৃষি। এর প্রসার ও উন্নতি সরকারি উৎসাহ ও আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে স্থিতিশীল (stagnant) অবস্থায় রয়ে গেল। (৪) অস্থায়ী বার্ষিক ব্যবস্থায় কঠোরভাবে রাজস্ব আদায়ের ফলে বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত জমিদার পরিবারগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[১৫৩]

রায়তদের অবর্ণনীয় দুরবস্থার কথা দূরে থাক, দেবীসিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রমুখ কোম্পানির দুরাচারী বেনিয়া ও কর্মচারীদের ভূমিরাজস্ব আদায়ের নামে কঠোর অত্যাচার-অনাচারে খোদ বাংলার সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত জমিদার পরিবারগুলি বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের বড় বড় জমিদারশ্রেণীর অবস্থাই এমন হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত এরা ইজারাদার-রায়ত প্রভৃতির সহযোগে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন (১৭৮৩), যা সরকার শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী নামিয়ে দমন করতে বাধ্য হয়েছিল।

বস্তুত এই সামগ্রিক অব্যবস্থাপনা দূরীকরণ, কোম্পানির সরকারের নিয়মিত ভূমিরাজস্ব প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ও তথাকথিত প্রজাকল্যাণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস নতুন এক পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন (২০শে ফেব্রুয়ারি[১৫৪], ১৭৮১)। এর মুখ্য বিষয় ছিল

---

১৫৩ বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ২৯-৩০।
ড. ভি. এ নারায়ণও উল্লেখ করেন 'All the great zamindars of Bengal, all the ancient landed families, suffered under this system of annual settlements (*of Hastings*), frequent enhancements, and harsh methods of realisation Old Zamindars, if they failed to compete with auction bidders, were turned out from estates which their forefathers had held for generations If they kept their estates as farmers at an enhanced revenue and failed in prompt payment, on their estates were forced, managers who plundered the tillers of the soil and caused misery and depopulation.'
(V. A. Narain's treatise in Land Revenue in India: Historical Studies, Ed. by Dr Ram Sharan Sharma, pp. 67)

১৫৪. জে. রেজিন্যাল্ড বা রেগিন্যাল্ড হ্যান্ড ২০শে ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ৯ই ফেব্রুয়ারি, হেস্টিংস-এর এই নতুন সংস্কার চালু করার কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন, Early English Administration of Bihar, 1781-1785, J. Reginald Hand, pp. 25

৫টি। সেগুলি নিম্নরূপ:-

১ কোম্পানির ৪জন উচ্চপদস্থ 'চুক্তিবদ্ধ' (covenanted) কর্মচারী নিয়ে অনতিবিলম্বে নতুন একটি কমিটি গঠিত হবে যার নাম হবে 'কমিটি অফ রেভেন্যু' (Committee of Revenue)।[১৫৫] গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলরদের নিয়ন্ত্রণে থেকে এদের উপর দায়িত্ব বর্তাবে সরকারি রাজস্বের যাবতীয় বিলিবণ্টন ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা দেখাশুনা,

২ স্থিত প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি বিলুপ্ত হবে এবং এদের দায়-দায়িত্ব গিয়ে বর্তাবে নবগঠিত 'কমিটি অফ রেভেন্যু'-এর উপর;

৩ জেলাগুলিতে কর্মরত নায়েব-আমিলেরা প্রত্যাহৃত হয়ে তদস্থলে ইংরেজ 'কালেক্টর'গণ পুনরাধিষ্ঠিত হবে। এদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ভার থাকবে 'কমিটি অফ রেভেন্যু'-এর উপর,

৪ 'খালসা'র সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর পদ ও দপ্তর বিলুপ্ত হবে। এর অধীন দপ্তরসমূহ সরাসরি 'কমিটি অফ রেভেন্যু'-এর কর্তৃত্বে নীত হবে, এবং

৫ ঐতিহ্যবাহী 'কানুনগো' পদ পুনঃচালুকরণ এবং তারা মোগল সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করবে।[১৫৬]

---

১৫৫ নবগঠিত 'কমিটি অফ রেভেন্যু'-এর প্রথম সদস্য ছিলেন -- (১) ডেভিড অ্যান্ডারসন, (২) স্বনামখ্যাত জন শোর, (৩) স্যামুয়েল চার্টার্স ও (৪) চার্লস ক্রফটস।

১৫৬ এখানে প্রসঙ্গত মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনের 'কানুনগো' পদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হলো। বস্তুত মোগল ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামোয় এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য একটি পদ।

এ কথা সত্য যে, 'The kanungo comes into prominence in the reign of Akbar, . to keep records of the pargana, a revenue sub-division'. তথাপি জে ডি প্যাটারসন, তৎকালীন 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' দপ্তরে ১৭৮৭ সনের মে মাসে যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন তাতে মোটামুটি মোগল আমলের কানুনগোদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তার সূত্রে, ঐতিহাসিক আর. বি র‍্যামসবোথাম বলেন, 'He was in fact a registrar of a district appointed to see that the crown received its dues and that the ryot was not oppressed, his duties were responsible and onerous, he had to *register the usages of a district, the rates and mode of assessment all regulations relating thereto. To note and record the progress of cultivation: the produce of the land and the price current thereof, and to be at all times able to furnish Government with materials to regulate the assessment by just and equitable proportions.* . The kanungo's duties also included *the keeping of a record of all events, such as the appointments, deaths or removals of zamindars, to preserve the records of the Tumar and Taksim Jama, and the record of the boundaries and limits of zamindaris, talukdaris parganas, villages, etc* ' (Quoted from, The Cambridge History of India, Vol V., pp 412)

নতুন এই ব্যবস্থাপনা সংস্কারের পিছনে হেস্টিংস-এর মূল লক্ষ্য ছিল, 'This measure was designed to carry out the essential points of Hastings' revenue policy of 1772-73, and to bring the revenue administration to centre at Calcutta.'[১৫৭] এখানে নিম্নরেখাঙ্কিত অংশ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

আসলে এ পর্যায়ে হেস্টিংস চাচ্ছিলেন কলকাতাকে বাংলা তথা ভারতীয় প্রশাসনযন্ত্রের মূলকেন্দ্র রূপে শুধু প্রতিষ্ঠিত করা-ই নয় (যা ইতোমধ্যে তিনি অনেকখানি করেছিলেনও বটে), উপরন্তু রাজধানীর ন্যায় এখান থেকেই একদিকে যেমন বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ জারি হয়ে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে, তেমনি অন্যদিকে প্রশাসনের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে। আগে যেমন কলকাতায় 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে সর্বোচ্চ কমিটি বা সংস্থাগুলি ক্রিয়াশীল ছিল এবং সেই কমিটির অব্যবহিত পরবর্তী শক্তিধর কমিটিগুলি (যেমন প্রাদেশিক কাউন্সিল) ছিল প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো-ছিটোনো (যেমন মুর্শিদাবাদে, পাটনায়, ঢাকায়)। কিন্তু এবার মূল নীতিনির্ধারক কলকাতা কাউন্সিলের অব্যবহিত পরবর্তীস্তরের শক্তিশালী একমাত্র 'ইউনিট'টিকেও আনা বা রাখা হলো কলকাতাতেই, অর্থাৎ কাউন্সিলের প্রত্যক্ষ নজরদারি ও খবরদারির মধ্যে।

উল্লেখ্য সুপ্রিম কোর্ট, সদর দিওয়ানি আদালত ইত্যাদি এ সময় কলকাতাতেই ছিল। ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু নবীন নগর হিশেবে অবকাঠামোগত প্রাচুর্য ও ব্যাপকত্ব ও নাম-খ্যাতি অর্জনের দিক দিয়ে কলকাতা যে তখন শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল, তা না বললেও চলে।

১৭৮১ সালে (৬ই এপ্রিল) হেস্টিংস দিওয়ানি আদালতেরও কিছু সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছিলেন । এ জন্য তাকে প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পে-র সঙ্গেও কিছুটা পরামর্শ করতে হয়েছিল। এই সংস্কারের মধ্যে প্রধান ছিল নতুন ৪টি মফস্বল দিওয়ানি আদালতের প্রতিষ্ঠা।

এ পর্যায়ে আগে-পরে মিলিয়ে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় মোট মফস্বল দিওয়ানি আদালতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৮টি (পূর্বের ৬টি প্রাদেশিক বা মফস্বল ও ৮টি প্রধান প্রধান জেলাস্থ দিওয়ানি আদালত)। এখন বাংলায় হলো ১৫টি ও বিহারে ৩টি। এগুলি:-

প্রধান প্রধান জেলাওয়ারি মফস্বল দিওয়ানি আদালতের নাম			
১	ঢাকা	২.	মুর্শিদাবাদ
৩.	ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)	৪	কলকাতা
৫.	রংপুর	৬	মেদিনীপুর
৭.	নাটোর (রাজশাহি)	৮.	পাটনা (বিহার)
৯.	তাজপুর (দিনাজপুর)	১০.	বর্ধমান
১১	আজমিরিগঞ্জ (সিলেট)	১২.	ভাগলপুর
১৩.	মুরলি (যশোহর)	১৪.	রঘুনাথপুর (বীরভূম, বিষ্ণুপুর)
১৫.	বাকেরগঞ্জ (বরিশাল)	১৬.	দ্বারভাঙ্গা (বিহার)
১৭.	চিত্রা বা চাপ্‌রা (রামগড়)	১৮.	লাউড়িয়া (চম্পারণ, বিহার)

১৫৭ The Fifth Report, pp. 631.

এর মধ্যে ইসলামাবাদ, রংপুর, ভাগলপুর ও চিত্রা বা চাপরা (সীমান্তবর্তী জেলা) ব্যতীত অন্য ১৪টি আদালতে বিচারক হিশেবে কোম্পানির 'চুক্তিবদ্ধ' কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। এদের প্রচলিত পদবি 'সুপারিনটেন্ডেন্ট' পরিবর্তন করত 'জজ বা জাজ' (Judge) করা হলো। অবশিষ্ট ৪টি আদালতের (ইসলামাবাদ প্রভৃতি) বিচারক হয়েছিলেন ইংরেজ কালেক্টরেরাই। আইনত কালেক্টরগণ -- 'In revenue matters they were subject to the orders of the Committee of Revenue (*already set up at Calcutta*), ... But so far as justice was concerned, they were entirely independent of that Committee, being subject only to the orders of the Judge of the Sadar Diwani Adalat and the Governor-General and Council'[১৫৮]

বস্তুত শেষোক্তদের বেলায় দেখা যায়, ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহক (Collector), ফৌজদারি আদালতের বিচারক (Magistrate) এবং দিওয়ানি আদালতের বিচারক (Civil Judge) -- একই ব্যক্তি হওয়ায় মূলত কালেক্টরদের ক্ষমতা ও কার্য-বলয় একদিকে যেমন ব্যাপকভাবে বেড়েছিল, তেমনি তা হয়েছিল পূর্বাপেক্ষা জটিল ও বিস্তৃততর, এবং অন্যদিকে এতে করে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারও হচ্ছিল।

যা হোক ঠিক এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে ১৭৭৩ সালের তথাকথিত 'নিয়ন্ত্রক আইনে'র ক্রটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ ও কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন একটি 'ডিক্লারেটরি আইন' পাশ করা হলো (21st Geo. III, c. 70)। সাধারণ্যে এটি **'Bengal Judicature Act, 1781'** বা **'Act of Settlement, 1781'** নামে পরিচিত। বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক অবকাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা (সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ৩৯নং ধারা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে বিধায় এখানে অনুল্লেখ্য রাখা হলো) নিম্নরূপ। যথা:-

১. সরকারি কর্মচারী বিশেষত গভর্নর-জেনারেল ও তার কাউন্সিলরগণ, অফিসিয়াল যোগ্যতায় (in their official capacity) কাউন্সিলে যেই পরামর্শ বা আলোচনাই করুক না কেন, বা আদেশ দি'ক বা সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনকালে যেই কর্ম-ই করুক না কেন, সে জন্য সুপ্রিম কোর্ট কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না, **অর্থাৎ এক্ষেত্রে তারা সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারমুক্ত,**

২. সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ার শুধু কলকাতা ও এর অধিবাসীদের ওপর নিবদ্ধ থাকবে। তবে কোন মামলার বাদি ও বিবাদিপক্ষ যদি স্বেচ্ছায় সুপ্রিম কোর্টের অধীনে বিচারপ্রার্থী হয়, সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট তাদের জন্য প্রযোজ্য দেশি আইন-কানুন ও আচারবলে বিচারিক দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু দেশীয়রা তাদের উত্তরাধিকার ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পারম্পর্য নির্ধারণে, চুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণত সুপ্রিম কোর্টের আওতা-বহির্ভূত থাকবে;

---

১৫৮. The Judicial Administration of the East India Company in Bengal, pp. 269.

৩. সুপ্রিম কোর্ট এদেশীয়দের বিচারকালে বা কোন আদেশ, ডিক্রি জারির ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় ও সামাজিক আইন-কানুন, আচার-ঐতিহ্য, প্রথা ইত্যাদির প্রতি নজর রাখবে;

৪ গভর্নর-জেনারেল ও তদীয় কাউন্সিলের রাজস্ব আদালত হিশেবে এক্তিয়ার যথারীতি জারি থাকবে। রাজস্ব আদায়ে কর্মচারীদের যে কোন অপকর্ম বা দুর্নীতির শাস্তি বিধানের ক্ষমতা কাউন্সিলের থাকবে, যদি না সেই শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, অঙ্গহানি বা এইরূপ স্থায়ী প্রকৃতির হয়; এবং

৫. প্রাথমিকভাবে গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিল, প্রাদেশিক তথা মফস্বল আদালত বা কাউন্সিলের জন্য স্থানীয়ভাবে অনুসরণযোগ্য বিধিবিধান প্রণয়ন ও জারি করতে পারবে, তবে পরবর্তীকালে সেগুলি 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলী ও 'সেক্রেটারি অফ স্টেট'-এর অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হলে বাতিল বলে গণ্য হবে।

আইনটি ১৭৮১ সালে পাশ হলেও তা এদেশে এসে পৌছোয় জুলাই, ১৭৮২ সালে।[১৫৯]

একই বছর (১৭৮২) হেস্টিংস, নাবালক ও যে সকল ক্ষেত্রে মহিলারা জমিদারি-তালুকদারি পরিচালনা করতেন, তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে ('for the management of the estates of minor and female zamindars') 'জমিদারি দপ্তর' (zamindari daftar) নামে একটি প্রতিষ্ঠান ।[১৬০] বলতে গেলে এটি ছিল এই আমলের সত্যিকার এক চমৎকার উদ্ভাবনা -- 'This was a wise and beneficent step which anticipated the work of the present court of wards.'[১৬১]

এদিকে কোম্পানির 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীর ওপর পার্লামেন্টীয় অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনাকে কিছুটা ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ সনে 'পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' নামে আর একটি আইন পাশ হলো (১৩ই আগস্ট, ১৭৮৪)।[১৬২] নতুন এই আইন বলে 'হোম গভর্নমেন্ট' (Home Government) হিশেবে দু'টি কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব

১৫৯ The Administration of Justice under the East-India Company in Bengal, Bihar and Orissa, pp. 112

১৬০ তৎকালীন 'জমিদারি দপ্তর'গুলির কার্যাবলি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, The Role of the Zamindars in Bengal, Dr. Shirin Akhtar, Chapter III

১৬১ The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 429.

১৬২ এর আগে এদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসন সংস্কারের লক্ষ্যে পার্লামেন্টে 'দুন্ডা আইন, ১৭৮২' এবং 'ফক্স ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৭৮৩' নামে দু'টি আইন পাশের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথমটি বিরোধী দলের সদস্যকর্তৃক আনীত বলে এবং পরেরটি রাজ-সম্মতি লাভে ব্যর্থ হয় বলে আইনে পরিণত হয়নি।

স্বীকার করা হলো -- (১) 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল' ও (২) স্থিত 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলী।[১৬৩] 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল'-এর সদস্যবর্গ নির্দিষ্ট হলেন -- সেক্রেটারি অফ স্টেট, চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকার ও প্রিভি কাউন্সিলের ৪-জন সম্মানিত সদস্য। আইনে এঁদের বেতন-ভাতা (১৬,০০০ পাউন্ড) পার্লামেন্টকর্তৃক প্রদেয় বলা হলেও সেটি মূলত দেয়ার বিধান করা হয়েছিল কোম্পানির বাংলা তথা ভারতীয় রাজস্ব আয় থেকে, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ভদ্র পথে এদেশের অর্থ ইংল্যান্ডে সরানোর আরেকটি প্রচেষ্টা ছিল এটি।

'আইনে' কর্মচারীদের উপরও কিছু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছিল। ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়কালে কোনরূপ অবৈধ দাবি, পুরস্কার বা উপঢৌকন[১৬৪] গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এদেশের চাকুরি শেষে কোম্পানির কোন কর্মচারী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে শপথ করে বলতে হতো, সে কী কী সম্পদ বা 'সৌভাগ্য'[১৬৫] (fortunes) এখান থেকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে বা

---

১৬৩ কেন্দ্রে এই দু'টি কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে মূলত এদেশে নতুন ধরনের আরেক টি দ্বৈতশাসন চালু করা হয়েছিল -- একটি কোম্পানির 'ডিরেক্টর'মণ্ডলীর ও অন্যটি পার্লামেন্টের।।
ড Smith বলেন, 'Pitt's remedy was a double or joint government of Company and Crown.' (The Oxford History of India, pp 522)।
এই দ্বৈত শাসনাবস্থা ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। দেখুন, The Oxford History of India, pp. 523, British Rule in India and After, pp 69

১৬৪ কোম্পানির কর্মচারীদের এই অবৈধ উপঢৌকন গ্রহণের হার বা পরিমাণ কী মারাত্মক পর্যায়ে গিয়েছিল একটি উদাহরণ দিলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। সরকারিভাবে অর্থাৎ ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি কমিটিগুলোর বিভিন্ন সময়ের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পলাশির যুদ্ধোত্তর সময়ে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত স্থানীয়দের কাছ থেকে কর্মচারীদের এই জাতীয় অবৈধ পুরস্কার গ্রহণের পরিমাণ ছিল (ক্লাইভকে প্রদত্ত জায়গিরের আয় ব্যতীত) ২১,৬৯,৬৬৫ পাউন্ড-স্টার্লিং। (এটি ছিল প্রকাশ্য বা কাগজে পত্রের হিসাব, লুক্কায়িত ও গোপন হিসাব এর অন্তর্ভুক্ত নয়)। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এর সঙ্গে ক্ষতিপূরণের নামে এ সময়ে ৩৭,৭০,৮৩৩ পাউন্ড নিয়েছিল উচ্চপদস্থরা (The Cambridge History of India, Vol. V, pp 519)। তবে হেস্টিংস-এর সময়ে এর পরিমাণ কিছুটা কমলেও তখনও যা অবৈধভাবে গ্রহণ করা হতো তাও মোটামুটি এই আলোকে বিচার্য।

১৬৫. ভুলে গেলে চলবে না যে, এরা এদেশে আসতো 'গরিবি' হটানোর উদ্দেশ্যে। অতএব এখানকার চাকুরি শেষে যখন এরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতো এবং উচ্চপদস্থরা সেখানে গিয়ে 'নব্য নবাব' (স্বদেশবাসী তাদেরকে সম্ভবত ঈর্ষান্বিত হয়েই ব্যঙ্গার্থে এই খেতাবে ডাকতো) নামে অভিজাতমহলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতো তখন স্বদেশে এ জন্য কখনও কখনও তাদেরকে প্রচুর বিড়ম্বনা ও প্রশ্নের, এমন কি মামলার সম্মুখীন পর্যন্ত হতে হতো -- এদেশের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে চুরি ও লুণ্ঠনের দায়ে। প্রসঙ্গত ক্লাইভ, হেস্টিংস, ইমপে প্রমুখের পার্লামেন্টে কৈফিয়ত হওয়া ও জবাবদিহিতার কথা স্মর্তব্য। এদেশের মানুষের এমনই ভাগ্য, এবং ক্ষমতাসীনদের কর্মফল যে, যারা এসেছিল এদেশে কেরানিগিরি করতে, অবস্থা বৈগুণ্যে তারাই হয়েছিল তাদের শাসক, তাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা। স্যার মনিয়ের মনিয়ের-উইলিয়াম্স বলেন, 'The East India Company made them clerks and book-keepers. Necessity transformed them into conquerors and rulers.' (Modern India and the Indians: Being a Series of Impressions, Notes, and Essays, pp. 277).

গেছে (এই বাধ্যবাধকতা অবশ্য পরে বাতিল করা হয়েছিল ১৭৮৬ সালের সংশোধনী বলে)। স্বাস্থ্যগত কারণ ছাড়া কোন কর্মচারী একটানা ৫-বছর কোম্পানির চাকুরিতে অনুপস্থিত থাকলে তার পুনর্নিয়োগে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের তিন-চতুর্থাংশের সমর্থন নিতে হবে। এছাড়া কর্তৃপক্ষীয় আদেশ অমান্যকে সীমা-লঙ্ঘন ও দুষ্কর্ম হিশেবে গণ্য করার বিধান চালু করা হয়েছিল। শীর্ষস্থানীয় কর্মচারীদের (মূলত গভর্নর-জেনারেল, কাউন্সিলর প্রভৃতি) এই সকল অপরাধ (বাংলা ও ভারতে কৃত) বিচারার্থ একটি বিশেষ আদালত (ইংল্যান্ডে) গঠনের কথা ঘোষণা করা হলো, যার সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে থাকবেন -- ৩-জন বিচারক, ৪-জন অভিজাত ব্যক্তি (peers) ও 'হাউস অফ কমন্স'-এর ৬-জন সদস্য। সুতরাং সহজেই বোধগম্য যে, এটি ছিল একটি অত্যন্ত শক্তিশালী আদালত। অবশ্য দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৭৮৬ সালে তা সংশোধিত হয়েছিল এবং পরে একই ধরনের একটি আদালত গঠনের কথা বলা হলেও তা আর কখনই গঠিত হয়নি।[১৬৬]

মোটামুটি এই ছিল গভর্নর ও পরে গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময়কার বাংলায় ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গৃহীত ও অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনের রূপরেখা। নানা কারণে তার সময়ে প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। উদাহরণত, ১৭৬৬ সালে প্রশাসনের ব্যয় যেখানে ছিল ২,৫১,৫৩৩ পাউন্ড, তার শাসনামলে মাত্র ৮-বছরেই সেটি ১৭৮৪ সালে বেড়ে হয়েছিল ৯,২৭,৯৪৫ পাউন্ড[১৬৭], অর্থাৎ ৩ গুণেরও বেশি। স্বীকার করতে দোষ নেই যে, তার সময়ে কোম্পানির দেশীয় রাজ্য বিস্তার আগের তুলনায় বেড়েছিল[১৬৮], কিন্তু সেটি কোন অবস্থায়ই প্রশাসনিক ব্যয়কে ৩ গুণ বৃদ্ধি করার পর্যায়ে ছিল না। নিঃসন্দেহে প্রশাসনিক ব্যয়ের নামে সর্বস্তরে বিশেষ করে ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় ইংরেজ কর্মচারীগণকর্তৃক তা বিভিন্নভাবে চুরি ও স্বদেশে পাচার, এবং অপচয়িত হয়েছিল -- এটা যেমন সত্য, তেমনি এর চেয়েও অধিক সত্য, -- 'All these increased emoluments and costs were derived from the people (*of Bengal, Bihar and Orissa*)'[১৬৯]

তবে এই অতিরিক্ত ও বাহুল্য খরচ সত্ত্বেও কোম্পানির দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ শাসন দৃঢ় ও স্থায়ীকরণে গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ভূমিকা ছিল

---

১৬৬. Advanced Study in the History of Modern India, Vol. I, pp 277

১৬৭ The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 213; A Constitutional History of India, Dr Keith, pp. 91-92, History of the Muslims of Bengal, Vol. IIA., Dr M. M Ali, pp. 54.

১৬৮ বাংলার প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময়ে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখল ও অধিগ্রহণকৃত অঞ্চল বলতে বুঝাতো, মনিয়ের মনিয়ের-উইলিয়াম্স-এর তথ্যানুযায়ী, 'At that time our possessions in India were (1) Bengal, Behar, Orissa, and Benares, (2) a jagir of land round Madras, and the strip of country on the eastern coast, called Northern Circars, (3) the island of Bombay.' (Modern India and the Indians, Sir Monier Monier-Williams, pp. 277-78).

১৬৯ History of the Muslims of Bengal, Vol. IIA., pp. 54.

দীর্ঘ ও অপরিসীম।[১৯০]

কেননা যদি আমরা বিবেচনা করি যে, 'In the Bengal of 1772 there was no organized government, functioning regularly and properly through all its branches, there was no systematic administration of law and order, no security for person and property, no police force, no system of taxation. There was only anarchy, universal and unlimited.'[১৯১]; যদিও স্বীকার্য যে, এ ছিল তার গুণমুগ্ধ জীবনীকার A. Mervyn Davies-এর সুচয়িত শব্দের প্রাঞ্জল বক্তব্য, এবং নির্ঘাৎ এতে অতিরঞ্জন বর্তমান, কিন্তু তারপরও এ কথা স্বীকার না করে আমাদের উপায় থাকে না যে, ১৭৮৫ সালে হেস্টিংস যখন দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন (৮ই ফেব্রুয়ারি[১৯২]) তখন বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অবকাঠামোর সেই বিশৃঙ্খল ও অসংগঠিত অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল।

পরিশেষে তাই স্যার মনিয়ের মনিয়ের-উইলিয়ামস-এর একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করে এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করতে পারি। তিনি বলেন, 'Warren Hastings was *our* first Governor-General, from 1774 to 1785. With all his faults he was perhaps the greatest of *our* great Indian rulers. He was the parent of

১৯০ Davies যথার্থই বলেন, 'Perhaps the greatest service Hastings rendered India was in giving the first impetus to a new outlook on the part of the British rulers towards the country they governed.' (Life and Times of Warren Hastings, pp. 420)

১৯১ Life and Times of Warren Hastings, pp. 83
হেস্টিংস, নিজেও এ কথা স্বীকার করেছেন এভাবে 'I received the government of Bengal with incumbrances. . I found myself the titular head of a numerous, and not always accordant, council, . which had neither determinate form nor system, nor any orders or instructions which could enable them to give it either. I attempted, and with the aids of my colleagues, where I was allowed them, I gave it both form and system; for every office into which it was distributed, to the time of my departure, received its institution during the period of my administration. .' (Quoted from, Life and Times of Warren Hastings, pp. 468-69)
এ উক্তির মোদ্দা বক্তব্য অস্বীকার করা যায় না।

১৯২ The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 430; Indian Land-System, 202.
ডেভিস তার দায়িত্ব হস্তান্তর-কাল -- কলকাতা ত্যাগ ও স্বদেশ যাত্রার তারিখ হিসেবে যথাক্রমে ১লা ও ৬ই ফেব্রুয়ারির উল্লেখ করেছেন। (দেখুন, Life and Times of Warren Hastings, pp. 417). অন্যদিকে ড. G. S. Chhabra তার কর্মত্যাগ বা অবসর গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করেন ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৫। (দেখুন, Advanced Study in the History of Modern India, Vol. I., pp. 303)

our whole civil administration."[১৭৩]
একটি কল্যাণধর্মী ও যুগোপযোগী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তক হিশেবে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কৃতিত্ব যদ্যপি খুব প্রশংসা করার মতো নয় বা আদৌ ছিল না[১৭৪], অন্তত আমাদের দৃষ্টিতে; বরং এক্ষেত্রে তার অযোগ্যতা ও অপরিণামদর্শিতার পরিচয়-ই বাংলা-বিহারের সর্বত্র বিস্তৃত[১৭৫], তথাপি ভারতবিশেষজ্ঞ মনিয়ের-এর উক্তির মৌল বক্তব্য একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

---

১৭৩ Modern India and the Indians, pp. 277
অবশ্য বঙ্গীয় তথা ভারতীয় সিভিল প্রশাসনের প্রাথমিক রূপায়ণ বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে হেস্টিংস-এর ভূমিকা ছিল অপরিসীম, ঐতিহাসিক মাত্রই তা স্বীকার করেছেন। ড. আলী আহমদ বলেন, 'Much of the work of Warren Hastings was experimental. But there is no denial of the fact that he laid the foundation of a Civil Service in the modern sense, so far as India was concerned. In fact, when he returned to England, the whole system of administration under the Company seemed to be purified, clarified and reorganised ' (Role of Higher Civil Servants in Pakistan, Dr Ali Ahmed, pp. 14)

১৭৪ এ বিষয়ে তার সীমাহীন ব্যর্থতার একটা ছক এঁকেছেন ঐতিহাসিক ব্যামসবোথাম এভাবে: 'The assessment of 1772 was summary and admitted by its authors to have been too high The system of putting up the farms to open auction resulted in utterly fictitious values that were never realised and was soon afterwards forbidden by the Company. The system of pattahs, or leases, completely broke down, and failed, then as later, to protect the ryot Furthermore, the reinstatement of the kanungos, the abolition of collectors, the establishment of the provincial diwans, and lastly the excessive power placed in the hands of the diwan of the Committee of Revenue, all testify to the incapacity of Hastings in his administration of the Bengal land revenue; he may have failed in his personal handling of the land revenue, ' (The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 430-31). অল্পকথায় এ মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে চমৎকার ও মূল্যবান।

১৭৫ ক্লাইভ ও হেস্টিংস-পূর্ববর্তী ইংরেজ গভর্নরগণ বাংলার আপামর রাজস্ব-প্রদাতৃশ্রেণীকে আগেই নাঙ্গা, রিক্ত ও নিঃশেষিত করেছিল। ফলে নতুন শাসক হিশেবে হেস্টিংস-এর জন্য যেখানে রায়তদের চাঙ্গা ও উদ্বুদ্ধ করতে নমনীয় প্রথানুসরণের প্রয়োজন ছিল, সেখানে তার (হেস্টিংস) গৃহীত ব্যবস্থায় ভূমিরাজস্বের অত্যধিক চাপ তাদেরকে একেবারে সর্বশান্ত করে ছেড়েছিল। অধিকন্তু ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন জমিদারিগুলির অস্তিত্বও তা বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করে তুলেছিল। ড তারাচাঁদ বলেন, 'Hastings' land-revenue settlements, brought ruin upon the cultivators and the proprietors as the uncertainty of assessment negatived the will to improve cultivation. . (He) had dealt a terrific blow to the ancient edifice of Indian rural economy.' (History of Freedom Movement in India, Vol One, pp. 245). বলাবাহুল্য এটিই ছিল তার ব্যবস্থার সবচেয়ে খারাপ দিক।

চতুর্থ অধ্যায়

লর্ড কর্নওয়ালিস ও বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩ খ্রিঃ

হেস্টিংস-এর অব্যবহিত পরে স্যার জন ম্যাকফারসন (Sir John Macpherson) স্বল্পকালের জন্য বাংলাব গভর্নব-জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কোম্পানির শীর্ষস্থানীয় সিভিল সার্ভেন্টদের অন্যতম।[১] স্বভাবতই এ অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসন সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল যথেষ্ট স্বচ্ছ ও অভিজ্ঞতা প্রচুর। মোটামুটি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য তার আমল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক. নতুনভাবে বিদ্যমান জেলার সীমা-চৌহদ্দি নির্দিষ্টকরণ, বা 'কালেক্টরশিপ'গুলিকে ঢেলে সাজানো; এবং দুই. 'কমিটি অফ রেভেন্যু'-এর নাম 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' (Board of Revenue) হিশেবে প্রতিস্থাপন এবং তা পুনর্গঠন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কাল বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রায়-বন্ধ্যা একটি যুগের স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেলেও তার সহকর্মীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সমকালীন বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত ঈর্ষণীয় জ্ঞান ও দক্ষতা হাসিল করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন জন শোন, জেম্‌স গ্রান্ট, ডেভিড অ্যান্ডারসন, চার্লস ক্রফ্‌টস, স্যামুয়েল চার্টার্স প্রমুখ। উত্তরকালে এঁদের কেউ কেউ শুধু বিশেষজ্ঞের খ্যাতিই অর্জন করেননি, উপরন্তু তাঁরা ছিলেন অন্ত্য-মোগল তথা নবাবি ব্যংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একমাত্র সূত্র ও মুখপাত্র তথা ব্যাখ্যাতা। যা হোক, এদের সঙ্গে পবামর্শক্রমে, এবং মূলত 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীর ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দেব পত্রের প্রেক্ষিতে ম্যাকফারসন যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ বা সংস্কার করেছিলেন সেগুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ধারণা দেয়া হলো।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ কবেছি, হেস্টিংস-এব সময়ে বাংলা, বিহাব ও ওড়িশা -- ৩টি প্রদেশ মিলিয়ে মোট ২৫/২৬টি জেলা বা 'কালেক্টরশিপ' ছিল।[২] কিন্তু প্রশাসনিক সুবিধার্থে এবং প্রধানত

---

১. ফেব্রুয়ারি ১৭৮৫ থেকে সেপ্টেম্বর ১৭৮৬ পর্যন্ত জন ম্যাকফাবসন প্রায় ২০-মাসের মতো বাংলার গভর্নব-জেনাবেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেখুন, The Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire, Vol II: Historical, pp. 486.

২ Ibid., pp 486.

৩ বাংলা ও ওড়িশায় হেস্টিংস-এর সময়কাব (সর্বশেষ স্থিতি) জেলা বা 'কালেক্টবশিপ'গুলি -- (১) বীরভূম, (২) ঢাকা, (৩) দিনাজপুর, (৪) হুগলি, (৫) যশোহর, (৬) নদীয়া, (৭) পূর্ণিয়া, (৮) রাজমহল-ভাগলপুর, (৯) বাজশাহি, (১০) রংপুর; (১১) বর্ধমান, (১২) মেদিনীপুর, (১৩) চট্টগ্রাম (ত্রিপুরা বা কুমিল্লাসহ), (১৪) চুনাখালি, (১৫) জাহাঙ্গিরপুর, (১৬) লস্করপুর, (১৭) মাহমুদশাহি, ও (১৮) রোকনপুর। বিহারে -- (১) সারণ-চম্পারণ, (২) ত্রিহুত, (৩) মুঙ্গের, (৪) রোহ্‌টাস, ও (৫) শাহাবাদ। এর বাইরে ছিল ছোটনাগপুর অঞ্চলীয় কোচবিহার বা কুচবিহার, জঙ্গল তেরাই বা টেরাই ও পালামৌস্থ মিলিটারি 'কালেক্টরশিপ'সমূহ।

ভূমিরাজস্ব আদায় কার্যক্রম সুচারু ও নির্বিঘ্নকরণার্থ এগুলি গঠিত ও পুনর্বিন্যস্ত হলেও বাস্তবে জেলা বা 'কালেক্টরশিপ'-এর আকার-প্রকারে কোনরূপ সমতা ও স্থিরতা ছিল না। সত্যি বলতে এগুলি গড়ে উঠেছিল মোগল ও নবাবি আমলের 'সরকার' ও 'পরগণা' ব্যবস্থাপনা বা রূপরেখার উপর, যার মূল ভিত্তি ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজস্ব-বিভাজন, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিরাজস্ব আয়-ক্ষম অঞ্চল, যা কখনো একটি একক ভূখণ্ড আকারে, আবার একাধিক দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডসমূহ নিয়েও গঠিত হয়েছিল। স্বভাবতই এই ব্যবস্থাপনার উপর দিওয়ানি-উত্তব ব্রিটিশ 'কালেক্টরশিপ' বা কালেক্টরেট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এগুলি ছিল আকারে-প্রকারে বিভিন্ন ও অখণ্ডত্ববিহীন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুর্শিদাবাদ 'কালেক্টরশিপ' মূলত 'হুজুর জিলা' মুর্শিদাবাদ নিয়ে গড়ে উঠলেও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল আবার ঢাকা নিয়াবত। অথচ মেজর রেনেল-এর সুবিখ্যাত 'বেঙ্গল অ্যাটলাস' (১৭৮১ সালের সংস্করণ) সূত্রে দেখা যায়, তৎকালীন ঢাকা নিযাবত থেকে মুর্শিদাবাদের দূরত্ব ছিল কমপক্ষে ২৭৮ মাইল।[৪] সুতরাং সুষ্ঠু শাসনকার্য পরিচালনা ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম যে এতে ব্যাহত হতো তা অনস্বীকার্য। বস্তুত এই অসুবিধা দূরীকরণ ও স্থিত প্রশাসনিক এককগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা গ্রহণযোগ্য সমতা ও অখণ্ডত্ব সৃষ্টি উপলক্ষ্যে ম্যাকফারসন বাংলা, বিহার ও ওড়িশাস্থ জেলাগুলিকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করে ৩৫টি 'কালেক্টরশিপ' প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[৫] যেহেতু কর্তৃপক্ষ নীতিগতভাবে ধরে নিয়েছিল যে, "The division of the province into districts is the backbone of the whole system of the refroms"[৬]; সেহেতু কালেক্টরকে তারা সুপ্রচুর ক্ষমতায় বিভূষিত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। ফলে, 'The collector becomes a responsible officer, making the settlement and collecting the revenue; ...'[৭]
বলাবাহুল্য নতুন ব্যবস্থায় কালেক্টরের দায়িত্ব অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল। স্থানীয় জমিদার-তালুকদার, ইজারাদার প্রভৃতির সাথে তারা ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত চুক্তি সম্পাদন করতো। উল্লেখ্য আগে এটি ছিল তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব, ফলত অনিয়মিত অর্থাৎ ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ যখন নির্দেশ দিতো একমাত্র তখনই তারা তা করতে পারতো। বরঞ্চ রাজস্ব আদায় করাই ছিল তাদের মূল কাজ। কিন্তু এখন গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল তথা কলকাতা কর্তৃপক্ষ নিজেদের হাতে শুধু 'controlling and advising the collectors and sanctioning their settlement'-এর ক্ষমতা রেখে জমিদার-তালুকদারদের সাথে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত বা ইজারা চুক্তি সম্পন্ন করা এবং নিরূপিত রাজস্ব যথাযথভাবে আদায়ের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন কালেক্টরদের উপর। এর ফলে কলকাতার বাইরে এক ধরনের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল তা বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিক ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'Some reforms were at once made in land revenue administration. They were based upon a scheme of complete decentralisation. The Committee of

---

৪ দ্রষ্টব্য, Indian Land-System: Ancient, Mediaeval and Modern. Dr Radha Kumud Mookerji, pp 202.

৫ আগেই জানিয়ে রাখা ভালো যে, লর্ড কর্নওয়ালিস তদীয় শাসনামলে (১৭৮৭) প্রশাসনিক ব্যয় সঙ্কোচনার্থ 'কালেক্টরশিপ' ৩৫টি থেকে ২৩টিতে নামিয়ে এনেছিলেন।

৬ The Cambridge History of India, Vol V pp. 431.

৭ Ibid., pp 431

Revenue at headquarters was to retain only a general power of supervision and sanction."[৮]

বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় কালেক্টরকে এককভাবে অধিকতর ক্ষমতাশালী করতে দেশি দিওয়ানের পদ (রেজা খানের দখলাধীন) অবলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। হেস্টিংস-এর যুগের শেষদিকে পুনরাবির্ভূত (পুনরুজ্জীবিতও বটে) 'কানুনগো' দপ্তরকেও ম্যাকফারসন ঢেলে সাজালেন। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিশেবে দেশি কানুনগো-দের মাথার উপর বসিয়ে দেয়া হয়েছিল (১৯শে জুলাই, ১৭৮৬) একজন অভিজ্ঞ ইংরেজ কর্মচারী, যার পদবি ছিল 'প্রধান সেরেস্তাদার' (Chief Serishtadar/ Chief Record Keeper)। আগে কানুনগো-দের দপ্তরে থাকতো ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব-নিকাশের ঝাঁপি -- খতিয়ান ইত্যাদি। এখন সেগুলি প্রধান সেরেস্তাদারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে, কেন্দ্রীয় দপ্তরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলো। এতে করে দেশীয় কানুনগো-দের পদ-বিস্তৃতি ঘটলেও তাদের চিরাচরিত ক্ষমতার দাপট অনেকখানিই কমে গেলো।[৯] অন্যদিকে ভূমিরাজস্বের কাগজপত্র, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি ইংরেজ দপ্তর-প্রধানের জিম্মায় ন্যস্ত হওয়ায় তাদের (ইংরেজদের) পক্ষে তা নেড়েচেড়ে ও ঘেঁটে দেখবার সুযোগ ঘটলো, এবং এর ফলে ভবিষ্যত ইংরেজ কর্মচারীদের এ সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের পথ সুগম হয়েছিল তা বলাবাহুল্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলার প্রথম প্রধান সেরেস্তদার নিযুক্ত হয়েছিলেন স্বনামধন্য জেম্‌স গ্রান্ট (James Grant)। এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে, পরবর্তীকালে সম্ভবত তাঁর পক্ষে বাংলার মোগল-নবাবি পর্বের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখনীয়, নির্ভরযোগ্য ও প্রায়-একক আকরগ্রন্থ -- 'Historical and Comparative Analysis of the Finances of Bengal, 1786' প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল।

অন্যদিকে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীর নির্দেশনা মতে গভর্নর-জেনারেল 'কমিটি অফ রেভেন্যু' বাতিল করে তদস্থলে 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' প্রতিষ্ঠিত করলেন (১১ই জুন, ১৭৮৬)।[১০] 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' গঠিত হয়েছিল ৫-জন সদস্য নিয়ে। সদস্যরা প্রত্যেকেই ছিলেন -- 'most intelligent of the senior servants of the Company'[১১]. তবে নতুন ব্যবস্থার বিশেষত্ব ছিল এই যে, 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর প্রধান বা প্রেসিডেন্টকে অপরিহার্যভাবে গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য করা হলো, যদিও সেই পদক্রমে তার স্থান ছিল সর্বনিম্নে, অর্থাৎ

৮. Indian Land-System, pp. 202.

৯. The Cambridge History of India, Vol. V., pp 432.
তবে প্রসঙ্গত এটাও স্মর্তব্য, 'The Kanungo's office was also reformed and maintained as an Office of information and registry for the Collectors, above the influence of Zemindars.' (Indian Land-System, pp. 203).

১০. উল্লেখ্য যে, একই সময়ে 'বেঙ্গল গভর্নমেন্ট'কে মোট ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। যথা: (১) বোর্ড অফ কাউন্সিল, (২) মিলিটারি বোর্ড, (৩) বোর্ড অফ ট্রেড, ও (৪) বোর্ড অফ রেভেন্যু'। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টারের বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য। তিনি বলেন, 'To each of these it assigned a separate constitution and definite duties.' (Bengal MS Records, Vol. I., pp. 21).

১১. Court of Director's Letter, dated 22nd December, 1785, para 30; quoted from, Bengal MS Records, Vol. I., pp 21.

কনিষ্ঠ।[১২] আগেই জানিয়েছি, এ পর্যায়ে 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর মূল কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছিল, 'to sanction the Settlements made by the Collectors, subject, of course, to the general control of the Supreme Council.'[১৩]

এখানে তাৎপর্যের সাথে লক্ষ্যণীয় যে, দিওয়ানি-উত্তর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার এই পর্বে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ, কালেক্টরদের সঙ্গে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষপাতী হয়েছিলেন এবং 'কালেক্টরশিপ'কে কেন্দ্র করেই তারা চেয়েছিলেন সামগ্রিক প্রশাসনযন্ত্র ঢেলে সাজাতে। ইংরেজ ঐতিহাসিক আর. বি. র‍্যাম্‌সবোথাম যথার্থই বলেন, 'The reforms of 1786 were, therefore, the work of men who desired to gain the confidence of and to co-operate with the local district officer. The authors of the reforms were convinced from their own district experience that the real work of the revenue must be carried out by trusted officers on the spot; they set themselves to create the conditions and atmosphere in which those officers could best work.'[১৪]

মোটামুটি এই ছিল স্যার জন ম্যাকফারসনের সময়কার বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ চালচিত্র।[১৫] তবে একসনা ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত বা ইজারা পদ্ধতি তখনও বহাল ছিল।

আর এই পরিস্থিতিতেই লর্ড কর্নওয়ালিস ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৬ সালে বাংলা, বিহার ও ওড়িশা এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের দ্বিতীয় গভর্নর-জেনারেল হিশেবে কলকাতায় পদার্পণ করেছিলেন।[১৬]

---

১২. Bengal MS Records, Vol. I., pp. 21.

১৩. Indian Land-System, pp 203.

১৪. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 432.

১৫. 'এঁর অন্তরবর্তীকালীন শাসনকালকে কর্নওয়ালিস যদিও 'system of the dirtiest jobbing' বলে নোংরা সমালোচনা করেছেন, তথাপি কোম্পানির দায়মুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, 'Sir John Macpherson, ... applied himself with vigour to the reduction of the expenditure, and to reforms in the Financial Department, succeeding so well that by the close of his short administration he had diminished the Government debt by the sum of a million sterling.' (Analytical History of India, Robert Sewell, pp. 147). 'কালেক্টরশিপ' তাঁর আমলে বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছুটা প্রশাসনিক ব্যয় বেড়েছিল এটা মেনে নেয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিকের এ উক্তির যাথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না। উল্লেখ্য তুলনামূলকভাবে শান্তিপ্রিয় গভর্নর-জেনারেল হিশেবে এই আমলে সাম্রাজ্য প্রসারজনিত যুদ্ধ ব্যয় হ্রাস পেয়েছিল বলেই তাঁর পক্ষে কোম্পানির বিপুল ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

১৬. মার্কুইস চার্লস কর্নওয়ালিস (Marquess Charles Cornwallis) ছিলেন (জন্ম ৩১শে ডিসেম্বর, ১৭৩৮) বাংলা তথা ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল যিনি একাধারে ব্রিটিশ আইন সভার উচ্চকক্ষের সদস্য (১৭৬২), দীর্ঘ সামরিক জীবনের অধিকারী (মেজর-জেনারেল পদে উত্তীর্ণ) এবং যুগপৎ ব্রিটিশ সরকার ও জনসাধারণের কাছে সমভাবে গ্রহণীয়। সেই তুলনায় কোম্পানির কর্মকাণ্ডের বিষয়ে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল একেবারে শূন্য। ফলে বলা যায়, বাংলা এই প্রথমবারের ন্যায় একজন নিরপেক্ষ ইংরেজ শাসক পেয়েছিল স্বীয় ভাগ্য-নিয়ন্তারূপে, যদিও আগাগোড়াই কর্নওয়ালিস ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে কাজ করেছিলেন।

এখন আমরা তার আমলে অনুসৃত উল্লেখযোগ্য ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক সংস্কার এবং বিশেষ করে বহুল আলোচিত, নন্দিত-নিন্দিত বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

প্রথমেই উল্লেখ্য যে, কর্নওয়ালিস গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হলেও (এই পদ গ্রহণে সরকার তাকে দু-দু'বার প্রস্তাব দিয়েছিল) তিনি সেই পদ গ্রহণে সরকারের কাছে দু'টি শর্ত আরোপ করেছিলেন। তার কারণও ছিল। বলাবাহুল্য স্বদেশের বুদ্ধিজীবিদের আলোচনা-সমালোচনা প্রসঙ্গে, পত্র-পত্রিকা পাঠে এবং অভিজ্ঞ বন্ধুদের মাধ্যমে তিনি ইতোমধ্যে জানতে পেরেছিলেন, কলকাতা কাউন্সিলে বাংলার গভর্নর-জেনারেলের অসহায় অবস্থান, বিশেষ করে হেস্টিংস ও ক্লেভারিং প্রমুখের দ্বন্দ্বের কথা। ফলে সরকারের পক্ষ থেকে তার কাছে প্রস্তাব এলে শুরুতেই কর্নওয়ালিস আবেদন করেন, তাকে গভর্নর-জেনারেলের পদ নিতে হলে একই সঙ্গে তাকে 'কাউন্সিলে' সর্বময় ক্ষমতাও দিতে হবে যাতে করে যে কোন বিরোধ বা মতপার্থক্যে তিনি কাউন্সিলরদের মতামত উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, এবং দ্বিতীয়ত মুখ্য সেনাধিপত্য তথা কমান্ডার-ইন-চীফের দায়িত্বও তার হাতে থাকবে। ফলত সরকার তার এ উভয় শর্তই মেনে নিয়ে তাকে বাংলায় প্রেরণ করেছিল। অধিকন্তু এ জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্বতন্ত্র আইনও প্রণয়ন করা হয়েছিল।[১৭] স্বভাবতই বলা যায়, কর্নওয়ালিস এদেশে এসেছিলেন অত্যন্ত আঁটঘাট বেঁধে।

বস্তুত আলোচ্য দু'টি ক্ষমতা একক হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় 'কাউন্সিলে' কর্নওয়ালিসের অবস্থান ও কর্তৃত্ব যে তার পূর্বসূরীদের তুলনায় সুদৃঢ় ও অনন্য হয়েছিল সে কথা না বললেও চলে।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেশে ও বাইরের কোন কর্মকাণ্ড বা নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নের সঙ্গে কর্নওয়ালিসের আগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকার ও জনগণের ইচ্ছার মূর্ত প্রতিভূ[১৮]; তারা চেয়েছিলেন তার মাধ্যমে এদেশে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় প্রশাসনে নতুন রক্ত, নতুন বীর্য, নতুন প্রাণ সঞ্চারিত ও অন্তঃপ্রবাহিত হোক, এবং ক্লাইভ-হেস্টিংস প্রমুখের অপকর্মের ফলে ভারতীয় জনগণের চোখে ও ইউরোপে ব্রিটিশ সরকার ও জনগণের যে ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে, তার কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার হোক।

যা হোক নিযুক্তি ও কর্ম-পরিসর বিন্যাসে লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালকে আমরা প্রধান দু'টি পর্বে বিভক্ত করতে পারি।[১৯] এক. প্রথম নিযুক্তিকাল -- ১৭৮৬ থেকে ১৭৯৩ অবধি;-- এই পর্বে

---

১৭. The Oxford History of India, pp. 530; History of British India under the Company and the Crown, pp. 222.

১৮. কোম্পানির এদেশীয় উচ্চ-নীচ সর্বস্তরের কর্মচারীদের নির্লজ্জ ভূমিকায় ত্যক্ত-বিরক্ত ব্রিটিশ জনগণের এই সময়কার মনোভাব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক P. E. Roberts জানাচ্ছেন, 'The feeling was now widely prevalent in England that a Governor-General should be appointed who had not spent his official career in the corrupt atmosphere of the covenanted service.' (History of British India under the Company and the Crown, pp. 220).
লর্ড কর্নওয়ালিস ছিলেন তাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত ধরনের একজন গভর্নর-জেনারেল।

১৯. A Brief History of the Indian Peoples, W. W. Hunter, pp. 192.

দিওয়ানি প্রশাসনিক ব্যবস্থার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার।[২০] দুই. ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বারের নিযুক্তিকাল।

অবশ্য এবারে তিনি যখন বাংলায় পদার্পণ করেন তখন তিনি ছিলেন নিতান্তই একজন বৃদ্ধলোক -- ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল শরীর। ফলে নতুন কিছু করার বদলে, 'Travelling up to the north-west during the rainy season, he sank and died at Ghazipur (in India in October), before he had been ten weeks in the country."[২১]

এ কথা সুস্পষ্ট যে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলী কর্নওয়ালিসকে পাঠিয়েছিলেন বিশেষ কিছু দায়িত্ব দিয়ে। প্রথমত নতুনভাবে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিলিবণ্টন করতে যা একদিকে যেমন কোম্পানির স্থায়ী স্বার্থ নিশ্চিত করবে এবং অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় ভূমিরাজস্ব প্রদাতৃশ্রেণীর উপর থেকে এ যাবৎকালের সংঘটিত অত্যাচার-অনাচার কমাবে। দ্বিতীয়ত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও দিওয়ানি বিচার ব্যবস্থার চিরাচরিত অপকর্ম-দুর্নীতি নির্মূল করে প্রশাসনযন্ত্রকে একটা সুদৃঢ় ও সংহত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিতকরণ। অবশ্য ১৭৮৪ সালের 'পিট্‌স ইন্ডিয়া অ্যাক্টে'র ৩৯ ধারা আগেই 'কোর্ট'-এর ওপর এ দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিল -- 'to give orders (*to its covenanted servants in India*) for settling and establishing upon principles of toleration and justice, according to the laws and constitution of India, the permanent rules by which the tributes, rents and services of the Rajas, zamindars, polygars, talukdars and other native landlords should be in future rendered and paid to the United Company."[২২] ফলে পার্লামেন্টের আইনি আদেশ ও কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশনা[২৩] বাস্তবায়নে একেবারে শুরু থেকেই একটা অভিনব কিছু করার তাড়নায় কর্নওয়ালিস ছিলেন যারপরনাই উন্মুখ ও সংকল্পবদ্ধ।

২০. The Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire, Vol. II, Historical, pp. 486.

২১. A Brief History of the Indian Peoples, pp. 200
এই দশ সপ্তাহে (জুলাই-অক্টোবর) তিনি মূলত দিওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেছিলেন। তার পূর্বসূরী লর্ড ওয়েলেসলি-র সময়ে নিয়ম ছিল যে, ঊর্ধতন আদালতের (সদর দিওয়ানি ও সদর নিজামত আদালত) যিনি প্রধান বিচারক (Chief Judge) হবেন তিনি অবশ্যম্ভাবীরূপে কাউন্সিলের সদস্য থাকবেন। কিন্তু এ পর্যায়ে কর্নওয়ালিসের ঘোষিত নীতি যেহেতু ছিল প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার আলাদা অবস্থান নিশ্চিতকরণ, সুতরাং তিনি এই পর্বে বিধান করেন, প্রধান বিচারক এখন থেকে আর কাউন্সিলের সদস্য হবেন না, বরং এই পদ কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ ঊর্ধতন কর্মচারীদের মধ্য থেকে পূরণ করা হবে। (Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, p. 148).

২২. Quoted from, Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. I., pp. 13.

২৩. এ সম্বন্ধে ড. রাধাকুমুদ মুখার্জি একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'On September 12, 1786, Lord Cornwallis landed in Calcutta bringing with him a letter of instructions from the Court of Directors, dated 12th April 1786, a lengthy document of 89 paragraphs.' (Indian Land-System, pp. 203).

এ ব্যাপারে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে যাঁদেরকে সহযোগী হিশেবে পেয়েছিলেন, বস্তুত যাঁদের বুদ্ধি-পরামর্শে তিনি একের পর এক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার-কর্ম হাতে নিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। এই তালিকায় প্রথমেই আসে স্বনামধন্য স্যার জন শোর (কর্নওয়ালিস-পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল), -- তখন পর্যন্ত ইনি ছিলেন 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'র অধ্যক্ষ বা প্রধান (প্রেসিডেন্ট)। ভূমিরাজস্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন কর্নওয়ালিসের প্রধান সৈনিক ('chief lieutenant in revenue matters') বা মন্ত্রণা-দাতা।[২৪] রাজস্ব বিষয়ে তাকে আরও সহযোগিতা করেছিলেন জোনাথান ডানক্যান (Jonathan Duncan)। কর্মজীবনে ইনি ছিলেন জেলা কালেক্টর, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিষয়-জ্ঞান, এবং কর্নওয়ালিসের সুপারিশ তাঁকে পরবর্তীকালে বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর পদে আসীন করেছিল।[২৫] অন্যদিকে চার্লস গ্রান্ট (কোম্পানির ব্যবসায়-বাণিজ্যের মুখ্য পরামর্শদাতা) ও তদীয় ভাইপো (মতান্তরে ভাগ্নে) কানুনগো দপ্তরের 'প্রধান সেরেস্তাদার' জেম্‌স গ্রান্টও কর্নওয়ালিসকে ভূমিরাজস্ব বিষয়ে নীতি-ব্যবস্থা প্রণয়নে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন। শেষোক্ত জন সম্বন্ধে যদিও ড. Lilian M. Penson মন্তব্য করেছেন, যে, 'James Grant is indeed as famous as Shore in connection with the revenue settlement. But Grant had but little practical experience. His reputation has come from his wide study of the revenue system, and the series of published works in which he stated the results of his learning. He was an expert rather than a man of affairs. As *saristadar* he had unrivalled opportunity for studying revenue records, and Cornwallis retained the office of *saristadar* till Grant went home in 1789."[২৬], তথাপি গ্রান্টের ভূয়োদর্শন কর্নওয়ালিসের অনেক কাজে লেগেছিল। বিশেষ করে ভবিষ্যতে বাংলার গৃহীতব্য দীর্ঘমেয়াদি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে জন শোর ও জেম্‌স গ্রান্টের ঐতিহাসিক বিতর্ক অত্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল (যথাস্থানে আলোচিত)। এই তালিকায় আরও দু'জন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, স্ব স্ব ক্ষেত্রে যাঁদের কীর্তি ও অবদান আজও সমান সম্মানের সঙ্গে স্মরণীয়, -- এঁদের একজন 'History of Bengal'-খ্যাত ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্ট (কলকাতা কাউন্সিলের সদস্য ও 'বোর্ড অফ ট্রেড'-এর অধ্যক্ষ, ১৭৮৬-৮৯) এবং অন্যজন প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ স্যার উইলিয়াম জোন্‌স। পণ্ডিত জোন্‌স সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, 'Sir William Jones, (was) an oriental scholar of reputation unrivalled in his time, and a man of great practical ability, who had devoted many years to the study and practice of the law. In 1983 he had come to India as judge of the Supreme Court of

২৪. The Oxfrod History of India, pp. 530.

২৫. ১৭৮৭ সালের দিকে লিখিত এক পত্রে কর্নওয়ালিস এঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এই বলে যে, 'He (Jonathan Duncan) ... , next to Mr. Shore, was more capable of assisting me, particularly in revenue matters, than any man in this country (Bengal).' (Quoted from, The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 435).

২৬. The Cambridge History of India, Vol. V., pp 435.

Judicature at Calcutta, and he brought to his task the zeal of an enthusiast, and the knowledge of an expert. ... He gave, ... full aid to Cornwallis in his reform of the judicial administration and in the regulation of the police."[২৭]

যা হোক, উল্লিখিত বিজ্ঞ রথি-মহারথিদের বুদ্ধি-পরামর্শ ও উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার স্থিত ভূমিরাজস্ব প্রশাসন ও দিওয়ানি বিচার ব্যবস্থায় যে সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছিলেন, তা মূলত ৩টি পর্যায়ে বা সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল -- ১৭৮৭, ১৭৯০ ও ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে।[২৮] নিচে সেগুলি একে-একে তুলে ধরা হলো।

১৭৮৭ সালের সংস্কারাদি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি কর্নওয়ালিস যখন গভর্নর-জেনারেলের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন তখন নববিন্যস্ত ব্রিটিশ জেলা বা 'কালেক্টরশিপ'গুলিতে ভূমিরাজস্ব ও দিওয়ানি বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হতো মূলত স্থানীয়ভাবে দু'টি কর্তৃপক্ষ দ্বারা -- এক. জমিদাব-তালুকদার প্রভৃতির সঙ্গে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত চুক্তি সম্পাদন ও তদনুযায়ী বছরব্যাপী রাজস্ব আদায়ের কাজ করতেন কালেক্টর; এবং দুই. দিওয়ানি বিচার ব্যবস্থা বিশেষত ভূমিরাজস্ব বিষয়ক মামলা নিষ্পত্তি, জমিদারে-জমিদারে বা জমিদারে-তালুকদারে বিরোধ মিমাংসা, ভূ-সম্পত্তির বৈধ উত্তরাধিকার নির্ণয়, সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন ইত্যাদির বিচার কার্য নিষ্পাদন করতেন মফস্বল দিওয়ানি আদালতের বিচারকবৃন্দ। বলাবাহুল্য কালেক্টর ও দিওয়ানি আদালতের বিচারকবৃন্দ সকলেই ছিলেন ইংরেজ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, 'When Cornwallis arrived, the work of collecting the revenue was almost wholly divorced from that of administering justice."[২৯]

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে এই উভয় স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড কোম্পানির নিজস্ব ইংরেজ কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হলেও এতে করে প্রশাসনের দৈনন্দিন ব্যয় পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যদিকে জেলাগুলির ফৌজদারি আদালতে ভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তব্যরত থাকায় এই ব্যয় ছিল আরও উর্ধমুখি।

আগেই জানিয়েছি, জন ম্যাকফারসনের সময়ে ব্রিটিশ 'কালেক্টরশিপ'-এর সংখ্যা ৩৫-এ উন্নীত হয়েছিল। স্বভাবতই অনুমেয় একটি জেলাতেই যেখানে কেন্দ্রীয় নিয়ন্তামণ্ডলীকে তিন্‌টি ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষের পিছনে অর্থ ব্যয় করতে হতো, সেখানে ৩x৩৫-টি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা ও স্থাপনার ব্যয় কী বিপুল পরিমাণের ছিল। তাছাড়া এটাও স্মর্তব্য যে, পূর্ববর্তী গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস যতোই প্রশাসনিক কাটা-ছেঁড়া করুন না কেন, একটি ভিন্‌দেশি নতুন শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রশাসনিক পুনর্গঠনের এই ভাঙ্গা-গড়ার পর্বে বলা যায়, বাংলার তৎকালীন জেলাগুলির সামগ্রিক ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ও দিওয়ানি বিচার ব্যবস্থা ছিল, 'complicated, illogical, wasteful and suspected of being corrupt."[৩০]

---

২৭. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 436.
২৮. Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 136.
২৯. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 440
৩০. Ibid., pp. 440.

এই ত্রিমুখি প্রশাসনিক ব্যয় সঙ্কোচন ও স্থিত ব্যবস্থাপনাগুলির মধ্যে আপাত সমন্বয় সাধন তথা এককথায়, প্রশাসনের সর্বস্তরে, 'economy, simplification and purification' -- বিনির্মাণে কর্নওয়ালিস দু'ধরনের (two-fold) পদ্ধতি[৩১] অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন।

এক. ১৭৮৭ সালের জানুয়ারি-মার্চ নাগাদ তিনি কালেক্টরশিপ ৩৫টি থেকে ২৩টিতে কমিয়ে আনলেন[৩২];

দুই. রাজস্ব, দিওয়ানি ও ফৌজদারি[৩৩] বিচারের সামগ্রিক দায়-দায়িত্ব-ভার ইংরেজ কালেক্টরদের হাতে তুলে দেয়া সমীচীন মনে করলেন (ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে এই প্রক্রিয়া জুন নাগাদ চলেছিল)।[৩৪]

এখানে উল্লেখ্য, যেহেতু কর্নওয়ালিসের ঘোষিত নীতি ছিল সকল স্তরের কর্মচারী বিশেষ করে কালেক্টরদের প্রশাসনিক অসততা ও দুর্নীতি নির্মূলন, অন্তত ন্যূনতম পর্যায়ে অবসিত করা বা সীমিত রাখা, সে জন্য তিনি কালেক্টরদের বেতন বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিলেন। আগে কালেক্টররা মাসে বেতন পেতেন ১,২০০ টাকা, তিনি তা বাড়িয়ে করলেন ১,৫০০ টাকা। অবশ্য কালেক্টরের

---

৩১. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 443.

৩২. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 443; A Constitutional History of India, Dr. Keith, pp. 106.
অনেকে অবশ্য জন ম্যাকফারসনের সময়ে 'কালেক্টরশিপ' ৩৬টি ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন, এবং তা থেকে কমিয়ে ২৩টি করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। দেখুন, Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 136; A New Look on Modern Indian History, Dr. B. L. Grover, pp 122; British Rule in India and After, Dr. Vidya Dhar Mahajan, pp. 73. কিন্তু তা সঠিক নয়।

৩৩. মফস্বল বা জেলা ফৌজদারি আদালতের বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবে ছোটখাট ফৌজদারি মামলার (যে ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ ১৫-দিনের উর্ধে নয়, এমন) বিচার্য আসামিদের আটক ও বিচার করার দায়িত্ব ছিল কালেক্টরের তথা কালেক্টর-কাম জজ-কাম ম্যাজিস্ট্রেটের উপর। পনেরো দিনের উর্ধে শাস্তিযোগ্য মামলা নিষ্পত্তির জন্য কালেক্টর নিকটবর্তী মফস্বল নিজামত আদালতে প্রেরণ করতেন।

৩৪. এ বিষয়ে প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক James Mill একটা কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়, 'In each district, the same man was collector of the revenue, judge of the Diwani Adalat, and moreover head of the police. Of two such offices as those of collector and judge, lodged in the same hands, it was notorious that the one had a very strong tendency to produce a sacrifice of the duties of the other.' (The History of British India, Vol. III., pp. 330). ফলে, 'As a security against that great and glaring evil, the rulers of 1786 prescribed, that the proceedings of the collectors, in their financial department, and in their judicial and magisterial departments, should be kept separate and distinct.' (Ibid., pp. 330-31).

৩৫. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 443; A Constitutional History of India, pp. 106.

মতো একটি অত্যন্ত লোভনীয় পদে মাসিক মাত্র কয়েক শত টাকা বৃদ্ধিই যথেষ্ট ছিল না তা কর্নওয়ালিস ভালোই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি কালেক্টরদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিরোধ এবং ভূমিরাজস্ব আদায়ে তাদেরকে আরও মনোযোগী করার লক্ষ্যে মোগল যুগের ন্যায় 'কমিশন' দেয়ার প্রথা চালু করলেন। বস্তুত নতুন ব্যবস্থায় নিরূপিত রাজস্বের নিরিখে প্রকৃত যে আদায় (জমা-উসুল) হতো তার শতকরা ১ ভাগ কালেক্টরদের কমিশন দেয়া শুরু হলো।[৩৬]

প্রাথমিক বা বাহ্যিক হিসাবে যদিও ১% ছিল খুব সামান্য একটা অঙ্ক, কিন্তু বাস্তবে যখন তা সমন্বিত বা পুঞ্জীভূত হতো তখন সেই পরিমাণ টাকা নিতান্ত কম হতো না। বিশেষত যখন কোন বড় জেলার ভূমিরাজস্ব আদায় হতো এবং কালেক্টর তার প্রাপ্য কমিশন লাভ করতেন তখন সেটি অন্য কালেক্টরদের জন্য তো বটেই, এমন কি কোম্পানির নীতি-নির্ধারক ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছেও ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়াতো। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। যেমন, ১৭৮৭ সালের জেম্‌স গ্রান্টের প্রস্তাবে বর্ধমান জমিদারির ভূমিরাজস্ব ধার্য হয়েছিল ৪৩,৩০,০০০ টাকা এবং তন্মধ্যে কোম্পানির দাবি ছিল ৪০,০০,০০০ 'সিক্কা' টাকা।[৩৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ সময় বর্ধমান জমিদারির বিস্তার ছিল স্থিত বর্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ জুড়ে।[৩৮] ফলে যদি ধরা হয় যে কোম্পানির পাওনা উল্লিখিত সম্যক পরিমাণ বা তার কিছু কম অর্থ সংশ্লিষ্ট তিনটি জেলার কালেক্টরগণ বছরে আদায় করতেন (যতো আদায় ততো কমিশন -- এই নীতি প্রচলনের কারণে সেটা প্রায় কাছাকাছিই আদায় হতো এটা বিশ্বাস করা যেতে পারে; অবশ্য এর ফলে তাদের আদায় কাজে বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছিল সেটাও এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে), তাহলে তাদের (কালেক্টর) গড় মাসিক আয় যে নিয়মিত বেতন-ভাতাব বাইরে অনেক গুণ ছাড়িয়ে যেতো তা না বললেও চলে।

যা হোক কর্নওয়ালিস কালেক্টরদের রাজস্ববিষয়ক কাজেকর্মে সহযোগিতা প্রদানের জন্য দু'জন করে ইউরোপীয় সহকারী নিয়োগ করেছিলেন।[৩৯] এদের সিনিয়র জনের মাসিক বেতন নির্দিষ্ট হয় ৫০০ টাকা, জুনিয়রের ৪০০। কোন কোন ক্ষেত্রে বৃহৎ 'কালেক্টরশিপ' বিবেচনায় তৃতীয় একজন ইংরেজ সহকারীও নিযুক্ত হয়েছিল যার বেতন ছিল মাসে ৩০০ টাকা।[৪০] ফলত আগেই উল্লেখ করেছি, কর্নওয়ালিস-এর এ সব কিছু করার পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল একটাই, আর তা হলো কালেক্টরদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসায়-বাণিজ্য করা থেকে নিরত রাখা বা বিচ্ছিন্ন করা।[৪১] এ ব্যাপারে তিনি কমবেশি সফলও হয়েছিলেন তা অনস্বীকার্য।

কালেক্টরের ভূমিরাজস্ব আদালতের নাম ছিল 'মাল আদালত'। কর্নওয়ালিসের সংশোধিত

---

৩৬. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 444; A Constitutional History of India, pp. 106.

৩৭. বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৭।

৩৮. পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, ড. রজতকান্ত রায়, পৃষ্ঠা ৫১।

৩৯. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 444.

৪০. Ibid., pp. 444.

৪১. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 444. ঐতিহাসিক Ethel R. Sykes-ও বলেন, 'Lord Cornwallis ... increased the salaries of the officials, so that they should no longer be tempted to abuse their positions of trust, ..' (Readings from Indian History, pp. 67).

ব্যবস্থায় 'মাল আদালতে' প্রদত্ত তার যে কোন আদেশ বা রায়ের বিরুদ্ধে 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'র দপ্তরে আপিল দায়েরের বিধান চালু করা হয়েছিল। তবে 'বোর্ডে'র ওপরে, আপিলের চূড়ান্ত রায় বা নিষ্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত রাখা হয় গভর্নর-জেনারেল-ইন কাউন্সিলে।"[৪২]

কালেক্টরকে তার দিওয়ানি বিচার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার্থ একজন এদেশীয় সহযোগীও দেয়া হয়েছিল। এর পদবি ছিল 'রেজিস্ট্রার'। যদিও কালেক্টর দিওয়ানির প্রধান প্রধান কার্যাবলি দেখাশুনা করতেন, কিন্তু তার উপর থেকে বহুতর কাজের চাপ কমাতে নবনিযুক্ত রেজিস্ট্রারকে ২০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের দিওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির দায়িত্ব দেয়া হলো। উল্লেখ্য, এর আদেশ বা রায়ের লিপিতে কালেক্টরের প্রতিস্বাক্ষর সংযোজনের বিধান রাখা হয়েছিল। ২০০ টাকা ঊর্ধের মামলা শুনতেন কালেক্টর স্বয়ং। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশনার সূত্র ধরে কর্নওয়ালিস আদেশ দিয়েছিলেন, কালেক্টর যখন জমিদারে-জমিদারে, বা জমিদারে-তালুকদারে বিরোধীয় মামলা, তাদের সীমানাসংক্রান্ত জটিলতা ও উত্তরাধিকার নির্ণায়ক মোকদ্দমার শুনানি গ্রহণ করবেন, তখন অবশ্যই তারা যেন, 'due consideration of the prevailing local customs or usages'-এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন বা দৃষ্টি দেন।"[৪৩]

কালেক্টরের দিওয়ানি আদালতে নিষ্পন্ন ১,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের মামলার আপিল শুনতেন সদর দিওয়ানি আদালত (এই আদালত গঠিত হয়েছিল গভর্নর-জেনারেল ও তদীয় কাউন্সিলরবর্গ সমন্বয়ে)। তাদেরকে সহযোগিতা করতেন এদেশীয় অধস্তনরা -- মুসলিম আইনের জন্য কাজি বা মুফতিগণ, এবং হিন্দু আইনের জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তাছাড়া কালেক্টর আদালতের ৫,০০০ টাকা বা তদূর্ধ মূল্যের মামলার আপিল শুনানি ও চূড়ান্ত রায় ঘোষণার অধিকার ছিল ইংল্যান্ডের রাজার (King-in-Council in England)।

যা হোক, ১৭৮৭ ও ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্পাদিত, 'With these changes the more fundamental reforms in the administrative system were for the time complete, and Cornwallis was able to issue detailed regulations covering all sides of the collectors' work By the regulations of July details of establishment and procedure were prescribed and rules laid down to govern the action of the collectors in their judicial and magisterial functions."[৪৪] এখানে বলা দরকার, যদিও পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ্য করেছি, কালেক্টরের হাতে যুগপৎ ভূমিরাজস্ব, দিওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের ক্ষমতা একত্রিত বা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সমকালে কালেক্টরের কার্য-পরিধি ও ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বেড়েছিল, এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে তা প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় অনেকখানিই কমিয়েছিল (একটি ব্যবসায়ীগোষ্ঠী হিশেবে কোম্পানির তা প্রার্থনীয়ও ছিল বটে), তথাপি এটাও সত্য, একই হস্তে অধিক ক্ষমতা-প্রয়োগাধিকার কালেক্টরকে ক্ষেত্রবিশেষে নিষ্ঠুর স্বৈরশাসকেও পরিণত করেছিল।

তবে তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে কার্পণ্য করা অনুচিত যে, কর্নওয়ালিসের শাসনকালীন প্রাথমিক পর্বে, 'Though by the judicial reforms of 1787, Cornwallis united the judicial office and administration in the hands of one Englishman i.e.

---

৪২. Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 137.

৪৩. Ibid., pp. 137.

৪৪. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 444.

Collector, it was considered a better step to suit the then existing conditions than the earlier separation of judiciary and executive."[৪৫]

১৭৯০ সালের সংস্কার

মূলত কর্নওয়ালিসের ১৭৮৭ সালে গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছিল ভূমিরাজস্ব ও দিওয়ানি বিচার প্রশাসনের সংস্কারসম্পর্কিত। এবার তাকে ফৌজদারি ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হলো। (অপ্রাসঙ্গিক বিধায় এগুলো আলোচনা থেকে বিরত থাকছি)। তবে এই পর্বে তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন যা না উল্লেখ করলেই নয়, তা হলো বিভাগীয় আদালত প্রতিষ্ঠা। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের এক ঘোষণায় মফস্বল ফৌজদারি আদালতসমূহ বাতিল করা হয়।[৪৬] তদস্থলে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সমগ্র দিওয়ানি অধিকারভুক্ত এলাকাকে ৪টি অঞ্চলে বিভক্ত করে ৪টি আঞ্চলিক বা বিভাগীয় আদালত গঠন করা হয়েছিল। এগুলোর নাম রাখা হলো 'কোর্ট অফ সার্কিট' (Court of Circuit) বা 'সার্কিট কোর্ট', এবং তা প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলা-ওড়িশার কলকাতা, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকায়, এবং বিহারের পাটনায়। প্রতিটি আদালত গঠিত হয়েছিল কোম্পানির দু'জন[৪৭] চুক্তিবদ্ধ অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়ে এবং সেই সঙ্গে তাদেরকে দেশি আইন-কানুন দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য ছিল একাধিক কাজি ও মুফতি এবং হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত।[৪৮] এই আদালতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, এটি কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থিতিশীল বা স্থায়ী প্রকৃতির ছিল না। বরং তা ছিল ভ্রাম্যমান ধরনের এক নতুন আদালত। এর বিচারকবৃন্দ বছরে দু'বার অধীন জেলাগুলির বিচার কার্যক্রম নিষ্পাদনার্থ সদলবলে বেরিয়ে পড়তেন এবং জেলা থেকে জেলায় ঘুরে ঘুরে অর্থাৎ এক স্থানে কিছুদিন আদালত বসিয়ে বিচার করতেন।[৪৯] এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আগেই জানিয়ে রাখা যেতে পারে যে, যদিও এগুলো নামে ছিল ভ্রাম্যমান, কিন্তু তা জেলাগুলিতে বিচারের সময় একটি পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে বা স্থাপনায় (Builiding and premises) বসতো। যা হোক এই স্থাপনাগুলিকেই কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে জেলায় জেলায় 'সার্কিট হাউস' (Circuit House) গড়ে উঠেছিল।
'কোর্ট অফ সার্কিটে'র রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যেতো সদর নিজামত আদালতে।[৫০] উল্লেখ্য, এ পর্যায়ে কর্নওয়ালিস স্থিত সকল স্তরের ফৌজদারি আদালতের শীর্ষপদে

---

৪৫. Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 137.

৪৬ Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 137.
অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, জেলায় কোন ফৌজদারি বিচারালয় ছিল না। জেলার ফৌজদারি আদালত পরিচালনা করতো আগের মতো ইংরেজ কালেক্টর, -- ম্যাজিস্টেরিয়াল ক্ষমতায়।

৪৭. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 445; A Constitutional History of India, pp. 107; The Maratha Supremacy, pp. 478.

৪৮. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 445.

৪৯. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 445; A Constitutional History of India, pp. 107.

৫০. Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 137.
তবে ড. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ উল্লেখ করেন, এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে হতো সরাসরি সুপ্রিম কোর্ট অফ জুডিকেচারে। দেখুন, The Maratha Supremacy, pp. 478.

ইউরোপীয়দের নিযুক্তির লক্ষ্যে মুর্শিদাবাদস্থ সদর ফৌজদারি আদালতের প্রধান বিচারকের পদ থেকে সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খানকে (নবাবের বদলে তখন পর্যন্ত খানই এটির মুখ্য বিচারকের ভূমিকায় ছিলেন) আগেই কর্মচ্যুত করেছিলেন এবং একই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ থেকে সদর নিজামত আদালতও সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়।[৫১] অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাজ্য শাসনের জন্য জরুরি প্রশাসনের সকল বিভাগ ও দপ্তরের প্রধান প্রধান তথা নিয়ন্ত্রণকারী অফিসগুলো এখন থেকে আবার ইংরেজদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একীভূত হয়েছিল বাংলার নতুন রাজধানী কলকাতায়।

অন্যদিকে ফৌজদারি বিচার প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ -- কোতওয়াল বা পুলিশি ব্যবস্থারও কর্নওয়ালিস সংস্কার সাধন করলেন। তিনি প্রথমবারের ন্যায় কলকাতা শহরে 'সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ' (Superintendent of Police) পদের প্রচলন করেছিলেন (১৭৯১), যদিও এর তত্ত্বাবধানের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল কালেক্টর-কাম-ম্যাজিস্ট্রেট-কাম জজের হাতে।[৫২] আগে যেখানে স্ব স্ব এলাকায় জমিদার-তালুকদারেরা চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-বদমায়েশ ও ছোটখাট বিদ্রোহীদের দমন ও নিরস্ত্র করতে ভূমিকা পালন করতো, কর্নওয়ালিস তা পরিবর্তন করে পরের বছরই 'দারোগা'দের হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন।[৫৩]

১৭৯৩ সালের সংস্কার

কর্নওয়ালিসের ১৭৯৩ সালের সংস্কারগুলিই ছিল বস্তুত তার চিন্তার মৌল প্রক্ষেপ, এবং অনেকটা স্থায়ী প্রকৃতির। বলাবাহুল্য এ যাবৎ তিনি যা করেছিলেন সেগুলো ছিল তার তাৎক্ষণিক চিন্তাভাবনার ফল এবং আশু প্রয়োজন মিটানোর লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা। অবশ্য ততোদিনে তার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এক-এক করে অনেক কিছুই সঞ্চিত হয়েছিল। বিশেষত মধ্য-১৭৮৬ থেকে ১৭৯২ পর্যন্ত তিনি এদেশের ভূমি ও বিচার ব্যবস্থার মৌল কাঠামোটিকে খুব কাছ থেকে দেখবার ও বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলেন; সেই সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভের অত্যল্পকালের মধ্যে তিনি কালেক্টর ও কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্থানীয় ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, জমিদার-তালুকদার প্রভৃতির ভূমিকা, রায়তদের অবস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে যে বিশদ প্রতিবেদন চেয়েছিলেন সেটিও এর মধ্যে তার হস্তগত হয়েছিল। মোদ্দা কথা, এ থেকেও তিনি এখানকার সর্বশেষ আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এবার এটাকেই তিনি কাজে লাগাতে মনঃস্থির করলেন। যা হোক এই লক্ষ্যে কর্নওয়ালিস ১৭৯৩-পর্বে যে বিশদ প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কার কার্য সম্পন্ন করেন, এককথায় তা ছিল বেশ ব্যাপক, ক্ষেত্রত বিপ্লবাত্মক ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ।

১৭৯৩ সালের ১লা মে কর্নওয়ালিস তার বিখ্যাত 'কোড' ('Cornwallis Code' নামেই সমধিক পরিচিত) ঘোষণা করলেন।

এর মধ্যে ৪৮-টি প্রবিধান (Regulations) বা নিয়ম-কানুন ছিল যা তিনি স্যার জর্জ বারলৌ

---

৫১. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 445; A Constitutional History of India, pp. 106-7.

৫২. The Maratha Supremacy, pp. 478-79.

৫৩. Ibid., pp. 479.

(Sir George Barlow)-এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় প্রস্তুত করেছিলেন।"[৫৪]

এর মধ্যেই মূলত তার ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা ও কোম্পানির কর্মচারীদের করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও রূপরেখা ফুটে উঠেছিল। Dr. Vincent Smith বলেন, 'The aim of the regulations was to make permanent Cornwallis's work by defining it. 'They dealt with the commercial system, with civil and criminal justice, with the police and with the land revenue. While restating the existing position, they contemplated further changes ...' The regulations were intended to ensure ordered administration and prevent any return to the chaos and abuses of the past."[৫৫]

বলাবাহুল্য এটি ছিল প্রবিধান প্রণেতা বা প্রণেতাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য বা নীতি।

এই প্রবিধানের নীতি-আদর্শ বাস্তবায়নের ফলে অতঃপর বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সামগ্রিক ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও দিওয়ানি-ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার যে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, এককথায় বলতে গেলে তা, 'The basic principles underlying the Cornwallis Code of 1793 were the divorce of revenue from civil jurisdiction, the separation of judicial from executive functions and the multiplication of judicial courts."[৫৬]

নিচে 'কর্নওয়ালিস কোড'-এর প্রাসঙ্গিক অংশ ও তৎপরিপ্রেক্ষিতে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনসম্বন্ধীয় যে সকল সংস্কার সাধিত হয়েছিল তা বিবৃত করা হলো।

প্রবিধান ২.৩	কর্নওয়ালিস চেয়েছিলেন বাংলা তথা ভারতে স্বদেশের মডেলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা অবকাঠামো ঢেলে সাজাতে। 'আইনে শাসন' (Rule of Law)-এর ভিত্তিতে এদেশের জনগণ প্রশাসনের কাছ থেকে প্রাপ্য ব্যবহার পাবে এবং সবাই থাকবে আইনের কঠোর নিগড়ে -- এই ছিল তার মনস্কামনা। এই লক্ষ্যে তিনি ভূমিরাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ বা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছিলেন। স্থিত অবস্থায় জেলা কালেক্টর ছিলেন একাধারে ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহক, দিওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসমূহের জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। এবার তাকে (কালেক্টর) শুধু অধিক্ষেত্র জেলার ভূমিরাজস্ব নিরূপণ অর্থাৎ জমিদার-তালুকদার ইত্যাদির সঙ্গে বন্দোবস্ত চুক্তি সম্পাদন ও আদায়ের সঙ্গেই কেবল সম্পর্কিত রাখা হলো। Dr. B. B. Misra-এর কথায় বলা যায়, 'He ceased to be a

৫৪. Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 139, 142: A Dictionary of Indian History, pp. 266.

৫৫. The Oxford History of India, pp. 628-29.

৫৬. A Comprehensive History of India: The Consolidation of British Rule in India (1818-1858), Vol. XI, pp. 522.

Magistrate."[৫৭] তার রাজস্ব বা 'মাল আদালত' বিলুপ্ত করে তদস্থলে প্রতিটি জেলায় একজন করে ইংরেজ জজের পদ সৃষ্টি করে তার উপর অর্পিত হলো 'মাল আদালত'সম্পর্কিত যাবতীয় বিচারিক দায়িত্বভার। এই লক্ষ্যে নতুনভাবে ২৩টি জেলা ও ৩টি নগর (City) অর্থাৎ মোট ২৬টি[৫৮] সিভিল বা দিওয়ানি আদালত পুনর্গঠিত করা হলো। কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ অভিজ্ঞ কর্মচারীরাই হতেন দিওয়ানি আদালতের জজ[৫৯], পদের দিক থেকে এরা ছিলেন কালেক্টরের চেয়েও কিছুটা অগ্রসর বা উর্ধতন[৬০], এবং নিয়ুক্তির সময়ে এদেরকে নির্দিষ্ট শপথ বাক্য (Prescribed Oath) পাঠ করতে হতো।

এই দিওয়ানি আদালতের আদেশ বা রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা যেতো 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'র আদালতে এবং তাদের রায়ের বিরুদ্ধে গভর্নর-জেনারেল-ইন কাউন্সিল সমীপে।[৬১]

প্রবিধান ৪

২৩টি জেলার দিওয়ানি আদালত ছাড়াও ৩টি নগর আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনায়। ভূমিরাজস্ব ও সম্পূর্ণত দিওয়ানি প্রকৃতির তথা খাজনা ধার্য ও আদায়, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, সীমানা বিরোধ, ব্যক্তিগত অধিকার ইত্যাদি জড়িত মোকদ্দমাসমূহই প্রথমত জেলা বা শহর দিওয়ানি আদালতের বিচার্য ছিল। উল্লেখ্য এর বিচারকগণ স্ব স্ব জেলা বা শহরের ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবেও কর্তব্য পালন করতেন।[৬২] দেশি আইন-কানুনের ভিত্তিতে (মুসলমান ও হিন্দুদের ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় ও সামাজিক আইন-বিধান ও প্রথানুসরণে) এবং তাতে না কুলোলে 'equity and reason'-এর উপর আস্থা রেখে দিওয়ানি আদালতের বিচারকদের বিচার করতে হতো।[৬৩]

---

৫৭. A Comprehensive History of India: The Consolidation of British Rule in India (1818-1858), Vol. XI, pp. 522.

৫৮. A Constitutional History of India, pp. 107.

৫৯. British Rule in India and After, pp. 74.

৬০. 'One of the Company's servants, higher in rank than the collector, was the judge.' (The History of British India, Vol. III., James Mill, pp. 332).

৬১. Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 139.

৬২. এই অবস্থায় তার দায়িত্ব ছিল, ড. আলি আহমদের ভাষায়, 'Judge-Magistrate .. was to maintain law and order, supervise police work, apprehend thieves and robbers, try them as Magistrate and function as Civil Judge.' (Role of Higher Civil Servants in Pakistan, pp. 16).

৬৩. Advanced Study in the History of Modern India, Vol. I., Dr. G. S. Chhabra, pp. 312.

প্রবিধান ৫

'কোর্টস অফ সার্কিট' বিলুপ্ত করে পূর্বের জায়গায় অর্থাৎ কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনায় প্রাদেশিক আপিল আদালত (Provincial Courts of Appeal) প্রতিষ্ঠা করা হলো। এই আদালত গঠিত হয়েছিল ৩-জন ইউরোপীয় বিচারক নিয়ে[৬৪], যারা -- 'chosen from the civil department of the Company's service, and distinguished by the appellations of first, second, and third; ..'[৬৫]

বলাবাহুল্য জেলা ও শহর দিওয়ানি আদালতের মামলার আপিল শুনানি ছাড়াও এদের আদি এক্তিয়ারও ছিল। ১,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তির (ভূ-সম্পত্তির বেলায় বাৎসরিক ৫০০ টাকা আয়ক্ষম) মামলায় এদের রায় বা আদেশ ছিল চূড়ান্ত। তবে ১,০০০ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ৫০,০০০ টাকার নিম্নের মামলায় আপিল শুনতো কলকাতাস্থ সদর দিওয়ানি আদালত এবং তদূর্ধ মূল্যের মোকদ্দমাসমূহের আপিল করা যেতো সরাসরি ইংল্যান্ডের রাজা বা রাণীর দরবারে।

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে, 'These courts were also to supervise the working of District Courts and on the basis of their report the Sadr Diwani Adalat could suspend the District Judges.'[৬৬]

অধিকন্তু, 'The judges are required, on their return from the circuit, to make a report, containing an account of everything which has appeared to them to be worthy of the notice of government, in the perfections or imperfections of the law; in the condition of the jails; in the management of the prisoners; and even in the moral and physical condition of the people.'[৬৭]

উল্লেখ্য প্রাদেশিক আপিল আদালত যখন ফৌজদারি মামলার আপিল শুনতো তখন এর নাম হতো প্রাদেশিক সার্কিট আদালত।

৬৪. এদের সঙ্গে আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচারী হিশেবে আরও থাকতো একজন রেজিস্ট্রার, কোম্পানির নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক সহকারী, একজন কাজি ও একজন মুফতি এবং একজন হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত।
দেখুন, The History of British India, Vol. III., pp. 333.

৬৫. The History of British India, Vol. III., pp. 333.

৬৬. A New Look on Modern Indian History, pp. 120, A Constitutional History of India, pp. 108.

৬৭. The History of British India, Vol. III., pp. 337-38.

৬৮. বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ১৫০।

প্রবিধান ৬

আদালতে মামলা দায়েরের জন্য ১৭৮৭ সালের কিছুকাল আগে থেকে চলে আসা 'কোর্ট ফী' প্রথা বাতিল করা হলো। প্রচলিত ব্যবস্থায় এর হার ছিল শতকরা ২ থেকে ৫ টাকা।[৬৯] সে আমলে এই টাকা দিয়ে মামলা রুজু করা বেশ ব্যয়সাধ্য ছিল। কর্নওয়ালিস মনে করতেন, যেহেতু বিচার পাওয়া, অন্তত আদালতের দ্বারস্থ হওয়া প্রত্যেকেরই মৌলিক অধিকার, সুতরাং এই প্রথা বারিত হওয়া উচিত। এতে করে প্রত্যেকেই সমানভাবে আদালতে যাওয়ার সুযোগ পাবে। বাস্তবে হয়েও ছিল তাই।

প্রবিধান ৭

আগে যে কোন ব্যক্তি আদালতে উকিলের কাজ করতে পারতো। নতুন বিধানে এই প্রথা বাতিল করে পেশাদাব উকিলদের মধ্যেই তা কেবল সীমিত রাখা হলো। আবার উকিলেরা যাতে করে মক্কেলদেব শোষণ করতে বা নিংড়ে নিতে না পারে সেজন্যও তাদের ফিস বেঁধে দেয়া হলো। প্রয়োজনে আদালতকর্তৃক মক্কেলদের কাছ থেকে তা আদায় করে দেয়া হতো। এছাড়া সরকারি মামলা পরিচালনার জন্য সরকারি বেতনভোগী উকিল এবং সরকার-বিবাদি মামলায় বাদির উকিলকে সরকারকর্তৃক পারমিট বা অনুমতি দেয়ারও নিয়ম চালু করা হলো। যা হোক, এই প্রবিধানটি নিঃসন্দেহে ছিল কর্নওয়ালিসেব একটি বড় রকমের সংস্কার এবং এর ফলও হয়েছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

প্রবিধান ১১

হিন্দু ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে আগে ব্যবস্থা ছিল কিছু কিছু তথা বড় বড় জমিদার পরিবারগুলির মূল জমিদারের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হবে। সম্ভবত 'জমিদারী অটুট ও অখণ্ড রাখার জন্য এ প্রথা অনুসরণ করা' হয়েছিল। তবে এখন থেকে বিধান করা হলো, ছোট-বড় সকল শ্রেণীর জমিদারি-তালুকদারির ক্ষেত্রেই তা বলবৎ হবে।

প্রবিধান ১৪

এটা ঠিক যে, যে কোন উপায়ে নিরূপিত ভূমিরাজস্ব প্রাপ্তির নিশ্চয়তা লাভই ছিল কর্নওয়ালিসের গৃহীত সকল ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য। আর এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তিনি ছিলেন সদা সতর্ক। নব প্রবর্তিত ও অনেকটা উদার এবং নিরপেক্ষ ধরনের আদালত প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে নানা টালবাহানা ও মামলা-মোকদ্দমার ফাঁদে ফেলে জমিদার-তালুকদারগণ যাতে কালেক্টরের ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায় কাজে কোনরূপ বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য 'কালেক্টার কর্তৃক ভূমিরাজস্ব সংগ্রহকে নতুন আদালত প্রথার বহির্ভূত রাখা হয় এবং আইন করা হয় যে রাজস্ব বাকী পড়লে কালেক্টার সে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য জমি নিলামে বিক্রি করতে পারবে এবং এ পন্থার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মোকদ্দমা করা যাবে না।'[৭০]

---

৬৯. বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ১৫১।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫১-৫২।

প্রবিধান ১৭	বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য আগে রায়তদেরকে আটক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হতো। কিন্তু এখন থেকে বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ করত জমিদার-তালুকদারদের সকল দাবি-দাওয়া বা পাওনা দিওয়ানি আদালতের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি বা উসুল করার বিধান করা হয়েছিল।
প্রবিধান ২৭	৩টি প্রদেশ (বাংলা, বিহার ও ওড়িশা)-র আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ সায়ের শুল্ক বা কর নিষিদ্ধ করা হলো।
প্রবিধান ২৮	এই প্রবিধানটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। বস্তুত এর দ্বারা কোম্পানির কর্মচারী ব্যতীত অন্য সকল বৃটিশ নাগরিকের জন্য শহর কলকাতার ১০-মাইলের বাইরে বসবাস ও গমনাগমন বারিত করা হয়েছিল। কারণ এরা শহরের বাইরে থাকাবস্থায় নানা অজুহাতে স্থানীয়দের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাতো। ফলে কর্তৃপক্ষ চাইলো তা বন্ধ করতে। যা হোক এরপরও কেউ সেখানে বসবাসে আগ্রহী হলে তাকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হতো, এবং তাকে শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, এক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে স্থানীয়দের কোনরূপ অত্যাচারের অভিযোগ পাওয়া গেলে, দেশীয়রা তার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে এবং সে মামলা হবে দেশি আইনে। আগেই আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে যে, 'পূর্বে বৃটিশ নাগরিকদের বিচার করতো একমাত্র কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট এবং কোন কোম্পানীর কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন নেটিভ আদালতে মামলা করতে পারতো না। এ বাধা রদ করে এখন আইনের চোখে সবাইকে সমান ঘোষণা করা হয় এবং সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে এমনকি সরকারের বিরুদ্ধেও দেশীয় অধিবাসীদের আদালতে মামলা করার অধিকার দেয়া হয়।'[৭১] প্রবিধানটির মূল বক্তব্য ছিল এ রকম: 'The official acts of the collectors might be challenged in the Civil Courts, that Government, itself might be sued like any private individual, and that such suits could only be cognisable by judges who had no direct or personal interest in enforcing the claims of Government.'[৭২] নিঃসন্দেহে এ ছিল প্রচলিত বিধিবিধানের এক যুগান্তকারী সংস্কার, এবং কর্নওয়ালিস এ জন্য প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ভারতীয় সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ ড. কুলশ্রেষ্ঠ-এর ভাষায়, 'It was really a very courageous and bold step taken by Lord Cornwallis.'[৭৩]

৭১. বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ১৫১।
৭২. Advanced Study in the History of Modern India, Vol. I., pp. 312-13.
৭৩. Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 140.

প্রবিধান ৩৭ ৪৮ — সম্পত্তি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ তথা এর নিরাপত্তার প্রশ্নটিও এই সময় কর্তৃপক্ষের কাছে যথেষ্ট তাৎপর্যবহ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই ভূমি হস্তান্তর, সম্পত্তিসংক্রান্ত চুক্তি, বন্ধক প্রভৃতি নিবন্ধন (Registration) করা আবশ্যকীয় করা হলো। দান-হেবা, বিক্রয় ও উত্তরাধিকার নির্ণয়, অন্য কথায় জমা-বিভক্তির ফলে ভূমি-স্বত্বের যে উপর্যুপরি রদবদল হতো, তা রেকর্ড করার জন্য কালেক্টরকে একটি রেজিস্টার খোলার নির্দেশ দেয়া হলো (৫ বছর পর পর এই রেজিস্টার পরিবর্তিত হতো)। উল্লেখ্য যে, 'ভূমি নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা(ই) উক্ত রেজিস্টার ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য' ছিল তা বলা যেতে পারে।

প্রবিধান ৩৮ — ইউরোপীয় সিভিলিয়ানগণকর্তৃক এদেশীয়দের জমি ক্রয় ও কোনরূপ ঋণ প্রদান বারিত করা হয়েছিল।

প্রবিধান ৪০ — গ্রামাঞ্চলে ছোটখাট মামলা-মোকদ্দমা শালিশ-মিমাংসা করার জন্য দেশি সদর আমিন বা কমিশনার নিযুক্ত করা হলো। অনূর্ধ ৫০-টাকা মূল্যের মামলা এরা আমলে নিতে পারতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, পরবর্তীকালে এদেরই পদবি হয়েছিল 'মুন্সেফ' বা 'মুন্সিফ'। তবে এখানে লক্ষ্যণীয় ছিল এই যে, 'The Munsiffs were selected out of the landholders or their agents who were expected to do the job honorarily and were getting some commission on the sums involved in the litigation.'[৭৪]

যা হোক 'কর্নওয়ালিস কোড'-এর অধীনে পূর্বালোচিত বিভিন্ন রকমের সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াও প্রবল ক্ষমতাধর গভর্নর-জেনারেল-ইন কাউন্সিল হিশেবে কর্নওয়ালিস আরও কিছু আপাত সরল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। Dr. Lilian M. Penson-এর দেয়া তথ্য থেকে জানা যায়, এ সময় -- 'The treasury, the pay-master's office, and the accountant-general's office were all reformed; the duties of the *Khalsa* (the exchequer) defined; the establishment of the customs reduced. .. For each department a special list of rules for the conduct of business was drawn up, defining the duties to be carried out and the restrictions placed on the actions of their members. The regulations on these matters were among the lasting achievements of Cornwallis.'[৭৫]

মোটামুটি এই ছিল লর্ড মার্কুইস কর্নওয়ালিস-এর সময়কালের বাংলা, বিহার ও ওড়িশার ভূমিরাজস্ব প্রশাসন ও দিওয়ানি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার ও সর্বশেষ স্থিতি।

এখন আমরা বাংলার বহুল বিতর্কিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নিয়ে আলোচনা করবো।

---

৭৪. Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 140.

৭৫. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 447.

বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩ খ্রিঃ

আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার বহুল আলোচিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয় ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মার্চ[৭৬], প্রচলিত দশসালা বন্দোবস্ত ইংল্যান্ডের 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীকর্তৃক লিখিত অনুমোদন লাভের পর।[৭৭] আইনের দিক থেকে দশসালা বন্দোবস্ত বাংলার ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়েছিল ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯ সালে; একইভাবে বিহার প্রদেশে ২৫শে নভেম্বর, ১৭৮৯ এবং ওড়িশায় ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৯০ সালে। এরও আগে ঘরে-বাইরে তথা বাংলা ও ভারতে এবং ইংল্যান্ডে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা, পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, পক্ষে-বিপক্ষে প্রচুর মতামত এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এদেশীয় প্রেক্ষাপটে উপর্যুপরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা -- কখনও বর্ষভিত্তিক ইজারা পদ্ধতি অনুসরণ, আবার কখনও দ্বি বা ত্রৈবার্ষিক, এমন কি পঞ্চসনা বন্দোবস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন শেষে প্রার্থিত ফল না পেয়ে কোম্পানির স্থানীয় নীতি-নির্ধারক মহল সর্বশেষ সিদ্ধান্তের আলোকে আপাত/চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিশেবে 'The Decennial Settlement of Bengal' গ্রহণ করলো, এবং এটিই যখন 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি নিয়ে 'The Permanent Settlement of Bengal'-এ পরিণত হলো, তখন এর মুখবন্ধের অব্যবহিত পরবর্তী অনুচ্ছেদে (অনুচ্ছেদ ১) সরকারি যে ঘোষণা ছিল, পর্যালোচ্য ক্ষেত্রে সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিধায় এখানে তুলে ধরা প্রয়োজনীয় মনে করছি:

Article I In the original Regulations (*Bengal Regulation VIII of 1793*) for the decennial settlement of the public revenues of Bengal, [*Bihar and Orissa,*] passed for those Provinces, respectively, on the 18th September, 1789, [*the 25th November, 1789, and the 10th February, 1790,*] it was notified to the proprietors of land, with or on behalf of whom a settlement might be concluded, that the *jumu* assessed upon their lands under those Regulations would be continued after the expiration of the ten years; and remain unalterable for ever, provided such continuance should meet with the approbation of the Honourable Court of Directors for the affairs of the East India Company, and not otherwise.

৭৬. The Bengal Permanent Settlement Regulation, 1793 (সংক্ষেপে Bengal Regulation I of 1793)-এর শুরুতেই উল্লেখ ছিল - 'A Regulation for enacting into a Regulation certain Articles of a Proclamation bearing date the 22nd March, 1793'.

৭৭. আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর, অধ্যাপক সমরকুমার মল্লিক, পৃষ্ঠা ৩০০।

উল্লেখ্য যে, এর পরের দু'টি অনুচ্ছেদেই মূলত এই আইন (সাধারণভাবে **Bengal Regulation I of 1793** নামে পরিচিত) বা বন্দোবস্ত (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত)-এর মোদ্দা কথা তথা সরকারি বক্তব্য অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে ফুটে উঠেছিল।

Article II The Marquis Cornwallis, Knight of the Most Noble Order of the Garter, Governor General in Council, now notifies to all *zamindars*, independent *talukdars* and other actual proprietors of land paying revenue to Government, in the provinces of Bengal, [*Bihar and Orissa,*] that he has been empowered by the Honourable Court of Directors for the affairs of the East India Company to declare the *jama*, which has been or may be assessed upon their lands under the Regulations above-mentioned, fixed for ever.

Article II The Governor General in Council accordingly declares to the *zamindars*, independent *talukdars* and other actual proprietors of land with or on behalf of whom a settlement has been concluded under the Regulations above-mentioned, that at the expiration of the term of the settlement no alteration will be made in the assessment which they have respectively engaged to pay, but that they and their heirs and lawful successors will be allowed to hold their estates at such assessment for ever.

উপরোদ্ধৃত অনুচ্ছেদ দু'টিতে (শুধু এই অনুচ্ছেদগুলিতেই নয়, বরঞ্চ আলোচ্য আইনের প্রায় সর্বত্র) বাংলার (বিহার ও ওড়িশারও) ভূমি মালিকানার ধারক-বাহকরূপে বেশ কয়েক ধরনের ভূম্যধিকারী শ্রেণীর নামোল্লেখ করা হয়েছে, যথা -- জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিক (এরা এ যাবৎ ছিল সরকারের পক্ষে নিতান্তই খাজনা সংগ্রহকারী কমিশনভোগী এজেন্ট মাত্র); এদেরকে সরকার ঘোষিত আইনে, রাষ্ট্রীয়ভাবে এই প্রথমবারের মতো ভূমির মালিক ও স্বত্বাধিকারী হিশেবে স্বীকৃতি দেয়া হলো। বস্তুতপক্ষে বিদেশি বেনিয়াগোষ্ঠীর এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ কতোটুকু ন্যায়সঙ্গত, যৌক্তিক এবং প্রচলিত আইন-কানুনের (তখনও পর্যন্ত নবাবি তথা মোগল শাসনতন্ত্র কার্যকর) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, সে আলোচনা যথাস্থানে করা হবে। তবে এখানে শুধু এটুকুই বলে রাখা দরকার যে, এই আইনে বাংলা ও ভারতবর্ষীয় ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার অন্যতম অনুষঙ্গ এবং বিশেষত আবহমান কাল ধরে ভূমির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট আপামর রায়তশ্রেণীকে পুরোপুরি উপেক্ষা বা অস্বীকার করা হয়েছিল। নানা সময়ে বিভিন্নভাবে এ পর্যন্ত যারা রায়তদের কাছ থেকে খাজনা

আদায় করতো, স্থান-কাল ভেদে যাদের শ্রেণী চরিত্র ও সামাজিক অবস্থান ভিন্ন ভিন্নভাবে গঠিত হয়েছিল, যেমন -- কেউ ছিল জমিদার, কেউ হুজুরি বা স্বাধীন তালুকদার, আবার কেউ মাসকুরি[৭৮] বা অধীন তালুকদার প্রভৃতি; বলাবাহুল্য এই আইন জারির মধ্য দিয়ে অতঃপর সব ধরনের মধ্যস্বত্ব (রাষ্ট্র ও রায়তের মধ্যে যোগসূত্র বা খাজনা আদায়ের অধিকারী এবং সেই সূত্রে কমিশনভোগী -- এই অর্থে) একটি নির্দিষ্ট ও সাধারণ 'জমিদার' অভিধায় সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ড. অতুল সুর বলেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারেরা ও স্বাধীন তালুকদারেরা জমির মালিক ঘোষিত হয়। এর দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদারদের (যথা কুচবিহার ও ত্রিপুরার রাজাদের মত মোঘল যুগের করদ নৃপতি, রাজশাহী, বর্ধমান ও দিনাজপুরের রাজাদের মত পুরাতন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ, মোঘল সম্রাটগণের সময় থেকে বংশানুক্রমিক-ভাবে রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদভোগী পরিবারসমূহ ও কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানী লাভের পর ভূমিরাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা) একই শ্রেণীভুক্ত করে তাদের সকলকেই জমির মালিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।'[৭৯] অর্থাৎ আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, এখন থেকে সরকারের দৃষ্টিতে এদের সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণী একীভূত ও সমান্তরাল হয়ে গিয়েছিল। এই আইন প্রচলনের প্রায় ১৪৭-বছর পরে প্রকাশিত, বিখ্যাত 'Floud Commission Report'-এও এই বক্তব্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে: 'The effect of the Permanent Settlement so far as the zamindars (ব্যাপকার্থে) were concerned, was to level all classes under the same denomination'[৮০] বস্তুত তথাকথিত এই জমিদারগোষ্ঠী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তনের ফলে, ' -- for all lands, whether cultivated or uncultivated, the zamindars had been declared proprietors in 1793.'[৮১]

যা হোক বাংলার ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় যুগান্তকারী ও আমূল পরিবর্তন সূচনাকারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনটি যেহেতু লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে প্রচলিত হয়েছিল, স্বভাবতই ধারণা হয়ে থাকে যে, তিনিই এই আইনের প্রবর্তকের পাশাপাশি এর উদ্‌গাতাও। কিন্তু ধারণাটি ভুল। বরং এর পিছনে মোটামুটি দেড়-দুই দশকের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। এই সময় পরিসরে নীতিনির্ধারক কর্তৃপক্ষীয় পর্যায়ে, স্বদেশে-বিদেশে বিভিন্ন ইংরেজ লেখক, চিন্তাবিদ ও বিশেষ করে কোম্পানির উচ্চস্তরের অভিজ্ঞ কিছু কর্মচারী, বিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান প্রমুখ এ সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি, আলোচনা, পক্ষে-বিপক্ষে মতামত, প্রস্তাবনা-প্রচারণা ইত্যাদি চালিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য এদেরই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকার কারণে খোদ ইংল্যান্ডেই বাংলা তথা ভারতে স্থায়ী প্রকৃতির ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অনুসরণের পক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়েছিল, যা বাস্তবায়িত হয় লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়ে।
খুব সংক্ষেপে সেই ইতিহাস তুলে ধরা হলো।

---

৭৮ হুজুরি ও মাসকুরি তালুক বা তালুকদার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মৎপ্রণীত বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪২-৪৭।

৭৯. আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৭৭।

৮০. Report of the Land Revenue Commission: Bengal, Vol. I., pp. 14.

৮১. Change in Bengal Agrarian Society, Dr. Ratnalekha Ray, pp. 74

তবে তার আগে এখানে আর একটু বলে নেয়া দরকার, পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি, ১৭৬৫ সালে দিওয়ানি লাভের পর থেকে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, বাংলা, বিহার ও ওড়িশা থেকে বাৎসরিক একটি মোটা অঙ্কের স্থির ভূমিরাজস্ব আয় বা প্রাপ্তির নিশ্চয়তায় উপর্যুপরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই পরীক্ষা হয় ব্যর্থ, বা অন্যকথায় কোম্পানির প্রার্থিত ফল প্রদানের অনুকূল বিবেচিত হয়নি। বরং এক পর্যায়ে তা নেতিবাচকতার দিকেই ধাবিত হয়েছিল।
সুতরাং একটি স্থায়ী কিন্তু সুনিশ্চিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অনুসরণ ও তদনুকূল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন কোম্পানির ভিতরে-বাইরে আগাগোড়াই তাগিদ ও লক্ষ্য ছিল তা না বললেও চলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের পূর্ব-প্রস্তুতি (ground work) হিশেবে তাই নীতি-নির্ধারকগণ প্রধানত ৩টি বিষয় সঠিকভাবে জেনে নিতে বিশেষ আগ্রহী ছিল। বিষয়গুলি নিম্নরূপ[৮২] :

এক. সরকারি পাওনা ভূমিরাজস্ব এককালীন আদায়যোগ্য হিশেবে স্থির করা হলে সেক্ষেত্রে বার্ষিক 'জমা'র পরিমাণ কী হবে?

দুই 'জমা' বন্দোবস্ত চুক্তি কাদের সঙ্গে সম্পাদিত হবে -- জমিদার, নাকি ভূমাধিকারী প্রজার সঙ্গে, এবং এর প্রকৃতি স্থায়ী, নাকি কয়েক বছর মেয়াদি হবে?

তিন. এ যাবৎ চলে আসা ভূমিস্থ বিভিন্ন প্রকারের স্বত্ব-স্বামিত্ব, সংশ্লিষ্টদের অর্থাৎ জমিদার-তালুকদার প্রভৃতি ও রায়তকুলের স্বার্থ সংরক্ষণে উপযুক্ত কী ধরনের আইন প্রণয়ন করা হবে?

বস্তুত জরুরি ভিত্তিতে এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে চেয়ে গভর্নর-জেনারেল-ইন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলার কালেক্টরদেরকে পত্র দেয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী কালেক্টরগণ তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে সুচিন্তিত মতামতসহ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করেন, যা 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর মাধ্যমে (তাদের মতামতও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল) গভর্নর-জেনারেল- ইন কাউন্সিলের হাতে এসে পৌঁছে ২০শে নভেম্বর, ১৭৮৮ নাগাদ।[৮৩] তবে বর্ণিত প্রশ্নাবলির প্রেক্ষিতে কালেক্টরদের প্রেরিত যে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলিই যে শুধু কোম্পানির সরকারকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের প্রণোদনা দিয়েছিল তা নয়। বরং কোম্পানির নীতি-নির্ধারকমণ্ডলী একটি সুদূরপ্রসারী ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে এ পথে অগ্রসর হয়েছিল। Dr. A. R. Desai তাঁর 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি' গ্রন্থে এ সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন যা অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম বিবৃত করেছেন এভাবে: 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ডঃ এ. আর. দেশাই তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডের ভূমি-ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে বাংলাদেশেও সেরকম ভূমি-ব্যবস্থা চালু

৮২ Bengal MS Records, Vol. I, Chapter III; A New Look on Modern Indian History, pp. 124; Change in Bengal Agrarian Society, pp. 74; The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 245.

৮৩. The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 245.

করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, অগণিত কৃষকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে খাজনা আদায়ের চাইতে সংখ্যায় ক্ষুদ্র একটি জমিদার-শ্রেণীর কাছ থেকে খাজনা আদায় করা প্রাথমিক পর্যায়ে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের জন্য প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই লাভজনক ছিল। তৃতীয়তঃ, নিজেদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই ইংরেজদের বাংলার বুকে একটা প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার-শ্রেণী সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল, যে শ্রেণী তাদেব শ্রেণী-স্বার্থের খাতিরেই বৃটিশ শাসক-শ্রেণীকে সর্বতোভাবে সমর্থন যোগাবে।"[৮৪]
বাস্তবে ঘটেও ছিল তা-ই। যা হোক এখন যে সব লেখক-চিন্তাবিদ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা গ্রহণে কোম্পানির নীতি-নির্ধারকদেব অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাদেব সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো।

আলেকজান্ডার ডাউ (Alexander Dow)

Firminger-এর বিখ্যাত 'Report'-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আদি প্রস্তাবকরূপে যে দু'জনের নামোল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন আলেকজান্ডার ডাউ ও হেনরি পত্তুলো।[৮৫] এরা ফিলিপ ফ্রান্সিস-এর অনেক আগেই নিজস্ব বিভিন্ন লেখায়, বক্তব্যে কোম্পানিকে তাদেব আয় নিশ্চিতির লক্ষ্যে একটি স্থায়ী প্রকৃতিব ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।
জন্মগতভাবে ডাউ ছিলেন স্কটিশ। ব্রিটিশ বঙ্গীয় সৈন্যবাহিনীতে বিভিন্ন পদে তার প্রায় ২০-বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা ছিল। সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালে অবসরে তিনি তৎকালীন সবকারি ভাষা ফারসি শিক্ষা করেন এবং এদেশের প্রাচীন ও সমকালীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করতেন। এরই ফল হিশেবে তিনি বিশাল কলেবরে 'হিন্দুস্তানের ইতিহাস' (The History of Hindostan) প্রণয়ন করেন। যদিও এটি ছিল মধ্যযুগীয় বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক আবুল কাশিম হিন্দুশাহ ফিরিশতা-র 'তারিখ-ই ফিরিশতা'-এর মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটি অনুবাদ।[৮৬] তথাপি ডাউ এই বিখ্যাত গ্রন্থের সংযোজনী হিশেবে 'A Dissertation on the Origin and Nature of Despotism in Hindostan and An Enquiry into the State of Bengal, with a Plan for restoring that Kingdom to its former Prosperity and Splendour' শীর্ষক যে মূল্যবান রচনাটি লিখেছিলেন তাতেই মূলত তার এ সম্পর্কিত চিন্তার স্ফুরণ ঘটেছিল। এতে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ছিল।

---

৮৪. বাংলাদেশ: সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা, পৃষ্ঠা ২৭।
ড. দেশাই-এর এই বক্তব্যের আবও সমর্থন পাওয়া যায় ড. কেশব চৌধুরীর রচনায়। তাঁর ভাষায়, 'বহু কারণে কর্ণওয়ালিশের বন্দোবস্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব কর্ণধারদের মনঃপুত হয়। এই বন্দোবস্ত ভূমি বিলিব্যবস্থাব ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আইন ও অর্থনীতি সংক্রান্ত ধ্যানধারণার ছকে রচিত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ কৃষকের কাছ থেকে ভূমিবাজস্ব আদায় করাব চেয়ে কয়েক হাজাব জমিদাবেব কাছ থেকে তা আদায় করা সহজতব ছিল। ভাবতীয় জনসাধাবণের আন্দোলন বা বিদ্রোহেব বিরুদ্ধে অনুগত মিত্র সৃষ্টি কবার কাজে চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত সহায়ক হয়েছিল। শাসকশক্তির অনুগ্রহে ব্রিটিশ ভারতের জমিদারদেব উৎপত্তি ঘটেছিল এবং ব্রিটিশ শক্তিব উপস্থিতি তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল।' (ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ, পৃষ্ঠা ৭৫)।

৮৫ The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 198.

৮৬. তিন খণ্ডে অনূদিত এই সুবিশাল গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ড লন্ডনে প্রকাশিত হয় ১৭৬৮ সালে এবং ৩য় ও শেষ খণ্ড ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই প্রস্তাবনা ফ্রান্সিস-এর পরিকল্পনার বেশ কয়েক বছর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল।

১. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এমন ধরনের আইন পাশ করা দরকার যাতে করে কোম্পানি, বর্তমান রাজস্ব-হার বজায় রেখে স্থায়ীভাবে বাৎসরিক নগদ সেলামি আদায়ের ভিত্তিতে বাংলা ও বিহারের সমুদয় ভূমিখণ্ড ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিতে সক্ষম হয়;

২. ভূমি বিক্রয়জনিত বাজার মূল্য হ্রাস নিরোধে সরকার এককালীন সমুদয় ভূমিখণ্ড হস্তান্তর না করে ফি-বছর এক-চতুর্থাংশ বিক্রি করবে এবং এভাবে ৪-বছরের মধ্যে বিক্রি-কার্য সম্পন্ন করে ১ কোটি পাউন্ড হাসিল করবে;

৩ উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে লব্ধ আয় ছাড়াও কোম্পানিকে বার্ষিক অতিরিক্ত ৪০ লক্ষ পাউন্ড ভূমিরাজস্ব আয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতেও না কুলোলে, 'if this amount should 'appear too small for perpetuity, many ways and means of increasing the taxes, without raising the rents, will present themselves'. অর্থাৎ সোজা কথায় আবওয়াব ধার্য করে সরকার আয় বৃদ্ধি করবে;

৪. ভূমিতে একচেটিয়া মালিকানার কুফল রোধ করতে কোম্পানিকে ভূমি হাসিলের সর্বোচ্চ-সীমা (Ceilling) বেঁধে দিতে হবে, এবং মোটামুটি একজন ভূস্বামীর অধীনে বা দখলে বার্ষিক ৫০,০০০ টাকার আয়-ক্ষম ভূখণ্ডের অধিক রাখা যাবে না।

ডাউ-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 'তাঁর প্রস্তাবিত সংস্কার (যদি গ্রহণ করা হয়) শুধু অর্থনৈতিক উন্নতিরই সহায়ক হবে না, দেশবাসীকে ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত করার পথেও তা রাখবে শ্রেষ্ঠ অবদান, কেননা ব্রিটিশদের কৃপায় যারা সম্পত্তির মালিক হবে তারা সম্পত্তির কারণেই ব্রিটিশের প্রতি থাকবে সদা অনুগত।"[৮৭]

যা হোক, যদিও সত্যি কথা বলতে বাংলার তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে প্রায়োগিক দিক থেকে আলেকজান্ডার ডাউ-এর পরিকল্পনায় বেশ কিছু অসঙ্গতি ও অবাস্তবতা লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, 'Yet Dow's treatise is historically important because it contains the earliest exposition of the idea of a permanent settlement of lands with the zamindars."[৮৮] উপরন্তু তিনিই ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে জমি বরাদ্দের ঊর্ধ-সীমা বেঁধে দেয়ার বিষয়ে সর্বপ্রথম নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

হেনরি পত্তুলো (Henry Pattullo)

জাতে হেনরি পত্তুলোও (এর নামের উচ্চারণ কেউ কেউ পেটুলো -- ড. সিরাজুল ইসলাম, কেউ পাটুলো -- ড. অতুল সুর, প্রভৃতি করেছেন), ছিলেন একজন স্কটিশ, তবে উত্তরকালে তিনি ফ্রান্সের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার ভূমিরাজস্ব সম্বন্ধীয় তার ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বস্তুত তৎপ্রণীত 'An Essay upon the Cultivation of the

---

৮৭. দেখুন, বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৮৬।

৮৮. The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 201-202.

Lands, and Improvements of the Revenues of Bengal' গ্রন্থে। এটি লন্ডনে প্রকাশিত হয় ১৭৭২ সালে। স্মর্তব্য ডাউ-এর অনূদিত 'হিন্দুস্তানের ইতিহাস'-এর তৃতীয় খণ্ডও একই বছরে লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল।

নীতিগতভাবে পত্তুলো ছিলেন ফরাসি আদর্শে ধনতান্ত্রিক কৃষি-অর্থনীতি বিকাশের পক্ষে, যে কারণে ফরাসি 'ফিজিওক্র্যাট মুভমেন্ট'[৮৯]-এর তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া সমর্থক।[৯০] তার প্রস্তাবনার মূল কথা ছিল, বাংলায় কৃষির উন্নতি ঘটাতে হলে ভূমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা মালিকানা সৃষ্টি করতে হবে, এবং 'সবাইকে মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সে সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করার অধিকার' দিতে হবে। বলাবাহুল্য, 'সম্পত্তি অর্জনে ও ভোগে যদি বাধা সৃষ্টি করা হয়, তবে কৃষকসমাজ কৃষিকর্মে অনুপ্রেরণা পায় না এবং প্রয়োজনের অধিক উৎপাদন করতে চায় না। উদ্বৃত্ত উৎপাদন বাজারজাত না করলে কৃষিতে ধনতন্ত্র বিকাশেরও কোনো সম্ভাবনা থাকে না।' অথচ এ পর্যন্ত বাংলায় কোম্পানির নীতি-নির্ধারকমণ্ডলী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে যা করে আসছে তা পত্তুলো-র প্রস্তাবিত ধনতন্ত্র বিকাশের নিতান্ত প্রতিকূল। কেননা এখানকার 'কৃষকরা করভারে কুঁজো, শ্রমের সুফল লাভ থেকে তারা বঞ্চিত', ফলত এই অবস্থায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার অভাবে সম্পদ বৃদ্ধি তাই অসম্ভব। কাজেই পত্তুলো মনে করেন, বাংলায় 'ভূমিতে সম্পত্তি সৃষ্টি করা হলে এবং সে সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করলে ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ সুগম হবে এবং বাংলার কৃষি-অর্থনীতিতে ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ করবে।'[৯১] তবে পত্তুলো ভূমি ও কৃষি সম্বন্ধে যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি করেছিলেন, তার নিহিত আবেদন যেহেতু সর্বকালে এবং সর্বযুগেই অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী, স্বভাবতই এখানে সেটি না উদ্ধৃত করে পারছি না। তার মতে, 'সমস্ত সম্মান, পদবি ও রাজস্বের মূল উৎস ভূমি ও কৃষি। ভূমির উৎপন্ন-দ্রব্যকেই বলা যায় আসল ঐশ্বর্য। ভূমিনিঃসৃত ধন ছাড়া বাকি ধন একেবারেই মূল্যহীন। ব্যাঙ্ক বন্ধই থাকুক বা খোলাই থাকুক, এর রক্ষিত ধাতব ধনরাজি মানুষকে না পারে খাওয়াতে, না পারে পরাতে। বিরলতম হীরা-মুক্তা-জহরত আসলে বোকামীর বুদ্‌বুদ্‌ বৈ আর কি? মাটির উৎপন্ন দ্রব্যের অবর্তমানে উচ্চ-নীচ সব সমান হয়ে যাবে এবং শীঘ্রই বিশ্ব উপনীত হবে এর অন্তিম সন্ধ্যায়।'[৯২]

---

৮৯. মধ্য-১৭০০ শতকে প্রধানত ফ্রাঁসোয়া কুইসনে (Francois Quesnay)-এর নেতৃত্বে ফরাসি অর্থনীতিবিদদের এক আন্দোলন। 'ফিজিওক্র্যাট'রা বিশ্বাস করতেন যে, জমিই হচ্ছে ধনাগমের একমাত্র উৎস (single source of wealth)। অধিকন্তু, 'They thought that only in agriculture could the value of products exceed the value of the materials used for their productions.' (The World Book Encyclopedia, Vol. 15, pp. 480). তাঁদের ধারণায়, শিল্প-বাণিজ্য পেশা হিশেবে প্রয়োজনীয় হলেও তা কৃষির ন্যায় যথেষ্ট ধন-বৃদ্ধির সহায়ক নয়। এঁরা বিভিন্ন রকমের কর বা ট্যারিফের বদলে শুধু ভূমির ওপর কর ধার্যের পক্ষপাতী ছিলেন।

যা হোক এই আন্দোলন প্রথম দিকে চাঙ্গা থাকলেও পরবর্তীকালে (মোটামুটি ১৭৭৬ নাগাদ) স্তিমিত হয়ে এসেছিল।

৯০. A Rule of Property for Bengal, Dr. Ranjit Guha, pp. 44-45.

৯১. সংগৃহীত, বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ৮৭।

৯২. মূল, An Essay upon the Cultivation of the Lands, and the

ফিলিপ ফ্রান্সিস[৯৩] (Philip Francis)

এঁর সম্বন্ধে আগেই অনেক কথা বলা হয়েছে । এখানে শুধু এটুকু বলা যায় যে তিনি তার ১৭৭৬ (২২শে জানুয়ারি) সালের পরিকল্পনায় যে সব প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন তার অনেকগুলিই কর্নওয়ালিস-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পদ্ধতিতে গৃহীত না হলেও দু'টি প্রস্তাব হুবহু গ্রহণ করা হয়েছিল। সত্যি বলতে এই দু'টি প্রস্তাব ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়। ফ্রান্সিস-এর প্রস্তাব এবং ইংল্যান্ডব্যাপী তার সেই প্রস্তাবের পক্ষে সৃষ্টি হওয়া গণ-তাগিদের কারণেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় প্রথমত কোম্পানির বার্ষিক প্রাপ্য ভূমিরাজস্ব চিরস্থায়ীভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছিল, এবং দ্বিতীয়ত 'জমা' বন্দোবস্ত চুক্তি জমিদারদের সঙ্গে সম্পাদন করে[৯৪] প্রথমবারের মতো জমিদার-তালুকদার প্রভৃতিকে ভূমি-মালিক বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল, যা ছিল এই পর্বের বাংলা-ভারতের ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্যণীয় দিক।

তবে এছাড়াও আরও যারা কোম্পানিকে চিরস্থায়ী প্রকৃতির ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত অনুসরণে বিভিন্ন সময়ে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম -- স্যামুয়েল মিডলটন, ভ্যান্সিটার্ট, রিচার্ড বেচার, ডেভিড অ্যান্ডারসন, রিচার্ড গুডল্যান্ড (Richard Goodland), পি. এম. ড্যাক্রিস (চীফ অফ ক্যালকাটা), বাউটন রাউস, চার্লস স্টুয়ার্ট, জি. জি. ডুকারেল, উইলিয়াম হাওয়ার্ড (William Howard), টমাস ল (Thomas Law) প্রমুখ।[৯৫] শেষোক্ত জন (টমাস ল)-কে তো কর্নওয়ালিস বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিষ্ঠাতা (Founder) বলেই উল্লেখ করেছেন।[৯৬] যদিও এই মূল্যায়ন অতিরঞ্জন বৈ নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ল যখন বিহারের কালেক্টর ছিলেন (১৭৮৬-৮৭) তখন সেখানকার কয়েকটি পরগণায় জমিদারদের সঙ্গে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে 'মোকারারি'[৯৭] ব্যবস্থাপনায় ভূমিরাজস্বের বিলিবন্টন করেছিলেন। 'From his investigations into the land system of Bihar he found that the zamindars were proprietors of the soil ; if , however , they had not been proprietors, he would have

Improvements of the Revenues of Bengal, pp 24, অনুবাদ সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭।

৯৩. ড. অতুল সুর এঁকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 'সবচেয়ে বড় প্রস্তাবক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন, আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৭৭।

৯৪. চার্লস স্টুয়ার্ট-এরও প্রস্তাব ছিল, 'জমি বন্দোবস্ত করা উচিত শুধু জমিদারের সঙ্গে। .... জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হওয়া উচিত চিরস্থায়ী ভিত্তিতে।' (দেখুন, বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ৯২)।

৯৫. কোম্পানির স্বভূমি তথা ইংল্যান্ডে এই নিয়ে যাঁরা মতামত, বক্তৃতা ও লেখালেখি চালিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে খোদ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীগণ ও যশস্বী লেখক-মনীষীকুল ছিলেন। যেমন পিট, ফক্স, ডুন্ডা, হেস্টিংস, বার্ক প্রমুখ।

৯৬. The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 228; বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৩১।

৯৭. 'মোকারারি' শব্দের অর্থ স্থায়ী। এই জাতীয় স্বত্বের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৭।

considered it 'advisable to establish landholders'.[৯৮]

১৭৮৯ সালে দশসালা বন্দোবস্ত পদ্ধতি গ্রহণের অব্যবহিত ২/৩ বছর পূর্বে ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন টমাস ল-এর এই পদক্ষেপ যে কর্নওয়ালিসকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। এর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পরবর্তীকালে (১৭৯১) কর্নওয়ালিস তাকে 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর সদস্য করেছিলেন। তবে শুধু টমাস ল-ই নয়, বরং পুনরুক্তি হলেও এ কথা বলা উচিত যে, পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে কমবেশি ভূমিকা বা অবদান রেখেছিলেন। বস্তুত 'এদের সবাই ছিলেন রাজস্ববিশারদ এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী'।[৯৯]

অবশ্য বর্ণিত তালিকায় কোম্পানির কর্মচারিদের মধ্যে, যাদের এতদবিষয়ক পক্ষ-বিপক্ষীয় মতামত, যৌক্তিক বাদানুবাদ বা তর্ক-বিতর্ক প্রায় প্রকাশ্য রূপ নিয়েছিল এবং যা নীতি-নির্ধারক মহলে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল তারা হলেন -- স্যার জন শোর ও জেম্‌স গ্রান্ট এবং অবশ্যই লর্ড কর্নওয়ালিস স্বয়ং। ড রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'These regulations were, however, preceded by much discussion and controversy in which the principal parts were taken by James Grant, Sir John Shore and Lord Cornwallis."[১০০] বলাবাহুল্য, 'The controversy between Grant and Shore had the effect of clearing the path considerably for the final scheme of a Settlement.'[১০১] অধিকন্তু বলা যায়, এদের এই বিতর্ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সমকালীন বাংলা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করে।

কোম্পানির প্রধান সেরেস্তাদার গ্রান্ট, 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর প্রেসিডেন্ট শোর এবং গভর্নর-জেনারেল কর্নওয়ালিস-এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি নিয়ে জোর মত-পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল।[১০২] আরও নির্দিষ্ট করে বললে গ্রান্ট ও শোর-এর মধ্যে প্রথম দু'টি[১০৩] এবং কর্নওয়ালিস ও শোর-এর মধ্যে শেষের প্রশ্ন দু'টি নিয়েই মূলত বিরোধ বেঁধেছিল।

এক. ভূমির স্বত্ব ও মালিকানা (Proprietory right) নিরূপণ;

দুই. ধার্যযোগ্য 'জমা'র পরিমাণ ও এর ভিত্তি-বছর নির্দিষ্টকরণ (Assessment to be fixed and Base-year),

তিন. 'জমা' বন্দোবস্তের মেয়াদ -- চিরস্থায়ী, না দীর্ঘমেয়াদি,

চার. 'জমা' উসুলের মাধ্যম হিশেবে জমিদারদের উপযুক্ততা (Suitability of zamindars as the medium or agency of collection)।

---

৯৮. The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 228.

৯৯ বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ৮৯। ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও স্বীকার করেন, 'These officials (তিনি অবশ্য এখানে 'অফিসিয়াল' বলতে পি. এম. ড্যাক্রিস, মিডলটন, ড্যাম্পিটার্ট ও ডুকারেল-কে বুঝিয়েছেন) were, therefore, the first advocates of Permanent Settlement.' (Indian Land-System, pp. 228).

১০০. The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp 204

১০১ Ibid, pp. 204.

১০২. বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৩৩।

১০৩ The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 218.

জেমস গ্রান্ট (James Grant)	জন শোর (John Shore)
গ্রান্ট-এর এতদবিষয়ক বিস্তৃত বিবৃতি ও মতামত বস্তুত তার তিনটি রচনায় নিহিত। তিনটিই অত্যন্ত মূল্যবান ও বহু গুরুত্বপূর্ণ ও একক তথ্যের আকর বললে অত্যুক্তি হয় না। যথা: (১) Political Survey of the Northern Circars, (২) Analysis of the Finances of Bengal ও (৩) The Historical and Comparative View of the Revenues of Bengal. প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০শে ডিসেম্বর, ১৭৮৪, পরেরটি ২৭শে এপ্রিল, ১৭৮৬ এবং শেষেরটি ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৮ সালে। মূলত তার বিভিন্ন যুক্তি খণ্ডন ও তথ্যের ভ্রান্ততা প্রদর্শনেই শোর কলম ধরেছিলেন।	শোর-এর বক্তব্য ও গ্রান্ট-এর দেয়া বিভিন্ন তথ্য-পরিসংখ্যানের পাল্টা বিবরণ পাওয়া যায় মূলত তার সুবিখ্যাত 'Minute of 18th June, 1789'-তে। সমকালীন ও আধুনিক অনেক ঐতিহাসিক একে 'monumental work' বলতেও কুণ্ঠিত হননি। অবশ্য এটি প্রকাশের আগে শোর আরও দু-একটি লেখায়-ভাষণে তার এ সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরেছিলেন। এর মধ্যে -- 'Remarks on the Mode of Administering Justice to the Natives in Bengal and on the Collection of the Revenue' (জানুয়ারি, ১৭৮২) ও 'Minutes of 2nd April, 1788, and 18th September, 1789' উল্লেখযোগ্য।
এক. বাংলায় ভূমির স্বত্ব-মালিকানা প্রশ্নে গ্রান্ট-এর স্পষ্ট অবস্থান ছিল জমিদারদের বিপক্ষে। তার মতে, যুগ যুগ ধরে বিশেষত মোগল ও নবাবি শাসনপর্বে বাংলায় ভূমি ছিল সম্রাট তথা রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। রাষ্ট্রের পক্ষে 'কমিশন' নিয়ে জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের মাধ্যম হিশেবে কাজ করতো মাত্র। কাজেই তিনি মনে করেন, নতুন বন্দোবস্তের নামে জমিদারদের মালিক ঘোষণা করা এ দেশীয় ঐতিহ্য-বিরোধী ও অসঙ্গত। তবে, রাষ্ট্র যেহেতু সমুদয় ভূমিখণ্ডের মালিক, ফলে রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এদের যে কোন পক্ষের সঙ্গে 'জমা' বন্দোবস্ত করতে পারে।[১০৪]	এক. শোর মনে করতেন, জমিদাররাই হলো আসলে বাংলার সমস্ত ভূমির মালিক। তারা উত্তরাধিকার সূত্রেই শুধু ভূমি ভোগ-দখল করে না, উপরন্তু 'জমি দান, বিক্রি ও বন্ধক রাখার তাঁরাই অধিকারী'। সুতরাং ভূমিতে যদি স্বত্বাধিকার (proprietory rights) দিতেই হয় তবে তা দিতে হবে জমিদারদের। অন্যদিকে রায়তদের, তিনি মনে করতেন, ছিল নিতান্তই অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট একধরনের অধিকার (their rights appear very uncertain and indefinite)। বছরের পর বছর তারা ভূমির সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে বটে, তবে এতে করে ভূমির ওপর তাদের

১০৪. আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর, পৃষ্ঠা ৩০২।

দখলিস্বত্ব (occupancy rights) ছাড়া অন্য কোনরকম বিশেষত মালিকানা-স্বত্ব (proprietory right) জন্মাতো না। ফলত তাদের না ছিল ভূমি বিক্রির অধিকার, না তা বন্ধক রাখার।

উভয়ের এই তথ্য-পরিসংখ্যানভিত্তিক বাদানুবাদে কর্নওয়ালিস ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু জানতে পারলেও তিনি সমর্থন করলেন শোর-কে। বস্তুত মনে-প্রাণে 'হুইগ' রাষ্ট্রাদর্শে বিশ্বাসী কর্নওয়ালিস ব্রিটিশ শাসনের অনুগত একটি নিজস্ব এদেশীয় শক্তিশালী সমর্থকগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত জমিদারদেরকেই ভূমির মালিক করতে মনস্থ করেছিলেন। কেননা তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন, বাংলার নানা জাতপাতে, ধর্মে-বর্ণে বিভক্ত তথা শ্রেণীভিত্তিক সমাজে এ ধরনের একটি অনুগত বাহিনী সৃষ্টি করা হলে একদিকে তারা যেমন শ্রেণীস্বার্থেই আগাগোড়া ইংরেজদের বশংবদ ও গোলাম হয়ে থাকবে, তেমনি অন্যদিকে ভবিষ্যতে স্থানীয়দের বিশেষত রায়তদের তরফ থেকে কোনরূপ বিদ্রোহ-উপপ্লব দেখা দিলে জমিদারদেরকে কাজে লাগিয়েই তা সহজে দমন করা যাবে। এভাবে এদেশে ইংরেজ শাসন হবে সুসংহত ও সুরক্ষিত এবং দীর্ঘস্থায়ী। অর্থাৎ এককথায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাই ছিল সুচতুর কর্নওয়ালিস-এর জন শোর-এর অন্যায্য বক্তব্য সমর্থন করার মৌল উদ্দেশ্য।

দুই. নতুন বন্দোবস্তে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ও ভিত্তি-বছর হিশেবে গণ্য করার জন্যে গ্রান্ট প্রস্তাব করেন, কোম্পানির দিওয়ানি লাভের বছর -- ১৭৬৫ সালকে ভিত্তি-বছর ধরে দিওয়ানি অঞ্চল বা ভূমিখণ্ড (Diwani Lands) যে পরিমাণ রাজস্বে বিলিবণ্টন করা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে 'জমা' বন্দোবস্ত দিতে। বিষয়টিকে তিনি আরও স্পষ্ট করলেন এভাবে যে, দিওয়ানি লাভ পর্যন্ত মূলত বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় নবাব মিরকাশিমের (১৭৬০-৬৩) সময়কার 'জমা-বন্দোবস্ত' প্রচলিত ছিল।[১০৫] মিরকাশিম তদীয় রাজত্বকালে বিভিন্নভাবে

দুই. জন শোর এ ব্যাপারেও গ্রান্ট-এর বিরোধিতা করলেন। তিনি যুক্তিপূর্ণ অভিমত দিলেন এই যে, মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিরূপিত ভূমিরাজস্ব (Demand or Assessment) ও আদায়কৃত রাজস্ব (Actual collection or realisation)-এর মধ্যে বরাবরই একটা পার্থক্য থেকে যেতো। রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষে সর্বতোভাবে চেষ্টা সত্ত্বেও বাৎসরিক ধার্য রাজস্ব কোন অবস্থায়ই সংশ্লিষ্ট বছরে পুরোপুরি উসুল করা সম্ভব হতো না। নানাবিধ কারণে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন অনাবৃষ্টি বা খরা, অতিবৃষ্টি ও প্লাবন,

১০৫. নবাব মিরকাশিমের রাজত্বকালের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের বিস্তৃত বিবরণী জানার জন্য দেখুন, মৎপ্রণীত 'বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ১ম খণ্ড' এবং 'Mir Qasim: Nawab of Bengal (1760-1763), Dr. Nandalal Chatterji'.

মোগলামলীয় 'জমা' সর্বাধিক বৃদ্ধি করেছিলেন। সুতরাং তাঁর 'জমা'র পরিমাণ কোম্পানি গ্রহণ করলে এতে তাদের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে জেলাগুলির জন্য গ্রান্ট-এর স্বতন্ত্র প্রস্তাব ছিল।

তার ধারণা, এ যাবৎ কোম্পানির কর্মচারিদের ব্যক্তিগত লোভ ও অবৈধ ব্যবসায়িক স্বার্থের কারণে এই সমস্ত এলাকায় ইতোপূর্বে যে বিভিন্ন রকমের ইজারা বা বন্দোবস্ত (একসনা, পাঁচসনা প্রভৃতি) পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল তাতে খাজনা ধার্য হয় খুবই কম (under-rated); ফলে এ এলাকাগুলির ক্ষেত্রে তিনি সরেজমিনে নতুনভাবে ভূমিরাজস্বের বিস্তৃত হস্তবুদ তৈরি করে তবেই বন্দোবস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

প্রসঙ্গত গ্রান্টবর্ণিত বাংলার ভূমিরূপ সম্পর্কেও কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরা হলো। তার মতে, বাংলার এই সময়কার আয়তন বা মোট ভূমির পরিমাণ ছিল ৯০,০০০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ পাহাড়-পর্বত-টিলা ও পতিত জমি, এক-পঞ্চমাংশ শহর-বন্দর, নদী-খাল, রাস্তাঘাট, বনজঙ্গল প্রভৃতি, দুই-পঞ্চমাংশ গোচর-ভূমি এবং অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ তথা মাত্র ১৮,০০০ বর্গমাইল ছিল আবাদি জমি[১০৬], অর্থাৎ মূলত এ থেকেই ভূমিরাজস্ব সংগৃহীত হতো।

মহামারি প্রভৃতি) জমিতে ফসলোৎপাদন কম হতো বা কখনও কখনও পুরোটাই নষ্ট হতো। এতে করে বাস্তবক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ফি-বছরই রায়তের দেয় রাজস্ব কমবেশি রেয়াত দিতে হতো। বস্তুত এটাই ছিল এই অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার চিরাচরিত ও স্বাভাবিক প্রবণতা। শোর আরও প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, মিরকাশিম তৎপূর্বে প্রচলিত 'জমা'র বাইরেও 'কৈফিয়ত' ও 'তৌফির' নামে অতিরিক্ত ৭৪ লক্ষেরও বেশি টাকা ধার্য করেছিলেন। এ থেকে নিশ্চিতভাবেই অনুমিত হয় যে, মিরকাশিমের 'জমা' বন্দোবস্তের হিসাব ছিল অনেকটা 'paper assessment and not realisable' এবং কার্যত 'a mere pillage and rack-rent'.

ফলে '১৭৬৫-র জমার ভিত্তিতে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হলে জমিদার ও রায়তের উপর অস্বাভাবিক আর্থিক চাপ সৃষ্টি হবে'[১০৭]-বলে তিনি মনে করেন এবং প্রস্তাব করেন, ১৭৮৭ সালের আদায়কৃত ভূমিরাজস্বের ভিত্তিতেই জমিদারদের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা যুক্তিসঙ্গত। কেননা ততোদিনে এ বিষয়ে কোম্পানির নীতি-নির্ধারকগণ যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং 'কমিটি অফ সার্কিট'কর্তৃক সরেজমিনে গিয়ে যে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তাতে প্রকৃত আদায়যোগ্য রাজস্ব সম্বন্ধে বেশ গ্রহণযোগ্য ধারণাই পাওয়া গিয়েছিল।

---

১০৬. বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৩৪।

১০৭. Indian Land-System, pp. 216; The Agrarian System of Bengal, Vol. pp. 220.

যা হোক এদের দু'জনের মতামত সম্বন্ধে অল্পকথায় এটুকুই শুধু বলা যায় যে, 'Shore's refutation of Grant's arguments is not quite satisfactory in all cases, but his discussion is marked by ripe experience and balanced ideas.'[১০৮]

লক্ষ্যণীয় যে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় ভূমিরাজস্ব ধার্যের পরিমাণ ও এর ভিত্তি-বছর নির্দিষ্টকরণের এই বিষয়টিতেও কর্নওয়ালিস শোর-এর মতই সমর্থন করেছিলেন। আসলে অন্ত্য-মধ্যকালীন বাংলা সম্বন্ধে জন শোর-এর বিস্তৃত জ্ঞান ও ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (গ্রান্ট-এর এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তেমন ছিল না, তবে তার কাগজপত্রের জ্ঞান ছিল গভীর ও অপরিসীম) যে ব্যাপক ছিল এবং কর্নওয়ালিস এ জন্য তাকে অত্যন্ত সম্মান দেখাতেন ও সমীহ করতেন[১০৯], তাই-ই তাকে (কর্নওয়ালিস) তার (শোর) অভিমত গ্রহণে সাতিশয় অনুপ্রাণিত করেছিল।
ফলত কর্নওয়ালিস ১৭৮৮-৮৯ ও ১৭৮৯-৯০ -- এই দুই আর্থিক বছরের ভূমিরাজস্বের ভিত্তিতে স্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্বের পরিমাণ নিরূপণ করেছিলেন।[১১০]

জন শোর

স্থায়ী, না কয়েক বছর মেয়াদি -- অর্থাৎ বন্দোবস্তের প্রকৃতি নিয়ে জন শোর ও কর্নওয়ালিস-এর মধ্যে যে মতদ্বৈধতা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে শোর ছিলেন স্থায়ী বন্দোবস্ত-বিরোধী। তিনি চেয়েছিলেন কয়েক বছর মেয়াদে (for a turn of years) কোম্পানি জমিদারদের সঙ্গে রাজস্ব-বন্দোবস্ত চুক্তি সম্পাদন করুক; এটা ১০-বছর মেয়াদিও হতে পারে[১১১] তবে কোন অবস্থায়ই চিরস্থায়ীভাবে নয়।

কর্নওয়ালিস

কিন্তু কর্নওয়ালিস শোর-এর মত আদৌ সমর্থন করতে পারেননি। এ বিষয়ে অবশ্য তারও কিছু ন্যায়সঙ্গত যুক্তি ছিল। এর মধ্যে প্রথম ও প্রধান (এটিই ছিল সবচেয়ে জোরালো ও মোক্ষম) যুক্তি ছিল 'Pitt's India Act, 1984'-এর ৩৯ ধারার প্রেক্ষিতে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বদলে স্থায়ী প্রকৃতির রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্পাদন বিষয়ে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'দের সুস্পষ্ট

---

১০৮. The Agrarian System of Bengal, Vol. I, pp. 226.

১০৯ জন শোর সম্বন্ধে কর্নওয়ালিস-এর ব্যক্তিগত মূল্যায়ন ছিল অত্যন্ত উঁচু। সকৃতজ্ঞ চিত্তে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'The abilities of Mr. Shore and his knowledge in every branch of the business of the country, and the very high character which he holds render his assistance to me invaluable.' (সংগৃহীত, আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর, পৃষ্ঠা ৩০১-২)।

১১০ বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৩৪; আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর, পৃষ্ঠা ৩০০।

১১১ বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ৯৫।

স্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে তার আপত্তির কারণগুলি যে একেবারে অমূলক ছিল তা নয়, বরঞ্চ তা ছিল যথেষ্ট যুক্তিনির্ভর ও প্রণিধানযোগ্য। "তাঁর আপত্তির পেছনে প্রধান যুক্তিগুলি হল: (ক) স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে ভবিষ্যতে লোকসংখ্যা ও চাষ বাড়লেও সরকার জমির আয় থেকে বঞ্চিত হবে। (খ) ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোম্পানির কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থাকবে।[১১৩] (গ) রায়তদের অধিকার, জমিদারির সীমানা, নিষ্কর সম্পত্তি, গোচারণ ভূমি ও পতিত জমির হিসাব অসম্পূর্ণ। এমতাবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলে ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থায় নানারকম জটিলতা দেখা দেবে।"[১১৪]

লিখিত নির্দেশ।[১১২] এ ব্যাপারে কর্নওয়ালিস-এর যুক্তি হল (তার ভাষায়, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯):

'a. A Permanent settlement, alone, in my judgment, can make the country flourish, and secure happiness to the body of the inhabitants.
b Where the landlord has a permanent property in the soil, it will be worth his while to encourage his tenants, who hold his farm in lease, to improve that property: at any rate he will make such an agreement with them as will prevent their destroying it.
c. I may safely assert that one-third of the Country's territory in Hindostan is now a jungle, inhabited only by wild-beasts; without a permanent settlement, the zemindars will not be incited to clear away

১১২. ১২ই এপ্রিল, ১৭৮৬ তারিখের 'কোর্ট'-এর বিস্তৃত পত্রে (Paragraph 52) এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে, 'It is therefore our intention that the jumma now to be formed shall, as soon as it can have received our approval and ratification, be considered as the permanent and unalterable revenue of our territorial possessions in Bengal, so that no discretion may be exercised by our servants abroad in any case, and not even by us, unless in some urgent and peculiar case, of introducing any alteration whatsoever.'
(Quoted from, Zemindari Settlement of Bengal, R. H. Hollingbury, pp. 48).

১১৩. এ সম্পর্কে শোর-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল এই যে, 'সব ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়া উচিত অভিজ্ঞতা, তত্ত্ব নয়।' (দেখুন, বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ৯৬)।

১১৪. বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৩৪।

that jungle and bring it into cultivation, and effect other substantial improvements.

d. With a permanent settlement, the zemindars will do all such acts as are calculated to promote the improvement of the country, such as assisting ryots with money, refraining from exactions, foregoing small temporary advantages for future permanent profits, such as must ultimately redound to the benefit of the zemindars, and ought to be performed by them.

e. It is for the interest of the State that the landed property should fall into the hands of the most frugal and thrifty class of people, who will improve their lands and protect the ryots, and thereby promote the general prosperity of the country."[১১৫]

বস্তুত এই বক্তব্যের পরেই কর্নওয়ালিস যে চূড়ান্ত দায়িত্বহীন উক্তি করেছিলেন সেটি ছিল আরও মারাত্মক। তিনি বলেন, 'It is immaterial to Government what individual possesses the land, provided he cultivates it, protects the ryots, and pays the public revenue.'

তিনি জমিদারের অধিকার সর্বোচ্চ -- এ

১১৫. Quoted from, Zemindari Settlement of Bengal, pp. 50-51.

দাবি না করলেও রাষ্ট্রের অধিকারে বা দখলে ভূমি সংরক্ষণের বিরোধী ছিলেন।

উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয় যে প্রশ্নে মত-পার্থক্য দেখা দিয়েছিল তা রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের মাধ্যম হিশেবে জমিদারদের নিয়োগ ও তাদের উপযুক্ততা বিষয়ে। স্মর্তব্য, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায়ই শুধু নয় পরন্তু সর্বযুগেই আগাগোড়া বাংলায় ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের কাজে জমিদারদের ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে যে, 'Economical landlords are prudent trustees of public interests'; ফলত এই নিরিখে জমিদারদের মাধ্যমে খাজনা সগ্রহ ছিল অত্যন্ত সহজ ও কম ঝুঁকিপূর্ণ।

দুই. শোর ছিলেন এ ব্যাপারে অনেকখানি জমিদার-বিরোধী। তার স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত হয়েছিল ১৭৮৯-র জুন ভাষ্যে। তিনি লিখেছিলেন, 'জমিদারদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি পরিচালনায় যথার্থরূপে যোগ্য। সাধারণভাবে বলতে গেলে তাঁরা একাজের জন্যে যথার্থ শিক্ষা পাননি। জমিদারি পরিচালনায় সাধারণ কাজের বিভিন্ন দিক এবং পদ্ধতি সম্পর্কে এঁরা অজ্ঞ ও কাজে অমনোযোগী; এমনকি যখন তাঁদের নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনো তাঁরা জমিদারি পরিচালনার মানসিকতা বা সাহস দেখাতে পারেন না।'[১১৬]

শোর-এর মতে জমিদারদের আলস্য ও অজ্ঞতার একটি মারাত্মক কুফল হলো এরা এদের নায়েব-গোমস্তা প্রভৃতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অথচ এরাই আপন স্বার্থ রক্ষার তাগিদে সব সময়ই জমিদারদের কাছে অসত্য ও বানোয়াট তথ্য-পরিসংখ্যান সরবরাহ করে এবং

দুই. বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে কর্নওয়ালিস-এর বক্তব্য ছিল পুরোপুরি জমিদারদের পক্ষে, যা তার ইতোপূর্বে উদ্ধৃত ভাষ্য থেকে প্রমাণিত। এ সত্ত্বেও তার ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৭৯০ তারিখের সুদূরপ্রসারী চিন্তার প্রক্ষেপ এখানে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক মনে করি। তিনি বলেন, 'In case of a foreign invasion, it is a matter of the last importance, considering the means by which we keep possession of the country, that the proprietors of the lands should be attached to us from motives of self-interests. A landholder, who is secured in the quiet enjoyment of a profitable estate, can have no motive for wishing for a change.'[১১৭]

অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী হিশেবে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার ছোটবড় জমিদারশ্রেণী যদি একটি

---

১১৬. দেখুন, বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৩৫।

১১৭. Quoted from, Zemindari Settlement of Bengal, pp. 52.

রায়তদের ওপর বিস্তার করে দুর্ভেদ্য শোষণজাল। ফলে এ শোষণজাল ছিন্ন না করে, জমিদারদের পরিবেশিত তথ্য-পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার বিপদ সম্বন্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তা এড়াতে তিনি প্রস্তাব করেন, বলেন আরও সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ করতে। শোর দৃঢ় মত প্রকাশ করেন, প্রয়োজনে অভিজ্ঞতার আলোকে দশসালা বন্দোবস্তকে আরও বর্ধিত করা যেতে পারে, তথাপি অপর্যাপ্ত তথ্যপঞ্জির ওপর অন্ধ নির্ভর করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত হবে না। "[১১৮] চিরস্থায়ী ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের সুবিধা পায় তবে তারা নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থেই সরকার তথা ইংরেজদের প্রতি চির অনুগত থাকবে, এবং এর ফলে যে কোম্পানির শাসন আরও সুসংহত ও দীর্ঘস্থায়ী হবে সে কথা কর্নওয়ালিস ঠিকই বুঝেছিলেন।

যা হোক কোম্পানির উচ্চপদস্থ নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে চলমান এই বাদানুবাদ-বিতর্কের মধ্যেই গভর্নর-জেনারেল-ইন কাউন্সিল কর্নওয়ালিস তার মনস্থির করে ফেলেছিলেন।

ড. Lilian M. Penson-এর ভাষায়, 'It was at this point that Cornwallis left his wise caution, and threw aside the counsel both of Grant and Shore. Unlike them he held that there was now sufficient information to warrant a settlement not merely for ten years but for perpetuity. ... He decided therefore provisionally for perpetuity, referring the matter home for ultimate decision. At the end of 1790, in Bengal, the collectors were circularised with instructions to carry out the settlement. A proclamation of 10 February, 1790, announced the ten years' settlement with zamindars and other landholders; the settlement to be made perpetual if the home government should authorise it.'"[১১৯]

কর্নওয়ালিস-প্রেরিত দশসালা বন্দোবস্ত প্রস্তাবকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মর্মে স্বীকৃতি দেয় 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলী তাদের ২৯শে আগস্ট, ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের পত্রে[১২০], যদিও তা ব্রিটিশ সরকারের তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের চূড়ান্ত অনুমোদন পেতে কিছুটা সময় নেয়, এবং পরে

---

১১৮. বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ৯৬।

১১৯. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 448-49.

১২০. The Cambridge History of India, Vol. V., pp. 450; The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 292; বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৩৭। কিন্তু 'কোর্ট'-এর চূড়ান্ত অনুমতি দানের তারিখ রমেশ দত্ত ২৯শে সেপ্টেম্বর (The Economic History of India, pp 66) এবং ড. সিরাজুল ইসলাম ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯২ (বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ১০১) বলে উল্লেখ করেছেন।

পত্রটি ১৭৯৩ নাগাদ বাংলায় এসে পৌঁছুলে তদনুযায়ী বাংলা, বিহার ও ওড়িশা (রূপনারায়ণের কূল থেকে নিয়ে সুবর্ণরেখা নদীতীরের মধ্যবর্তী ভূভাগ)-র বহুল আলোচিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ঘোষিত হয়েছিল (২২শে মার্চ)।
এ পর্যায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন তথা ১৭৯৩ সালের ১নং প্রবিধান[121]-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধান (৩টি অনুচ্ছেদ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে) সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

অনুচ্ছেদ ৪ জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ[122] অধীন ভূমি যা তারা এ যাবৎ সরকারি রাজস্ব ধার্যের আওতামুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছে অথচ খাস হিশেবে দখল করছে বা ইজারা দিয়েছে (ইজারা মেয়াদ শেষ হলে বা ভূম্যধিকারী স্বেচ্ছায় তা প্রত্যার্পণে রাজি হলে সে সময়ান্তে), উক্ত ভূমির জন্য নতুন আইনে ধার্য রাজস্ব তারা যথারীতি দিতে স্বীকৃত থাকলে সংশ্লিষ্ট ভূমি ভবিষ্যতে কোনরূপ রাজস্ব-বৃদ্ধি ছাড়াই তারা ভোগদখল করতে পারবে এবং একই হারে তা তাদের বংশপরম্পরা বলবৎ থাকবে যদি তারা চায়।

অনুচ্ছেদ ৬ জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ এবং বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সাধারণ অধিবাসীদের কাছে এটা অত্যন্ত সুবিদিত যে পুরাকাল থেকে নিয়ে অধ্যাবধি এ অঞ্চলে ভূমিতে আগে কখনও 'জমা' স্থায়ীভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি, বরং এখানকার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-প্রথাই ছিল এই যে, শাসককুল সময়ে সময়ে ইচ্ছে মতো 'জমা' বৃদ্ধি করতেন। কিন্তু কোম্পানির সরকার বিশেষত 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'গণ এই 'জমা' স্থায়ীভাবে সুনির্দিষ্ট করলেন এই কারণে যেন সংশ্লিষ্টগণ এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা , যেমন ভূমি ইজারা দেয়া ও নিজস্ব

---

১২১. একই সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আইন ঘোষণার অনতিবিলম্বে (১লা মে থেকে শুরু) গভর্নর-জেনারেল-ইন কাউন্সিল কর্নওয়ালিস অনেকগুলি প্রবিধান জারি করেন (মোট ৪৭/৪৮টি)। এগুলিকে একসঙ্গে 'Cornwallis Code' বলা হয়ে থাকে। সত্যি বলতে এর মধ্যে কয়েকটি ছিল মূল আইন (১নং প্রবিধান)-এর অপেক্ষাকৃত সংশোধনী বা সহযোগীস্বরূপ। যেমন ২নং প্রবিধান বলে মুখ্যত কালেক্টর ও 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর বিচারিক ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হয়েছিল। প্রবিধান ৮ দ্বারা অধীন তালুকদার ও রায়তদের তথাকথিত নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করা হয়; প্রবিধান ১৪ দ্বারা জমিদার প্রভৃতির কাছ থেকে ধার্য ভূমিরাজস্ব নিশ্চিতভাবে আদায়ের জন্য তাদেরকে শারীরিকভাবে আটক ও তাদের ভূমি ক্রোকের ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছিল এবং প্রবিধান ১৭ বলে জমিদার, তালুকদার প্রভৃতিকে তাদের অধীন রায়তদের কাছ থেকে বকেয়া খাজনা আদায়ের প্রয়োজনে তাদের (প্রজাদের) ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি কব্জা ও বিক্রয়ের অধিকার সমর্পিত হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রসঙ্গান্তরে আরও আলোচনা করা হবে।

১২২. আইনের সর্বত্র যেখানেই জমিদার ও স্বাধীন তালুকদার অভিধা ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই 'অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ' (other actual proprietors of land) বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি যে 'অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ' বলতে আসলেই কাদেরকে বুঝানো হয়েছে। তবে এটা নিশ্চিত যে এ দ্বারা সাধারণ রায়তগণকে আদৌ বুঝানো হয়নি।

লোক নিয়োগ করে এ থেকে খাজনা উসুল করে ও এর চাষাবাদ তথা উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে পারে ('will exert themselves in the cultivation of their lands, under the certainty that they will enjoy exclusively the fruits of their own good management and industry, ...')। শুধু তাই নয়, সরকার আশা করে খাজনা আদায়ার্থ তারা যে ব্যক্তিদের নিযুক্ত করবে তারাও যেন বিশ্বস্ততা ও সহৃদয়তার সঙ্গে এই কাজটি করে সে সম্পর্কে তারা নিশ্চিত হবে।

এছাড়া একবার 'জমা' নির্দিষ্ট হওয়ার পর ভবিষ্যতে খরা, বন্যা বা অন্যকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে অর্থাৎ কোন অবস্থায়ই 'জমা' রেয়াত বা মওকুব করা হবে না। অধিকন্তু যথাসময়ে নিরূপিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্টদের ভূমির সেই পরিমাণ অংশ (যেটুকু -- সম্পূর্ণ, বা আংশিক -- বকেয়া উসুলের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে) অবশ্যই অন্যত্র বিক্রি করে 'জমা' আদায় করা হবে।

অনুচ্ছেদ ৭

এক. গভর্নর-জেনারেল-ইন কাউন্সিল ইচ্ছে করলে যখন-খুশি-তখন সকল শ্রেণীর প্রজার বিশেষত অধীন তালুকদার, রায়ত ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষা তথা নিরাপত্তা নিশ্চিত ও কল্যাণে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান প্রণয়ন করতে পারবেন, সে ব্যাপারে কোন জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন বা ধার্য রাজস্বের বিষয়েও কোন প্রশ্ন করতে পারবে না।

দুই. ২৮শে জুলাই, ১৭৯০ সালে গভর্নর-জেনারেল-ইন কাউন্সিল 'সায়ের' আদায়ের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন তা বহাল থাকবে এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ভূম্যধিকারীগণ (জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ) হারাহারিভাবে দেয় রেয়াত পাবে। তবে সরকার ভবিষ্যতে 'সায়ের' পুনরারোপ করতে চাইলে তখন আর তারা এই ধরনের সুবিধা দাবি করতে পারবে না।

তিন. আপাত অবিচ্ছিন্ন (লুক্কায়িত বা গুপ্ত বলাই সঙ্গত) 'জমা'বহির্ভূত ভূমি ভবিষ্যতে চিহ্নিত হলে বা পাওয়া গেলে যদি দেখা যায় তা অবৈধভাবে গোপন করা হয়েছে অর্থাৎ সরকারি হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে তবে গভর্নর-জেনারেল-ইন কাউন্সিল তাতে তদীয় ইচ্ছানুযায়ী ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব ধার্য করতে পারবেন।

চার. থানা ও পুলিশ চৌকি বা স্থাপনার ব্যয় নির্বাহের দায় থেকে জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

অনুচ্ছেদ ৮

জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিধিবিধানের আলোকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভোগদখলকৃত

জমিদারি বা এর অংশবিশেষ বিক্রয়, দান বা অন্য যে কোন প্রকারের হস্তান্তর তথা ভূমির স্বত্বাধিকার ত্যাগ করতে পারবে এবং এ জন্য তাদের সরকারের কোনরূপ পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে না।
মোটামুটি এই হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের মূল কথামালা।

এখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের উপরিউক্ত বিধানাবলি আলোচনা করলে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ ধরা পড়ে সংক্ষেপে সেগুলিকে আমরা নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করতে পারি:-

এক. বাংলা, বিহার ও ওড়িশার জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকদেরকে দশসালা বন্দোবস্তের 'জমা'র ভিত্তিতে উত্তরাধিকার-পরম্পরা চিরকাল জমিদারি ভোগ-দখল করার অধিকার প্রদান করা হয়। যে কারণে এই বন্দোবস্তকে কেউ কেউ যথার্থই 'জমিদারি বন্দোবস্ত' বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৩]

দুই. 'জমা' যেমন চিরস্থায়ীভাবে সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় করা হয়, তেমনি ভবিষ্যতে খরা, বন্যা বা অনুরূপ কোন প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে ফসল হানি বা একেবারে অজন্মা হলেও সেজন্য রাজস্ব সম্পূর্ণ মওকুব বা হারাহারিভাবে রেয়াত দেয়ার সুযোগ রহিত করা হয়।

তিন নির্ধারিত দিনে (সূর্যাস্তের পূর্বে) সরকারি কোষাগারে কোন জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিক দেয় 'জমা' জমা করতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের জমিদারির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ প্রকাশ্যে অন্যত্র বিক্রি করে তা উসুলের ব্যবস্থা রাখা হয়।

চার. জমিদারদের 'সায়ের' বা অভ্যন্তরীণ শুল্ক আদায়ের অধিকার প্রত্যাহৃত হয় এবং একই সঙ্গে তাদেরকে থানা ও পুলিশ চৌকি সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের ব্যয় নির্বাহের হাত থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়।

পাঁচ. জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকদেরকে তাদের ভোগ-দখলীয় জমিদারি সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকেই অন্যত্র বিক্রয়, দান বা অনুরূপ সকল ধরনের হস্তান্তরের অধিকার প্রদান করা হয়।

যা হোক এ পর্যায়ে আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এর ফলাফল আলোচনার চেষ্টা করবো।

---

১২৩. ১৭৯৩ সনের ১নং প্রবিধান বলে জমিদারি ব্যবস্থা যদিও মূলত বাংলা, বিহার ও ওড়িশার জন্য প্রণীত বা প্রবর্তিত হয় কিন্তু অচিরেই তা বাংলার বাইরে বারাণসী ও উত্তর সরকারেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ জমিদারি ব্যবস্থার পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চলে তালুকদারি (অযোধ্যা), রায়তওয়ারি (বোম্বাই ও মাদ্রাজ), মহলওয়ারি (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), মালগুজারি (মধ্যপ্রদেশ), গ্রামওয়ারি (দিল্লি ও পাঞ্জাব) নামের প্রভৃতি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। দেখুন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ, ড. কেশব চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪।

মোটামুটি দু'দিক থেকে এ আলোচনা করা যেতে পারে। এক. কোম্পানির দৃষ্টিকোণ থেকে এর কয়েকটি ভালো দিক, এবং দুই. দেশীয় তথা জমিদার ও রায়ত বিশেষত শেষোক্ত শ্রেণীর ওপর এর তীব্র প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় মন্দ দিকগুলো। Dr. Smith-এর সূত্রে Dr. Percival Spear বলেন, 'This Settlement has been variously praised and blamed; it is for us to assess its results on the life of the three provinces.'[১২৪]
বস্তুত প্রচলিত জেলাগুলির ওপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী ফল আলোচনা থেকে এর ভালো-মন্দ দিক সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। প্রসঙ্গত জানানো দরকার যে, ১৭৯৩ সালের ১নং প্রবিধানের আওতায় নিচের জেলাগুলি পড়েছিল[১২৫] :-

বাংলা

বর্ধমান	নদীয়া	ময়মনসিংহ
বাঁকুড়া	মুর্শিদাবাদ	ফরিদপুর
বীরভূম	দিনাজপুর	বাকেরগঞ্জ (বরিশাল)
হুগলি	মালদহ	চট্টগ্রাম
হাওড়া	রাজশাহি	নোয়াখালি
২৪-পরগণা	রংপুব	ত্রিপুরা (কুমিল্লা)
যশোহর	বগুড়া	ঢাকা
খুলনা	পাবনা	সিলেট (অংশবিশেষ)

বিহার

পাটনা	দ্বারভাঙ্গা (তিরহুত)	পূর্ণিয়া
গয়া	সারণ	ভাগলপুর
শাহাবাদ	চম্পারণ	মুঙ্গের
মুজাফ্ফরপুব (তিরহুত)		

ওড়িশা

মেদিনীপুর (কটক-এব সঙ্গে সংযুক্ত একটি পরগণা ছাড়া)

এ ছাড়া সাঁওতাল পরগণা ও ছোট নাগপুরভুক্ত কিছু জেলা[১২৬] যেমন মানভূম, সিংহভূম, লোহারদাগ, হাজারিবাগ-এর কিছু এলাকা ও তিস্তা-তীরবর্তী জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগ, আসামের গোয়ালপাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতাভুক্ত হয়েছিল।[১২৭]

১২৪. The Oxford History of Modern India, pp. 91 Also see, The Oxford History of India, Dr. V. A. Smith, pp. 535.
১২৫. The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 441.
১২৬. ছোট নাগপুরভুক্ত আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকা মূলত ১৭৬৯ সাল নাগাদ ব্রিটিশদের অধিকারে এসেছিল। দেখুন, Dr. J. C. Jha in 'Land Revenue in India: Historical Studies', Ed. Dr. Ram Sharan Sharma, pp. 71.
১২৭. The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 441-42. দার্জিলিং প্রভৃতি এর বাইরে ছিল। Land Revenue Administration in India, S. C. Roy, pp. 11.

এটা ঠিক যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল এ অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিরূপ ও ভূমির উৎপাদনের মাত্রা, 'জমা'র ধরন ও জমিদারির সীমানা চিহ্নিতকরণ, জমিদার ও রায়তদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সর্বশেষ অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাৎক্ষণিকভাবে কোনরূপ প্রাক-জরিপ না-করেই।[১২৮] বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়, 'No detailed investigation into the resources of the zamindari estates was made before fixing the decennial *jama* on them.'[১২৯] অথচ চিরস্থায়ী দাবি নির্ধারণের জন্য সবকিছু সঠিকভাবে জানাটা কোম্পানির পক্ষে খুবই জরুরি ছিল। কেননা এর পরে যতই ভূমি ও 'জমা' জরিপ করা হোক, আর সঠিকভাবে দাবি নিরূপণ করা হোক, আইনত কর্তৃপক্ষ তখন আর 'জমা' বৃদ্ধির অধিকারী ছিল না (যদিও পরবর্তীকালে বিভিন্ন অজুহাতে ও নামে তারা তা করেছে)। কিন্তু প্রাক-জরিপ না করার অনিবার্য ফল হয়েছিল এই যে, যে 'জমা' -- জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ (অতঃপর এই তিন-শ্রেণীকে একত্রে 'জমিদার' হিশেবে এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে)-এর ওপর ধার্য করা হয়েছিল তা ছিল যে কোন বিবেচনায় এ যাবৎকালে অত্যধিক।[১৩০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৭৯০-৯১ সনের (বাংলা ১১৯৭) 'জমা'র ভিত্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলা, বিহার ও ওড়িশা -- এই তিন 'সুবা'র জমিদারদের বার্ষিক দেয় নির্দিষ্ট হয়েছিল ২,৬৮,০০,৯৮৯ 'সিক্কা' টাকা[১৩১] (কোম্পানির 'আর্কট' মুদ্রায় ২,৮৫,৮৭,৭২২

১২৮. The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 287, 407; The Economic Life of A Bengal District: Birbhum (1770-1857), Dr. Ranjan Kumar Gupta, pp. 84; ড. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৯২। অবশ্য এ কথা পুরোপুরি যথার্থ নয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আগে কোম্পানির নীতিনির্ধারকদের সামনে কোন রাজস্ব খয়-খতিয়ান ছিল না। বরং সত্যি বলতে, 'The amount to be paid in the future was fixed by reference to what had been paid in the past.' (The Imperial Gazetteer of India, The Indian Empire, Historical, Vol. II., pp. 487).

১২৯. The Permanent Settlement in Bengal : A Study of Its Operation (1790-1819), pp. 22. ড. আজিজুর রহমান মল্লিকও বলেন, 'The Settlement of 1793 which made over the lands of Bengal and Bihar in perpetuity to 'new' zamindars was fraught with dangerous consequences as it was made without survey, without any record of landed rights and without, in fact, ascertaining the boundaries of estates too.' (British Policy and the Muslims in Bengal, 1757-1856, pp. 38).

১৩০. ড. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ যথার্থই বলেন, 'In the year 1793 the amount demanded could not be regarded as a moderate *jumma*. The country was rated fully as high as it could bear. Remote little known districts were not assessed as much as it could yield. But in the settled areas the demand was as high as it could be.' (The History of Bengal, pp. 100).

১৩১. The Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire: Historical, Vol. II., pp. 487; Trade and Finance in the Bengal Presidency (1793-1833), Dr. Amalesh Tripathi, pp. 19; Reply by the Various Landholders' Association of Bengal, pp. 40.

টাকা[১৩২] বা ৩১,০৮,৯১৫[১৩৩] বা ৩৪,০০,০০০ পাউন্ড[১৩৪])।[১৩৫] যেহেতু ১৭৯০-৯১ বা ১৭৯২-৯৩ খ্রিষ্টাব্দের দশসালা বন্দোবস্তের প্রকৃত 'জমা'র হিসাব কোন সময়ই সঠিকভাবে জানা যায়নি, সুতরাং বর্ণিত হিসাবটিকে আমরা প্রকৃত 'জমা'র কাছাকাছি ধরে নিতে পারি।[১৩৬]

এখানে এটাও জানিয়ে রাখা দরকার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই 'জমা' ছিল নবাব মুর্শিদকুলি খান ও নবাব শুজাউদ্দিন খানের সময়ের 'জমা' অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ এবং নবাব মিরজাফর আলি খানের আমলের (১৭৬৪-৬৫) 'উসুল'-এর চেয়ে তিন গুণ, এমন কি মুহম্মদ রেজা খানের 'নায়েব-ই নাজিমত্বে' কোম্পানির দিওয়ানি লাভের প্রথম বছরের (১৭৬৫-৬৬) আদায় অপেক্ষা দ্বিগুণ বেশী।[১৩৭] সুতরাং সহজেই অনুমেয়, 'The assessment was, therefore, as severe as it could possibly be made; and it was possible to raise it so high because it was declared to be final and permanent.'[১৩৮]

অন্যদিকে এককভাবে বাংলার ধার্য রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৯০,৪০,০০০ 'সিক্কা' টাকা।[১৩৯] এর মধ্যে আবার বাংলার ১২টি বৃহৎ জমিদারির ওপর 'জমা' ধার্য হয়েছিল (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)[১৪০] :-

---

১৩২. Resolution or Memorandum, Revenue Department, Calcutta, the 26th November, 1874, pp. 7; Reply by the Various Landholders' Association of Bengal, pp. 162.

১৩৩. Reply by the Various Landholders' Association of Bengal, pp. 40.

১৩৪. R. P. Dutta in 'India To-day', pp. 44, 48; উদ্ধৃতি সংগ্রহ, উনিশ শতকের মুসলিম মানস ও বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), অমর দত্ত, পৃষ্ঠা ১৩। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ২,৬৮,০০,৯৮৯ 'সিক্কা' রুপিকে পাউন্ডে ২৬,৮০,০০০ নির্ধারণ করেছেন। দেখুন, The Muslim Society and Politics in Bengal, A.D. 1757-1947, pp. 33.

১৩৫. অবশ্য H. S. Cunningham বলেন, 'The revenue in 1793 was about 3 millions, and as the zemindar's share was fixed at a tenth of the revenue, it cannot have been more than between PS 3,00,000 and PS 4,00,000.' (British India and Its Rulers, pp. 167)
তবে তার এই শেষোক্ত তথ্য যে ঠিক নয় তা পূর্বের আলোচনা থেকেই প্রমাণিত।

১৩৬ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর, কলকাতাস্থ রাজস্ব দপ্তরের 'কার্য-বিবরণী' বা স্মারকেও এ কথা বলা হয়েছে, 'No record can be found of the exact demand of 1792-93, but the above figures may be accepted as very approximately correct.' (pp. 7).

১৩৭. The Economic History of India, Romesh Dutt. pp. 66; The Muslim Society and Politics in Bengal, A.D. 1757-1947, pp. 33.

১৩৮. The Economic History of India, pp. 66.

১৩৯. The Permanent Settlement in Bengal: A Study of Its Operation, pp. 3. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ১,৯০,১৯,৬০০ টাকার কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন, The Muslim Society and Politics in Bengal, A.D. 1757-1947, pp. 33.

১৪০. The Permanent Settlement in Bengal, pp. 3.

বাংলার ১২টি বৃহৎ জমিদারির নাম	দশসালা 'জমা'	মোট 'জমা'র শতকরা হার
বর্ধমান[১৪১]	৩২,৬৬,০০০	১৭.১৫
রাজশাহি[১৪২]	২২,৫০,০০০	১১.৮১
দিনাজপুর[১৪৩]	১৪,৮৪,০০০	৭.৭৯
নদীয়া[১৪৪]	৮,৫৪,০০০	৪.৪৮
বীরভূম[১৪৫]	৬,৩০,০০০	৩.৩১
বিষ্ণুপুর[১৪৬]	৪,০০,০০০	২.১০
ইউসুফপুর (যশোহর)	৩,০৩,০০০	১.৫৯
রাজনগর (ঢাকা)	৩,০০,০০০	১.৫৭
লস্করপুর[১৪৭] (রাজশাহি)	১,৮৯,০০০	০.৯৯
ইদ্রাকপুর[১৪৮] (রংপুর)	১,৬০,০০০	০.৮৪
রৌশনাবাদ (কুমিল্লা)	১,৫৪,০০০	০.৮৪
জাহাঙ্গিরপুর (দিনাজপুর)	১,২৩,০০০	০.৬৪
সর্বমোট 'সিক্কা' টাকা	১,০১,১৩,০০০	৫৩.১১

১৪১. যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী'র 'বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড'-এ বর্ধমান জমিদারির ওপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে 'জমা'র পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে ৪২,০৮,৮৩০ 'সিক্কা' টাকা (পৃষ্ঠা ২৬৮। এ বিষয়ে আরও দেখুন, Land and Local Kingship in Eighteenth-Century Bengal, John R. Mclane; পশ্চিমবঙ্গ : বর্ধমান জেলা সংখ্যা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

১৪২. ড. এ বি এম মাহমুদের মতে, এটি ছিল ২২,৫২,০০০ টাকা। দেখুন, The Revenue Administration of Northern Bengal (1765-1793), pp. 215.

১৪৩. ড. রত্নালেখা রায়ের মতে, এটি ছিল ১৪,৮০,০০০ টাকা। দেখুন, Change in Bengal Agrarian Society (c. 1760-1850), pp. 182.

১৪৪. ১৭৯০-৯১ সাল নাগাদ ২৬১টি স্বতন্ত্র তালুকে বিভক্ত এবং ২০৫ জন বিভিন্ন শ্রেণীর ভূম্যধিকারী জমিদারকর্তৃক প্রদেয় জেলার মোট দাবি ১২,৫৫,৩২৫ 'সিক্কা' টাকার মধ্যে নদীয়া রাজের একক 'জমা'ই ছিল উক্ত পরিমাণ অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ। দেখুন, A Statistical Account of Bengal, Vol. II: Districts of Nadiya and Jessore, W. W. Hunter, pp. 115; নদীয়া-কাহিনী, কুমুদনাথ মল্লিক, পৃষ্ঠা ৩৭।

১৪৫ ২২শে এপ্রিল, ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' মূলে ৬,৫০,০০০ 'সিক্কা' টাকা রাজস্ব নির্দিষ্ট করলেও বাস্তবে বীরভূমের কালেক্টরের জুলাই, ১৭৯৩ সালের এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে 'জমা' নির্ধারিত হয়েছিল ৬,২৯,৮৯৭-১২ 'সিক্কা' টাকা। দেখুন, (The Economic Life of A Bengal District: Birbhum, pp. 74).

১৪৬. বাংলার অন্যান্য বড় জমিদারির মতো এ সময় মূল বিষ্ণুপুর জমিদারিও ছিল খণ্ডিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শাহজুড়া, কিসমত শাহজুড়া, মালিয়ারা তালুকগুলিকে কোম্পানি আলাদাভাবে বন্দোবস্ত করেছিল। দেখুন, Change in Bengal Agrarian Society, pp. 182.

১৪৭. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর রাজশাহী (পৃষ্ঠা ৩৬৮)-তে এই জমিদারির 'জমা' উল্লেখ করা হয়েছে ১,৮৯,৫৯২-৪-০ টাকা।

১৪৮. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : রংপুর (পৃষ্ঠা ৩৪১)-তে ১,৫৮,৭০০ টাকা উল্লিখিত।

আমাদের পরবর্তী আলোচনার সুবিধার্থে উপরিউক্ত তথ্য-পরিসংখ্যানটি এখানে তুলে ধরা হলো। কেননা হঠাৎ করে এই বিপুল পরিমাণ ভূমিরাজস্ব ধার্য প্রক্রিয়ার অভিঘাত যে অত্যন্ত মারাত্মক হয়েছিল, তা এই অঞ্চলের বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যবাহী বড় বড় জমিদারিগুলির ভয়াবহ পরিণাম থেকে প্রতীয়মান হবে। অবশ্য একদিক থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 'জমা' তুলনামূলকভাবে খুব চড়া হলেও, তা ভালো ছিল এই অর্থে যে পূর্ববর্তী একসনা-পাঁচসনা প্রভৃতি পদ্ধতির ন্যায় ঘন ঘন রাজস্ব বৃদ্ধি ও অব্যবস্থা এতে ছিল না। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'A thorny problem was thus solved after various experiments had been tried for more than twenty-five years.'[১৪৯] বলাবাহুল্য এতোদিন পর জমিদাররা আগেভাগে নিশ্চিত হলো তাদের বার্ষিক 'দেয়' সম্বন্ধে।

কোনরূপ প্রাক-জরিপ বা অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তড়িঘড়ি করে বিপুল অঙ্কের 'জমা' নিরূপণের মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালুর ফলে দৃশ্যত এর কিছু ভালো দিক লক্ষ্য করা গেলেও অচিরেই বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম সিকি শতকেই এর অবশ্যম্ভাবী খারাপ প্রতিক্রিয়াগুলো বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সঙ্গে জন শোর-এর যে আশঙ্কা ছিল, বলা যায় সেটিও সত্যে পরিণত হলো। ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'The history of the Permanent Settlement in its early years justified Shore's misgivings about the hasty adoption of the new system on the basis of inadequate and confusing data.'[১৫০]

এ পর্যায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভালো-মন্দ দিকগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

আগেই বলেছি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বলে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার (অতঃপর 'বাংলা' বলতে মূলত বাংলা, বিহার ও ওড়িশা-কে বুঝাবে) জমিদারদের বার্ষিক দেয় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ এককালীন সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। এতে করে কোম্পানির আয় যেমন নিশ্চিত হয়েছিল, তেমনি রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে ইতোপূর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে যে বিপুল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল, এবং কোম্পানির বার্ষিক রাজস্ব প্রাপ্তিতে যে অনিশ্চয়তা ছিল, তা স্থায়ীভাবে দূর হলো। এ প্রসঙ্গে স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায়ের উক্তি ধার করে বলা যায়[১৫১], 'To convince ourselves, in the first instance, of the accuracy of the opinion that the perpetual settlement has proved advantageous to government, a reference to the revenue records of the former and

১৪৯. An Advanced History of India, Dr. R. C. Majumdar & Others, pp. 787.

১৫০. History of India, pp. 562.

১৫১. Exposition of the Practical Operation of the Judicial and Revenue Systems of India and of the General Character and Condition of Its Native Inhabitants, Rajah Rammohun Roy, pp. 287.
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও বলেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবলমাত্র আংশিকরূপে সফলতা লাভ করিয়াছিল। ইহা বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিল এবং সরকারের রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়াছিল।' (বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, আধুনিক যুগ, পৃষ্ঠা ৪৬)।

present rulers will, I think, suffice. No instance can be shewn in those records, in which the sum assessed and annually expected from these provinces was ever collected with equal advantage prior to the year 1793.'

রাজস্ব আয় নিশ্চিতির কারণে কোম্পানির পক্ষে তাদের রাজস্ব ব্যয়ের খাতগুলি বিশেষ করে স্বদেশে শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড দেয়া, ভারতে ও ভারতের বাইরে নানাবিধ যুদ্ধবিগ্রহ ও প্রশাসনিক ব্যয় প্রভৃতি চিহ্নিত ও নিয়মিতকরণ সম্ভব হয়েছিল। অধিকন্তু রাজস্ব আদায়ের জন্য কোম্পানিকে যে বিশাল কর্মীবাহিনীকে পুষতে হতো তাদের প্রত্যাহার করে অনেককে ছাঁটাই ও অবশিষ্টদের অন্যত্র কর্মে নিয়োগ করে প্রশাসনিক ব্যয় সঙ্কোচন করা সম্ভব হয়েছিল।

তবে এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সবচেয়ে লাভবান শ্রেণীটি ছিল বাংলার ছোট-বড় অসংখ্য জমিদার-তালুকদারগোষ্ঠী।[১৫২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এদের (জমিদার) সঙ্গে বন্দোবস্ত চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় একে 'জমিদারি' বন্দোবস্তও বলা হয়ে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে যে সব লেখক-ঐতিহাসিক -- ইংরেজ, হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে-- কিছু-না কিছু লিখেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, এই ব্যবস্থার তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি উপকারভোগী ছিল বাংলার ভূস্বামী-জমিদারশ্রেণী। এখানে দু-একজনের মত উদ্ধৃত করা হলো।

P.E. Roberts বলেন, 'The Permanent Settlement, in contrast to the chaotic system which it supplanted, had many fairly obvious advantages. It ultimately improved the position of the zamindar, who was secured in his zamindari as long as he paid the state revenues.'[১৫৩]

ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম বলেন, 'The zamindars were the greatest gainers in this settlement, as it vested in them the hereditary proprietorship of the zamindari.'[১৫৪]

এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলায় ভূ-সম্পত্তিতে প্রথমবারের ন্যায় সরকারি উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব হয়েছিল। প্রাচীন যুগে এ অঞ্চলে ভূমির মালিক ছিলেন রাজা তথা রাষ্ট্র, মধ্যযুগে বিশেষত সুলতানি ও মোগল আমলে এবং পরবর্তীকালে নবাবি যুগে ভূমিতে কিছু কিছু ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি হলেও (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এই লেখকের 'বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা' দেখা যেতে পারে) আদতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাই ছিল মূল

---

১৫২. রুশ ঐতিহাসিক রসতিসলভ উলিয়ানভস্কি প্রদত্ত এক তথ্য থেকে জানা যায়, ১৭৯৪ সাল নাগাদ এদের (zamindar tax-farmers) সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪৬,০০০ জনে (Agrarian India Between the World Wars, Rostislav Ulyanovsky, pp. 29), যাদের অধীনে কমপক্ষে ১,৫০,০০০টি 'এস্টেট' ছিল। (দেখুন, British India and Its Rulers, H. S. Cunningham, pp. 166).

১৫৩. History of British India under the Company and the Crown, pp. 229.

১৫৪. History of Muslims in Indo-Pakistan Sub-Continent, Drs. Reazul Islam, M. A. Rahim & Abdul Hamid, pp. 378.
Also see, A Short History of Pakistan: Alien Rule and The Rise of Muslim Nationalism, Book Four, pp. 76; The Muslim Society and Politics in Bengal, pp. 32-33.

কথা।

অন্যদিকে ১৭৯৩-পূর্ব সময় পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও ওড়িশায়, এমন কি ভারতব্যাপী ভূমি রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকলেও এই প্রথম অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এ অঞ্চলের ভূ-সম্পত্তিতে প্রকৃতার্থ ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি করা হলো। ড. অমলেশ ত্রিপাঠী বলেন, 'The most significant effect of the Permanent Settlement was the creation of private property in land in the full legal sense.'[১৫৫]

শুধু তাই নয়, বলা যায় এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় স্বত্বাধিকার প্রায়-বর্জিতই হয়েছিল। এককথায় আগে যারা ছিল নিতান্তই রাষ্ট্রপক্ষে রায়ত সাধারণের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের কমিশনভোগী এজেন্ট মাত্র, তারাই এখন হুট করে হয়ে গেলো অঢেল ভূমির মালিক, স্বত্বাধিকারী। বামপন্থী লেখক-বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমরের ভাষায়, 'এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশের ভূমি-ব্যবস্থার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন সূচিত হলো। পূর্বে যে জমির মালিক ছিলো কৃষিকার্যরত খোদ কৃষক, সেই জমির মালিক এ-বার হলো পূর্ববর্তীকালের রাজস্ব আদায়কারী সরকারী এজেন্ট -- জমিদার। এই মালিকানার ফলে জমিদাররা ইচ্ছেমতোভাবে জমি ক্রয়-বিক্রয়, বিলি-ব্যবস্থা সব কিছু করার অধিকার লাভ করলো।'[১৫৬] নিঃসন্দেহে এতে করে অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির পাশাপাশি জমিদারদের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানেরও অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক Meadows Taylor বলেন, 'It established a local aristocracy and created immense private wealth.'[১৫৭]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে কৃষি কাজের ব্যাপক উন্নতি হবে, এবং রায়তকুলের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে তথা সামগ্রিকার্থে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে -- এটাই ছিল কর্তৃপক্ষের বিশেষ করে কর্নওয়ালিস-এর ধারণা। সত্যি বলতে প্রাথমিক কয়েকটি সাফল্য তাদের এই ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িতও করেছিল। 'জমা' আগেভাগে স্থিরীকৃত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে জমিদারগণ যেমন স্বীয় জমিদারির অন্তর্গত বিভিন্ন অনাবাদি ও পতিত জমি নিত্যদিন চাষের আওতায় আনতে উৎসাহিত হয়েছিল (প্রাথমিক অবস্থায় এটা নিজস্ব লোক দিয়ে তারা প্রকাশ্য-গোপন দু'ভাবেই করতেন এবং এ জন্য রাষ্ট্রকে তাদের বাড়তি কোন রাজস্ব দিতে হতো না), তেমনি নিম্নশ্রেণীর (পাইকাস্ত) কৃষকদের কাজে লাগিয়ে জঙ্গল পরিষ্কারের ফলে বসতি ও চাষাবাদ সম্প্রসারিত হওয়ায় কৃষি উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বেড়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে এর ফল ভোক্তা হয়েছিল জমিদারগণ। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রও এই ফলের আংশিক ভাগ পেয়েছিল। কৃষক যৎসামান্য সুবিধা পেলেও বস্তুত সেটা ছিল তার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের অর্জিত ফসল। যা হোক এখানে বিখ্যাত 'ফ্লাউড কমিশন' তাদের রিপোর্ট প্রণয়নের স্বার্থে দেশব্যাপী যে প্রশ্নমালা

১৫৫. Trade and Finance in the Bengal Presidency, pp. 19.
ড. সুলেখচন্দ্র গুপ্তও জানাচ্ছেন, 'As is well known, the principal economic feature of the Bengal Permanent Settlement was that it sought to create a landed aristocracy in the country by conferring a right of private property in the soil on the zamindars of Bengal.' (Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp. 70).

১৫৬. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, পৃষ্ঠা ২০।

১৫৭. A Student's Manual of the History of India, pp. 528.

বিলি করেছিল (১৯৩৮), এবং যার প্রেক্ষিতে বাংলার বিভিন্ন জমিদার সমিতি যে উত্তর দিয়েছিল, তার দু'-একটি প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলে ধরছি। এ থেকে বুঝা যাবে, আসলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাথমিক যুগে বাংলার বেশ কয়েকটি জমিদার-পরিবার ঐতিহ্য সূত্রেই হোক, কী স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে, এরা উল্লেখযোগ্য কিছু জনহিতকর কাজ করেছিলেন, যার ফলে এ অঞ্চলে কিছু হলেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছিল।

'কমিশন'-এর সর্বমোট ৯৩টি প্রশ্নমালার মধ্যে একটি প্রশ্ন (৩ নং)-এর অংশবিশেষ ছিল: 'What part have the landlords played in the economic development of the country since the Permanent Settlement ?'

এর উত্তরে জমিদারদের বিভিন্ন সমিতি যে উত্তর দিয়েছিল তার মধ্যে উভয় বাংলার প্রতিনিধিত্বশীল দু'টি সমিতির বক্তব্য ছিল এ রকম:-

(ক) 'Bakarganj Landholders' Association' জানিয়েছিলঃ 'The landlords improved the lands by clearing jungles, excavating khals, and constructing embankments. They also reserved forests for the supply of fuel and timber and they used to set apart lands in every mauza for the purpose of pasturage and granted rentfree lands for the purpose of habitation of the agriculturists and they made roads and canals for facility of communication, and established *hats* and *bazars* to give marketing facilities to agriculturists and handicraftsmen.'[১৫৮];

(খ) 'Burdwan Landholders' Association'-এর জবাব ছিলঃ 'In 1793 one-third and according to some historians half of the cultivable area of Bengal lay waste and infested by wild beasts. The pioneer landlords by their industry, enterprise and business capacity converted the vast tracts of waste lands into fertile agricultural fields. The origin of most of the irrigation, and other tanks that we find scattered over the countryside today is to be traced to the industry and enterprise of the zamindars. It is a well-known fact that within 22 years of the Permanent Settlement almost half of the landed property in the province was transferred by public sale and it is difficult to produce the accurate figures of investment of money by the zamindars for improvement of waste areas, after the lapse of 146 years. I can only refer to the record of contemporary historians, in support of my proposition that the zamindars of Bengal "have been very powerful and active factors" in the improvement and economic development of the country.'[১৫৯]

এটি জমিদারদের নিজেদের উক্তি হলেও সদর্থে বিবেচনা করলে, এর সত্যতা আদৌ অস্বীকার

১৫৮. Reply by the Various Landholders' Association of Bengal, pp. 1.

১৫৯. Ibid., pp. 384.

করা যায় না। আধুনিক ঐতিহাসিকগণও জমিদারদের এই সৎ কীর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কোম্পানির ভূমিরাজস্ব-নীতির একজন কট্টর সমালোচক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, 'The Permanent Settlement is an unqualified boon to the country. Cultivation has largely extended within the last 100 years, the income from land has largely increased and the increase has remained with the people and for the good of the people.'[১৬০]

ড. সিরাজুল ইসলামের বক্তব্য এ ব্যাপারে আরও স্পষ্ট, যদিও তা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত। তাঁর ভাষায়, 'অনেকে মনে করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের কৃষির সম্প্রসারণ ঘটে। তাহাদের মতে জমিদার কর্তৃক দেয় সরকারী রাজস্ব যেহেতু ছিল চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়, আর যেহেতু সরকারী রাজস্বের উপরে সমস্ত আয়ের অধিকারী ছিল জমিদার একা, সেহেতু জমিদারগণ অর্থনৈতিক কারণেই কৃষির সম্প্রসারণ করিয়া আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করে। পতিত ও পারিপার্শ্বিক অরণ্য আবাদ করার চেষ্টা করে। এ কথা ঠিক যে উনবিংশ শতকে কৃষির যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাংলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলিয়া কর্তৃপক্ষ মনে করে। কিন্তু উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক নাগাদ এই অনাবাদ জঙ্গল পরিবেশ আমরা লক্ষ্য করি না। এর কারণ কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণ। এই সময়ে নানা রকম অর্থকরী ফসল (যথা -- রেশম, নীল, পাট, ইক্ষু, তামাক, চা প্রভৃতি) ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। অনস্বীকার্য যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কৃষির যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটে।'[১৬১] অবশ্য এর পাশাপাশি তিনি এ প্রশ্নও উত্থাপন করেন, 'কিন্তু এর কারণ কি জমিদারদের সক্রিয় প্রচেষ্টা না জনসংখ্যা বৃদ্ধি? সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কৃষির সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে যথেষ্ট, কিন্তু উন্নতি হয় নাই। কৃষির উন্নতি ও কৃষির সম্প্রসারণ এক কথা নয়। কৃষির কৌশল ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধন করিয়া সমপরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণ ফসল ফলানো এবং উদ্বৃত্ত ফসল লাভজনকভাবে বাজারজাত করার ব্যবস্থাকে বলা যায় কৃষির উন্নতি, আর চিরাচরিত কৃষি কৌশলের অধীনে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে যে পতিত জমি আবাদ করা হয়, তাহা হইতেছে কৃষির সম্প্রসারণ। সেই সম্প্রসারণে কৃষকের অর্থনীতির কোন পরিবর্তন ঘটে না। সম্প্রসারণের ফলে বাড়তি ফসল বাড়তি মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে মাত্র। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষির উন্নতি হয় নাই, কৃষির সম্প্রসারণ হয়। এই সম্প্রসারণের জন্য দায়ী বাড়তি লোকসংখ্যা, জমিদারের সক্রিয় প্রচেষ্টা নয়।'[১৬২]

যা হোক বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পরবর্তী বাংলার কৃষি কাজের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে জমিদারদের ভূমিকাকে একেবারে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই বলে আমরা মনে করি। বস্তুত কৃষির সম্প্রসারণ ও উন্নতি ঘটেছিল বলেই উত্তরোত্তর ভূমির চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৬৩]

বলা হয়ে থাকে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এই প্রথম আইন করে রায়তদেরকে জমিদারকর্তৃক 'পাট্টা' দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এবং এর ফলে রায়তগণ নিজেদের

১৬০. Reply by the Various Landholders' Association of Bengal, pp 285.
১৬১. বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৯৪-৯৫।
১৬২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯৫।
১৬৩ Studies in Indo-Pakistan History, Prof. M. A. Hanafi, pp. 521-22.

ভূম্যধিকার ও দখল-ভোগের নিশ্চয়তা লাভ করে এবং সেই সঙ্গে তাদের দেয় খাজনার পরিমাণও জমিদার আগেভাগে লিখিতভাবে জানিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে জমিদারকর্তৃক রায়তদের হয়রানি করার সুযোগ ও প্রবণতা হ্রাস পেয়েছিল বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা জন্মেছিল। মনীষী James Mill বলেন, 'In this ill-judged measure, there was one redeeming point. The ryots were reduced to the rank of tenants of the Zamindars, but tenants with the fixity of tenure.'[১৬৪]

কিন্তু 'পাট্টা' দেয়ার বিধানটি মূলত কাগজে-পত্রেই সীমিত ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ জমিদার তা রায়তকে দিতে অস্বীকার করেছে, কারণ এতে তার বিভিন্ন অজুহাতে খাজনা বৃদ্ধির সুযোগ হাত ছাড়া হতো। অন্যদিকে রায়তও তা গ্রহণে খুব একটা উৎসাহিত হয়নি, কেননা জমিদার লিখিত 'পাট্টা' দিলেও তাতে উল্লিখিত শর্তাদি সে নিজেই মানতো না, এবং তার হাতে হয়রানিরও কোন শেষ ছিল না। অধিকন্তু গরিব রায়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা মনে রাখা দরকার যে, 'It is true that the zamindars were enjoined to enter into agreements (*pattas*) with the cultivators, which stated the exact sum of the rent including the customary dues (recognised cesses or *abwabs*), the area held and the rates, and prohibited, on pain of fine, the realisation of any amount over and above the specified sum, or the levy of any new cesses. But the remedy provided against any breach of the agreement was the institution of a case in a court of law – a course both dilatory and expensive and beyond the means of the cultivator.'[১৬৫] অহেতুক মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে কোর্ট-কাছারিমুখো হতে বাংলার রায়তের কোনকালেই আগ্রহ ছিল না। স্বভাবতই এ রকম পরিস্থিতিতে জমিদারের কাছ থেকে 'পাট্টা' গ্রহণে তার উৎসাহ কম থাকারই কথা।

তথাপি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কিছু ভালো দিকের কথা মনে রেখে ইংরেজ ঐতিহাসিক J. C. Marshman-এর ভাষায় আমরা এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, 'The Permanent Settlement of Bengal was a bold, brave and wise measure and under the genial influence of this territorial charter, which for the first time established indefeasible rights and interests in the soil, the gradual improvement has become visible in the habits and comforts of the people since then.'[১৬৬]

তবে ঐতিহাসিকের এই শেষোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত নই। কেন নই, সেটাই এখন আলোচনা করবো।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মন্দ দিকগুলো আলোচনার শুরুতে আমরা ড. তারাচাঁদের একটি মূল্যবান মন্তব্য উল্লেখ করে নিতে চাই। তিনি বলেন, 'A more fundamental change in the structure of Indian society and the rural economy of the country was

১৬৪. Quoted from, British Rule in India: A Select Study, pp. 89.
১৬৫. History of Freedom Movement in India, Vol. One, pp. 255.
১৬৬. Reply by the Various Landholders' Association of Bengal, pp. 385.

wrought by the Permanent Settlement introduced by Cornwallis. The Settlement destroyed the old village community, changed the property relations, created new social classes and caused a social revolution in the Indian countryside."[১৬৭]

সত্যি বলতে এই ব্যবস্থার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল অন্তঃশীলা প্রবাহের ন্যায় -- সঙ্গোপন, তীব্র, মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও অষ্টাদশ শতকের শেষ নাগাদই কর্তৃপক্ষ তা টের পেতে শুরু করেছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু-তিন দশকেই তা পুরোপুরি বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনকে সংক্রামিত করে ফেলেছিল।

আগেই বলেছি এই ব্যবস্থায় জমিদারদের 'দেয়' চিরস্থায়ীভাবে স্থিরীকৃত হয়েছিল। ফলে রাষ্ট্র ইচ্ছে করলেও আগের মতো আর যখন-তখন 'জমা' বৃদ্ধি করতে পারতো না। অন্তত আইনগতভাবে রাষ্ট্রের সেই সুযোগ তখন ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে ১৯৫০ সনে 'রাষ্ট্রীয় (জমিদারি) অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন' (পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে) প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় কাগজে-পত্রে ১৭৯৩ সনের 'জমা'ই ছিল স্থির। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, কোম্পানির সরকার বা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার নানাবিধ অজুহাতে, 'সেস', 'উন্নয়ন কর' প্রভৃতি নামে তথাকথিত এই 'জমা' আদৌ বৃদ্ধি করেনি। ড. বিনয়ভূষণ চৌধুরী বলেন, 'The 'Permanent Settlement', however, did not mean a complete freezing of the land revenue, and the Company could secure an increase in it from time to time."[১৬৮]

তবে 'জমা' বৃদ্ধি যেহেতু বছর-বছর করার আইনি অধিকার কোম্পানির বা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না, সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, 'The Settlement proved financially ruinous for the government in course of time."[১৬৯]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সবচেয়ে ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী কুফলদায়ক দিক ছিল সম্ভবত বাংলার বংশানুক্রমিক ও ঐতিহ্যবাহী বড় বড় জমিদার পরিবারগুলির ওপর এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া। এটা ঠিক যে কর্নওয়ালিস এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় তথা ভারতে কোম্পানির নিজস্ব অনুগত একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তার নিজস্ব বক্তব্য থেকেও যেমন এটা জানা যায় , তেমনি ঐতিহাসিকগণও তা একবাক্যে স্বীকার

১৬৭. History of Freedom Movement in India, Vol. One, pp. 252.

১৬৮. The Cambridge Economic History of India (1757-1970), Vol. II., Ed. Dr. Dharma Kumar, pp. 89. ড. চৌধুরীর দেয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ১৭৯০ থেকে ১৮৭০ সময়-পর্বে বিহারের পাটনায় 'জমা' বৃদ্ধির হার ছিল ৪৮%, ১৮০৫ থেকে ১৮৯৭ সময়-পর্বে ওড়িশায় ৯৩% প্রভৃতি। দেখুন, ঐ, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০।

১৬৯. Dr. M. A. Rahim in A Short History of Pakistan: Alien Rule and The Rise of Muslim Nationalism, pp. 76.
অন্যত্রও তিনি বলেন, 'But this settlement deprived the government of its share of the increase of the land revenue which was caused by the great extension of cultivation in the subsequent years.' (The Muslim Society and Politics in Bengal, pp. 32).

করেছেন।

ফলত কর্নওয়ালিস-এর এই উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়েছিল বলতে হবে। পববর্তীকালে (১৮২৯) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এভাবে, 'আমি এটা বলতে বাধ্য যে, ব্যাপক গণবিক্ষোভ অথবা গণবিপ্লব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে, এমন কি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হলেও, এব ফলে এমন এক বিপুলসংখ্যক ধনী ভূস্বামী শ্রেণী সৃষ্টি হযেছে যারা বৃটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখতে বিশেষভাবে আগ্রহশীল এবং জনগণেব ওপর যাদেব অখণ্ড প্রভুত্ব বজায় আছে।'[১৭০]

কিন্তু জমিদারদের বেলায় সেটাই শেষ কথা ছিল না। বরং তা ছিল তাদের ভবিষ্যতের ভয়াবহ পরিণতির সূচনা মাত্র! তাদের এই ব্যাপক আকস্মিক উত্থানের মধ্যেই ছিল তাদের আত্মঘাতী ভাঙন ও সমূহ পতনের বীজ। রাষ্ট্র বা রায়তের (যেটাই ধরা হোক না কেন) স্বত্বাধিকার প্রথমবাবের ন্যায় জমিদাবদের কব্জায় তথা অধিকারে চলে যাওয়ায প্রাথমিকভাবে জমিদারশ্রেণী লাভবান হলেও অন্যদিক থেকে তারাই হয়েছিল এই ব্যবস্থার প্রথম ক্ষতির শিকার, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাদের জন্য মরণ-ফাঁদ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

বস্তুত প্রাক-জরিপ ছাড়া জমিদারদেব ওপর যে 'জমা' নির্ধাবণ করা হয়েছিল তা কোথাও কোথাও কিছুটা কম প্রতীয়মান হলেও বাস্তবে অধিকাংশ জমিদারিব ক্ষেত্রেই তা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। এককথায়, উদাহরণ হিশেবে যদি আমরা ধরি যে দিওয়ানি-উত্তর বাংলায় ১৭৮৩-৮৪ সালে ভূমিরাজস্ব নিরূপিত হয়েছিল ২,৭২,৬৫,৪১৪ টাকা, কিন্তু এর ৭-বছর পবে তা বরং

১৭০ বিবৃতি সংগ্রহ, চিরস্থাযী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, পৃষ্ঠা ২১।
১৮৬২ সালে লিখিত ভাবত-সচিবের একটি পত্র থেকেও অনুরূপ তথ্য পাওযা যায়। তাব ভাষায় 'চিরস্থাযী বন্দোবস্ত হইতে যে বহু প্রকাবেব বাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে মহাবাণীব সবকাব কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না। . ইহাব ফলে যে-শাসনব্যবস্থা ভূস্বামীদেব এইরূপ বিবাট সুযোগ স্বেচ্ছায দান কবিযাছে এবং যে-শাসনব্যবস্থার স্থাযিত্বের উপব ঐ ভূস্বামীদেব অস্তিত্ব নির্ভব কবে, সেই শাসনব্যবস্থাব প্রতি ভূস্বামীগণেব অনুরক্তি ও আনুগত্যেব মনোভাব জাগ্রত না হইযা পাবে না।' (সুপ্রকাশ রায, ভাবতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫, উদ্ধৃতি সংগ্রহ, বাজা বামমোহন বায় বঙ্গদেশেব অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, ড. কুমুদকুমাব ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৪০)।
আধুনিক লেখক-ঐতিহাসিকগণও বেন্টিঙ্কের এ বক্তব্য সমর্থন করেছেন। ড. কেশব চৌধুরী বলেন, 'ভাবতীয জনসাধারণেব আন্দোলন বা বিদ্রোহের বিরুদ্ধে অনুগত মিত্র সৃষ্টি কবার কাজে চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত সহায়ক হয়েছিল। শাসকশক্তির অনুগ্রহে ব্রিটিশ ভাবতের জমিদারদেব উৎপত্তি ঘটেছিল এবং ব্রিটিশ শক্তিব উপস্থিতি তাঁদেব পক্ষে অপরিহার্য ছিল। ... মোট কথা, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে রাজস্ব প্রদানের চুক্তিতে যাঁরা জমিদার হন তাঁরা নিঃসন্দেহে রাজভক্ত ছিলেন। এই রাজভক্তি ঔপনিবেশিক শাসনের বনিয়াদ রচনায় অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভেব কাজ করেছিল।' (ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ, পৃষ্ঠা ৭৭)।
অধ্যাপক আনোযারুল ইসলাম বলেন, 'বৃটিশ-সৃষ্ট ভারতীয় জমিদার-শ্রেণী সব সময়েই ইংরেজ শাসকদেব সাথে নিজেদের একাত্ম করে দেখেছে; বৃটিশ স্বার্থকে বজায বাখাব জন্য সর্বপ্রকারেব গণ-বিবোধী ভূমিকা পালন করেছে, বৃটিশ বাজকে টিকিয়ে বাখাব জন্য রাজনৈতিক সহায়তা করেছে, এবং সর্বোপরি বিদেশী শাসকদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ঠিক রাখার জন্য নির্যাতন-শোষণ চালিয়েছে গণ-মানুষেব উপব।' (বাংলাদেশ: সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা, পৃষ্ঠা ২৭-২৮)।

কিছুটা কমে ২,৬৮,০০,৯৮৯ টাকায় এবং পরের দু'টি বছরও একই জায়গায় স্থির থেকে হঠাৎ করে এর অব্যবহিত পরের বছরই (১৭৯৩-৯৪) এক লাফে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩,১৭,৭০,২৮০ টাকা[১৭১]; এবং সেটা যে জমিদারদের 'জমা' বৃদ্ধি করেই আদায় করতে হবে এবং যার চূড়ান্ত রেশ গিয়ে দাঁড়াবে নিরীহ রায়তদের উপর তা অনস্বীকার্য।

অবশ্য এই অভূতপূর্ব 'জমা' বৃদ্ধি অনেক জমিদারই মেনে নিতে চাননি। চট্টগ্রামের জমিদারেরা স্পষ্ট ভাষায় কোম্পানির নীতিনির্ধারকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন তাদের অঞ্চলের কৃষি এতো অনিশ্চিত যে তাদের পক্ষে এই অত্যধিক রাজস্ব মেনে বন্দোবস্ত চুক্তি করা অসম্ভব। একইভাবে বর্ধমানের জমিদার তেজচন্দ্র স্বয়ং কলকাতা এসেছিলেন 'জমা' কমানোর তদ্বির করতে, যদিও তাতে কিছুমাত্র কাজ হয়নি। রাজশাহি, যশোহর, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, রংপুর, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, ২৪-পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদাররাও এই ধরনের নিষ্ফল আবেদন-নিবেদন করেছিলেন। এমন কি কেউ কেউ বন্দোবস্ত চুক্তি সম্পাদনে অস্বীকৃত হওয়ায় তাদেরকে পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়ে কুঠিতে ধরে নিয়ে গিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর নেয়া হয়েছিল (বাখেরগঞ্জের কিছু কিছু জমিদার এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত)।

বস্তুত এই যেখানে বাস্তবতা সেখানে অত্যধিক রাজস্বের ভারে ন্যুব্জ বড় জমিদারিগুলির অবস্থা কী দাঁড়াতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত আগেই দেখিয়েছি বাংলার মোট ভূমিরাজস্বের প্রায় অর্ধেক আসতো বর্ধমান, রাজশাহি (নাটোর), দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের জমিদারি থেকে।[১৭২] আগে থেকেই এরা রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠুতা ও নিয়মনিষ্ঠার কারণে মোগল সম্রাট-সুবেদার-নবাবদের কাছ থেকে 'রাজা', 'মহারাজা', 'রায়-রায়ান' প্রভৃতি উপাধি লাভ করেছিল। সুতরাং বুঝা যায় সরকারি দপ্তরে যেমন এদের খ্যাতি ও প্রবল গ্রহণযোগ্যতা ছিল, তেমনি সমাজেও তারা পেয়েছিলেন প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি। অথচ এই জমিদারিগুলিই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পরবর্তী মাত্র ৭-বছরের মধ্যে 'সূর্যাস্ত বা বিক্রয়-আইন'-এর কঠিন গ্যাঁড়াকলে পড়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেলো। এদের মধ্যে একমাত্র বর্ধমানের মহারাজা বিকল্প পদ্ধতিতে রাজস্ব-আয়ের সংস্থানে সমর্থ হওয়ায় কোন রকমে টিকে গিয়েছিলেন।[১৭৩] তবে এটাও সত্য, 'পরবর্তীকালে জমিদার হিসাবে তাহাদের যে সত্তা থাকে তাহা পূর্ব আয়তনের ছায়া মাত্র' ছিল।

১৭১. বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৪৩।

১৭২. বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৯২।

১৭৩. দশসালা বন্দোবস্তে বাংলার ১২টি বৃহৎ জমিদারির ৫৩.১১% ভূমিরাজস্বের মধ্যে ১৭.১৫% ধার্য হয়েছিল বর্ধমান জমিদারিতে। বাংলার অন্যান্য জমিদারির ন্যায় এখানেও প্রচুর অনাবাদি ও পতিত জমি এবং সম্পূর্ণরূপে চাষ-অযোগ্য দুর্গম অঞ্চল ছিল। সেই নিরিখে যে রাজস্ব ধার্য হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত বেশি। নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব পরিশোধে তাৎক্ষণিকভাবে দু'এক বছরের জন্য মহারাজা তেজচন্দ্র সমর্থ হলেও এটি তার ওপর একটা সার্বক্ষণিক চাপ হয়েই বিরাজ করছিল। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষ সমীপে বারবার অনুরোধ-উপরোধ করেও তিনি রাজস্ব হ্রাসকরণে সমর্থ হলেন না। তখন তিনি বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে নির্দেশ দিলেন তার সুযোগ্য দিওয়ান বাবু প্রাণকৃষ্ণকে। বস্তুত সুচতুর ও বুদ্ধিমান প্রাণকৃষ্ণই তাকে বিকল্প পথের সন্ধান দিয়ে মানসিক ও আর্থিক চাপ থেকে মুক্ত এবং সামাজিক পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ সমগ্র বর্ধমান জমিদারিকে কয়েক হাজার খণ্ডে বিভক্ত করে তালুক 'পত্তনি' দিয়েছিলেন। প্রতিটি তালুকের খাজনা ধার্য করা হয় দুই থেকে তিন হাজার টাকা। বলাবাহুল্য এভাবে যে বিপুল ভূমিরাজস্বের চাপ ছিল একটি একক জমিদারির ওপর, অচিরেই তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজিত

অন্যদিকে এদেরই ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠেছিল আরেক শ্রেণীর নব্য জমিদারগোষ্ঠী। এরা উত্থানেই কেবল ভূইফোঁড় ছিল না, শ্রেণীতেও ছিল উঠ্‌তি ধনিক-বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কার্যত অনুপস্থিত চরিত্রের জমিদার। কলকাতা ছিল এদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের মূলকেন্দ্র (যে কারণে ব্যঙ্গ করে এদেরকে 'কলকাতা বেনিয়ান'ও বলা হয়ে থাকে); এখানে থেকেই নগদ পয়সার জোরে স্বনামে-বেনামে এরা বাংলার দেনাগ্রস্ত বনেদি জমিদারিগুলি বা তার অংশবিশেষ নিলামে চড়া মূল্যে ক্রয় করেছিল।

স্বভাবত এরা জমিদারি ক্রয় করলেও কালেভদ্রে মূল জমিদারি-স্থলে যেতেন। বরং ক্রীত জমিদারিগুলি তাদের নায়েব-গোমস্তারা দেখাশুনা করতো। নব্য জমিদারগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ কেউ ছিল বড় জমিদারিগুলির নায়েব-দিওয়ান-গোমস্তা। জমিদারি পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে এরা তলে তলে সংশ্লিষ্ট জমিদারিরই বিপক্ষে কাজ করতো। ইচ্ছে করে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মালিক জমিদারের অজ্ঞাতে জমিদারির দেয় বকেয়া ফেলতো। রায়তদের কাছ থেকে যা আদায় করতো তার বিশাল অংশ নিজেরাই কুক্ষিগত করতো। পরে মূল জমিদারি নিলাম হলে অন্তরালে থেকে নামে-বেনামে তারাই ক্রয় করতো। অযোগ্য অপদার্থ আসল জমিদারের তখন সব কিছু চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার থাকতো না। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যেমন নড়াইল জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা কালিশঙ্কর রায় ছিলেন প্রথম জীবনে লাঠিয়াল ও মাত্র কয়েক বিঘা জমির মালিক (১৭৭০); পরবর্তীকালে রাজশাহি জমিদারের দিওয়ান থাকাকালে তিনি বিভিন্ন জায়গায় জমিদারি ক্রয় করেন। মৃত্যুকালে (১৮৩৪) তিনি যে জমিদারি রেখে গিয়েছিলেন তার রাজস্ব ছিল কয়েক লক্ষ টাকা।[১৭৪] আবার কেউ কেউ ছিল ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও কালেক্টরদের প্রধান সহযোগী (ডেপুটি) বা দিওয়ান (এদেরও বেনিয়ান বলা হতো)। এই জাতীয়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কাশিমবাজার জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু বা কৃষ্ণকান্ত নন্দী। প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন সামান্য মুদি-দোকানের কর্মী ও ইংরেজ কুঠির মুহুরি; পরে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর দিওয়ান নিযুক্ত হয়ে প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হন। কান্দি-পাইকপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও ছিলেন হেস্টিংস-এর মুৎসুদ্দি, শোভা বাজার

হওয়ায় সহজেই রাজস্ব আদায় হওয়া শুরু হলো, এবং তেজচন্দ্রের পক্ষে 'জমা' যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা সম্ভব হয়েছিল।

যা হোক এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, 'নতুন এই পদ্ধতিতে বাড়তি রাজস্ব বন্দোবস্তের চুক্তিতে জমিদারীর অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি করা' হয়েছিল এবং সত্যি বলতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ রায়তদের স্বত্বাধিকার ছিনিয়ে জমিদার, তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকদের যেভাবে ভূমির মালিক করেছিলেন তাতে রাষ্ট্র ও রায়তের মধ্যে একটি মাত্র মধ্যস্বত্ব অবস্থান করলেও, তেজচন্দ্রের ছত্রচ্ছায়ায় দিওয়ান প্রাণকৃষ্ণ এই আপাত নিরীহ কিন্তু সুদূরপ্রসারী কুফলদায়ক অপকর্ম দ্বারা বাংলায় বহুল আলোচিত ও কুখ্যাত মধ্যস্বত্বের জন্ম দিয়েছিলেন। কেননা বর্ধমান জমিদারির দেখাদেখি অতঃপর কোন কোন অঞ্চলে 'পত্তনি', 'দর-পত্তনি', 'সে-পত্তনি', 'দরাদর-পত্তনি' এভাবে ক্রম-নিম্নগামী এতো বেশি মধ্যস্বত্বের প্রচলন হয়েছিল যে, জমিদার ও রায়তের মাঝখানে অন্তত ২০ থেকে ৬০ জনের অস্তিত্ব ছিল বলে কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন। (দেখুন, বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪২)।

১৭৪. 'সমাচার-দর্পণ', ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৪৫১, The Permanent Settlement in Bengal, pp 175.

জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ ছিলেন ক্লাইভের দিওয়ান, আন্দুল জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা রামচরণ রায় ও খিদিরপুরের ভূকৈলাস জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল যথাক্রমে জেনারেল স্মিথ ও ভেরেলস্টের দিওয়ান ও বেনিয়ান, পোস্তার জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ধরের দৌহিত্র মহারাজা সুখময় ছিলেন প্রধান বিচারপতি স্যার ইলিজা ইম্পে-র দিওয়ান, বাগবাজারের মুখার্জি-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় রাজশাহির কালেক্টর রুস, টাকশালের প্রধান হ্যারিস ও আফিম-এজেন্ট হ্যারিসনের দিওয়ান, প্রভৃতি।

ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য এই উঠতি নব্য জমিদারগোষ্ঠীকে 'চতুর ব্যবসায়ী দাওবাজ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এদের উত্থান ও স্বরূপ উদঘাটনে তিনি যে চমৎকার ভাষা ব্যবহার করেছেন তা এ রকমঃ 'এই চতুর ব্যবসায়ী দাওবাজদের মধ্যে কয়েকজনের উত্থানের ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনা করলে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের উপরে এঁদের নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করা যাবে। কলকাতা শহরের নব্য অভিজাতশ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা যাঁরা, বংশ-পরিচয়ের কিংবা ধন-কৌলীন্যের দিক থেকে তাঁরা অজ্ঞাতকুলশীল ও দরিদ্র ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। শোভাবাজারের রাজপরিবার, পোস্তার রাজপরিবার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার, সিমলার দে-সরকার-পরিবার, পাইকপাড়ার সিংহ-পরিবার, ঝামাপুকুরের মিত্র-লাহা-পরিবার, খিদিরপুরের ভূকৈলাসের ঘোষাল-পরিবার, হাটখোলার ও রামবাগানের দত্ত-পরিবার, বড়বাজারের মল্লিক-বংশ প্রভৃতি কলকাতার উচ্চশ্রেণীর পরিবার-প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রায় অখ্যাত ও অজ্ঞাত। এঁরা এবং এঁদের বংশধররা সকলেই প্রায় ইংরেজদের অধীনে দেওয়ান, বেনিয়ান, মুনশী, খাজাঞ্চী, সরকার প্রভৃতি পদে চাকরি করে ও সাহেবদের ঋণ দিয়ে কোম্পানির কাগজ ও অন্যান্য দ্রব্য কেনা-বেচা করে এবং ঠিকাদারি, ইজারাদারি ও তেজারতি ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন এবং কোম্পানির অনুগ্রহে গ্রামের জমিদারি ও শহরের ভূসম্পত্তি কিনে কলকাতা শহরের রাজা-মহারাজা অথবা ধনী জমিদার-রূপে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছেন।'[১৭৫]

এভাবে পুরোনোদের ক্রম-বিলুপ্তি ও নতুন জমিদারশ্রেণীর অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, 'It meant a great reshuffling in the structure of the traditional landed society. The fall of the rajas and maharajas and transfer of their lands to thousands of new landholders within a decade, and the extensive transfers of other traditional zamindaris during the same period do pronounce a revolutionary change in the composition of the landed society. It was now thoroughly transposed and restructured."[১৭৬]

---

১৭৫. রাজা রামমোহন বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩।

১৭৬ History of Bangladesh (1704-1971), Ed Dr Sirajul Islam, pp 254 ধনিক-বণিক-নির্ভর নব্য জমিদারগোষ্ঠীকর্তৃক পুরাতনদের স্থান দখলকে তথা বাংলার আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের এই দিকটিকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ড ইরফান হাবিব, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন প্রসঙ্গের প্রয়োজনে সেটিও এখানে তুলে ধরা জরুরি বলে মনে করি। কোম্পানির নিরূপিত ভূমিরাজস্বের দেনা মোকাবিলায় ভূমিতে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্রম-হ্রাসমান মূল্যের নিরিখে, তাঁর ভাষায়, '. জমিদারদের অনেকেই যে কোম্পানির নির্ধারিত রাজস্বের দাবি মেটানোর জন্যে কৃষকদের কাছ থেকে পুরোনো হারে খাজনা সংগ্রহ করতে পারেনি এবং নিজেদের অধিকার বিক্রয় করে দেওয়া কিংবা অন্যান্য নীলাম ডাকনেওলার হাতে

বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অব্যহিত-পরবর্তী শতকেই এভাবে বাংলার বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যবাহী জমিদারপরিবারগুলির ধ্বংসস্তূপে যে নব্য জমিদার সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে (এদের প্রায় সকলেই ইতোমধ্যে ইংরেজদের কাছ থেকে 'রাজা', 'মহারাজা' প্রভৃতি গাল-ভরা উপাধি পেয়েছিল) তাদের সংখ্যা মোটামুটি ৩০-এর মতো ছিল এবং ১৮৩০ সনের এক সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় 'বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ জমি বনেদী পুরানো জমিদারদের কাছ থেকে হাত বদল হয়ে নতুন জমিদারদের কাছে' চলে গিয়েছিল।[১৭৭]
যা হোক এ পর্যায়ে আমরা পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জমিদারি -- রাজশাহি বা নাটোর জমিদারি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মরণ ছোবলে মাত্র কয়েক বছরে কিভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে শেষ পর্যন্ত কালের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এ থেকেই বুঝা যাবে অন্য জমিদারিগুলির উপর এই ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া কী তীব্র, বিষম ও অস্তিত্ব-বিনাশী হয়ে ছিল।

রাজশাহি (নাটোর) জমিদারি

কোম্পানির ঘরে রাজস্ব জমার দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় এটি ছিল তৎকালীন বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম জমিদারি। এই জমিদারির অতীতেতিহাস[১৭৮] সম্বন্ধে যতোদূর জানা যায় তাতে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, বিয়োগান্তক পলাশির পট-পরিবর্তনের অনেক আগে থেকেই তা ছিল পূর্ণ-বিকশিত। এর প্রতিষ্ঠাতাদের বিবরণ নিম্নরূপ:-

পুঁঠিয়া রাজ-পরিবারের[১৭৯] অধীনে লস্করপুর পরগণার বরই বা বারইহাটি কাছারির তহসিলদার

নিজেদের অধিকার নীলাম হয়ে যাওয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর যে কোনো বিকল্প খুঁজে পায়নি সেটা আশ্চর্যজনক নয়। এটা ছিলো সেই সময়, যখন বেশ কিছু সংখ্যক জমিদারী বন্ধকী ঋণের দায়ে, বিক্রী হয়ে কিংবা নীলাম হয়ে মহাজন আর বণিকদের হাতে চলে গিয়েছিলো। অতএব, এটা নিছক বাণিজ্য থেকে জমিতে পুঁজির রূপান্তর নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানির হাতে ঐ পুঁজির অপ্রত্যক্ষ দখলদারী (ছিল)।'
(ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, অনুবাদ কাবেরী বসু, পৃষ্ঠা ২৫৮)।

১৭৭. রাজা রামমোহন: বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ৪৮।

১৭৮ "নাটোর পরিবারের আকস্মিক অভ্যুদয়ের আগে রাজশাহীর জমিদারী একটি প্রাচীন পশ্চিমাগত লালা কায়স্থ পরিবারের হাতে ছিল। নিকটে চারটি প্রাচীন রাজ্য বরেন্দ্রভূমের পণ্ডিতদের আশ্রয়স্থলরূপে পরিগণিত হত:

সান্তোলং লস্করপুরং নবদ্বীপশ্চ ভূষণা।
মণ্ডলানি চ চত্বারি শস্তানি বহুপণ্ডিতৈঃ।। (লঘুভারত)"

১৭৯ পুঁঠিয়া রাজ-বংশ ছিল রাজশাহি অঞ্চলের প্রাচীনতম বনেদি পরিবার। এর প্রতিষ্ঠাতা বৎসরাচার্য্য মোগলদের কাছ থেকে 'সনন্দ'সূত্রে এটি লাভ করেন। তখনকার দিনে পুঁঠিয়া বলতে মূলত 'লস্করপুর' পরগণাকেই নির্দেশ করতো। এর বিস্তৃতি ছিল পদ্মানদীর উভয়তীরে মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহি জেলার ব্যাপকাংশব্যাপী। বৎসরাচার্য্যের মৃত্যুর পর একে একে পুত্র পিতাম্বর, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বর, তৎপুত্র আনন্দ, তৎপুত্র রতিকান্তের তিন সন্তানের জ্যেষ্ঠ নব নারায়ণের জমিদারিকালে নাটোর জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের পিতা কামদেব বরইহাটির তহসিলদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। কর্নওয়ালিস-এর সময়ে এর 'জমা' ধার্য হয় ১,৮৯,৫৯২-৪-০ টাকা।

ছিলেন জনৈক কর্ণৌজি ব্রাহ্মণ কামদেব।[১৮০] এর ছিল ৩ পুত্র -- রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম। এদের মধ্যে রঘুনন্দন ছিলেন সবচেয়ে প্রতিভাবান, মূলত তিনিই ছিলেন রাজশাহি জমিদার বা রাজ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।[১৮১] ছোটবেলা থেকেই রঘু ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী ও প্রভুভক্ত এবং বাজস্বসংক্রান্ত আইন-কানুন জানায় বিশেষ উৎসাহী। পুঁঠিয়া জমিদারিতে কর্মকালে কোন এক কারণে তৎকালীন পুঁঠিয়া-রাজ তার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাকে জাহাঙ্গিরনগব (ঢাকা)-এব নাজিম-দববারে স্বীয় উকিল (ওয়াকিল) বা প্রতিনিধি নিযুক্ত কবেন। পরে ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তবিত হলে রঘুনন্দনও তথায় বদলি হন। এ সময় মুর্শিদাবাদের 'সদর-কানুনগো' ছিলেন বিখ্যাত দর্পনাবায়ণ। তিনি ছিলেন পুঁঠিয়া-বাজেব ব্যক্তিগত বন্ধু। তিনি রঘুনন্দনের রাজস্ববিষয়ক জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্ম-স্পৃহা লক্ষ্য করে তাকে নিজের সহকারি নিযুক্ত করলেন। পবে বঘুনন্দন প্রবল প্রতাপান্বিত নবাব-সুবেদার মুর্শিদকুলি জাফব খানের সুনজরে পড়ে, তাঁরই বদান্যতায় অচিরেই মুর্শিদাবাদেব 'দেওয়ানী বিভাগেব বিশিষ্ট রাজপুরুষেব ভূমিকায়' অবতীর্ণ হলেন। শুরু হলো বঘুনন্দনের উন্নতির সোপানে উর্ধারোহণ। মুর্শিদকুলি ১৭১৬ সালে তাকে সায়রাত মহালের ইজারাদার ও ১৭২২ নাগাদ টাঁকশালের দারোগা নিযুক্ত করেন। যা হোক এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকাকালীন তিনি মধ্যম-ভ্রাতা রামজীবন ও ভাইপো (বামজীবন-পুত্র) কালিকাপ্রসাদের নামে কযেকটি জমিদারি ক্রয় বা পরগণা হস্তগত করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বানগাছিব চৌধুবি (গণেশ রাম ও ভগবতী চবণ)-দের খাজনা বকেয়া পড়ায় কৌশলে তাদের কাছ থেকে পরগণে বানগাছি হাসিল (১৭০৬), সান্তোল (সাঁতোর) রাজ রামকৃষ্ণেব বিধবা পত্নী রানী সর্বাণীর কাছ থেকে ভাতুড়িয়া বা ভাটুবিয়া ক্রয (১৭১০), অতঃপর একে একে পরগণা বাজশাহি ও ভূষণা এবং ইব্রাহিমপুর (১৭১৪), পরগণা নলদহ বা নলদি (১৭১৫), হাবিলি মুহম্মদপুর, তুজ্ঞি, শাহজিয়ান, স্বরূপপুর বা সোহরাবপুর এবং জালালপুর (ঢাকা) জমিদারির ফতেবাদ বা ফতেহাবাদ (১৭১৮) প্রভৃতি ক্রয় করেন ও বন্দোবস্ত নেন।

মূলত এভাবে ছলে-বলে-কৌশলে যে বিশাল ভূখণ্ড রঘুনন্দন করায়ত্ত করেছিলেন তা ছিল আযতনে বাংলার সর্ববৃহৎ জমিদাবি এবং এর আয় ছিল ৫২ লক্ষ টাকার মতো।[১৮২] সরকারি কোষাগাবে এর বাজস্ব জমা পড়তো ১৭,৪১,৯৮৭[১৮৩], মতান্তরে ১৬,৯৬,০৮৭ টাকা।[১৮৪]

১৮০ The Revenue Administration of Northern Bengal, pp 8, বাংলাদেশ জেলা গেজেটীযাব: বৃহত্তর বাজশাহী, পৃষ্ঠা ৩৭০। তবে ড রজতকান্ত বায় এর নাম বামদেব বলে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, পৃষ্ঠা ৫১)।

১৮১ একে 'উত্তরবঙ্গ জমিদারি'ও বলা হয়ে থাকে।

১৮২ বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়াব: বৃহত্তর রাজশাহী, পৃষ্ঠা ৩৭১। স্থানিক ব্যাপকত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে রাজশাহি জমিদারি ছিল তখনকাব লস্কবপুব পরগণা ব্যতীত রাজশাহি, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, বংপুর, ফবিদপুর, ঢাকা, যশোহর, সাঁতাল পবগণা, ভাগলপুব জেলাব ১৩৯টি পরগণাব সমন্বয়ে গডে ওঠা এক বিশাল ভূখণ্ড। রাজস্ব প্রদানেব দিক দিয়ে যদিও এর অবস্থান ছিল বর্ধমান জমিদারিব অব্যবহিত পরে কিন্তু আয়তনে রাজশাহি ছিল বর্ধমানের চেয়েও বড়। (দেখুন, পলাশীব ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, পৃষ্ঠা ৫১)।

১৮৩. The Revenue Administration of Northern Bengal, pp. 19; বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়াব: বৃহত্তর রাজশাহী, পৃষ্ঠা ৩৭১।

১৮৪. পলাশীব ষডযন্ত্র ও সেকালের সমাজ, পৃষ্ঠা ৫১।

১৭২৪ সালে মোটামুটি পরিণত বয়সে রঘুনন্দন উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র কালিকাপ্রসাদও মারা যান। কয়েক বছর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন ও তার অন্য পুত্রও পরলোকবাসী হলে তখন জীবিত ছিল শুধু কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুরামের ছেলে দেবীপ্রসাদ। কিন্তু সে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের হওয়ায় রামজীবন বাধ্য হয়ে মৃত্যুর আগে জনৈক রসিক রায়ের সন্তান রামকান্তকে দত্তক নেন (১৭৩০)। এর বয়স তখন ১৮-বছর মাত্র। এ অবস্থায় দেবীপ্রসাদ ও রামকান্তের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সাময়িকভাবে রামকান্ত জমিদারি হারান। বাংলার মসনদে তখন ছিলেন নবাব আলিবর্দি খান। দেবীপ্রসাদের তদ্বিরে এবং দরবারি রাজনীতির চালে নবাব প্রথম দিকে তার প্রতি অপ্রসন্ন হলেও অচিরেই তিনি তাকে জমিদারি ফিরিয়ে দেন। এখানে উল্লেখ্য যে রামকান্ত যুবক হলেও আচরণে ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও প্রজাবৎসল, স্বভাবতই জমিদারি কার্যে ছিলেন অনেকটা উদাসীন। ফলে তার হয়ে জমিদারি দেখাশুনা করতেন অভিজ্ঞ দিওয়ান দয়ারাম রায়। ইনি যেমন ছিলেন কর্মনিপুণ ও রাজস্ববিষয়ক আইন-কানুনে পারদর্শী, তেমনি সুচতুর ও বুদ্ধিমান। দিওয়ানগিরির ফাঁকে ফাঁকে তিনি জমিদারির সম্পদ বেহাতকরণ ও অন্যত্র নামে-বেনামে জমিদারি ক্রয়ে ব্যস্ত ছিলেন।[১৮৫] অন্যদিকে রামকান্তের স্ত্রী ছিলেন উমা ওরফে ভবানী; যিনি শুধু বিপুল সুখ্যাতির অধিকারিণী, অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ও প্রাতঃস্মরণীয়া বিদুষী নারীই ছিলেন না, পরন্তু ছিলেন --'a woman of great foresight, sagacity and intelligence ' বুদ্ধিমতী স্ত্রীর পরামর্শে ও দয়ারামের বাহ্যিক কর্ম-নৈপুণ্যে রামকান্তের জমিদারি আয়তনে পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। এ পর্যায়ে পরগণে পাতিলাদহ ও স্বরূপপুর পরগণার কিয়দংশ রাজশাহি জমিদারির অধিভুক্ত হয় (সম্ভবত তখন নবাব সরফরাজ খান ছিলেন বাংলার সুবেদার)। মৃত্যুকালে (১৭৪৮) রামকান্ত যে জমিদারি রেখে গিয়েছিলেন তাতে ছিল ১৬৪টি পরগণা এবং এর সরকারি দেয় ছিল ১৮,৫৩,৩২৫ টাকা।[১৮৬] ইত্যবসরে তিনি মোগল বাদশাহ মুহম্মদ শাহের কাছ থেকে 'সনন্দ'ও লাভ করেছিলেন।[১৮৭] রামকান্তের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। একমাত্র কন্যা তারা, ও স্ত্রী ভবানী।

১৮৫. ইনি নাটোরের দীঘাপাতিয়ার জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা। দেখুন, রাজশাহীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কাজী মোঃ মিছের, পৃষ্ঠা ২৭১ ৭৩।

১৮৬. James Grant's 'Analysis', pp 302-307, Quoted from, The Revenue Administration of Northern Bengal, pp. 19.

১৮৭ এই বিখ্যাত সনদ বা 'সনন্দ'টি দীর্ঘ হলেও এখানে এই জন্য তুলে ধরতে চাই যে, এ থেকে মোগল আমলে জমিদারদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অনেক কিছু অবগত হওয়া যাবে। জেমস গ্রান্টকৃত এটির উল্লেখযোগ্য ইংরেজি ভাষ্য এরূপ· 'he (Ramkanta) shall remit the Peshcush etc and the balances in stated instalments to the treasury, and realize the revenues, (after taking credit to himself for the *Muscoorat* Nancar, etc.) from year to year in the customary manner, and at the usual seasons; conducting himself towards the ryots and inhabitants in general in a conciliating manner, and being indefatigable in the expulsion and chastisement of the refractory – he shall be careful that no thieves, highwaymen, or disturbers of the public peace, take shelter within the limits of his jurisdiction, and he is otherwise to exert his endeavours to promote the comfort and

অবশ্য রামকান্ত মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়ে যান। সে অনুসারে রামকৃষ্ণ নামক এক বালককে দত্তক নেন রানী। তবে তাঁর হয়ে জমিদারি পরিচালনা করতেন জামাতা রঘুনাথ লাহিড়ী, যদিও মূল দায়িত্ব-কর্তব্য নির্বাহ করতেন দিওয়ান দয়ারাম। রঘুনাথও অল্পকাল পরে মারা যান। এবার রানী বাধ্য হলেন স্বহস্তে জমিদারি পরিচালনার ভার গ্রহণে।
যা হোক ১৭৫৭ সালে যখন পলাশির প্রান্তরে বাংলার নবাবি তখ্‌তের পরিবর্তন ঘটে তখন রানী ভবানীর নিয়ন্ত্রণাধীন রাজশাহি জমিদারির বিস্তৃতি ছিল বাংলার প্রায় এক-পঞ্চমাংশব্যাপী; মেজর রেনেল-এর আঁকা মানচিত্রানুযায়ী প্রায় ১২,৯০৯ বর্গমাইল। ড. রজতকান্ত রায়ের উদ্ধৃত তথ্য থেকে দেখা যায়, 'মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর পশ্চিম অংশ, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুরের প্রায় সমগ্র ভাগ, রঙপুর ও যশোহর জেলার প্রায় অর্ধাংশ নিয়ে এই জমিদারী অবস্থিত ছিল।'[১৮৮]

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি যখন বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানি লাভ করে তখন এক লাফে রাজশাহি জমিদারির 'জমা' বিশ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে সাড়ে চব্বিশ লক্ষ করেছিল। বলাবাহুল্য এই বিপুল পরিমাণ রাজস্ব পরিশোধ করা রানীর জন্য ছিল নিতান্ত অসম্ভব এক কাজ। কেননা পুণ্যবতী ও ধর্মপরায়ণা বিধবা রানী ততোদিনে স্বীয় জমিদারিতে বিপুল সংখ্যক নিষ্কর বা লাখেরাজ ভূমি সৃষ্টি করেছিলেন। ১৭৭৬ সালের 'আমিনি কমিশনে'র রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এখানে প্রায় ৪,২৯,১৪৯ বিঘা ছিল লাখেরাজ এবং ২,৩৪,৬৯০ বিঘা চাকরান জমি।'[১৮৯] উল্লেখ্য বিঘা প্রতি ১ টাকা খাজনা ধরলেও ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৬,৬৩,৮৩৯ টাকা। অবশ্য বাংলার সব জমিদারিতেই এই জাতীয় লাখেরাজ ও চাকবান ভূমি কমবেশি থাকলেও বলা যায় এটিই ছিল সর্বাধিক। এতো অধিক সংখ্যক লাখেরাজ ছিল একমাত্র বীরভূম

security of the ryots, the increase of cultivation, population, and the revenue. ... he shall be attentive to the protection of the high roads, that travellers may pass and repass without danger or molestation; but if a robbery should be committed, he shall produce the perpetrators with their booty; which shall be restored to its owner, and the delinquents given up for punishment; if he fails to produce the culprits, he shall consider himself responsible for the amount plundered. He shall take especial care, that no individual within the boundaries of his zamindary shall practise any unlawful deeds or drunkenness, and he is strictly forbidden from levying any Aboabs (exactins) prohibited by the Imperial Edict. He shall transmit the requisite accounts of the district in the usual manner, signed by himself and quanungoes of the Soubah to the Public Exchequer.' (Quoted from, The Revenue Administration of Northern Bengal, pp. 19).

১৮৮. পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, পৃষ্ঠা ৬৪।

১৮৯. The Revenue Administration of Northern Bengal, pp. 21; পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, পৃষ্ঠা ২৯৬।

জমিদারিতে।[১৯০] তবে মনে রাখতে হবে যে, সে জমিদারি ছিল রাজশাহির চেয়ে অনেক ছোট। যা হোক ১৭৯৩ সনে রামকৃষ্ণের জমিদারিকালে এই 'জমা' কিছুটা কমিয়ে পুনঃনির্ধারিত হয়েছিল ২৩,২৮,০০০ টাকা।[১৯১] অথচ ১৭৭৮-৭৯ সালেই ১৭৬৬-১৭ সালের বার্ষিক গড় আদায় ২৭,০২,০০০ টাকা থেকে মহারানীর অপরিমেয় দানশীলতা এবং ধর্মীয় ও দাতব্য প্রভৃতি জনহিতকর কাজে[১৯২] বেশুমার খরচের কারণে কমে মাত্র ২২,৮৬,০০০ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছিল।[১৯৩] সেই পরিস্থিতিতে অর্থাৎ আয় অপেক্ষা জমিদারির নিজস্ব ব্যয় ছাড়াই যেখানে সরকারি পাওনা অর্ধ লক্ষেরও বেশী, সেখানে কিভাবে সেই জমিদারি অখণ্ড রেখে পরিচালনা করা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থায় রামকৃষ্ণও মৃত্যুবরণ করলেন ১৭৯৬ সালে। রানীও তখন বয়োভারে ন্যুব্জ, শীর্ণা। রামকৃষ্ণের ২ পুত্র -- শিবনাথ ও বিশ্বনাথ; তারা তখন নাবালক। ফলে চতুর ইংরেজদের কারসাজিতে আইনি মারপ্যাঁচে পড়ে জমিদারি চলে গেলো 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডস'-এর কব্জায়।

১৭৯৮ সালে কুমার বিশ্বনাথ আঠারো বছরে পা দিলে ইংরেজরা তার হাতে জোর করে জমিদারি আবার সঁপে দিলেও ততোদিনে এতদঞ্চলের বহুশ্রুত নাটোর জমিদারি প্রকৃত অর্থেই 'লাটে' উঠেছিল। ড. সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'At last the bewildered raja took over the management at the end of 1798, but within one year under his management the whole of the zamindari was sold for arrears.'[১৯৪]

উপর্যুপরি বকেয়া রাজস্বের দায়ে -- নিলামে-নিলামে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হয়ে শেষ অবধি বাংলার আয়তনে বৃহত্তম, রাজস্ব জমাকরণে দ্বিতীয় জমিদারির কী হাল হয়েছিল তা নিচের ছক থেকেই বুঝা যাবে। ছকের প্রথম কলামে বিক্রীত জমির 'সদর জমা', দ্বিতীয় কলামে নিলামকৃত মূল্য ও তৃতীয় কলামে নিলাম-বিক্রির তারিখ প্রদর্শিত। এখানে প্রথম নিলামের তারিখ থেকে শেষ নিলামের তারিখ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী মাত্র ৭-বছরে গোটা জমিদারিই নিশ্চিহ্ন হয়েছিল, অতঃপর যা ছিল তা ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

---

১৯০. গোলাম হোসায়ন সলীম-এর 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' (বাংলার ইতিহাস) গ্রন্থে বীরভূম জমিদারি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'বীরভূমের জমিদার আসাদুল্লাহ্ ধার্মিক ও দরবেশতুল্য ব্যক্তি ছিলেন; তিনি তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক বিদ্বান, ধার্মিক ও দরবেশদের জন্য মদদ-ই-মাশরূপে দান করেছিলেন এবং গরীব ও দুঃস্থদের জন্য দৈনিক দান বরাদ্দ করেছিলেন।' (অনুবাদ আকবরউদ্দীন, পৃষ্ঠা ১৯৮)। আসাদুল্লাহ স্বীয় জমিদারির অর্ধেক ভূখণ্ড লাখেরাজ হিশেবে বিতরণ করলেও এই জমিদারির আয়তন যেহেতু রাজশাহি অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল, স্বভাবতই রানী ভবানীকর্তৃক সৃষ্ট লাখেরাজই ছিল সর্বব্যাপক ও বিশাল।

১৯১. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর রাজশাহী, পৃষ্ঠা ৩৭৩।

১৯২. ড. অতুল সুর বলেন, 'তাঁর এই বিশাল জমিদারী থেকে লক্ষ দেড় কোটি টাকা খাজনার অর্ধেক তিনি দিতেন নবাব সরকারে, আর বাকী অর্ধেক ব্যয় করতেন নানারকম জনহিতকর ও ধর্মীয় কাজে। অকাতরে অর্থ দান করে যেতেন দীনদুঃখীর দুঃখমোচনে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত প্রতিপালনে ও গুণীজনকে বৃত্তিদানে।' (আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৭৮)। ইংরেজ ঐতিহাসিক O'Malley-র দেয়া তথ্য থেকে জানা যায়, এক বারাণসীতেই তিনি ৩৮০টির মতো মন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (দেখুন, O'Malley's Rajshahi, pp 172).

১৯৩. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর রাজশাহী, পৃষ্ঠা ৩৭৩।

১৯৪. The Permanent Settlement in Bengal, pp 90.

সদর 'জমা'	প্রতি খণ্ড ভূমির নিলামকৃত মূল্য	নিলাম বিক্রয়ের তারিখ
('সিক্কা' টাকায়)	('সিক্কা' টাকায়)	
১১৬৩	১০৬০	জুন ৪, ১৭৯৩
২৮৪	৬৭৪	জুন ১৪, ১৭৯৩
২৫৯৪	২৫৯৪	এপ্রিল ২৭, ১৭৯৫
১৪৩	১৯০	জুন ২৯, ১৭৯৫
১০৪	১০০	আগস্ট ১, ১৭৯৫
১৯১৯	৫১০	সেপ্টেম্বর ১০, ১৭৯৫
৬০৯	৪১৩	অক্টোবর ১৩, ১৭৯৫
১০২	১৭২	মার্চ ৩১, ১৭৯৬
২৮৯	৪৫২	জুন ২৭, ১৭৯৬
৯৭	১৪৫	মে ২৭, ১৭৯৭
৮১	৩৪	মে ২৭, ১৭৯৭
১৩৭	৭৪	মে ২৭, ১৭৯৭
৭৩৮	১২৮০	জুলাই ১, ১৭৯৭
২৩১	৩৫০	জুলাই ২৪, ১৭৯৭
৬৫	২৯	আগস্ট ৫, ১৭৯৭
১০৮	১১৬	সেপ্টেম্বর ১৪, ১৭৯৭
৮০	৭২	অক্টোবর ১৫, ১৭৯৭
৫৪	২৬	জানুয়ারি ৪, ১৭৯৮
৪৬	৫০	জুলাই ৬, ১৭৯৮
৩০৬	১৩২	জুলাই ১০, ১৭৯৮
২৪৮	৯৫	জুলাই ২৩, ১৭৯৮
৪৭	৭৫	সেপ্টেম্বর ২৩, ১৭৯৮
৪০০	২৫১	নভেম্বর ১২, ১৭৯৮
৬৯৬	৪৬৪	ফেব্রুয়ারি ১০, ১৭৯৯
৮১৫	২৬০	ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৭৯৯
২২১	৯৯	মার্চ ১২, ১৭৯৯
৬৬৯	৬০৩	মার্চ ২৩, ১৭৯৯
৯৯২	৬১১	মে ১৮, ১৭৯৯
৬৩০	৩০৪	জুন ১০, ১৭৯৯
২৭০	২৪১	জুলাই ২০, ১৭৯৯
৬৭	২৩	জুলাই ২০, ১৭৯৯
৪১৩	১৬০	জুলাই ৬, ১৭৯৯
৩১১	৬৯৭	জুলাই ২০, ১৭৯৯

সদর 'জমা'	প্রতি খণ্ড ভূমির নিলামকৃত মূল্য	নিলাম বিক্রয়ের তারিখ
১১২	৭২	আগস্ট ২৮, ১৭৯৯
৪০১	১৩৯	আগস্ট ২৮, ১৭৯৯
২৫৪	২৩০	অক্টোবর ১৯, ১৭৯৯
১৪	৫	মে ৭, ১৮০০
১৫,৭১,০০০	১২,৮০,২০০	

সূত্র: The Permanent Settlement of Bengal, pp. 82-84, রাজা রামমোহন বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ৪১-৪২।

উপরের তালিকায় দু'টি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তা হলো, এক বরাবরের মতো সদর 'জমা' বা সরকারি ডাক অপেক্ষা নিলামকৃত মূল্য তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট কম ছিল, এবং দুই, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কয়েক মাসের মধ্যে সুবিশাল রাজশাহী জমিদারির যে বিক্রয়ের পালা শুরু হয়েছিল তা ঐ শতাব্দীরই শেষ নাগাদ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে, অর্থাৎ মাত্র ৭-বছরের মধ্যে বাংলার বৃহত্তম জমিদারির অটুট অস্তিত্বের ভয়ানক ভাঙ্গন ও বিলুপ্তি ঘটেছিল। অতঃপর এর যে অবশেষ ছিল তার 'জমা' ছিল মাত্র ৩৪,০০০ 'সিক্কা' টাকা।[১৯৫]

এখানে প্রদর্শিত নিচের ছক থেকেও আরও কিছু তথ্য পাওয়া যাবে যেখানে নিলামের বাইরেও যে কিছু ভূমি হস্তান্তরিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

দশসালা বন্দোবস্তের 'জমা'	২২,৫০,২০০ 'সিক্কা' টাকা
নিলামের ফলে 'জমা' বাদ	১৫,৭১,০০০ "
নিলাম ব্যতীত বিক্রির ফলে 'জমা' বাদ	২,৭৩,৯০০ "
তালুক আলাদাকরণের ফলে 'জমা' বাদ	৩,৭১,০০০ "

এ পর্যায়ে রানী ভবানীর শেষ জীবনের দু'একটি করুণ বৃত্তান্ত তুলে ধরে প্রসঙ্গান্তরে যাবো। তাঁর এ বিয়োগান্তক কাহিনী থেকে বুঝা যাবে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষময় ছোবল বাংলার আপামর রায়তকুলের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী বনেদি জমিদার-পরিবারগুলির ধারক-বাহকদেরও কী নিদারুণ হাল করে ছেড়েছিল। বস্তুত এ সব কিছুর মূলে ছিল বিদেশি বেনিয়াগোষ্ঠীর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অপচেষ্টা।

বাংলা ১২০৩ সনে ৭৯-বছর বয়েসে রানী ভবানী মৃত্যুবরণ করেন। বলাবাহুল্য যিনি গরিব-দুঃখীর দুঃখ-পীড়ন মোচনে ছিলেন যারপরনাই অকাতর, বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় যাঁর বদান্যতা ও দানশীলতার তুলনা ছিলেন তিনি নিজেই, তাঁর শেষ জীবন কি-না কেটেছিল অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ও মানসিক নির্যাতনে। একদিকে সুবিশাল জমিদারির ক্রম-ক্ষয়মানতা যেমন তাঁকে নীরব সাক্ষীর মতো চেয়ে চেয়ে দেখতে হচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনি একের পর এক খুব কাছের

১৯৫ The Permanent Settlement in Bengal, pp. 84.

আত্মীয়-স্বজনদের তাঁকে ছেড়ে পরপারে চলে যাওয়ারও তিনি হয়েছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী, সর্বোপরি বেনিয়াচক্র তাঁকে চতুর্দিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এরই অনিবার্য অভিঘাতে, 'শেষ পর্যন্ত রাণী ভবানী এমন নিঃস্ব হয়ে গেলেন যে তাঁকে নির্ভর করতে হল কোম্পানি প্রদত্ত মাসিক (মাত্র) এক হাজার টাকা বৃত্তির ওপর।'[১৯৬] শুধু তাই নয়, 'তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদি করবার জন্য, তাঁর স্বজনদের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল ইংরেজ কোম্পানির কাছে।' আর এভাবেই 'তাঁর ললাটে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কালিমার টিকা।' একেই বলে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। প্রসঙ্গত এখানে এটাও জানিয়ে রাখা ভালো যে, রানী ভবানীর জমিদারির মতো বাংলার অপরাপর বৃহৎ জমিদারিগুলির দ্রুত মালিকানা বদল হলেও সেগুলির সবই গিয়ে পড়ছিল বা পড়েছিল এক হিন্দুর হাত থেকে আরেক হিন্দুর হাতে। জাতিগত দিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে -- তা একই সম্প্রদায়ের মধ্যে বা হাতে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে আগের বংশানুক্রমিক জমিদারদের সঙ্গে এই নব্য ভুইফোঁড়দের পার্থক্য হলো, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া চরিত্রে শেষোক্তদের অধিকাংশই ছিল জুলুমবাজ, শোষক ও 'দুর্বৃত্ত' শ্রেণীর।'[১৯৭]

---

১৯৬ ১৭৯৯ সালের ১০ই অক্টোবরের এ সংক্রান্ত এক সরকারি আদেশ ছিল এ রকম: 'The former rank and situation of Maharanny Bowanny, her great age, and the distress to which both herself and the family have been reduced by the imprudence and misconduct of the Late Rajah of Rajesahy, are circumstances which give her claims to the consideration of Government. We therefore authorise to continue to her an allowance of Rs 1000 per month' (সংগৃহীত, আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৭৯)। উল্লেখ্য, কতো নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর হলে কোম্পানি এ ঘোষণা দিতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

১৯৭ ড অতুল সুর প্রমুখ আধুনিক লেখকগণ এদের কাউকে কাউকে সরাসরি 'দুর্বৃত্ত' হিশেবে চিহ্নিত করেছেন (আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৭৮), এবং তা যে অতিরঞ্জন নয় তার প্রমাণ এদের সম্পর্কিত ঐতিহাসিকদের যথার্থ মূল্যায়ণ। এর দু-একটি এখানে উল্লেখ করা হলো। এই বর্ণনা কিছুটা দীর্ঘ হলেও এই নব্য জমিদারগোষ্ঠীর মূল শ্রেণীচরিত্র বুঝতে এটুকু জরুরি বলে মনে করি।

কাশিমবাজার জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু সম্বন্ধে 'মুর্শিদাবাদ জেলার সত্যিকারের ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১) শ্রীরতন লাহিড়ী উল্লেখ করেনঃ 'ভারতবর্ষের সত্যিকারের ইতিহাসে শয়তানদের পার্শ্বচর বলে বর্ণিত হবে যারা তাদের অন্যতম মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারের কান্তবাবু বা কান্তমুদি বা কৃষ্ণকান্ত নন্দী। ইনি প্রথম জীবনে ছিলেন কাশিমবাজারের রেশম কুঠির মুহুরী। . পরবর্তীকালে (বিভিন্ন স্থানে) ইংরেজ সৈন্য ব্যাপক লুণ্ঠন করলে এই লুণ্ঠনের মোটা ভাগ পেয়েছিলেন কান্তবাবু। কাশী রাজভবনের পাথরের থাম, জানালা প্রভৃতি খুলে নিয়ে এসেছিলেন কান্তবাবু। বহু দুষ্কর্মের এই পাণ্ডাটি ১২৫০ বঙ্গাব্দে নরক বা দোজক যাত্রা করে। এই শয়তানই কাশিমবাজার জমিদার বাড়ির স্রষ্টা।'

(উদ্ধৃতি সংগ্রহ, চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমাদ মোর্তজা, পৃষ্ঠা ১৯৬-৭)।

একই লেখক কান্দি-পাইকপাড়ার জমিদারির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সম্পর্কে বলেনঃ 'এই কুখ্যাত লোকটি ছিলেন দেবীসিংহের জুড়িদার এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের একটি প্রিয় সহচর। . ধূর্তামি, জালিয়াতী, প্রবঞ্চনার ব্যাপারে ইনি ছিলেন এঁদের মধ্যে সর্বোত্তম। . গঙ্গাগোবিন্দ .. তখনকার দিনে ৭০০ টাকা মাহিনার চাকুরিতে নিযুক্ত হন। এর পর থেকে গঙ্গাগোবিন্দের জয়যাত্রা শুরু। . এই গঙ্গাগোবিন্দ তাঁর পুত্র প্রাণকৃষ্ণকে তাঁর সহযোগী করে

অন্যদিকে বীরভূমের বাইরে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জমিদার-তালুকদার ছিল তাদের মধ্যে 'বিক্রয় আইনে'র ছোবলে পড়ে বাংলার মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ড মুহম্মদ আবদুর রহিম বলেন, 'The Permanent Settlement was a **severe** blow to the Muslims because many hereditary Muslim zamindars lost their estates.'[১৯৮] অবশ্য ড সিরাজুল ইসলাম, মুসলমান জমিদারশ্রেণীর এই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ততার বিষয়টি স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, 'উইলিয়ম হান্টারের অনুসরণে অনেকে মনে করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদার সব ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাহাদের স্থান দখল করেন নব্য হিন্দু পুঁজিপতি। এই ধারণার ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা নাই। মুঘল আমল হইতে ভূমি প্রশাসনে হিন্দুদের ছিল একচেটিয়া আধিপত্য, আর মুসলমানদের ছিল বিচার বিভাগে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে ছয়টি বৃহৎ জমিদারীর মধ্যে একমাত্র বীরভূমের রাজা ছিলেন মুসলমান, বাকী সবাই হিন্দু। ক্ষুদ্র জমিদারদের মধ্যেও বেশীর ভাগ ছিলেন হিন্দু। যে যৎসামান্য জমিদার ছিলেন মুসলমান তাহাদের বেশীর ভাগই ছিলেন অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র জমিদারগণ সূর্যাস্ত আইনে খুব কমই ক্ষতিগ্রস্ত হন।'[১৯৯]

তবে ড ইসলাম যতোটা সরলীকরণ করেছেন বিষয়টি আদৌ ততো সরল ছিল না।

কেননা সদ্য রাজ্যচ্যুত, উচ্চনীচ নির্বিশেষে আপামর মুসলমান সম্প্রদায় যে আগে থেকেই নবীন শাসকশ্রেণী তথা ইংরেজদের মেনে নিতে পারেনি, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ড ইসলামের ভাষায় যে কিছু পরিমাণ 'ক্ষুদ্র জমিদার' বা তালুকদার তখনও পর্যন্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে টিকে ছিল, নতুন ব্যবস্থায়, বিশেষ করে 'বিক্রয় আইনে'র কবলে পড়ে সেই সুযোগও যখন হাতছাড়া হয়ে গেল, এবং অনেকেই পথের ভিক্ষুকে পরিণত হলো, তখন মুসলমানদের এই সামান্য ক্ষতিকেও অত্যন্ত প্রবল ও মারাত্মক বলতে হয় নৈ কি।

নেন। শোষণের প্রয়োজনে এঁরা জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা, শক্তি প্রয়োগ সব কিছু অপরাধ করেছিলেন। বিধবার সম্পত্তি অপহরণ, নাবালকের সম্পত্তি অধিগ্রহণের ব্যাপারে ইনি ছিলেন বিশেষভাবে অভিজ্ঞ।' (সংগৃহীত, ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৮-৯)।

আর গঙ্গাগোবিন্দের গুরু খোদ দেবীসিংহ সম্বন্ধে নিখিলনাথ রায় লিখেছেনঃ 'যদি কেহ অত্যাচারের বিভীষিকাময়ী মূর্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ মানব প্রকৃতির মধ্যে শয়তানবৃত্তির পাপ অভিনয় দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি একবার দেবীসিংহের বিবরণ অনুশীলন করিবেন, দেখিবেন, সেই ভীষণ অত্যাচারে কত কত জনপদ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কত কত দরিদ্র প্রজা অন্নাভাবে জীবন বিসর্জন দিয়াছে। কত কত জমিদার ভিখারীরও অধম হইয়া দিন কাটাইয়াছে। কুল-ললনার পবিত্রতা-হরণ, ব্রাহ্মণের জাতিনাশ, মানীর অপমান, এই সকল পৈশাচিক কাণ্ডের শত শত দৃষ্টান্ত ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাইবেন। দেবীসিংহের নাম শুনিলে, আজিও উত্তরবঙ্গ প্রদেশের অধিবাসিগণ শিহরিয়া উঠে, আজিও অনেক কোমল হৃদয়া মহিলা মূর্ছিতা হইয়া পড়েন। শিশুসন্তানগণ ভীত হইয়া জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লয়। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এরূপ পাশব অত্যাচারের দৃষ্টান্ত অধিক নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।' (মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃষ্ঠা ৩৪১)।

১৯৮ A Short History of Pakistan: Alien Rule and The Rise of Muslim Nationalism, pp. 76.
আরও দেখুন, The Muslim Society and Politics in Bengal, pp 34

১৯৯ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৯৩।

ড. আজিজুর রহমান মল্লিক বলেন, 'The Settlement of 1793 ... was in fact, however, that it most seriously damaged the position of the great Muslim aristocracy.'[২০০]

আসলে মুসলিম অভিজাতমণ্ডলীর এই পতনে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ক্ষতি হয়েছিল এই যে, ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা বলার, সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দেন-দরবার করার লোকের সংখ্যা তখন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছিল; বস্তুত যে সুবিধা ছিল হিন্দুর, বাংলার মুসলমানদের তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিঃশেষ করে দিয়েছিল।

তবে প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় ঝাড়ে-বংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এ অঞ্চলের আপামর কৃষক জনসাধারণ, বিশেষত 'খোদকাস্ত' রায়তগণ। বিদেশি বেনিয়াচক্রের কলমের এক খোচায় এরা শুধু ভূমির স্বত্ব হারালো (আরও সুস্পষ্ট করে বললে বলতে হয় এদের ভূ-স্বত্বাধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিল) তাই নয়, পরন্তু পরবর্তীকালে জমিদারদের নানারূপ শাসনে-শোষণে, নিপীড়নে-নির্যাতনে এরা নিতান্তই ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল।

বিখ্যাত বামপন্থী লেখক শ্রীনরহরি কবিরাজ যথার্থই উল্লেখ করেন, 'মুঘল আমলে জমিদারদের উপরে কোনো মালিকানাস্বত্ব ছিল না। তারা ছিল রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশ অর্থাৎ খাজনা-আদায়কারী মাত্র। মুঘল যুগে জমির মালিকানা না থাকলেও দখলিস্বত্ব ছিল কৃষকের। রাষ্ট্র জমির মালিক ছিল না। জমির উপর প্রধান অধিকার ছিল তার যে জমি কর্ষণ করত (এ প্রসঙ্গে অবশ্য আমাদের মত কিছুটা ভিন্ন)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এইদিকে অগ্রগামী পরিবর্তনের সূচনা না করে পশ্চাদ্‌গামী পরিবর্তনের সূচনা করল। কৃষকদের যে অধিকার ছিল তা সর্বাংশে কেড়ে নিয়ে জমিদারদের মালিকানাস্বত্ব দেওয়ার ফলে কৃষকেরা শক্তিশালী জমিদারদের অর্ধদাসে পরিণত হল।'[২০২]

এই ব্যাপারটি আরেক জন বামপন্থী লেখক-চিন্তাবিদ ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর এক সাম্প্রতিক লেখায় আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ 'ইংরেজ এসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিল, ১৭৯৩ সালে। তাতে কৃষক পরিণত হলো জমিদারের প্রজায়; এখন সে বন্দী, হালের গরুটির মতো। ভূমিতে তার স্বত্ব নেই; জমিদার ইচ্ছামতো খাজনা বসায়। না-দিলে বেঁধে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছা পেটায়। জমিদার বাড়ির তো বটেই, নায়েব গোমস্তা বাড়ির বিয়ে, অন্নপ্রাসন, শুদ্ধি, তীর্থযাত্রা সবরকমের অনুষ্ঠানের জন্য আবওয়াব অর্থাৎ অবৈধ টাকা তোলা বৈধ ছিল। জমিদার তো অবশ্যই, নায়েব-গোমস্তা পাইক বরকন্দাজের বিরাট বহরও কৃষকের শ্রম-শক্তি শোষণ করে বিলাস করতো। কৃষকের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হলো।'[২০৩]

আসলে কৃষককুল যে কী ভয়ঙ্কররূপে, বিভিন্ন মাত্রায় ও পদ্ধতিতে শোষিত, নির্যাতিত ও

২০০ British Policy and the Muslims in Bengal, pp 38.

২০১. ইংরেজ ঐতিহাসিক Hollingbury পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, 'Among the foremost of the results of the Permanent Settlement must be placed the destruction of those rights of millions of cultivating proprietors ..The object of the permanent settlement was to give security and contentment to the "great body" of inhabitants, that is, to the millions of cultivating proprietors, it is precisely that class which the settlement has destroyed.' (Zemindari Settlement of Bengal p. 69-83)

২০২. স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, পৃষ্ঠা ২৬।

২০৩. বাঙালীর জাতীয়তাবাদ, পৃষ্ঠা ৩৫৩।

উৎপীড়িত হয়েছিল পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করবো।
আগেই বলেছি, কোনরূপ প্রাক-জরিপ এবং স্বত্ব ও দখলবিষয়ক কোন কাগজপত্র যাচাই-বাছাই ছাড়াই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের আর একটা অনিবার্য প্রতিফল হয়েছিল এই যে, তা শুধু এ অঞ্চলের বংশানুক্রমিক বৃহৎ জমিদারিগুলিকে খণ্ড-বিখণ্ড এবং রায়তকুলকে ভূমিদাসে পরিণত করেই ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু তাদের একে-অপরের মধ্যে বিশেষত জমিদারে-জমিদারে, জমিদারে-তালুকদারে, জমিদারে-রায়তে, এমন কি একই জমিদার বা তালুকদারের উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমা বাঁধিয়ে ছেড়েছিল। এর চূড়ান্ত পরিণামে, মামলায় লিপ্ত সংঘর্ষমান পক্ষগুলিই শুধু অর্থনৈতিক-সামাজিকভাবে সর্বসান্ত হয়নি, ব্যাপকার্থে তা বাংলার সমূহ ধ্বংসকেও ডেকে এনেছিল।
সুতরাং এই বিবেচনায় T R E. Holmes-এর কথায় নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, 'The Permanent Settlement was a sad blunder. ... The inferior tenants derived from it no benefit whatever. The zamindars again and again failed to pay their rent charges, and their estates were sold for the benefit of the government.'[২০৪]
কর্নওয়ালিস বা কোম্পানির নীতিনির্ধারকগণ যতোই এ দেশের উন্নতি আর রায়তের কল্যাণের কথা বলে 'জমিদারি', 'তালুকদারি', 'রায়তওয়ারি', 'মহালওয়ারি', 'গ্রামওয়ারি' বা 'মালগুজারি' ইত্যাদি যে ব্যবস্থা-পদ্ধতিই প্রবর্তন করুক না কেন, তার মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য যে ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি ও স্বার্থ-চিন্তা, সেটা হিন্দু-মুসলিম ঐতিহাসিকগণ যেমন উল্লেখ করেছেন, হোম্‌স-এর ন্যায় নিরপেক্ষ ইংরেজ যেমন স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি, তেমনি বামপন্থী লেখক-চিন্তাবিদগণ তো তার আরও কঠোর সমালোচনা করেছেন।
তবে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে 'সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ও সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ' করেছেন সম্ভবত কার্ল মার্কস।[২০৫] তিনি মন্তব্য করেন (১৮৫৩): 'The Zemindari and the Ryotwari were both of them agrarian revolutions, effected by the British ukases, and opposed to each other; the one aristocratic, the other democratic; the one a caricature of English landlordism, the other of French peasant-proprietorship: but pernicious, both combining the most contradictory charactor – <u>both made not for the people, who cultivates the soil, not for the holder, who owns it, but for the Government that taxes it.</u>'[২০৬]
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, তা বাংলার কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ

---

২০৪ History of the Indian Mutiny, pp. 12; quoted from, History of British India under the Company and the Crown, pp 229.
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উত্তর দূষিত পরিবেশে কাজ করে ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের পর বাকেরগঞ্জ জেলার সেটেলমেন্ট রিপোর্টে মেজর জ্যাক বেশ কাব্যিক ঢঙে মন্তব্য করেছিলেন, এই ব্যবস্থা ছিল 'দুনিয়ার সুশৃঙ্খল ভূমিব্যবস্থার সবচেয়ে বিস্ময়কর অপকৃষ্ট নকল'।
(উদ্ধৃতি সংগ্রহ, কৃষকসভার ইতিহাস, মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, পৃষ্ঠা ১৯)।

২০৫ চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারী: বাংলার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা, নেপাল মজুমদার, পৃষ্ঠা ২০।

২০৬. উদ্ধৃতি সংগ্রহ, চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারী : বাংলার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা, পৃষ্ঠা ২০।

ঘটিয়েছিল। অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম যথার্থই মন্তব্য করেন, 'পূর্বতন ব্যবস্থায় গ্রামগুলো ছিল প্রায় স্বনির্ভর। উৎপাদন প্রধানতঃ নিজেদের (এবং গ্রামের) চাহিদা মেটানোর জন্যই করা হতো। পণ্যের আদান-প্রদান থাকলেও তা' ছিল গ্রাম-পর্যায়ে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়। কিন্তু নতুন ভূমি-ব্যবস্থায় বাংলার কৃষি পূর্বতন প্রাকৃতিক অর্থনীতির পর্যায় থেকে উত্তরণ করলো পণ্য-অর্থনীতির পর্যায়ে। উৎপাদন হলো বাজারে বিক্রয়ের পণ্য[২০৭], শুধুমাত্র নিজের চাহিদা মেটানোর উপকরণ নয়। কৃষির এই বাণিজ্যিকরণ সমগ্র অর্থনীতিতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। কৃষির বাণিজ্যিকরণের ফলে একদিকে ভেঙ্গে পড়লো পূর্বেকার স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি, অন্যদিকে বিলুপ্ত হলো গ্রামের তাঁতী ও অন্যান্য কুটীর-শিল্পী-সম্প্রদায়। মেশিনে তৈরী সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান আমদানী কুটীর-শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এসব সত্ত্বেও কৃষির বাণিজ্যিকরণকে তৎকালীন পরিস্থিতির বিচারে একটা প্রগতিশীল ব্যবস্থা বলেই গ্রহণ করতে হবে। তবে সেই সাথে এ-ও আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই পরিবর্তন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এনেছিলো তাদেরই স্বার্থে -- এককথায় ইংলণ্ডের বিকাশমান শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য -- আমাদের দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য নয়।'[২০৮]

যা হোক এ পর্যন্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা একটা কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মূলত কর্নওয়ালিস-এর ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার প্রায়-নিস্তরঙ্গ সমাজ বিন্যাসে আকস্মিক সৃষ্টি হয়েছিল -- 'নতুন স্তর, নতুন সমস্যা। এককথায় বৃটিশ শাসনের ভূমি ব্যবস্থার ফলে প্রচলিত ভূম্যধিকারী সমাজে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয় তাহার প্রতিক্রিয়া শুধু ভূপতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। উৎপাদন ক্ষেত্রে, সমাজ বিন্যাসে, আচার উৎসব ও চিন্তাধারায় সর্বত্র অনুভূত হয় বৃটিশ ভূমি ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী প্রভাব।'[২০৯]

এই ব্যবস্থার যতো খারাপ দিক বা বিরূপ প্রভাবই থাকুক না কেন, সব কিছুর পাশাপাশি এটাও অবলীলায় স্বীকার করতে হয়, 'এ ধরনের বহু ত্রুটি সত্ত্বেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর হাতে কিছু বাড়তি টাকার যোগান রেখেছিল যা বাংলা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি আন্দোলন, শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চায় সহায়ক

২০৭ উৎপাদনই শুধু বাজারে বিক্রয়ের পণ্য হয়েছিল সেটাই নয়, খোদ জমিই পরিণত হয়েছিল প্রকাশ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যসামগ্রীতে। এর ফলে ভূমি-নির্ভর বাংলার কৃষি-অর্থনীতির অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল তার একটি বাস্তব তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় মাত্র এক দশক পরে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের তৎকালীন কালেক্টরের প্রেরিত একটি প্রতিবেদন থেকে; তিনি উল্লেখ করেছিলেন, 'ক্রয়-বিক্রয় ও ক্রোক করার প্রথার ফলে বাংলার ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে যে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে, তার অপেক্ষা অধিকতর পরিবর্তন বোধ হয় কোনও যুগে কোনও দেশেই কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ বিধিবিধানের দ্বারা সংঘটিত হয়নি।'
(উদ্ধৃতি সংগ্রহ, রাজা রামমোহন: বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি পৃষ্ঠা ৩৭)।

২০৮ বাংলাদেশ, সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা, পৃষ্ঠা ৩৫।
নরহরি কবিরাজ বলেন, 'কোম্পানি একান্ত সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে এই ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও তারা ইতিহাসের যন্ত্র হিসাবে কাজ করল। অর্থাৎ জমির উপর পূর্ণ মালিকানাস্বত্ব, জমিকে পণ্যদ্রব্য হিসাবে দেখা, জমি কেনা-বেচা ইত্যাদি আধুনিক ব্যবস্থাগুলি যা হিন্দুস্থানে গ্রামীণ সমাজে কখনও গড়ে ওঠেনি সেইগুলির পত্তন করল কোম্পানি এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাহায্যে।' (স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, পৃষ্ঠা ২৬)।

২০৯ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৯৪।

হয়েছিল। বিদেশী শাসকের হাতে যদি এ উদ্বৃত্ত ভূমিরাজস্ব যেত তাহলে বাঙ্গালীদের এই প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন হত কিনা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়।"[২১০]

অধিকন্তু এটাও সত্য যে, 'সেদিন ইংরেজ একদিকে যেমন বাঙলার গ্রামগুলিকে হীন ও দীন করে তুলেছিল অপর দিকে তেমনই নগরে এবং তার আশপাশে গড়ে তুলেছিল এক নূতন সমাজ। সে সমাজের অঙ্গ ছিল ব্যবসাদার, ঠিকাদার, দালাল, মহাজন, দোকানদার, মুন্সী, কেরানী প্রভৃতি শ্রেণী। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার সমাজ-জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।'[২১১] নঙর্থক হলেও এই পরিবর্তন ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনিবার্য ফল।

উপসংহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সূচিত প্রচলিত ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের সর্বশেষ স্থিতি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাংলার ভূমিরাজস্ব সম্বন্ধে সামান্য ধারণা দিয়ে আমরা এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করবো। তবে পরবর্তীতে ভূমিরাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে যেহেতু প্রসঙ্গান্তরে প্রায়শই আলোচনা করা হবে সেহেতু এখানে শুধু ড. আলী আহমদের বর্ণিত একটি তথ্য তুলে ধরাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

তাঁর ভাষায়, 'In its final form as embodied in his (Cornwallis) Regulations of 1793, his scheme regarding the machinery of government was as follows. At the top was the Governor General in Council with the necessary Secretariat. Next came two boards, the Board of Trade, and the Board of Revenue, each presided over by a member of the Council. The local unit of administration was the district, to which officers were posted to perform three main functions, to keep the peace, collect the revenue and administer justice. This organization of the governmental machinery was the lasting achievement of Cornwallis."[২১২]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাংলার ভূমিরাজস্ব	
'জমা'র বছর	'জমা'র পরিমাণ (টাকায়)
১৭৯৪-৯৫	৩,২৩,৫২,৫৯০
১৭৯৫-৯৬	৩,১৩,০৬,৯৭০
১৭৯৬-৯৭	৩,১১,৮৫,৫৬০
১৭৯৭-৯৮	৩,০৯,৭৪,৪৩০
১৭৯৮-৯৯	৩,০৭,২৭,৪৩০
১৭৯৯-১৮০০	৩,২১,৩২,৩০০

২১০. ড. ধীরাজ ভট্টাচার্যের সূত্রে ড. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৪২-৪৩।

২১১. বাংলার সামাজিক ইতিহাস, ড. অতুল সুর, পৃষ্ঠা ১১০-১১১।

২১২. Role of Higher Civil Servants in Pakistan, pp. 18-19.

পঞ্চম অধ্যায়

কোম্পানির সরকারের অধীনে হতশ্রী বাংলা

'With the introduction of the Permanent Settlement and the conversion of rent-collectors into landlords began a period of greater ruin for Bengal.'[১]

শুরুতেই বলে নেয়া ভালো যে, বক্ষ্যমাণ উদ্ধৃতিটিকে এ অধ্যায়ে আমরা মূল বক্তব্য হিশেবে প্রতিপাদন ও উপস্থাপনের চেষ্টা করবো। মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়েই এককথায় বাংলার তথা এতদঞ্চলের প্রকৃত দুর্গতি ও অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছিল। আর এটা প্রমাণের জন্য এখানে ১৭৯৩ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাসম্পর্কিত যে সকল আইন-বিধি (এর অধিকাংশই ছিল কালাকানুন) প্রভৃতি প্রণীত হয়েছিল -- একদিকে সেগুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক অংশ যেমন তুলে ধরবো, তেমনি অন্যদিকে কর্নওয়ালিস-সৃষ্ট ব্রিটিশানুগত মেরুদণ্ডহীন নব্য জমিদারগোষ্ঠীর দ্বারা অতঃপর যে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ন্যায় বল্গাহীনভাবে রায়ত শোষণ ও নিপীড়ন শুরু হয়েছিল সেটিও সংক্ষেপে আলোচনা করে বাংলার এই পর্বের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার অন্তঃপ্রকৃতি তুলে ধরায় ব্রতী হবো। এই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে ইংরেজকর্তৃক বাংলা তথা ভারত থেকে ইংল্যান্ডে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার করা হয়েছিল (এটিকে চৌর্যবৃত্তি বা লুণ্ঠনও বলা যেতে পারে), তারও কিছু কিছু তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা করবো।

আলোচনার সুবিধার্থে ১৭৯৩-১৯৪৭ পর্বকে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হলো --এক. ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৮, এবং দুই. ১৮৫৯ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে শেষোক্ত ভাগে আমাদের মুখ্য আলোচ্য হবে ১৮৫৯ সালের 'খাজনা-আইন' ও ১৮৮৫ সালের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' (প্রসঙ্গের ব্যাপকত্ব ও গুরুত্ব বিবেচনায় এই ভাগের আলোচনা পৃথক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

যা হোক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালুর পর ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাসম্পর্কিত যে সকল 'রেগুলেশন' বা প্রবিধান জারি করা হয়েছিল[২], তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটির শিরোনাম ও সেগুলির মৌল প্রতিপাদ্য এবং বাস্তবে আইনটি কতোখানি

---

১. British Rule in India: An Assessment, Dr. Ram Gopal, pp. 34.

২. যেন-তেন প্রকারে রাজস্বের জন্য হন্যে বিদেশি বেনিয়াচক্র বাংলাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে এই সময়ে কতো যে প্রজাস্বার্থ-বিরোধী ও নিপীড়নমূলক আইন প্রণয়ন করেছিল তার সঠিক ইয়ত্তা পাওয়া দুষ্কর। এর সংখ্যাধিক্যের নমুনা এ থেকেই অনুমান করা যাবে যে, কর্নওয়ালিস যখন ১৭৯৩ সালে তার 'Code' তৈরি করেছিলেন তখন এক দিনেই ৪৩-টি প্রবিধান ঘোষিত হয়েছিল। দেখুন, The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 400.

কার্যকর বা ফলপ্রসূ হয়েছিল সেটি সংক্ষেপে নিচে বর্ণনা করা হলো।

১৭৯৩ সালের ৮ নং প্রবিধান

এই প্রবিধান বলে রায়তদের কাছ থেকে জমিদার, তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিককর্তৃক অবৈধ সেস বা কর, সরকারি পরিভাষায় 'আবওয়াব' বা 'মাথোট' আদায় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এছাড়া জমিদারকর্তৃক রায়তদের 'পাট্টা' দেয়ারও নির্দেশ জারি করা হয়। জমিদার ইচ্ছে করলে অর্থাৎ খেয়াল-খুশি মতো 'পাট্টা' বাতিল করার অধিকারী ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে তাকে প্রমাণ করতে হতো যে, তিনি 'পাট্টা' অনেকটা বাধ্য হয়ে দিয়েছেন, অথবা পরিস্থিতি এমন হতো যে বিগত ৩-বছরের গড় দেয়-এর চেয়ে পরগণার প্রচলিত হার বা নিরিখ-বন্দি হ্রাস পেয়েছে, অথবা সাধারণ জরিপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে রায়তের দেয় খাজনার হার বা পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু এ ছিল আইনি ব্যবস্থা। বাস্তবে জমিদার কখনই রায়তকে খুব সহজে 'পাট্টা' দেয়নি এবং দিলেও তাতে উল্লিখিত শর্তাদি পালনের ধার তিনি ধারতেন না। নানা কারণে রায়তও তা গ্রহণে বিশেষ আগ্রহী হতো না।[৩] ফলত উভয়ের সম্পর্ক তাই থাকতো সর্বদা পারস্পরিক সন্দেহযুক্ত, শীতল ও বৈরিতাপূর্ণ। অন্যদিকে কোম্পানির সরকারও ছিল এ বিষয়ে উদাসীন। জমিদারের কাছ থেকে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব নির্ধারিত রাজস্ব উসুল হলেই তারা নিজেকে দায় মুক্ত মনে করতো। যেন রায়তের প্রতি সরকারের কোন দায়িত্বই নেই।

সরকারি রিপোর্টে এর স্বীকৃতি পাওয়া যায় এভাবে: 'But beyond these vague and general rules, there was nothing laid down to regulate the relations between the zamindars and the raiyats.'[৪]

১৭৯৩ সালের ১৭ নং প্রবিধান

যে কোন কারণেই হোক রায়তের দেয় খাজনা বাকি পড়লে জমিদার এই প্রবিধান বলে রায়তের অস্থাবর মালামাল ক্রোক করতে পারতো।

১৭৯৪ সালের ৩ নং প্রবিধান

ইতোপূর্বে বকেয়া রাজস্বের জন্য সরকার জমিদারদের আটক করতে পারতো। এই প্রবিধান বলে সরকার সেই ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নেয়। কারণ হিশেবে বলা হলো যে, জমিদারের

---

৩. এ সম্বন্ধে ফ্লাউড কমিশন রিপোর্টে সংক্ষেপে তৎকালীন বাস্তব অবস্থা এভাবে তুলে ধরা হয়েছেঃ 'One of the provisions by which it was hoped to assure the customary rights of the khudkasht raiyats was the issue by the zamindars of pattas stating the rent payable by each raiyat. But the Patta Regulation, as it was called, was a complete failure. The zamindars thought it against their interests to limit their claims; while the raiyats apprehended that they might be evicted at the expiry of the 10 years prescribed by the patta.' (Vol. I., pp. 21).

৪. Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 85.

জমিদারিই তার রাজস্বের সবচেয়ে বড় জামিন। এ ক্ষেত্রে বাকি বাজস্বের জন্য তাকে বন্দি না করে বরং সংশ্লিষ্ট জমিদারির গোটা বা আংশিক বিক্রি করে বকেয়া উসুল করা হোক। অবশ্য তাতেও না কুলোলে তখন তাকে কয়েদ করা যেতো।

১৭৯৬ সালের ৫ নং প্রবিধান

প্রচলিত বিধান ছিল সরকাব বকেয়া রাজস্বের জন্য সংশ্লিষ্ট জমিদারি খণ্ড খণ্ড করে নিলামে বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু এই প্রবিধানে বলা হলো, জমিদারি বিক্রিব পর সরকারি পাওনা উসুল করার পরে যদি কোন উদ্বৃত্ত থাকে তবে তা জমিদারকে প্রত্যর্পণ করা যাবে।

১৭৯৯ সনের ৭ নং প্রবিধান

এটাই সেই কুখ্যাত 'হপ্তাম' (Haftam) প্রবিধান। খোদ ইংরেজ লেখকদের রচনা ও বিভিন্ন সবকারি বিপোর্টেই একে 'notorious' বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।[৫]
স্বভাবতই এটা যে কতো ভয়াবহ ছিল তা শুধু এর মূল বক্তব্য থেকেই অনুমেয় নয়, বরং এব কুফলও ছিল অত্যন্ত মাবাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। বলতে গেলে ইংরেজ আমলে বিশেষ করে মধ্য-উনবিংশ শতকের আগে-পরে এদেশে কৃষক সমাজের ওপর জমিদারকর্তৃক যতো অত্যাচার-অবিচার, নিপীড়ন-নির্যাতন হয়েছে তার মূলে ছিল এই বর্বর 'হপ্তাম' প্রবিধানের প্রভাব।
এর মূল প্রতিপাদ্য বা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপধারা (মূলত ১৫ ধারা) ছিল নিম্নরূপ[৬]:

১. খাজনা আদায় নিশ্চিত করাব জন্য জমিদার সবকাবের পূর্বানুমতি ছাড়াই বায়তকে বন্দি করতে পারবে (১);
২. এ জন্যে জমিদাব রায়তের সম্পত্তি বাজেযাপ্ত করতে পাববে। এ ধবনেব বাজেযাপ্তি সম্পর্কে রায়ত আদালতের আশ্রয় নিতে পাববে না (৬);
৩ বাকি খাজনার জন্য জমিদার বায়তকে প্রয়োজনে তাব বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করতে পারবে (৭),
৪. জমিদাব বাযতকে কাছারিতে আসতে বাধ্য করতে পারবে। কাছাবিতে তাকে কোনরূপ দৈহিক নির্যাতন কবা হলে রায়ত সে জন্য আদালতে তার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা দায়েব করতে পারবে না (৮)।

---

৫ Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 85, 92; Report of the Land Revenue (Floud) Commission, Bengal, Vol I., pp. 21.

৬ এই ধারাগুলি সম্বন্ধে ইংবেজ বিচারক Dr. Field তাঁর বিস্ময় প্রকাশ কবেছেন এই বলে যে, 'These last provisions scarcely require comment. There is scarcely a country in the civilized world in which a landlord is allowed to evict his tenant without having recourse to the regular tribunals; but the Bengal zamindar was deliberately told by the Legislature that he was at liberty to oust his tenants if the rents *claimed by him* were in arrear at the end of the year, ..' (Quoted from, Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 86; Also see, History and Incidents of Occupancy Right, Dr. RadhaRomon Mookerjee, pp 62).

অবশ্য জমিদারের জন্যও ছিল সরকারি খাড়া। তার রাজস্ব বকেয়া হলে সরকারের পক্ষে 'বোর্ড অফ রেভেন্যু', গভর্নর-জেনারেল-ইন কাউন্সিলের পূর্বানুমতি ব্যতীত তাকে আটক করতে পারতো এবং যে পর্যন্ত না তার বকেয়া পরিশোধিত হতো ততোক্ষণ তার রেহাই মিলতো না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'হপ্তাম' ছিল রায়ত এবং জমিদার -- উভয়ের জন্য একটি কালো আইন।[৭] তবে দু'ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল এই যে, সরকারের ঘরে জমিদারের দেয় ছিল পূর্ব ও সুনির্দিষ্ট, ফলে জমিদার আগেভাগেই জানতো তাকে কী পরিমাণ রাজস্ব কখন পরিশোধ করতে হবে। সে জন্য তার প্রস্তুতি থাকতো। নিত্য নতুন পতিত ও অনাবাদি, এমন কি জঙ্গল ভূমি আবাদ করে তার পক্ষে চাষের জমি সম্প্রসারণ তথা আয় বাড়ানোর সুযোগ ছিল। কিন্তু রায়তের কাছ জমিদারের পাওনা বাবদ মৌখিক চুক্তি হিশেবে (আগেই বলেছি 'পাট্টা'-'কবুলিয়ত'-এর চল এক্ষেত্রে খুব একটা হয়নি) একটা অঙ্ক নির্ধারিত থাকলেও নানাভাবে জমিদারের নায়েব-গোমস্তারা তার দ্বিগুণ-তিনগুণ আদায় করতো। ফলে কখনও কখনও ক্ষেতের প্রায় সবটুকু ফসল বিক্রি করেও রায়ত জমিদারের 'খাই' মিটাতে পারতো না, আর এটাই ছিল বাস্তবতা। তাই বলা যায় এই প্রবিধান জমিদারকে শুধু প্রজার সর্বপ্রকার অনিষ্ট সাধনের অসীম ক্ষমতাই দেয়নি[৮], উপরন্তু জমিদার যখন-তখন এর ন্যায্য-অন্যায্য প্রয়োগের মাধ্যমে রায়তকে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে পুরোপুরি নিংড়ে, চুষে ফতুর করে ফেলেছিল। প্রবিধানটির ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্পর্কে বেশী কিছু না বলে এখানে ড. রাধারমণ মুখার্জি-র সূত্রে[৯], Colebrooke-এর ভাষায় শুধু এটুকুই বলতে

৭ ড. সিরাজুল ইসলাম একে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম কালাকানুন বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন, বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ১১৪।

৮. 'Report on the Administration of Bengal, 1921-22'-এও এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা হয়েছেঃ 'The **notorious** Haftam, or Regulation VII of 1799, was, therefore, enacted "for enabling proprietors and farmers of land to realize their rents with greater punctuality." This Regulation gave the landlords practically **unrestricted right of distraint**. They were empowered "to distraint, without sending any notice to any Court of Justice or any public officer, the crops and products of the earth of every description, the grain, cattle, and all other personal property, whether found in the house or on the premises of any other person."
অবস্থার এখানেই শেষ ছিল না। 'To make matters worse, Magistrates were required to punish, by fine or imprisonment, raiyats who could not establish the truthfulness of complaints of hardship brought by them against landlords, or their distraining agents, and the Civil Courts were directed to indemnify zamindari officers, or others employed in the collections, when improperly summoned.' (pp. 85-86). অর্থাৎ যেনতেন প্রকারে খাজনা আদায়ই ছিল মূল ও একমাত্র লক্ষ্য।

৯. মূল, Colebrooke's Minute, dated November, 1814 - Calcutta Gazettee of 25[th] October, 1893, supplement, 2073; উদ্ধৃতি সংগ্রহ, History and Incidents of Occupancy Right, pp. 62. Baden-Powell-ও স্বীকার করেন, 'That this law produced the most evil results goes almost without saying.' (The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 636).

পারি, "The result of this Regulation, as pointed out by Colebrooke, "was that in twelve years the ancient rights of the raiyats throughout Bengal was on the verge of obliteration."

১৮১২ সনের ৫ নং প্রবিধান

একটু আগেই দেখানো হলো যে, 'হফ্‌তম আইন ছিল সমস্ত প্রজা ও কৃষকের নিকট ত্রাস ও আতঙ্কের বিষয়।'[১০] আর ১৮১২ সনে প্রণীত ৫নং প্রবিধান বা 'পঞ্জাম' (Panjam) বা পঞ্চম আইন ছিল তারই সহগোত্রীয় ও দোসর।

এটা ঠিক যে এই প্রবিধানটি জারি করা হয়েছিল বস্তুত 'হপ্তম' আইনের দোষ-ত্রুটি দূর করে রায়তকে জমিদারের কবল থেকে কিছুটা হলেও উদ্ধার বা মুক্ত করার লক্ষ্যে।[১১] এর মূল কথা ছিল -- যেহেতু জমিদাররা আইনত রায়তদেরকে 'পাট্টা' দিতে বাধ্য, সেহেতু বকেয়া খাজনার কারণে রায়তের সম্পত্তি ক্রোকের আগে জমিদার তাকে লিখিতভাবে জানাবে। এ বিষয়ে রায়তের কোন বক্তব্য বা ভিন্ন মত থাকলে সে ৫-দিনের মধ্যে জমিদারকে জানাবে এবং পরবর্তী ১৫-দিনের মধ্যে আদালতে জমিদারের অন্যায্য দাবির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে। তার আগ পর্যন্ত জমিদার রায়তের বিরুদ্ধে কোনরূপ জোরজবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

কিন্তু আদতে এই উদ্দেশ্য কতোটুকু পূরণ হয়েছিল তা বিভিন্ন সরকারি রিপোর্ট এবং ইংরেজ ও আধুনিক দু'-একজন লেখক-ঐতিহাসিকের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকেই টের পাওয়া যাবে।

'Report on the Administration of Bengal, 1921-22' থেকে জানা যায়ঃ 'But this provision was clogged with formalities and, in practice, was inoperative. . Of the excellent intention of the framers of this law there can be no doubt, but it made no provision for defining rights by record, and thus only dealt with a part of the evil."[১২] ফ্লাউড কমিশন রিপোর্টেরও মত প্রায় অনুরূপ। রিপোর্টের ভাষায়, 'The "Panjam" (Regulation V of 1812) mitigated to some extent the harshness of the "Haptam's" provisions for distraint, without remedying the real defects '[১৩]

১০. কৃষকসভার ইতিহাস, মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, পৃষ্ঠা ২২।

১১ 'There was, however, no intention to abrogate the rights of the raiyats by Regulation VII of 1799, and when, during Lord Minto's Administration, the evil effects of the Regulation became known, there was a strong revulsion of official feeling, which produced Regulation V of 1812 (the Panjam), whereby it was hoped to correct the bad effects of Regulation VII of 1799 ' (দেখুন, Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 86) ফ্লাউড কমিশন রিপোর্টেও বলা হয়েছেঃ 'Regulation V of 1812 was intended to mitigate the severity of the distraint law in Regulation VII of 1799 ' (Vol. I., pp. 24).

১২. pp. 86.

১৩. Vol. I., pp. 22.

কিন্তু এটা ছিল সরকারি ভাষ্য বা সরকারের গঠিত কমিশনের বক্তব্য। এতে 'পঞ্জাম' আইন প্রণয়নের পিছনে সরকারের তথাকথিত মহৎ উদ্দেশ্য এবং সেটি চালুর পরে কুখ্যাত 'হপ্তাম' আইনের কঠোরতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল বলে উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে অবস্থা ছিল ভিন্ন। বরং নতুন প্রবিধান প্রবর্তনের ফলে রায়তের দুর্ভোগ আরও বেড়েছিল। কারণ জমিদারের অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হলে -- 'The defaulting tenant had to execute a bond with a surety before either a Commissioner, a Judge, a Collector, or a Kazi of the pargana that he would speedily institute his suit, and a civil suit in those days involved much trouble, a good deal of time, and no inconsiderable outlay If the suit was not instituted within the prescribed time, the attachment revived against the person and the property of the defaulter who had given sureties for his action, and the property of the unfortunate surety became liable for the arrears of rent, if no suit was brought '[১৪]

এ অবস্থায় রায়তের দুরবস্থা আরও বাড়লো, যা আধুনিক লেখকদের রচনায় পাই। আবদুল্লাহ রসুল বলেন, 'তার কয়েক বছর পরে "পনজম" আইন (১৮১২ সনের পঞ্চম রেগুলেশন) জারি হ'ল। তখন তাদের (রায়তের) বিপদ বাড়ল বৈ কমল না। এতে বলা হ'ল জমিদাররা যে-কোন হারে খাজনা ধার্য করে প্রজাদের পাট্টা দিতে পারবে। অর্থাৎ খাজনার হার নির্ধারণ করার এবং জমি থেকে প্রজাকে উচ্ছেদ করা বা না করার ষোল আনা এক্তিয়ার ছেড়ে দেওয়া হ'ল জমিদারের ইচ্ছার উপর। প্রজাদের ফসল কেড়ে নেবার জন্য ক্রোকের অধিকার জমিদারকে আগেই দেওয়া হয়েছিল, ১৭৯৩ সনের আইনে। পনজম এখন সেই অধিকারকে বিধিসঙ্গত ও পাকা করে দিলে, তাদের ডাকাতির সুযোগ বাড়িয়ে দিলে। এই আইনে কদিমি প্রজা যারা, দীর্ঘকাল ধরে যারা একই নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়ে জমি ভোগ দখল করে এসেছে, তাদেরও খাজনার নিরিখ পরিবর্তন করবার, এমনকি তাদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করবারও অধিকার দেওয়া হ'ল। এইভাবে রাইয়ত ও কৃষকদের সর্বনাশ করার জন্য জমিদারদের হাতে কোম্পানির সরকার এই সমস্ত শোষণ ও অত্যাচারের সুযোগ ও অধিকার দিয়েছিল তার নিজের অমানুষিক শোষণের স্বার্থে। জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে যেমন, তেমনি সেই সরকারের বিরুদ্ধেও তাই বাংলার মধ্যে বারে বারে কৃষকদের এত বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান।'[১৫]

আসলেও 'হপ্তাম' এবং 'পঞ্জাম' মিলে বাংলার রায়তের আর্থ-সামাজিক দুর্গতির যে চূড়ান্ত করে ছেড়েছিল তা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেছেন।

R. H. Hollingbury বলেন, 'The zemindar's power of summoning ryots to his cutcherry, and the law of distraint (Huftum and Punjum, or Regulations VII, 1799, and V, 1812) were powerful instruments of oppression of the ryots. ... The advantage which Huftum and Punjum gave to the zemindar has been described as a knock-down blow to the ryot by way of a beginning. Through the corruption and

---

১৪. Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 86.

১৫. কৃষকসভার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২২।

dishonesty of distrainers and sale ameens, the blow was always effectual."[১৬]

১৮১৪ সনের ১৮ নং প্রবিধান

এই প্রবিধানানুযায়ী প্রতিটি জেলার কালেক্টরকে এই মর্মে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা হয় যে, কোন জমিদারের খাজনা বাকি পড়লে -- সেটা তার গোটা জমিদারিরই হোক, কী যৌথ মালিকীয় জমিদারিতে তার অংশের জন্য হোক -- কালেক্টর তা নিলামে চড়ানোর জন্য 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে পারবে। তবে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে কালেক্টরকে অবশ্যই 'বোর্ড'-এর অনুমতি নিতে হবে। আবার 'বোর্ড'ও, গভর্নর-জেনারেল-ইন কাউন্সিলের কোনরূপ অনুমতি বা তার সঙ্গে প্রাগালোচনা ছাড়াই কালেক্টরকে এই অনুমতি দিতে পারবে।

যা হোক এ থেকে একটা জিনিস প্রতীয়মান হয়, অনুমতি গ্রহণের নামে কোন স্তরে যাতে করে কোনরূপ সময় ক্ষেপণ না হয়, বরং সরকারি স্থানীয় সংস্থাগুলো যাতে নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা আদায়ার্থ তাৎক্ষণিক বিহিত ব্যবস্থা নিতে পারে সেটাই ছিল কোম্পানির আইন-প্রণেতাদের উদ্দেশ্য।

১৮১৯ সনের ২ নং প্রবিধান[১৭]

পরগণা বা মৌজা-বহির্ভূত এমন চরভূমি যা ইতোপূর্বে কোন কারণে দশসালা বন্দোবস্ত-এর সময়ে কোন তৌজি বা জমিদারের রেজিস্টারভুক্ত হয়নি, অর্থাৎ সরকারি রাজস্ব ধার্যের বাইরে ছিল, আলোচ্য প্রবিধান বলে তা সরকারি 'জমা'র আওতাভুক্ত হয়। অধিকন্তু জমিদারের নতুন আবাদ সম্প্রসারণের ফলে জঙ্গল পরিষ্কৃত হয়ে যে সকল ভূমি সরকারের অজান্তে জমিদারকর্তৃক খাজনা ধার্য করা হয়েছিল বা হচ্ছিল, সেগুলিতে সরকার যাতে করে রাজস্ব ধার্য করতে পারে, এই আইনে কোম্পানির সরকার সে ক্ষমতা লাভ করে।

১৮২২ সনের ১১ নং প্রবিধান

১৭৯৯ সালের কুখ্যাত 'হপ্তাম' আইনের অব্যবহিত পরবর্তী ২০-বছরে জারিকৃত বিভিন্ন প্রবিধানের মধ্যে এটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন।[১৮] গুরুত্বপূর্ণ এই অর্থে যে, মূলত এই আইনে নিলাম ক্রেতা নতুন জমিদারকে, একমাত্র খোদকাস্ত ও কাদিমি রায়ত ('residential and hereditary cultivators') ব্যতীত অন্যান্য সকল (সংশ্লিষ্ট জমিতে এদের অবস্থান

---

১৬. Zemindari Settlement in Bengal, pp. 272.

১৭. পরবর্তীকালে নদী বা সমুদ্র থেকে উত্থিত চর জমির মালিকানা, তাতে সরকারের অধিকার ও 'জমা' নিরূপণের পদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে এই জাতীয় বিভিন্ন প্রবিধান-আইন জারি করা হয়েছিল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'-একটির শিরোনাম -- 'The Bengal Alluvion and Diluvion Regulation, 1825 (Reg. XI of 1825)', 'The Bengal Alluvion and Diluvion Act, 1847 (Act IX of 1847)', 'The Bengal Alluvial Land Settlement Act, 1858 (Act XXXI of 1858)' ইত্যাদি।

১৮. Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 92.

তথা ভোগ-দখল যতো পুরোনোই হোক না কেন) প্রকারের প্রজাকে প্রয়োজনে উচ্ছেদ করে নতুনভাবে ভূমি বিলি-বণ্টনের অধিকার প্রদান করা হয়। আইনত যদিও এই অধিকার বা ক্ষমতা শুধু নতুন জমিদারদেরই দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এর অন্যায্য সুযোগ বা সুবিধা গ্রহণ করলো অন্যান্য সাধারণ জমিদারগণও।

এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, যদিও কর্নওয়ালিস-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় কোন অবস্থায়ই জমিদারদের দেয় রাজস্ব, এবং সেই সূত্রে রায়তের খাজনা বৃদ্ধির কোন সুযোগ ছিল না, কিন্তু আলোচ্য প্রবিধানের মাধ্যমে যখন সম্পূর্ণ অবৈধভাবে নতুন জমিদারদের, রায়তদের খাজনা বৃদ্ধির অধিকার দেয়া হলো, এবং এর ফলে অন্যরাও যখন সেই সুযোগে প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করলো তখন স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায়, এই প্রবিধান জারির ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার মূল নীতি-আদর্শের বিচ্যুতি ঘটেছিল, এবং আখেরে তা বাংলার রায়তের দুর্দশা আরও বাড়িয়েছিল।

পাশাপাশি এই প্রবিধান জারির মধ্য দিয়ে এটাও নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো যে, "The change in the law gave rise to the doctrine that khudkasht or residential raiyats, whose tenancies originated after the Permanent Settlement were a distinct class, liable to eviction; or if not evicted, liable to be assessed at the discretion of the landlord."[১৯]

১৮৩০ সনের ৭ নং প্রবিধান

মোটামুটি বকেয়া রাজস্ব আদায়সম্পর্কিত ১৮৫৯-পূর্ববর্তী পর্বে এটিই ছিল শেষ প্রবিধান, যদিও পরে এর কিছু কিছু সংশোধনী হয়েছিল।[২০] এই আইন বলে কালেক্টরকে বাকি রাজস্বের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের[২১] পূর্বানুমতি না-নিয়েই জমিদারি বা তার অংশবিশেষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিলাম বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তবে আগে যেখানে 'বোর্ডে'র নিয়ন্ত্রণে থাকাকালীন কালেক্টর নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেও পরবর্তী কোন পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু এই আইনে কালেক্টর, কমিশনারের পূর্বানুমতি-ব্যতীত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের সাথে সাথে নিলাম বিক্রয়ের কাজও চালাতে পারতেন। তবে বিক্রি পরবর্তী যে চূড়ান্ত অনুমোদন বা বিক্রয়-দৃঢ়ীকরণ (Sale Confirmation) -- এটা তাকে অবশ্যই নিতে হতো কমিশনারের কাছ থেকে, অন্যথায় নিলাম বৈধ হতো না।

যা হোক এখন উপরালোচিত জারিকৃত প্রবিধান বা আইনগুলি এক নজর দেখলে, আমরা এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, 'All legislation of this period, dealing with landlord and tenant, had one primary object, *viz.*, the security of the public revenue, and each successive Regulation served only to arm

১৯. Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. I., pp. 23

২০. Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 93.

২১. এ পর্যন্ত জেলা কালেক্টরের অব্যবহিত পরবর্তী উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ছিল 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'। কিন্তু ১৮২৯ সালের ১নং প্রবিধান বলে বিভাগীয় কমিশনার নিযুক্ত হলে তিনিই হন কালেক্টরের অব্যবহিত উর্ধতন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ। অতঃপর তার কাছেই মূলত কালেক্টরের তাৎক্ষণিক দায়বদ্ধতা বর্তেছিল।

those who were under engagements for revenue with additional powers, so as to enable them to realize their demands in the first instance, whether right or wrong. .. Remedies were no doubt provided in every Regulation for redress against any injustice by referring discontented parties to the Civil Court, but, constituted as the Civil Courts then were, the raiyats were left without adequate means of relief for the most manifest extortions."[২২]

বস্তুত সবকারি ভাষ্যেই যেখানে এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকৃত, সেক্ষেত্রে এ বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ আছে বলে মনে করি না। তথাপি শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, দৈশিক উন্নতি ও রায়তের তথাকথিত কল্যাণের নামে বিভিন্ন আইনি মারপ্যাঁচে রায়তকে বেঁধে রাষ্ট্র যেখানে সর্বগ্রাসী ও সর্ব-সংহারী হয়, সেখানে আপামর প্রজাসাধারণেব দুর্গতি ও দুববস্থার যে কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না, তা এই পর্বেব বাংলাব আর্থ-সামাজিক চিত্র থেকে প্রমাণিত হবে। তবে সে আলোচনায় যাওযার আগে এখানে আরও দু'-একটি প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিশেষ করে ১৭৯৩-১৮৫৮ পর্বের অন্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবিধান (যদিও তা সরাসরি রায়তের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ছিল না) সম্বন্ধে কিছু তথ্য তুলে ধরতে চাই।

১৭৯৩ সনের ৪৪, ১৮১২ সনের ১৮ ও ১৮১৯ সনের ৮ নং প্রবিধান

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১নং প্রবিধান -- চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের ৮নং অনুচ্ছেদে এ কথা স্পষ্ট বলা ছিল যে, জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়াই অধীন জমিদারির গোটা বা আংশিক অন্যত্র 'বিক্রয়, দান বা অন্য যে কোন ধরনের হস্তান্তর' (এখানে অন্য যে কোন ধরনের হস্তান্তর --'otherwise transfer' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়) করতে পারবে; তা সত্ত্বেও ১৭৯৩ সালের ৪৪নং প্রবিধান জারির মধ্য দিয়ে ওয়াদা-খেলাপি সরকাব জমিদারদের এই 'অন্য যে কোন ধরনের হস্তান্তরে'র ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করলো এই বলে যে, খাজনা সংগ্রহের প্রয়োজনে অর্থাৎ নিতান্ত অভ্যন্তরীণ কারণে জমিদাররা তাদের জমিদারির অংশবিশেষ খণ্ড খণ্ড করে ইজারা বা বন্দোবস্ত দিতে পারবে, তবে তা কোন অবস্থায়ই এককালীন ১০-বছরের অধিক সময়ের জন্য নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এতে মূল বন্দোবস্ত আইনের ৮নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথাকথিত স্থায়ী বিধিবিধানের শর্ত সরকার ভঙ্গ করেছিল। অবশ্য কোম্পানির সরকারেরও এই নতুন আদেশ জারি না করে উপায় ছিল না। প্রসঙ্গত এখানে একটু পিছনের কথা বলতে হয়।

আমরা আগেই জেনেছি যে কোনরূপ প্রাক-জরিপ ছাড়াই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের নামে সরকার বাংলার জমিদারদের ওপর অত্যধিক 'জমা'র পাহাড় চাপিয়ে দিয়েছিল, যে ভার অনেক বড় বড় জমিদারিই বহন করতে না পেরে অত্যল্পকালের মধ্যে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। কিন্তু এই তালিকায় বাংলাব সর্বাধিক রাজস্ব ধার্যের আওতায় থেকেও বর্ধমানের জমিদারি তাদের

২২. Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 87.
স্বনামখ্যাত বাঙালি ঐতিহাসিক ড. অমলেন্দু দে-ও উল্লেখ করেন, 'লক্ষণীয় এই যে, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সব আইন পাশ করা হয় তার সবটুকু সুবিধা জমিদারেরাই ভোগ করেন, কৃষকেরা নন।' (বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা ১১৭)।

সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্ভাবনার গুণে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। বর্ধমান রাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের সুযোগ্য দিওয়ান প্রাণকৃষ্ণের আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তায় ও তার তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে -- বিশেষ করে জমিদারির নিজস্ব কর্মচারিদের মাধ্যমে রায়তদের কাছ থেকে সরাসরি খাজনা আদায় না করে বরং সমগ্র জমিদারিকে কয়েক হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করে ইজারা বা বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছিল। স্থানীয়ভাবে এই বিলি-বণ্টনের নাম দেয়া হয়েছিল 'পত্তনি'। প্রতিটা পত্তনির বাৎসরিক ইজারা মূল্য ধরা হয়েছিল ২,০০০ থেকে ৩,০০০ টাকা।[২৩] এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, 'যাহার নিকট এইভাবে ইজারার ভিত্তিতে চিরস্থায়ীভাবে তালুক পত্তন দেওয়া হইত তাহাকে পত্তনীদার নামে অভিহিত করা হইত। বন্দোবস্তের সময় পত্তনীদারের নিকট হইতে মোটা অংকের দখলী সেলামী গ্রহণ করা হইত। এই পত্তনী তালুক সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পত্তনীদারের নিকট হইতে স্থায়ীভাবে রাজস্ব আদায় করা।'[২৪]

বলাবাহুল্য দিওয়ান প্রাণকৃষ্ণের এই যুগোপযোগী ভূমি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত কার্যকর ও পুরোপুরি ফলপ্রসূ বিবেচিত হয়েছিল। এর ফলে বর্ধমান জমিদারির সরকারি 'জমা' সর্বোচ্চ হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় পত্তনিদারদের কর্ম-তৎপরতায় (এ কাজে তারা উৎসাহিত হয়েছিল, কারণ এর দ্বারা তারা প্রতি মুহূর্তে লাভবান হচ্ছিল, এবং তা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানেরও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিল) খাজনা নির্ধারিত হারে ও সঠিক সময়ে আদায় হয়েছিল (বছরের শুরুতেই যেহেতু নিলাম ডেকে ভূমি বিলি-বণ্টন করা হতো, ফলে তেজচন্দ্র সমুদয় পাওনা আগেভাগেই পেয়ে যেতেন) এবং জমিদারের পক্ষে সরকারি 'জমা'ও নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে সরকারের ঘরে জমা করা সম্ভব হতো। যা হোক এই প্রবণতা অব্যাহত থাকায় এবং সরকারের তাতে নীরব সমর্থন পরিলক্ষিত হওয়ায় বাংলা, বিহার ও ওড়িশার অন্যান্য জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে শুরু করায় শেষ পর্যন্ত সরকারের টনক নড়ে। অবশ্য কোম্পানির সরকারের এটা ততোটা মাথা ব্যথার কারণ হতো না যদি না খোদ সরকারের অভ্যন্তরে কিছু সুস্থ চিন্তক কর্মচারী ও বিশেষত ইংল্যান্ডে কতিপয় মানবতাবাদী মনীষী তাঁদের বক্তব্য ও লেখনীতে এর বিরূপ সমালোচনা শুরু করতেন।

কারণ এঁরা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন, তথাকথিত 'পত্তনি' বা 'Sub-letting' প্রথার অত্যন্ত মন্দ কিছু দিক। এককথায় পত্তনি তালুক বলতে বুঝাতো, 'A *patni* tenure is, in effect, a lease, which binds its holder by terms and conditions similar to those by which a superior landlord is bound to the State.'[২৫]; বা, 'The *pattani* tenure was a system of rent collection.'[২৬]

বস্তুত 'rent collection'-এর সুবিধার্থে পত্তনি প্রথায় জমিদারের নিচে পত্তনিদার, তার নিচে দর-পত্তনিদার, তার নিচে সে-পত্তনিদার, তার নিচে দরাদর-পত্তনিদার -- এভাবে ক্রম-নিম্নগামী হয়ে রাষ্ট্র ও রায়তের মাঝামাঝি স্তরে অত্যল্পকালের মধ্যে অসংখ্য খাজনা আদায়কারীর জন্ম

২৩. বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪৯।

২৪ ভূমি আইন ও আলোচনা, ড. মোঃ নূরুল হক, পৃষ্ঠা ১০।

২৫. Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 96.

২৬. Bengal Land Tenure: The Origin and Growth of Intermediate Interests in the 19th Century, Dr. Sirajul Islam, pp. 19

হয়েছিল।[২৭] এই পত্তনিদারেরা প্রত্যেকেই ছিল এক-একজন মধ্য-স্বত্বাধিকারী; এদের প্রত্যেকে ন্যূনতম লাভ করলেও তাদের সম্মিলিত লাভের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই বেশ মোটা অঙ্কে দাঁড়াতো, এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে এর চাপ গিয়ে পড়তো বাংলার নিরীহ রায়তকুলের উপর, যারা এমনিতেই ছিল জমিদারের নানা প্রকার শাসনে ও শোষণে যারপরনাই জেরবার।

যা হোক পত্তনি প্রথার এই দূষিত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সরকার ১৭৯৩ সালের ৪৪নং প্রবিধান জারি করে ১০-বছরের বেশি সময়ের পত্তনি ইজারা বা বন্দোবস্ত প্রদান নিষিদ্ধ করে।

কিন্তু এর ফলে জমিদারদের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিবাদ উঠলো। সরকারের অত্যধিক রাজস্বের চাপে পড়ে তারা এমনিতেই ছিল সদা ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত -- কখন না জানি বাকি রাজস্বের জন্য জমিদারি নিলামে ওঠে। বলাবাহুল্য পত্তনি প্রথায় তারা রাজস্ব আদায়ের একটা নিশ্চিয়তা পেয়েছিল[২৮], এবং তা তাদের টিকে থাকার পথও দেখিয়েছিল। ফলে জমিদারেরা সরকারের কাছে বিভিন্নভাবে দেন-দরবার শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত সরকারও মেনে নিতে বাধ্য হলো তাদের দাবি। অতএব যথারীতি বহাল থাকলো জমিদারদের পত্তনি সৃজনের অধিকার।

'By ... Regulation XVIII of the same year (1812) proprietors were declared competent to grant leases for any period even in perpetuity. Finally, Regulation VIII of 1819[২৯], known as Patni Sale Law, declared the validity of these permanent tenures[৩০], defined the relative rights of

২৭. ড সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, জমিদার ও প্রকৃত রায়তের মাঝখানে প্রায় কুড়িটির মতো মধ্য-স্বত্বাধিকারীর অস্তিত্ব ছিল বলে জানিয়েছেন। দেখুন, বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৬। এবং এরই এক অনিবার্য পরিণতিঃ '১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দের এক সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, পিরামিডসদৃশ এই ভূমিস্বত্বের সর্বোচ্চ ধাপ থেকে সর্বনিম্ন ধাপ অর্থাৎ প্রায় দেড় লক্ষ জমিদারের অধীনে প্রায় নয় লক্ষ মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি হয়েছিল।' (দেখুন, বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৯৮)।

২৮. ড রাধারমণ মুখোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেন, 'The subletting system, relieves the zemindars from all connexion with their estates or raiyats and places these, *en masse* in the hands of middlemen and speculators,. ' (History and Incidents of Occupancy Right, pp. 72).

২৯. এই আইনটি প্রণীত হয়েছিল, W. W. Hunter-এর ভাষায়ঃ 'It was in order to give the holders of such tenures a locus standi in ... courts that Regulation VIII of 1819 was passed.' (A Statistical Account of Bengal, Vol. VIII., pp 232). আধুনিক ঐতিহাসিক John R. Maclane-ও মন্তব্য করেন, 'Regulation VIII of 1819 gave explicit legislative recognition to the patni system for the first time.' (Land and Local Kingship in Eighteenth-Century Bengal, pp. 302).

৩০. এর স্বত্ব আপাতস্থায়ী, এবং 'transferable by sale, gift, or otherwise' (A Statistical Account of Bengal, Vol. VIII., pp. 232) বিবেচিত হলেও যদি কখনও মূল জমিদারি বকেয়া রাজস্বের জন্য নিলামে অন্যত্র হস্তান্তরিত হতো, তবে অব্যবহিত পরবর্তী সকল উপ-নিম্ন পত্তনি সমূহের বিলুপ্তি ঘটতো অর্থাৎ পত্তনি বাতিল হতো। দেখুন, Land and Local Kingship in Eighteenth-Century Bengal, pp. 302.

the zamindars and their subordinate *patni* talukdars, and established a summary process for the sale of such tenures in satisfaction of the zamindar's demand of rent. It also legalized under-letting, on similar terms, by the *patnidars* and others."[৩১]
বস্তুত উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একটা জিনিস খুবই স্পষ্ট যে, পত্তনি প্রথা ভালো ছিল, কি মন্দ -- সেটা সরকারের কাছে যতোটা না গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বেশি প্রার্থনীয় ছিল যেন-তেন উপায়ে রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টা অর্থাৎ তাদের বেনিয়া স্বার্থই যে জমিদারদের দাবি মেনে নেয়ার মধ্যে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল সেটা সহজেই অনুমেয়।

১৭৯৩ সনের ১৯ ও ৩৭ নং প্রবিধান

এককথায় 'লাখেরাজ' বা নিষ্কর ভূমিস্বত্ব বলতে বুঝায়ঃ 'LAKHIRAJ is the common name of all tenures which, being estates-in-chief, are free from payment of the *sadr jama*, or Government revenue; or being subordinate tenures, pay no rent to their parent estate. .. Lakhiraj, in its narrower and specific meaning, is applied to rent-free lands granted in perpetuity, mostly in ancient times, to persons without distinction of creed or caste, and usually for political reasons."[৩২]
রাজনৈতিক (যেমন জায়গির, পাটওয়ারি, থানাদারি প্রভৃতি), কৃত্যভিত্তিক (যেমন নানকার, চাকরান, পাইকান, ঘাটওয়ালি প্রভৃতি), ব্যক্তিগত (যেমন আলতমঘা, আইম্মা, মদদ-ই-মাশ, মহাত্রাণ প্রভৃতি) ও ধর্মীয় বা দাতব্য (যেমন পিরপাল, চেরাগি, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি) প্রয়োজনে সৃষ্ট -- প্রাচীন ও মধ্যযুগের এই ভূ-স্বত্বগুলিকে[৩৩] ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ও ৩৭ নং প্রবিধানের নির্দেশনা মতে প্রধানত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল।[৩৪]

৩১. Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 96
৩২ A Statistical Account of Bengal, Vol. VIII., pp. 239-40.
৩৩. এগুলির মালিকানা ছিল প্রধানত যৌথভাবে সম্প্রদায়ের সকলের ও গৌণত ব্যক্তিগত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা, প্রথম অধ্যায়।
৩৪. অবশ্য স্বত্বের ধরন অনুযায়ী এগুলিকে আরও বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, ড. আর জি ফক্স তাঁর বিখ্যাত 'King, Clan, Raja and Rule' নামক গ্রন্থে বাংলার সমুদয় নিষ্কর ভূমি কাঠামোকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা -- (ক) ভাইয়াচারি ও (খ) পাট্টাদারি। দেখুন, ইতিহাস অনুসন্ধান/৪, গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ২৬৪। অন্যদিকে ড চিত্তব্রত পালিত একে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন ৩-টিতে। তাঁর ভাষায়, '*Lakhiraj* tenures were legion in description Some of them could be easily identified as service tenures of a semi-feudal society, such as *nankar, chakran, paikan, ghatwali* and others. The first was a means of subsistence for a collector of rent in lieu of salary, the second mainly for watch and ward, the third for supply of troops and the last for security of the holder. The second set may be called community tenures, given to occupational groups for their services to the community and to the

এক. বাদশাহি লাখেরাজ[৩৫] ও দুই. নন-বাদশাহি বা হুকুমি লাখেরাজ[৩৬]।
প্রাচীন যুগে বা সুলতানি, মোগল ও নবাবি আমলে এগুলি থেকে রাষ্ট্র কোনরূপ কর বা খেরাজ আদায় করতো না। বস্তুত এ থেকে যা আয় হতো তার সম্পূর্ণই ব্যয়িত হতো এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় বিশেষ করে এর দেখভালকারীদের দৈনন্দিন খায়-খরচ, স্থানীয় দেনা-পাওনা মিটানো এবং বাৎসরিক ওরশ বা ঈসালে সওয়াব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে। যে কারণে দেশীয় সরকারগুলি এর আয়ের ওপর কখনই হাত দিতো না। কিন্তু ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই আগস্ট দিওয়ানি অধিগ্রহণ করলো তখন তারা দেখলো, লাখেরাজ নামক বিশাল পরিমাণের[৩৭] ভূমিস্বত্ব থেকে রাষ্ট্রের কোন আয়াগমই হয় না। বলাবাহুল্য

grantor. In this way, potters, blacksmiths, goldsmiths, barbers, physicians (vaidyas) - all held land and they clearly paid a labour rent. The remaining tenures may be grouped under the heading of religious and charitable grants In Bengal, these were the largest group.' (Tensions in Bengal Rural Society. Landlords, Planters and Colonial Rule, 1830-1860 , pp. 27-28).

৩৫. সরাসরি মোগল বাদশাহ বা সম্রাটগণ প্রদত্ত তথা তদীয় লিখিত ফরমান বলে সৃষ্ট লাখেরাজ।

৩৬. বাদশাহকর্তৃক সরাসরি নয়, বরং তদীয় আমির-ওমরাহ, প্রাদেশিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও জমিদারদের দ্বারা সৃষ্ট লাখেরাজ।

৩৭. ১৭৭৬ সালের 'আমিনি কমিশনে'র রিপোর্টে এর একটা বিস্তৃত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছিল, যা থেকে সমকালীন বাংলার বড় জেলাগুলির লাখেরাজ ভূমির যে হিসাব পাওয়া যায় তার চিত্র নিম্নরূপ (তথ্য 'Tensions in Bengal Rural Society, pp. 29' থেকে) :-

জেলার নাম	লাখেরাজের পরিমাণ (বিঘায়)	চাকরান
রাজশাহি	৪,২৯,১৪৯	
যশোহর	৮৭,৩৫০	
চট্টগ্রাম	২,৭৩,২০২	
ঢাকা	৬,১৫,৪৬৮	
রংপুর	১,৪৬,০৭২	
মাহমুদশাহি	১,৩৬,৭৯০	
বর্ধমান	৫,৬৮,৭৩৬	
বীরভূম	১,০৮,৭৭১	১,২৭,১১৭
বিষ্ণুপুর	১,০৬,৯৩৪	১,৩৬,৯৭১
নদীয়া	৩,৭৮,৯০৪	
হুগলি	১,১৬,৫৪৫	
২৪-পরগণা	৩,৩৪,৯৬০	
মেদিনীপুর	২,০১,৮৬৩	
মোট	**৩৫,০৩,৬৪৪**	**২,৬৪,০৮৮**

পরবর্তীকালে (১৭৮৯) জন শোর তার এক লেখায় উল্লেখ করেছিলেন, বাংলার মোট লাখেরাজ ভূমির পরিমাণ ছিল কমবেশি ৭১,৭১,০৯৫ বিঘা এবং তা থেকে তার হিসাবে বিঘা প্রতি ৮ আনা

শ্রেণীচরিত্রে তারা যেহেতু ছিল বেনিয়া এবং বিদেশি (বিদেশি হওয়ার কারণে এ জন্য তারা কোন দায়ও অনুভব করেনি), স্বভাবতই তারা চাইলো এই প্রবণতার অবসান -- এগুলিতে হস্তক্ষেপ করে ছলে-বলে-কৌশলে এ থেকে রাজস্ব আয় করতে।

অবশ্য এ জন্য যে দেশীয় জমিদারদেব কিছু কিছু অসৎ প্রবৃত্তিও দায়ী ছিল না তা বলা যায় না। কাবণ প্রকৃত লাখেরাজ ভূমির পাশাপাশি সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার জন্য বিভিন্ন নামে এরা নিষ্কর ভূমিস্বত্ব সৃষ্টি কবেছিল ও করে চলেছিল।[৩৮] সরকার প্রথমে ১৭৯৩ সনের ১৯নং ও পরে একই বছরের ৩৭নং প্রবিধান জারি করে[৩৯] কোম্পানির দিওয়ানি অধিগ্রহণের পূর্বে অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই আগস্টের আগে যে সকল লাখেরাজ সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রাপকের ভোগ-দখল প্রমাণ সাপেক্ষে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো। এই কারণে একে 'বহালি লাখেরাজ'ও বলা হয়ে থাকে।[৪০]

সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা হলো যে, উক্ত সময়ের পরে কিন্তু ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে যে সব লাখেরাজ সৃষ্ট হয়েছিল তার পবিমাণ যদি ১০-বিঘার বেশি হয় তবে তা কোম্পানির সরকার বা সরকারের পক্ষে কোন বৈধ কর্মচারী কর্তৃক নিশ্চিতি বা দৃঢ়ীকরণ (Confirmation) হয়ে না থাকে, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। অন্যদিকে ১০-বিঘা পর্যন্ত একান্তভাবে ধর্মীয় বা দাতব্য কাজে ব্যবহৃত লাখেরাজ দিওয়ানি অধিগ্রহণের পরে সৃষ্টি হলেও তা বহাল রাখা হবে।

কিন্তু উপর্যুক্ত শর্তের মধ্যে পড়ে না অথচ সামাজিকভাবে লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূ-স্বত্ব বলে পরিচিত, সেগুলিও বাতিল বা বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হলো। এ জন্য একে 'বাজেয়াপ্তি লাখেরাজ' বলা হয়ে থাকে।[৪১] এই বাজেয়াপ্ত লাখেরাজ ভূমির উপরও রাজস্ব আরোপ করা হয়েছিল।

ড. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বেআইনি লাখেরাজ অধিগ্রহণে সরকারকে কতকগুলি অসুবিধাব সম্মুখীন হতে হয়। (ক) কোনটি আসল আর কোনটি জাল দলিল তা নির্ণয় করা এক দুরূহ কাজ; (খ) লাখেরাজ সম্পত্তি সম্পর্কে সরকারের হাতে তথ্য খুবই কম; (গ) জমিদারদের স্বার্থ জড়িত থাকায় তাদের বিরোধিতা; (ঘ) ১৮০৫ সনে ৬০ বছরের পুরাতন লাখেরাজের

রাজস্ব ধরলেও প্রায় ৩৫,০০,০০০ টাকা আসার কথা, যা এক অর্থে ছিল রাষ্ট্রের ক্ষতি। এই পরিসংখ্যান কতোটুকু সঠিক এখানে সে প্রশ্ন না তুলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, একান্তই ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে ব্যবহৃত লাখেরাজ বাদ দিলেও লাখেরাজের নামে জমিদারেরা ব্যাপকভাবে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে চলেছিল।

৩৮. Tensions in Bengal Rural Society, pp. 28

৩৯. পরবর্তীকালে এ সংক্রান্ত আরও আইন-প্রবিধান জারি করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮১৯ সনের ২নং ও বিশেষত ১৮২৮ সনের ৩নং প্রবিধান উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত প্রবিধানের মূল প্রতিপাদ্য ছিল -- 'Regulation 3 of 1828 invested the collector with special legal powers to investigate *lakhiraj* tenures and make summary awards, subject to appeal to special commissioners created for the purpose and to the Board of Revenue. The new summary procedure recognised no grant as hereditary unless specified in the *taidad* or register. Non-registration or failure to notify mutation of title on succession subjected grants to lapse.' (Tensions in Bengal Rural Society, pp. 32).

৪০. Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 101.

৪১. Ibid., pp. 101

সরকারি স্বীকৃতি; (ঙ) কোম্পানির কর্মচারীর সংখ্যা কম থাকায় বিস্তৃত অনুসন্ধানে অসুবিধা ও সর্বোপরি, (চ) লাখেরাজ সম্পত্তি বহুবার হস্তান্তরিত হওয়ায় সরকারি অধিগ্রহণে বহু পরিবার নিঃস্ব হওয়ার সম্ভাবনা।"[৪২] যা হোক, 'জমিদারদের বাধা দান সত্ত্বেও বাংলার লাখেরাজ ভূমির একাংশ সরকারি খাসে আনা হয়। এবং ঐসব জমির ভোগদখলকারীর সঙ্গে ন্যায্য রাজস্বের ৫০ শতাংশ হারে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।"[৪৩]

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একটা জিসিন আমরা নিশ্চিতভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, কোম্পানির সরকারের কাছে এদেশের মানুষের যুগ যুগ লালিত লৌকিক আচার-বিচার, নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে রাষ্ট্রীয় সহানুভূতি বা আনুকূল্য দান -- এ সবের কোন মূল্যই ছিল না। বরঞ্চ কিভাবে ও কি কি উৎস থেকে রাজস্ব হাসিল হতে পারে ও তা নিজেদের পকেটস্থ হয়, সেটাই ছিল মুখ্য বিবেচনা। ফলে একদিকে প্রবল পরাক্রমশালী জমিদার বাহাদুর ও অন্যদিকে দুঃশীল রাষ্ট্রযন্ত্র -- এ দুই দুষ্টচক্র মিলে খাজনা আদায়ের নামে যখন প্রজাদের উপর হামলে পড়ে, তখন তার সর্বগ্রাসী ভয়াল রূপ কী হতে পারে তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। এ পর্যায়ে তারই কিছু কিছু নমুনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

তার আগে এ বিষয়টিও পরিষ্কার করে নেয়া ভালো যে, অনেকে মনে করেন বাংলার কৃষকদের চেয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কৃষকেরা বৃটিশদের অপশাসনে এই পর্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও নিপীড়িত হয়েছিল। কারণ হিশেবে তারা যুক্তি দেখান এই বলে, বস্তুত জমিদারি ব্যবস্থা চালুর ফলে বৃহত্তর ভারতীয় উপমহাদেশের একটি প্রদেশ অর্থাৎ বাংলায় যে পরিমাণ ভূমি বৃটিশদের শাসনে এসেছিল এবং তাদের মাধ্যমে জমিদারদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের শিকার হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ ভূমি সমষ্টিগতভাবে বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিকারে থাকায় স্বভাবতই ঐ সব অঞ্চলের কৃষককুল সম্মিলিতভাবে বেশি শাসিত ও শোষিত হয়েছিল।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই -- এটা ঠিক যে, ১৭৯৩ সালের তথাকথিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলা, বিহার ও ওড়িশা এবং বাংলার বাইরে আসাম, মাদ্রাজের কিছু অংশ এবং যুক্তপ্রদেশের বারাণসী মাত্র এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল;[৪৪] এবং সেই হিশেবে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে জমিদারি ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছিল মাত্র ১৯% এলাকায়।[৪৫] উল্লেখ্য বৃটিশ অধিকৃত অবশিষ্ট ৮১% এলাকায় ভূমি-ব্যবস্থাপনা ছিল সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে; যাতে মোটামুটি দু'ধরনের ব্যবস্থা বা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল -- এক. রায়তওয়ারি (৪৯/৫০% অংশে) ও অস্থায়ী বন্দোবস্ত বা ইজারা প্রথা (৩০/৩১% অংশে)। রায়তওয়ারি ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছিল মাদ্রাজ, বোম্বাই (মুম্বাই), বেরার, সিন্ধু, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে বা অঞ্চলে।[৪৬]

---

৪২. বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ১৪।

৪৩. বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ১৪।
এ সম্বন্ধে বিস্তৃত জানার জন্য দেখুন, Tensions in Bengal Rural Society, Chapter Two; Resolution of Revenue Department, Calcutta, the 26th November, 1874.

৪৪. রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১৯২।

৪৫. রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১৯২; চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারী: বাংলার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা, পৃষ্ঠা ১০।

৪৬. রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১৯২।

অন্যদিকে অস্থায়ীভাবে বিলি-বন্টনকৃত অঞ্চলের মধ্যে প্রধানত ছিল পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, বাংলা ও বোম্বাইয়ের কিছু অংশ।[৪৭]
রায়তওয়ারি অঞ্চলে সরকারি কর্মচারিরা সরাসরি রায়তের কাছ থেকে নির্ধারিত হারে রাজস্ব আদায় করতো। এখানে কোন মধ্যস্বত্ব ছিল না। অস্থায়ীভাবে ইজারাকৃত ভূমি যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রায়তদের সঙ্গে সম্পাদিত হতো না, যে কারণে এখানে রায়ত ও সরকারের মধ্যবর্তী স্তরে এক বা একাধিক মধ্যস্বত্বের উপস্থিতি অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এর মাধ্যমে যে রাজস্ব আসতো তা যেহেতু নিতান্তই নগণ্য ছিল, সুতরাং এক্ষেত্রে রায়তের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ ছিল অনেক কম। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৮৭১-৭২ সালে ওড়িশা ও আসাম ব্যতীত বাংলা ও বিহারের মোট 'জমা'র পরিমাণ যেখানে ছিল ৩,৫৪,৮২,৬৭১ টাকা (মোট রাজস্বের প্রায় ৯২%), সেখানে অস্থায়ীভাবে বিলি-বণ্টিত ভূমি থেকে সরকারের আদায় হয়েছিল মাত্র ২৮,২২,২৮৫ টাকা (প্রায় ৮%)।[৪৮] ফলে আয়তনগত দিক থেকে পর্যালোচ্য সময়ে যদিও বৃটিশ ভারতের প্রায় ৮১% অঞ্চলে বাংলার ন্যায় জমিদারি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না, সেই হিশেবে লোকসংখ্যা ও তদনুযায়ী রায়তের সংখ্যা বেশি ছিল, কিন্তু খাজনার ব্যাপারে তাদের যোগাযোগ সরাসরি সরকারের সঙ্গে থাকায় তারা সঙ্গত কারণেই শোষিত হয়েছিল কম এ কথা সহজেই অনুমেয়। কারণ তাদের ওপর মধ্যস্বত্বের কোন শোষণ, নিপীড়ন ছিল না। অন্যদিকে বাংলায়, ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় মাত্র ১৯% অঞ্চলে জমিদারি ব্যবস্থা অনুসৃত হলেও এখানে যেহেতু রাষ্ট্র ও রায়তের মাঝে অসংখ্য মধ্যস্বত্ব গজিয়ে উঠেছিল, স্বভাবতই এখানে শোষণ ও নিপীড়ন ছিল বহুমাত্রিক ও পরিমাণে অনেক অনেক বেশি।
ফলত ১৭৯৩-১৮৫৮ পর্বে খাজনা সংগ্রাহক জমিদার ও তৎ-নিম্নবর্তী পিরামিড-সদৃশ সংখ্যাতীত মধ্যস্বত্বের কঠোর যাঁতাকলে পড়ে বাংলার রায়তের শুধু নাভিশ্বাসই ওঠেনি, পরন্তু হরহামেশা তারা কাতারে-কাতারে অনাহারে, অর্ধাহারে, রোগে-শোকে মৃত্যুবরণ করেছে -- কখনও নিজ গৃহে (সেটাও ছিল অধিকাংশেরই খুপরি গুহার মতো), কখনও জমিদারের বা সরকারের কয়েদখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। বলা যায় এটা ছিল সমকালীন গ্রাম বাংলার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা বা চালচিত্র। পরিস্থিতিই তাদের বাধ্য করতো জমিদারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে (আখেরে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াতো)।
এ পর্যায়ে সেই ইতিহাস তুলে ধরার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিশেবে আমরা এখানে প্রথমে বাংলার রায়তশ্রেণীর ওপর জমিদার ও সরকারি কর্মচারিদের যে অকথ্য অত্যাচার-নিপীড়ন চলেছিল তা সরাসরি আলোচনা না করে এ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি লেখক-ঐতিহাসিক যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ও এই সময়কার পত্র-পত্রিকায় যে প্রতিবেদন বা খবর বিধৃত হয়েছে তা তুলে ধরে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করবো। সত্যি বলতে এতে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি তা স্পষ্ট করবে খোদ ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তাদেরই স্বগোত্রীয়গণ কী ঘৃণা ভরে বৃটিশ শাসনকে ভর্ৎসনা করেছে, তা।
দ্বিতীয়ত এই সময়কার বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও কৃষি-অর্থনীতিতে যে নতুন অনুষঙ্গ বা প্রবণতার যোগ হয়েছিল সে সম্বন্ধেও প্রাসঙ্গিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবো, না হলে আমরা মনে করি এই পর্বের ভূমিরাজস্বের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

---

৪৭. রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১৯২।

৪৮. Resolution of the Revenue Department, Calcutta, 1874, pp. 21.

আগে ইংরেজ বেনিয়া প্রশাসনের ছত্রচ্ছায়ায় খাজনা আদায়ের নামে জমিদারেরা রায়তদের কাছ থেকে মূল ভূমিরাজস্ব ছাড়াও যে বিভিন্ন প্রকারের নজরানা বা 'আবওয়াব' জোরপূর্বক আদায় করতো সে সম্বন্ধে সামান্য ধারণা পাওয়া যায় ঐ রকমঃ

ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য তাঁর 'রাজা রামমোহন: বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেন, 'সে-সময়ে প্রায় সমস্ত কিছুর জন্য রায়তদের কর দিতে হত। খাজনা সংগ্রহের জন্য ব্যয়-বাবদ কর, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কর, রাস্তা তৈরির জন্য কর, বাড়ি, হাট, বাজার ইত্যাদির জন্য কর, জমিদার-বাড়িতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবানুষ্ঠানের জন্য কর, কাশী, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে জমিদার-পরিবারের যাওয়ার জন্য কর ইত্যাদি প্রজাদের কাছ থেকে 'আব্ওয়াব' নামে আদায় করা হত। .... খাজনার সঙ্গে ভেট, ভাণ্ডারি, নায়েব-নজর, খোদ-নজর, রোশন, পেয়াদা, দাখিলা, চাঁদা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বেআইনী আব্ওয়াব, মাথট এবং শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন, পূজা, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে মাগন আদায় করার জন্য জমিদাররা রায়তদের উপরে বলপ্রয়োগ করা ছাড়াও রাতের আঁধারে প্রজাদের ধনসম্পত্তি লুঠ করার জন্য ডাকাত নিয়োগ করতেন।'[৪৯]

কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত সমসাময়িক পত্রিকা 'সুলভ সমাচার'-এ এই জাতীয় আরও ভিন্নধর্মী করের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা যুগপৎ কৌতূহলোদ্দীপক ও ভয়ঙ্কর। পত্রিকার ১১ই ভাদ্র, ১২৮০ সংখ্যায় পাওয়া যায়ঃ 'প্রজারা যখন বাজারে তরিতরকারি বিক্রয় করিতে আসিবে, তখন তোলা দিবে। আপনার জায়গায় গাছ তয়েরি (তৈয়ারি) করিবে, তাহার চৌথ জমিদার পাইবে। আক (আখ) হইতে গুড় করিবে, 'ইক্ষুগাছ কর' (দিয়া) জমিদারকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। ঘাটে নৌকা লাগাইবে, জমিদার 'খোটাগাড়ি' লইবেন, নৌকায় মাল তুলিবে কি তাহা হইতে মাল নামাইবে, 'কয়ালী' খাতায় কিছু জমা করিয়া দিতে হইবে। গরুর গাড়ি করিয়া বাজারে মাল পাঠাইতে হইবে, 'ধুলট' দিতে হইবে। ভাগাড়ে গরু ফেলিবে, 'ভাগাড়' জমা দিবে। প্রত্যেক জেলেকে 'জেলে জমা' দিতে হইবে। জমিদার জমিদারিতে তোষদান লইয়া উপস্থিত, সকলের নজর দিয়া সেলাম করিতে হইবে। জমিদারিতে কোনো কাজে আসিয়াছেন 'শাসন জমা' দিতে হইবে। কিছুদিন জমিদারিতে থাকিবেন 'আগমনী' দিতে হইবে। জমিদার কোন কুকার্য করিয়া কয়েদ হইলেন, 'গারদ সেলামী' দিয়া তাঁহাকে বাটী ফিরিয়া (ফিরাইয়া) আনিতে হইবে।'[৫০]

---

৪৯. পৃষ্ঠা ৩৫-৩৯।

৫০. সংগৃহীত, ঐ, পৃষ্ঠা ৮। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ১৭৭২ শক, ৮৪-সংখ্যায় এই জাতীয় আরও বিভিন্ন অবৈধ করাদায়ের নমুনা পাওয়া যায়। পত্রিকার ভাষায়, 'বাঙ্গলাদেশের অনেক ভূস্বামীরই এই প্রকার উপদ্রব, এবং অনেক প্রজারই এই প্রকার যাতনা। সম্প্রতি কৃষ্ণনগর জেলার কোন ভূস্বামী ও তাঁহারদের কর্মচারীদিগের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হওয়া গেল। তাঁহারা প্রজাদের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, তাহারদিগের শরীরও আপনার অধিকারভুক্ত জ্ঞান করেন, এবং তদনুসারে তাহাদিগের কায়িক পরিশ্রমও আপনার ক্রীত বস্তু বোধ করিয়া তাহার উপর দাওয়া করেন। তাঁহারদের এই প্রকার অখণ্ড অনুমতি আছে, যে কোন মূল্যে বিনা বেতনে তাঁহারদিগকে গোপেরা দুগ্ধ দান করিবেক, মৎস্যোপজীবিরা মৎস্য প্রদান করিবেক, নাপিতে ক্ষৌর করিবেক, যানবাহকে বহন করিবেক, চর্মকারে পাদুকা প্রদান করিবেক, ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব উপজীব্যোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারদিগের সেবা করিবেক। ক্রীতদাসকেও এ রূপ দাসত্ব করিতে হয় না। সেও স্বীয় কার্যের বেতন স্বরূপ অন্ন-বস্ত্র প্রাপ্ত হয়। আর ইঁহারা স্বীয় অধিকারস্থ ব্যবসায়ীদিগের নিকট যাবতীয় বস্তু ক্রয় করেন, তাহারও উচিত মূল্য দান করেন না। ইঁহারা যে

এ প্রসঙ্গে ড. কুমুদ আরও বলেন, 'কেউ যদি মনে করেন 'সুলভ সমাচার' অতিশয়োক্তি করেছে, আমরা সবিনয়ে বলব -- 'সুলভ সমাচারে'র এই বিবরণও সম্পূর্ণ নয়। এ ছাড়াও আরো অনেক 'বাজে আদায়' জমিদাররা করত।'[৫১] যেমন মুসলমান প্রজাদের দাড়ির ওপর কর (বারাসতের নারকেলবেড়িয়ার কৃষক-বিদ্রোহের নেতা তিতুমির-এর মতাবলম্বীদের ওপর পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কর্তৃক দাড়ি প্রতি আড়াই টাকা খাজনা ধার্যের কথা এক্ষেত্রে স্মর্তব্য), ছেলের মুসলমানি বা 'খৎনা'র ওপর কর, প্রভৃতি। এক্ষণে দেখার বিষয় এটাই যে, জমিদারের উপরোল্লিখিত 'আবওয়াব-মাথোট', সেটা রায়ত দিতে না চাইলে, এবং খাজনা দিতে তার সামান্য বিলম্ব বা ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে সেক্ষেত্রে জমিদাররা কী করতো?

বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের ভূমিকা ছিল আরও কঠোর, আরও ভয়ঙ্কর, আরও প্রত্যক্ষ। এখানে জমিদাররা রায়তকে যে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি বা দণ্ড প্রদান করতো সমকালীন পত্রিকা* থেকে

পণে দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাহার নাম 'সরকারী মূল্য' -- সে মূল্য তাঁহাদের ইচ্ছাধীন, -- সে মূল্য সাধারণরূপে প্রচলিত হইলে বাণিজ্য ব্যবসায় উচ্ছিন্ন হইত।'
(সংগৃহীত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, পৃষ্ঠা ২৭)।

৫১. রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ৮।
'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ৮১-সংখ্যায় একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল যাতে পাওয়া যায়ঃ ".. যে রক্ষক সেই ভক্ষক' এ প্রবাদ বুঝি বাঙলার ভূস্বামীদিগের ব্যবস্থার দৃষ্টেই সৃচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামী স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা একদিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কি জানি কখন কি উৎপাত ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্বদাই শঙ্কিত। তিনি কি কেবল নির্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগের যথাসর্বস্ব হরণে একাগ্রচিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন। তাহাদিগের দারিদ্র্য দশা, শীর্ণ শরীর, ম্লান বদন, অতি মলিন চীর বসন, কিছুতেই তাঁহার পাষাণময় হৃদয় আর্দ্র করিতে পারে না, কিছুতেই তাঁহার কঠোর নেত্রের বারি-বিন্দু বিনির্গত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি ন্যায্য রাজস্ব ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ী রাজস্বে নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনী, পার্বনি, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিষ্পীড়ন করিতে থাকেন। অনেকানেক ভূস্বামী অনাদায়ি ধনের চতুর্থাংশ বৃদ্ধি স্বরূপে গ্রহণ করেন। প্রতি শতে পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি করিয়া বৃদ্ধি। ইহার অপেক্ষা অনর্থকমূলক ব্যাপার আর কি আছে? ইহাতে তাহাদের সর্বনাশের সূত্র সঞ্চার হয়, -- তাহাদিগকে যাতনাযন্ত্রে পেষণ করা হয়। ভূস্বামীর ভবনে বিবাহ, আদ্যকৃত, দেবোৎসব বা প্রকারান্তর পুণ্য ক্রিয়া ও উৎসব ব্যাপার উপস্থিত হইলে প্রজাদের অনর্থপাত উপস্থিত; তাহাদিগকেই ইহার সমুদয় বা অধিকাংশ ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়। ইহা মাঙ্গন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তিনি মাঙ্গন ভিক্ষা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্বক অপহরণ করেন, ভিক্ষুক নাম গ্রহণ করিয়া দস্যু-বৃত্তি সাধন করেন। যে বৎসর দুই তিনবার এইরূপ ভিক্ষা না হয়, সে বৎসরই নয়। রাজস্ব সঙ্কলনের ন্যায় ইহাও নির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সংগৃহীত হয় এবং তৎপরিশোধে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি জন্মিলেও প্রজাদিগকে অতিশয় অনুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হয়।'
(সংগৃহীত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, পৃষ্ঠা ২৬-২৭)।
*সমকালীন পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী'তে এটি প্রকাশিত। এই পত্রিকার খবর বা প্রতিবেদনের গুরুত্ব সম্বন্ধে বদরুদ্দীন উমর বলেন, 'তৎকালীন পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে উনিশ শতকীয় কৃষক জীবনের যে চিত্র পত্রিকাটিতে অঙ্কিত হয়েছে তা সরাসরিভাবে তুলে ধরা। কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে কোনো বিশ্লেষণমূলক আলোচনা এই পত্রিকাটিতে না থাকলেও গ্রামীণ সমাজের চিত্রকে সততার সাথে বর্ণনার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার স্থান উনিশ শতকে অদ্বিতীয়।' (ঐ, পৃষ্ঠা ৩০)।

তার একটা তালিকা উদ্ধৃত করা হলো।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী' নামক পত্রিকায় 'পশুস্বভাব জমিদারদের' প্রজাদের ওপর নির্যাতনের যে ১৮-টি ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়েছিল সেগুলি নিম্নরূপ[৫২]:-

(১) দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত;
(২) 'চর্মপাদুকা প্রহার';
(৩) 'বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষঃস্থল দলন';
(৪) 'খাপরা দিয়া কর্ণ ও নাসিকা মর্দন';
(৫) ভূমিতে 'নাসিকা ঘর্ষণ';
(৬) পিঠে দু'হাত মোড়া দিয়ে বেঁধে 'বংশ ধণ্ড দিযা মোড়া দেওযা';
(৭) আদুল গায়ে বিছুটি দেয়া;
(৮) হাতে-পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে বাখা,
(৯) দু'হাতে কান ধরে 'দৌড় করানো',
(১০) 'কাঁটা'[৫৩] দিয়ে 'হস্তদলন',
(১১) গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে ইটের ওপর পা ফাঁক কবে দু'হাতে ইট দিয়ে দাঁড় কবিয়ে রাখা,
(১২) প্রচণ্ড শীতে ঠাণ্ডা পানিতে চুবানো;
(১৩) 'গোণীবদ্ধ' করে জলমগ্ন কবা;
(১৪) গাছে বা অন্যত্র বেঁধে টান টান দেয়া;
(১৫) ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় 'পুবে' বাখা;
(১৬) চুনের ঘরে গুমোট পরিবেশে আটকে রাখা;
(১৭) কারারুদ্ধ কবে উপবাসী বাখা,
(১৮) বদ্ধ ঘরে কয়েদ অবস্থায় লঙ্কা-মরিচের ধোঁয়া দেয়া।

বলাবাহুল্য সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলিতে প্রায়শই এই সমস্ত করুণ চিত্র তুলে ধরা হতো যাতে করে কর্তৃপক্ষ উৎপীড়িত রায়তদের বাঁচাতে যে কোনভাবে এগিয়ে আসে। কিন্তু-সে আবেদন হতো নিষ্ফল, অরণ্যে রোদনের সমতুল্য।

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে বিশপ হেবার লিখেছিলেন[৫৩], 'বর্তমানে যে-হারে কর ধার্য করা হইয়াছে তাহাতে দেশীয় বা ইউরোপীয় কোনো কৃষকের পক্ষেই চলা সম্ভব নয়। জমির উৎপাদনের অর্ধেকই গবর্ণমেন্টের পাওনা।... হিন্দুস্থানের (উত্তর ভারত) সরকারি কর্মচারী মহলের সাধারণ

---

৫২. 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাঃ পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা, শ্রাবণ, ১৭৭২ শক, ৮৪ সংখ্যা। সংগৃহীত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, পৃষ্ঠা ৩০; রাজা রামমোহন: বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪; গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, স্বপন বসু, পৃষ্ঠা ৫-৬।

৫৩. দু'টো বাঁশের বাখারির মধ্যে একদিক বেঁধে বা পেরেকে আটকিয়ে অন্য দিক অর্থাৎ খোলা দুই অংশ দিয়ে হাত ভিতোবে ঢুকিয়ে জোরে চেপে দলন বা মর্দন করার স্থানীয়ভাবে তৈরি এই তীব্র যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্রটির নাম ছিল 'কাঁটা'।

অভিমত (কতকগুলি ঘটনার অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের অভিমতের সহিত আমিও একমত) এই যে, দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাবর্গের তুলনায় কোম্পানি-শাসিত প্রদেশগুলির অবস্থা খারাপ; এইসব প্রদেশের কৃষকরা অধিকতর দরিদ্র, অধিকতর ভগ্নোদ্যম। ... আসল ব্যাপার এই যে, কোনো দেশীয় নৃপতিই আমাদের ন্যায় এত বেশী খাজনা দাবি করেন না।'

মার্কস-এঙ্গেলসও তাঁদেব 'উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে' গ্রন্থে বাংলার কৃষকের প্রতিনিয়ত করভাবে ন্যুব্জ হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের ভাষায়, '(বাংলা ও ভারত-এর) রায়ত হল ফরাসী চাষীর এক অদ্ভুত ধরণ -- জমিতে তাদের নেই মৌরসী পাট্টা আব ফসলের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছর বদলাচ্ছে করভার। ... যেমন মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তেমনি বাংলায়, যেমন রায়তওয়ারী প্রথায় তেমনি জমিদারিতে, রায়তেরা অসহ্য রকমের দুঃস্থ হয়ে পড়েছে।'[৫৪]

বস্তুত এই নানাবিধ কর-ভারে ইতোমধ্যে পিঠ-কুঁজো ও অসহায় এবং অন্যদিকে কর-প্রদানে রায়তের সামান্যতম অস্বীকৃতি বা গড়িমসিব কারণে দুরাচারী জমিদারের অত্যাচাব-নির্যাতনের ফলে বাংলার বায়তের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মধ্য-উনবিংশ শতাব্দী নাগাদ যা দাঁড়িয়েছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী প্রতিবেদন বা চিত্র সমকালীন এক ইংরেজি পত্রিকা (The Calcutta Review)-য় প্রকাশিত 'The Zamindar and the Ryot' শীর্ষক নিবন্ধে পাওয়া যায় এ রকম (এটি দীর্ঘ হলেও 'তথ্যসমৃদ্ধ' বিধায় এর প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলে ধবা হলো)[৫৫] :-

"বাংলার যে কোনো স্থানেই যাই না কেন, চোখে পড়বে সেই একই দৃশ্য। রায়তের খাদ্যের মধ্যে শুধু ভাত আর কাপড়ের মধ্যে শুধু একটি নেংটি। তাব শ্রম থেকে যা-কিছুই উৎপন্ন হয় তা উধাও হয়ে যায় নিমিষের মধ্যে। তার উপব উপরওয়ালার পাওনা দাবি অনন্ত। সব দাবিই একে একে তাকে মেটাতে হয়। এরপর সঞ্চয় আর কিছু থাকে না। ফলে তার হাতে কোনোদিন পুঁজি সৃষ্টি হয় না। বাধ্য হয়ে তাকে দ্বারস্থ হতে হয় মহাজনের কাছে। তার রক্ত শোষণ করে ফুলে-ফেঁপে উঠে মহাজন। বাংলার মাটি উর্ববতার জন্য খ্যাত। বীজ ফেললেই ফসল। প্রকৃতির এ বদান্যে রায়তের যদি স্বাধীনতা থাকতো, শোষণ থেকে নিরাপত্তা থাকতো, তবে দেশে সুখ-শান্তি-আনন্দের আর অবধি থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে কি? রায়তের জীবনে আছে শুধু অভাব, দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা। তাদের দুঃখ, তাদের কান্না, তাদের আর্তনাদ কারো মনে সহানুভূতির উদ্রেক করে না, জাগায় না কোনো মায়া-মমতা। শুধু প্রাণে বেঁচে থাকতে হলে একজনের জন্য মাসিক খরচ পড়ে দেড় থেকে তিন টাকা। পরিবারের সদস্যানুপাতে খরচও তদনুরূপ বেশি। আমরা

---

৫৪. পৃষ্ঠা ৮২-৮৩। সংগৃহীত, রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১৯৪-৯৫।

৫৫. বেনামে এ নিবন্ধটি লিখেছিলেন কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির তৎকালীন গ্রন্থাগারিক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক পিয়ারী বা প্যারীচাঁদ মিত্র। বলাবাহুল্য এটি সমকালীন ব্রিটিশ প্রশাসন ও ইংরেজ সমাজে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত লেখক-ঐতিহাসিক আলেকজান্ডার ডাফ। স্বাভাবিক কারণে কর্তৃপক্ষ তাঁকে কৈফিয়ত তলব করলে তিনি যে জোর গলায় জবাব দিয়েছিলেন তাও বেশ কঠোর ও সাহসিকতাপূর্ণ। তিনি যা বলেছিলেন তার বাংলা এ রকমঃ
'সম্পাদক হিসেবে আমি প্রবন্ধটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেই তা প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছি। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য তথ্য থেকে আমি যা জানি তা লেখকের অভিমত থেকে ভিন্নতর কিছু নয়।' (House of Lords Select Committee Report, 1858-3 [Second Report] Alexander Duff's evidence, Q. 6198-6201).

বিশ্বাস করি না যে, বাংলার কোনো জেলার একশত জনের মধ্যে পাঁচ জনেরও বাৎসরিক আয় একশত টাকার অধিক হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো রায়তের একক আয় দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ চলে না। তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সবাইকেই কাজ করতে হয় উপোষ এড়াবার জন্য। সে খায় শুধু মোটা ভাত আর সামান্য ডাল। শাকসব্জি-মাছ তার জন্য বিলাস। তার পোশাক হচ্ছে একটি নেংটি, এর উপর বড় জোর একটি গামছা। শোয়ার জন্য আছে একটি মোটা চাটাই ও একটি বালিশ। নল-খাগড়া-শনের তৈরি কুঁড়ে ঘরটি তার আবাস। একটি লাঙ্গল, দু'টি হালের গরু, একটি বা একাধিক মাটির লোটা ও কিছু বীজ-ধান নিয়ে তার গোটা সম্পদ। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কাজ করে, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার দারিদ্র্য ঘুচে না, বুকে তার পাঁজর দেখা যায়। এ বিবরণে নিশ্চয়ই কোনো অতিশয়োক্তি নেই। এমনকি কোনো আকাল না থাকলেও স্বাভাবিক সময়েও রায়তকে বৎসরে অনেক সময় উপোস করতে হয়। অত্যাচারে, অভাবে, অসহায় অবস্থায় রায়ত হারিয়েছে তার বিবেকবুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, মানবিক মূল্যবোধ। দেহ ও মনে সে এখন পশুর তুল্য।'

যা হোক এ বিষয়ে আর বিশদ বলার সুযোগ আছে বলে মনে করি না। শুধু আরেকজন ইংরেজ লেখকের একটি মন্তব্য উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করতে চাই।

Sir Charles Elliott বলেন, 'আমি বলিতে একটুও দ্বিধাবোধ করিতেছি না যে, কৃষক সম্প্রদায়ের অর্ধেক লোক পূর্ণাহার কাহাকে বলে জানে না। বৎসরের পর বৎসর তাহাদের এইরূপ অবস্থা চলিতেছে।'[৫৬]

আসলে এখানে এ বিষয়গুলি এতো বিশদভাবে আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, আমরা মূলত দেখাতে চাচ্ছি সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও দেশি-বিদেশি লেখক-ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে-চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উত্তর বাংলার কৃষক সমাজের দুরবস্থা কোন্ পর্যায়ে গিয়েছিল, সে ভয়াবহতার সামান্য হলেও যেন পাঠককুল অনুধাবন করতে পারেন।

অন্যদিকে বাংলার এই পর্বের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও কৃষি-অর্থনীতিতে আর যে দু'টি নতুন প্রবণতা যোগ হয়েছিল (প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল বলাই ভালো) -- সেটাও উল্লেখ করা দরকার বলে মনে হয়: এর একটি সুদখোর মহাজনী প্রথার ক্রম-প্রসার ও অন্যটি নীলকরদের অত্যাচার।

মহাজন* ও মহাজনী প্রথার ক্রমবিস্তার

আলোচ্য পর্বে বাংলার গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অধিষ্ঠান তথা কৃষি-অর্থনীতিতে নতুন সংযোজন

৫৬. রিক্ত ভারত, হেমেন্দ্রলাল রায়, ইংরেজ শাসনে বাজেয়াপ্ত বই, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১৪।

* *'মহাজন' শব্দের আভিধানিকার্থ যদিও 'উত্তমর্ণ বা যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করিয়া টাকা কর্জ দেয়' (শব্দ সঞ্চয়িতা: বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা ৬৯০); কিন্তু এই শ্রেণীর মানুষের ঘৃণ্য ভূমিকা তাদের এই অভিধা পাল্টে দিয়েছিলঃ 'মহাজন হচ্ছে মানুষ ও পশুর এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। যাঁরা দেহান্তর প্রাপ্তি ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন তাঁরা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এদের থাবা সিংহের, মস্তিষ্ক শৃগালের, এবং হৃদয় ছাগলের। ... ঘৃণিত জোঁকের মতন শুধু টাকা আদায় করে; গরিব চাষীদের রক্ত চুষে খায়।' (১৮৯৯ সালে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে পাঞ্জাবের লালা মুরলীধর মহাজনদের সম্পর্কে এ উক্তি করেছিলেন। তাঁর মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে যথার্থ ও মূল্যবান। (দেখুন, ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, ড. বিপান চন্দ্র, পৃষ্ঠা ৩২০)।

হিশেবে মহাজন বা মহাজনী প্রথার অনুপ্রবেশ ছিল যে কোন বিচারে আপামর রায়তকুলের বিশেষত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য মারাত্মক ও চরম দারিদ্র্য বিস্তারের সহায়ক।

এ বিষয়ে আলোচনার শুরুতে প্রথমেই জানিয়ে রাখতে চাই, 'The greatest evil that arose out of the British policies with regard to Indian agricultural economy was the emergence of the moneylender as an influential economic and political force in the country. Because of the high revenue rates demanded and the rigid manner of collection, the peasant cultivator had often to borrow money to pay taxes."[৫৭]

অন্যত্র ড. বিপান চন্দ্র বলেন, 'গ্রামীণ ভারতের দুঃখ-দুর্দশার তৃতীয় কারণ ছিল, সাহুকার অর্থাৎ মহাজন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে ভারতের গ্রামাঞ্চলে ঋণগ্রস্ততা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এটাই ছিল পল্লী অঞ্চলের অন্যতম প্রধান দুরূহ সমস্যা। গ্রামের মহাজন অত্যধিক চড়া হারে সুদ আদায় করত। চাষীর উপার্জনের একটা বড় অংশই সুদ মেটাতে চলে যেত। এবং প্রায়শই চাষী ঋণ পরিশোধ করতে না-পারার ফলে প্রচুর পরিমাণে জমি অ-কৃষিজীবী মহাজনদের অধিকারে চলে যেত। এই প্রক্রিয়ায় চাষী ক্রমশ পূর্বতন রায়ত মালিকের টঙ্কা প্রজায় পরিণত হচ্ছিল। যে-কারণে কৃষি এবং কৃষক উভয়েরই অবনতি ঘটতে থাকে।"[৫৮]

উপরে বর্ণিত আধুনিক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের প্রোক্ত বক্তব্যকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো -- এক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উত্তর কোম্পানির উচ্চ হারে ভূমিরাজস্ব ধার্যকরণ ও তা আদায়ে নজিরবিহীন কঠোরতা (স্মর্তব্য কোন কারণেও এই ব্যবস্থায় ধার্য রাজস্ব মওকুপের সুযোগ ছিল না) অনুসরণের ফলে বাংলার রায়তের অর্থনৈতিক চাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কাগজে-পত্রে যদিও রাষ্ট্র বা সরকার এ ব্যবস্থায় রাজস্ব ধার্য করতো জমিদার-তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকদের উপর, কিন্তু আদায়কালে এটি অনিবার্যভাবে গিয়ে পড়তো বা চাপতো রায়তদের ঘাড়ে; এবং দুই. উক্ত অর্থনৈতিক চাপ বা ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য মোকাবিলা করতে গিয়ে নিরুপায় রায়তের শেষ পর্যন্ত কুশীদজীবী মহাজনদের দ্বারে আত্মসমর্পণ ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না, অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ ও উপর্যুপরি ঋণ গ্রহণের কারণে রায়তের দারিদ্র্যের আরও সম্প্রসারণ ঘটতো।

বলাবাহুল্য মহাজনী কায়-কারবার বাংলায় আগেও যে ছিল না তা নয়। প্রাক-ইংরেজ যুগে বাংলার দরিদ্র রায়তগণ প্রয়োজনের সময়ে মহাজনের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিতো বটে। কিন্তু সুদের হার তখন ইংরেজ আমলের মতো এতো চড়া ছিল না।"[৫৯] সত্যি বলতে পর্যালোচ্য যুগেই এর প্রথমবারের ন্যায় ব্যাপকত্ব দেখা গেল। ড. এ আর দেশাই বলেন, 'ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতীয় কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এক দশক থেকে আরেক দশকে

৫৭. Freedom Struggle, Drs. Bipan Chandra, Amalesh Tripathi and Barun De, pp. 18.

৫৮. ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, পৃষ্ঠা ৩১৮।

৫৯. মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল যথার্থই বলেন, 'ইংরেজ আমলের পূর্বেও সমাজে মহাজন ছিল, সুদী কারবার চলত। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল কম, ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। এখনকার মতো এত বেশি লোককে, বিশেষ করে এত কৃষককে কর্জ নিতে হ'ত না, তাও খাজনা মেটাবার দায়ে।' (কৃষকসভার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩৯)।

তা বেড়ে যাচ্ছিল।"[৬০] এবং এটাও স্বীকার্য যে, এক পর্যায়ে তা বিধিবদ্ধতা বা প্রাতিষ্ঠানিকতার রূপ পরিগ্রহ করেছিল।[৬১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উত্তর পর্বে খাজনার হার যেহেতু ছিল অত্যধিক এবং আগেই বলেছি যে কোন অবস্থাতেই এতে রায়তের খাজনা মওকুপের কোন সুযোগ ছিল না, ফলে রোদে পুড়ে ও বৃষ্টিতে ভিজে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর কৃষক যে উৎপাদন করতো, তার তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি[৬২] চলে যেতো জমিদার-তালুকদারের ন্যায্য-অন্যায্য পাওনা পরিশোধে। এখানে উল্লেখ্য যে, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সরকারি রাজস্বশাসন প্রতিবেদনগুলি (Revenue Administration Reports) থেকেও আমরা জানতে পারি যে, কোন 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা উৎসবে অপব্যয় নয়, কৃষিজীবীগণের ঋণগ্রস্ততার একমাত্র কারণ (ছিল) রাজস্বের বিপুল হার'।[৬৩]

এই বিপুল রাজস্বের ভার কমাতে ভূমির উৎপাদনের পাশাপাশি বা উৎপাদনের বাইরে অবসরে রায়ত যে অন্যত্র শ্রম বিক্রি করবে, সে সুযোগও তার ছিল না। কারণ সে সময়টুকুও জমিদার নিয়ে নিতো 'বেগার' খাটানোর নামে।[৬৪] এর ফলে কী হলো?

---

৬০. ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, পৃষ্ঠা ৫২।
ড. কেশব চৌধুরীও জানাচ্ছেন, "১৮৮০ সাল নাগাদ ভারতীয় কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা ভয়াবহ পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের রায়ে দেখা যায় যে, 'জমিমালিক শ্রেণীগুলির এক-তৃতীয়াংশ গভীরভাবে· এবং পরিত্রাণ লাভের উপায়হীন অবস্থায় ঋণভারে জর্জরিত; আর, অন্তত এর সমান এক অংশের মুক্তিলাভ সাধ্যাতীত না হলেও, ঐ অংশও ঋণগ্রস্ত বটে।' তারপর দশক থেকে দশকে গ্রামীণ জনতার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।"
(ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ, পৃষ্ঠা ৯২)।

৬১. মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল বলেন, 'মহাজনী কারবার ইংরেজ শাসনের পূর্বেও ছিল কিন্তু ইংরেজ সরকার তাকে বিধিবদ্ধ করে।' (কৃষকসভার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৪)।
১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ক্যাপ্টেন উইনগেট আক্ষেপের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেনঃ '.. this miserable struggle between creditor and debtor is thoroughly debasing to both ... It is disheartening to contemplate, and yet it would be weakness to conceal the fact that this antagonism of classes and degradation of the people, which is fast spreading over the land, is the work of our laws and our rule.'
(History of the Freedom Movement in India, Vol. One, Dr. Tara Chand, pp. 298-99).

৬২. বাংলা ও বাংলার বাইরে কোথাও কোথাও এমন দেখা গেছে, কৃষকের উৎপাদনের শতকরা ৮৫ ভাগ তাকে বাধ্য হয়ে জমা দিতে হতো জমিদার বা সরকারের ঘরে। দেখুন, ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'ভারতের কৃষি উন্নয়ন ও বৃটিশ ভূমিরাজস্বনীতি', ইতিহাস অনুসন্ধান/২, পৃষ্ঠা ১৯৪।

৬৩. দেখুন ঐ, ইতিহাস অনুসন্ধান/২, পৃষ্ঠা ১৯৩-৯৪; মূল Replies to Enquiry into the working of the Rent Act of 1868, Uttar Pradesh State Archives, Lucknow, Board of Revenue, Oudh General File no 394, Part II.

৬৪. ২৪-পরগণা জেলার জমিদারদের বিভিন্ন রকমের অবৈধ কর প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীনরহরি কবিরাজ যে ২১টির নামোল্লেখ করেছেন তার মধ্যে 'বিনা-বেতনে পরিশ্রম' বা বেগারিও ছিল একটি। (দেখুন, স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, পৃষ্ঠা ১২২)। বলাবাহুল্য এটি শুধু ২৪-পরগণা জেলায়ই প্রচলিত ছিল না, বরং বাংলার সর্বত্রই এর প্রকোপ ছিল মাত্রাত্মক।

দেখা গেল, 'জমিদারের বিভিন্ন রকমের পাওনা মিটিয়ে রাইয়তের পক্ষে সংসার চালানো ও চাষের কাজ চালানো কঠিন, হয়তো সম্ভবই নয়। তখন মহাজনের দ্বারস্থ না হ'য়ে উপায় নাই।'[৬৫] এটাই ছিল সমকালীন ভূ-রাজস্ব-অর্থনীতির বাস্তব অবস্থা।

অনেক জমিদার ছিল নিজেরাই মহাজন অর্থাৎ চড়া সুদে রায়তদের ঋণ দিতো। কিন্তু তাদের চেয়েও অনেক অনেক গুণ বেশি ছিল প্রকৃত সুদের কারবারী মহাজনদের সংখ্যা। পরবর্তীকালে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে যখন 'The Bengal Moneylenders' Act' প্রণীত হয়েছিল তখন এর পর্যালোচনা সূত্রে 'Modern Review' তাদের অক্টোবর, ১৯৩৩ সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ৪৪০) আইনটির প্রবক্তা খান বাহাদুর আজিজুল হককে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিল, এই সময় বাংলায় প্রায় ৫০,০০০ কুশীদজীবী-মহাজনের অস্তিত্ব ছিল, যার মধ্যে আবার ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল বা বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ -- এই ৪টি মাত্র জেলাতেই ছিল প্রায় ২০,০০০ জন।[৬৬] এরা গরিব রায়তের দুর্দশাগ্রস্ততার সুযোগ নিয়ে অভাবের সময়ে তথাকথিত 'প্রজাদরদী' হওয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। ফলত কঠিন ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে বেঁধে ফেলতো।

স্বপন বসুর ভাষায়, 'জমিদারের হরেকরকম খাই মেটানো কৃষকের সাধ্যাতিরিক্ত হওয়ায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই অন্যের কাছে তাকে সাহায্যের জন্য হাত পাততে হল; সুযোগ বুঝে রঙ্গমঞ্চে হাজির হল গ্রাম্য মহাজনশ্রেণী, এবং কৃষককে তার দ্বারস্থ হতে হলও। মহাজন ঋণ দিল সাগ্রহে, কিন্তু পরের বছর ফসল উঠলে ঋণ ও সুদের দায়ে তার কাছেই ফসল বিক্রি করতে বাধ্য করল কৃষককে। ফসল থেকে প্রাপ্ত সামান্য অর্থ থেকে জমিদারের প্রাপ্য এবং মহাজনের সুদ মিটিয়ে সারাবছর চালাবার মতো সঙ্গতি অধিকাংশ কৃষকেরই থাকত না। সেইজন্য ঘুরেফিরে বারবারই তাকে মহাজনের দ্বারস্থ হতে হত।'[৬৭] অর্থাৎ একবার মহাজনের কবলে পড়লে সে রায়তের আর কোনভাবেও উদ্ধার ছিল না।[৬৮] ব্যাপারটি আরও চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন ড. তারাচাঁদ। তাঁর ভাষায়, 'Once the farmer was in the money-lender's clutches, the latter used all the chicanery and cunning that he had at his command, to keep his victim in bondage. Interest rates were fixed so high that the cultivator was at best able to pay only the interest on the loan; the repayment of the principal with fluctuating and low levels of income

---

৬৫. কৃষকসভার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৪।

৬৬ দেখুন, চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারী : বাংলার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা, পৃষ্ঠা ১০৬।

৬৭. গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, পৃষ্ঠা ১০।

৬৮. সমকালীন পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' তাদের ৪ঠা আশ্বিন, ১২৭১ সনের সংখ্যায় মহাজনের ঋণের জাল বিস্তারের ঘটনা প্রকাশ করেছে এভাবেঃ

"মহাজন শব্দটি শুনিতে মধুর বটে, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গবাসী প্রজার অদৃষ্টে ইহা বিষময় ফল প্রসব করে। কোথায় সহায় ও সম্বলহীন প্রজারা মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক-সমুদায় (সমুদয়) দায় হইতে রক্ষা পাইবে তাহা না হইয়া মহাজনই তাহাদিগের সর্বনাশের কারণ হইয়া উঠিয়াছেন এ কথা কে না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, সামান্য একজন গ্রাম্য মহাজন অতি অল্প (পুঁজি) লইয়া অচিরকাল মধ্যে প্রজার সর্বনাশ করিয়া অতুল ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠেন। ... মহাজনেরা সুদ, সুদের সুদ, ধরতা, বাঁটা, হিসাবানী, পার্বনী প্রভৃতি বাবদে অল্পদিনের মধ্যে ঋণজালে প্রজাকে এমনি বদ্ধ করিয়া ফেলে যে, তাহার আর উদ্ধারের উপায় থাকে না, ..।'

(উদ্ধৃতি সংগ্রহ, চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারী: বাংলার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা, পৃষ্ঠা ১০৩)।

was generally beyond his capacity. Even if a debtor by extraordinary industry and prudence tried to repay the loan and free himself, he was not allowed to do so, for the accounts were manipulated and the documents forged so that the arrears of interest accumulated more rapidly that their repayment by the debtor. The cultivator found himself helpless, for he could turn nowhere for protection."[৬৯]
তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, জমিদারের মতো মহাজন রায়তকে শারীরিক নির্যাতন করতো না (খুব কম ক্ষেত্রেই তেমনটা ঘটতো), বরং তার নির্যাতনের প্রকৃতি ছিল মানসিক -- নিঃশব্দ, অব্যর্থ, তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী।
এখন দেখা যাক, মহাজনদের সুদের হার কেমন ছিল।

১৯২৯-৩০ সালে বিশ্বজোড়া বাণিজ্য-সংকট ও আক্রা-মন্দার সময়ে বাংলার কৃষকের ঋণের পরিমাণ তদন্ত করার জন্য যে কমিটি (The Bengal Banking Enquiry Committee) গঠিত হয় তাদের প্রতিবেদন থেকে এই সময়কার বাংলার বিভিন্ন জেলায় রায়তদের কাছ থেকে মহাজনরা যে চড়া হারে সুদ আদায় করতো তার ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ[৭০]:-

বাৎসরিক শতকরা সুদের হার

জেলার নাম	সুদের হার	জেলার নাম	সুদের হার
বর্ধমান	২৪--১৭৫	ফরিদপুর	১৫--১৫০
বীরভূম	১৫--৩৭.৫	চট্টগ্রাম	১৫--৭৫
বাঁকুড়া	১৫--২৫	নোয়াখালি	২৪--৭৫
মেদিনীপুর	১২--৭৫	ত্রিপুরা / কুমিল্লা	২৪--৭৫
হুগলি	১২--৩৭.৫	রাজশাহি	১৮.৭৫--৭৫
নদীয়া	৩৭.৫--৭৫	পাবনা	৩৭.৫--৩০০
যশোহর	১৮.৭৫--৭৫	রংপুর	৩৭--৬৬.২৫
মুর্শিদাবাদ	১৮--১২০	মালদহ	১০.৭৫--৭৫
২৪-পরগণা	১৫--১৫০	জলপাইগুড়ি	১০--৫০
ঢাকা	১২- ১৯২	দার্জিলিং	১০--৫০
ময়মনসিংহ	২৬--২২৫	হাওড়া	১৩--১৭৫
বাকেরগঞ্জ	২৪--১০০		

যদিও উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানটি পরবর্তীকালের, কিন্তু এ থেকেই প্রতীয়মান হবে পর্যালোচ্য যুগে মহাজনরা কী হারে বা পরিমাণে রায়তদের দেয় ঋণের উপর সুদ আদায় করতো। বস্তুত বার্ষিক সুদের হার শতকরা সর্বনিম্ন ১০ হোক কি ৫০, কি সর্বোচ্চ ২০০ থেকে ৩০০ -- যাই হোক না কেন, এই অত্যধিক সুদের হার যে বাংলার রায়তসাধারণের দারিদ্র্যকে আরও বৃদ্ধি করেছিল এবং তাকে ক্রমশ পরনির্ভরশীল (এক্ষেত্রে পর বলতে মহাজন ও জমিদারকেই বুঝানো হচ্ছে) ও

৬৯. History of the Freedom Movement in India, Vol. One, pp. 298.
৭০ তথ্য সংগৃহীত, চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারী : বাংলার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা, পৃষ্ঠা ১০৫।

মহাজনের হাতের ক্রীড়ানক করে তুলেছিল, তা অনস্বীকার্য।

ড. দেবেন্দ্র বিজয় মিত্র যথার্থই বলেন, 'They (the vast agricultural population or ordinary peasants of Bengal) were completely under the grip of the money-lenders and money-changers who exploited them the most.'[৭১]

যা হোক ভূমিরাজস্ব প্রদাতৃশ্রেণীর সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত থাকার ফলে একটি নতুন কিন্তু প্রবল শক্তিশালী গোষ্ঠী হিশেবে অষ্ট্য-অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে নিয়ে মধ্য-উনবিংশ শতক বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে ঐ শতাব্দীর শেষ নাগাদ মহাজনদের এই শক্তিশালী উত্থান তাদেরকে বাংলার অপরাপর সামাজিক নিয়ামক শক্তিগুলির সমান্তরালে প্রাদুর্ভূত বা পল্লবিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। আবির্ভাবের অচিরকাল মধ্যে জমিদার, তালুকদার, নীলকর প্রভৃতির পাশাপাশি এরাও সমাজ নিয়ন্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিল।

ড. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'And thus, towards the end of the nineteenth century, in many parts of Bengal, we find a number of well-to-do traders, moneylenders, *zamindars* and tenu eholders belonging to these newly prosperous trading castes.'[৭২] যেহেতু জমিদার-তালুকদারদের সঙ্গে এই পর্বে রায়তদের বিরোধ-সংঘর্ষ ছিল একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার, মহাজনদের উত্থান ও তাদের শোষক চরিত্র, প্রজাদের অসন্তোষ যেমন বাড়িয়ে চলেছিল তেমনি তাদেরকে প্রজার নতুন শত্রু হিশেবেও চিহ্নিত করেছিল; যে কারণে পরবর্তীকালে জমিদার-তালুকদারের বিরুদ্ধে যে সব প্রজা-বিদ্রোহ সংঘটিত বা লড়াই পরিচালিত হয়েছে, তা একইসঙ্গে মহাজনদের বিরুদ্ধেও সংগঠিত হয়েছিল বলে আমরা গভীর তাৎপর্যের সঙ্গে দেখতে পাই।[৭৩]

যা হোক এ বিষয়ে পরবর্তীতে আরও আলোচনার সুযোগ রয়েছে, ফলে এখানে শুধু এটুকু বলবো যে, 'ঔপনিবেশিক বাংলায় ক্রমবর্ধমান কৃষিঋণ (সরকারি বা 'তাকাবি' বা মহাজনী -- যে কোন ধরনেরই ঋণ হোক না কেন) কৃষকদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে না। এই ঘটনা বরং তাদের বর্ধিষ্ণু দারিদ্র্য এবং ভূমিচ্যুত হওয়ার প্রবণতাকে নির্দেশ করে।'[৭৪]

নীলচাষ ও নীলকরদের অত্যাচার

ড. বিপান চন্দ্র, ড. অমলেশ ত্রিপাঠী ও ড. বরুণ দে যথার্থই মন্তব্য করেন, 'One of the greatest peasant movements of the modern era was the indigo agitation that engulfed Bengal in 1859-60. Indigo cultivation was a

৭১. Monetary System in the Bengal Presidency, (1757-1835), Dr Debendra Bijoy Mitra, pp. 196.

৭২. Caste, Politics and the Raj: Bengal (1872-1937), Dr. Sekhar Bandyopadhyay, pp. 106.

৭৩. এই প্রজা অসন্তোষ ও প্রজা-বিদ্রোহের জন্য দেখুন, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সুপ্রকাশ রায়; Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Dr. Ranajit Guha প্রভৃতি।

৭৪. মনোজকুমার সান্যাল-এর প্রবন্ধ, 'ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে ঋণ ও জমি হস্তান্তরের সমস্যা : একটি জেলাওয়ারী সমীক্ষা', দেখুন, ইতিহাস অনুসন্ধান/৪, পৃষ্ঠা ২৫১।

strict European monopoly. The foreign planters compelled the peasant to cultivate indigo and subjected them to untold oppression."[৭৫]

বস্তুত এই মোদ্দা কথাটি মাথায় রাখলে এবারকার আলোচনা বুঝা সহজ হবে বলে মনে করি। নীল বাংলার একটি প্রাচীন কৃষিজাত শস্য বা দ্রব্য[৭৬] হলেও মূলত ব্রিটিশ রাজত্বেই এর ব্যাপক চাষাবাদ শুরু হয় ও একটি রপ্তানিযোগ্য শিল্পপণ্য হিশেবে বিকাশ ঘটেছিল। ১৭৭২ সালে লুই বোনার্দ (Louis Bonnard) নামে একজন ফরাসি ভদ্রলোক সর্বপ্রথম হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে চন্দননগরের কাছে গোন্দলপাড়ায় একটি নীলকুঠি স্থাপন করে আনুষ্ঠানিকভাবে নীলের চাষ করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৭৭৩-য় চুঁচুড়ার তালডাঙ্গায়ও তিনি একটি কুঠি প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে খোদ ইংরেজদের মধ্যে ক্যারেল ব্লুম (Carel Blume) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে প্রথম নীল ব্যবসায়ের সাথে জড়িত হন। তিনি করেছিলেন হাওড়ায় কুঠি স্থাপন। পরবর্তীকালে, বলা যায় তার দেখাদেখি এবং তারই পরামর্শে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নীল চাষে আগ্রহী ও অর্থ লগ্নি করতে শুরু করেছিল।

১৭৮৩ সালের মধ্যে কোম্পানি বাংলার কয়েকটি জেলায়, যেমন হুগলি, ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর, নদীয়া, বর্ধমান, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে নীলকুঠি প্রতিষ্ঠিত করে এবং জাঁকিয়ে ব্যবসায় করতে থাকে। ঐ বছর কোম্পানি বাংলা থেকে প্রায় ১২/১৩শ' মণ নীল ইংল্যান্ডে রপ্তানি করেছিল (কলকাতা বন্দর দিয়ে এগুলি রপ্তানি হতো)।[৭৭] এখানে উল্লেখ্য যে, শিল্প বিপ্লব ও বিশেষ করে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে এই সময় ইউরোপে নীলের ব্যাপক চাহিদা ছিল এবং একটি উল্লেখযোগ্য নীল উৎপাদক দেশ হিশেবে বাংলা ও ভারতের[৭৮] গুরুত্বও তখন

---

৭৫ Freedom Struggle, pp. 45.

৭৬. প্রখ্যাত নীল গবেষক ও ঐতিহাসিক Blair B. Kling বলেন, 'প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ভারতে নীলচাষ ও নীল প্রক্রিয়াকরণ করা হতো এবং তা কিছু পরিমাণে রোম সাম্রাজ্যের যুগে ও মধ্যযুগের ইউরোপে রপ্তানি করা হতো। ক্রান্তীয় অঞ্চলের দুর্লভ পণ্য নীলের কারণেই ইউরোপীয় বণিকরা প্রথম ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে অবশ্য পর্তুগীজরা ওয়েষ্ট ইন্ডিজে যাওয়ার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করলে, তারা সেখান থেকেই সমগ্র ইউরোপীয় বাজারে সরবরাহের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণ নীল আমদানি শুরু করে। সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজরা নীল ব্যবসায়ে পর্তুগীজদের একচেটিয়া সুবিধা নষ্ট করে দেয়। এরপর, ইংরেজরা সন্তর্পণে ওলন্দাজদের পদাংক অনুসরণ করতে শুরু করে এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্রুতগতিতে তাদের সর্বাধিক লাভজনক পণ্যের তালিকায় নীল অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।' (নীল বিদ্রোহ: বাংলায় নীল আন্দোলন, ১৮৫৯-১৮৬২, ব্লেয়ার বি. ক্লিং, পৃষ্ঠা ১৩-১৪)।' ড. চিত্তব্রত পালিত বলেন, "Indigo was a native crop but 'from the seventeenth to the twentieth centuries, indigo was a fugitive among industries, wandering from Gujarat in western India to the West Indies and then back to Bengal in eastern India'." (Tensions in Bengal Rural Society : Landlords, Planters and Colonial Rule (1830-1860), Dr. Chittabrata Palit, pp. 88.)

৭৭. প্রবন্ধ 'নীল চাষের ইতিবৃত্ত ও রামমোহন', ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৮০, পৃষ্ঠা ২০২।

৭৮. ভারত বলতে বস্তুত গুজরাট, আগ্রা ও অযোধ্যাতেই তখন নীলের প্রধান চাষ হতো। তবে আগ্রা ও অযোধ্যার নীল ছিল বাংলার তুলনায় কিছুটা নিম্নমানের। (দেখুন, নীল বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা ১৪)।

ইংল্যান্ড তথা কোম্পানির কাছে যথেষ্ট বেড়ে যায়।[৭৯] ফলত অত্যল্পকালের মধ্যে এদেশে নীল চাষের ব্যাপক বিস্তৃতি ও নীলশিল্পের উত্তুঙ্গ বিকাশ লক্ষ্য করা গেল; একদিকে নীল চাষে নীলকরদের প্রভূত উৎসাহ দেয়ার জন্য যেমন কোম্পানির নিজস্ব বিনিয়োগ বেড়েছিল, তেমনি অন্যদিকে নীলের শনৈঃ শনৈঃ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কোম্পানির এক বছর থেকে পরের বছরই প্রচুর পরিমাণে নীল বিদেশে (এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে) রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছিল।
১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে নীল চাষে কোম্পানির বিনিয়োজিত অর্থের পরিমাণ যেখানে ছিল ১ লক্ষ 'সিক্কা' টাকা মাত্র, সেখানে পরবর্তী ৫-বছরে অর্থাৎ ১৭৯৫ সালে এই বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১০ লক্ষ 'সিক্কা'য়।[৮০] অথচ তখনও কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য ছিল বস্ত্র, লবণ, চিনি, শোরা বা আফিমকে ঘিরেই।[৮১] এছাড়া ১৭৯২ থেকে ১৮০৩ সাল সময়-পর্বে নীল চাষে কোম্পানি নাম মাত্র সুদে যে ঋণ দিয়েছিল তাও ছিল প্রায় ১ কোটি 'সিক্কা'র মতো। অন্যদিকে কোম্পানির নীল রপ্তানি যে উত্তরোত্তর বেড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত ছক থেকে।[৮২]

বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে প্রেরিত নীলের বছরওয়ারি পরিমাণ in cwt				
১৮১২-১৩	৪,৯৪,৭৫		১৮২১-২২	৬,২১,৭৫
১৮১৩-১৪	৫,০০,৯৬		১৮২২-২৩	৭,৫৪,০৫
১৮১৪-১৫	৬,৮৭,৪৬		১৮২৩-২৪	৫,৩৭,৮২
১৮১৫-১৬	৭,৬৬,৬১		১৮২৪-২৫	৭,৩৮,১২
১৮১৬-১৭	৫,৮৫,৮০		১৮২৫-২৬	১০,৪৮,৩১
১৮১৭-১৮	৪,৮৭,৩২		১৮২৬-২৭	৫,৩৩,৫৫
১৮১৮-১৯	৪,৫৬,৪২		১৮২৭-২৮	১০,১৫,৮৪
১৮১৯-২০	৭,০৯,৩২		১৮২৮-২৯	৬,৫৬,৩১
১৮২০-২১	৫,১০,৬৬		১৮২৯-৩০	৮,৯০,২৬

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্ণিত বছরগুলিতে তথা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় নীলচাষ উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং কোম্পানির রপ্তানির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সূত্রে তাদের মুনাফাও ক্রমশ গগনচুম্বী হয়েছিল।
'নীলচাষ করে রাতারাতি ধনী হওয়ার জন্য কোম্পানির অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী কোম্পানির

৭৯ নীলকে কেন্দ্র করে এই সময় ব্রিটিশ সরকারেরও নীতি-আদর্শের কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। বাস্তব কারণে তারা ভারতে নীল চাষের প্রতি আরও ঝুঁকে পড়ে। C. A. Bayly বলেন, 'Following the American War of Independence Britain's policy was to wrest control of the indigo trade from French, Spanish and Americans by promoting the cultivation of the commodity in India.' (Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion, 1770-1870, pp. 237).

৮০. রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১১৬।

৮১. The New Cambridge History of India Series: The Economy of Modern India (1860-1970), B. R. Tomlinson, pp. 51.

৮২. তথ্য সংগৃহীত, Tensions in Bengal Rural Society, pp. 88.

চাকরি ছেড়ে দিয়ে নীলকুঠি স্থাপন' করে এ সময় নীল ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছিল।

ড. সুগত বসু বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেন, 'In the early nineteenth century indigo was the main area of operation of capital supplied by the Agency Houses, the typical multi-faceted institutions of trade and finance formed by ex-servants of the Company and free merchants. The volume of indigo exports from Calcutta to London rose from 40,000 maunds in 1800 to 120,000 maunds in 1815, and between 1826 and 1830, the beginning of a period of severe instability, averaged 118,000 maunds.'[৮৩]

নীল চাষ ও ব্যবসা থেকে কোম্পানির 'দুনো' লাভ এবং কোম্পানির নিজস্ব বেতনভোগী কর্মচারীদের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে নীল ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়া এদেশীদের বিশেষত তথাকথিত 'কলকাতা বেনিয়ান' জমিদারগোষ্ঠীকেও এর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তা বলাইবাহুল্য। এদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নড়াইলের রামরতন রায়, হরনাথ রায়, রাণাঘাটের জয়চন্দ্র পালচৌধুরী প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জানা যায়, এক রামরতনেরই ছিল ২৪টি নীলকুঠি, দ্বারকানাথের ৬টি ইত্যাদি।'[৮৪]

বস্তুত অতঃপর ইংরেজ (১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এদের মালিকানায় নীলকুঠি ছিল ২৭১-টি) ও

---

৮৩. The New Cambridge History of India Series: Peasant Labour and Colonial Capital, Rural Bengal since 1770, Dr Sugata Bose, pp. 46-47. অতঃপর ১৮৫৯-৬০-পূর্ব পরবর্তী দশকগুলিতে নীলচাষ ও বাণিজ্যে কখনও কখনও সাময়িক মন্দা দেখা গেলেও তা যে নীলচাষকে আদৌ বিপর্যস্ত করতে পারেনি, বরং ক্রমশ এর চাষাবাদ সম্প্রসারিত হয়েছিল তার প্রমাণ, ব্লেয়ার বলেন, 'পরবর্তী দু'দশকে নীল ও অন্যান্য শিল্প-উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্রিটেনের কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কলকাতার কতিপয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের এক নতুন সংঘ। নীলকুঠি কেনা ও সেগুলোর মাসিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থসংস্থানের মাধ্যমে এই নতুন সংঘ নীল কনসার্নসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করে। বেশ অনুকূল সময়েই এই নতুন বাণিজ্যিক সংঘ সদর্পে নীলবাজারে প্রবেশ করে এবং এই সঙ্গেই নিম্নবাংলার নীলশিল্প, ১৮৩৪ ও ১৮৪৭ সালের সাময়িক মন্দা ব্যতীত ইউরোপ ও আমেরিকায় নীলের চাহিদার পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার কারণে, সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়।' (নীল বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা ১৭)।

বাংলার জেলায়-জেলায় নীলকুঠির বিস্তার (এবং সেইহেতু নীলকরদের অত্যাচার) কীরূপ ঘটেছিল তার প্রমাণ W. W. Hunter-এর উক্তিতে পাওয়া যাবেঃ

'Until 1860, the cultivation and manufacture of indigo were extensively carried on throughout the District of Pabna; and it was hardly possible to travel four or five miles in any direction without passing at least one indigo factory or out-work in charge of a European or native manager.' (A Statistical Account of Bengal, Vol. IX, pp. 330)। যদিও বাংলার একটি মাত্র জেলার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এ মন্তব্য করেছিলেন, কিন্তু তা সমগ্র বাংলা, বিহার ও ওড়িশার জন্যই ছিল সমান সত্য ও প্রাসঙ্গিক।

৮৪. গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, পৃষ্ঠা ১২।

দেশি (একই সময় এদের ছিল ১৪০টি) নীলকরেরা মিলে বাংলায় যে অবর্ণনীয় দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর ফলে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার অন্যতম অনুষঙ্গ ও শরিক কৃষককুলের উপর যে অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশা নেমে এসেছিল সেটাই এখন সংক্ষেপে তুলে ধরাব চেষ্টা করা হলো। তবে আগেই জানিয়ে রাখি, এ বিবরণ বাস্তবের ছিটেফোঁটা মাত্র।

দু'-পদ্ধতিতে নীলের চাষ করা হতো -- নিজ আবাদি ও রায়তি প্রথায়।[৮৫] নিজ আবাদি পদ্ধতিতে নীলকররা নিজস্ব জমিতে (এ জমি তারা স্থানীয় জমিদার-তালুকদার প্রভৃতির কাছ থেকে ৫-বছরের জন্য ইজারা নিতো) নিজেরাই বীজ সরবরাহ করে ও গরু-লাঙ্গল দিয়ে ভাড়ায় চাষী বা মজুর খাটিয়ে নীলের আবাদ করতো, -- এককথায় এ পদ্ধতির চাষ ছিল, 'at his own expense, on his own land'.

এই জমিগুলির অবস্থান হতো সচরাচর নীলকুঠি-সন্নিহিত ও প্রধানত চরাঞ্চলে। ১৮৬০ সনের 'নীল কমিশন' (The Indigo Commission)-এর রিপোর্টের উপর দু'কলম লিখতে গিয়ে বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট-গভর্নর John Peter Grant যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে উল্লেখ ছিলঃ 'The mass of *nij* cultivation is, I believe, conducted upon *char* lands more especially in the eastern districts; and it is unquestioned that on *char* land indigo is subject to comparatively small competition with other crops, and sometimes to none.'[৮৬]

অর্থাৎ চরাঞ্চলে চাষীদের দ্বারা নীলের চাষ করানো ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ ও কম ব্যয়বহুল।

অন্যদিকে রায়তি প্রথায় রায়তকে বিঘা প্রতি ২-টাকা দাদন দিয়ে একরকম বাধ্য করে তার ভোগ-দখলাধীন জমিতে নীল চাষ করা হতো। এ প্রথায় নীলচাষীকে যেহেতু আগেভাগেই দাদন দেয়া হতো সেহেতু চাষের সকল ব্যয়ভার চাষীকেই ব্যক্তিগতভাবে বহন করতে হতো। এখানে বলা দরকার যে, রায়তি আবাদের চেয়ে নিজ আবাদি প্রথায় যেহেতু খরচ অনেক বেশি পড়তো (কখনও কখনও তিন-চার গুণেবও বেশি), স্বভাবতই নীলকরেরা চাইতো রায়তি পদ্ধতিতে চাষ করতে, অন্যকথায় নীলচাষের সকল ব্যয় রায়তের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বার্ষিক বিঘা প্রতি মাত্র ২-টাকা দায় শোধ করে নীল উৎপাদনের সমস্ত সুবিধা বা ফায়দা হাসিল করতে। এ কারণেই দেখা যায়, 'নীলচাষের জন্য ব্যবহৃত জমির বড় অংশই ছিল রায়তী প্রথার অধীনে এবং তা ছিল কারখানা এলাকার বাইরে বন্যায় কিছুটা ডুবে যায় এমন ধরনের জমি।'[৮৭]

রায়তি প্রথায় চাষীর যেহেতু ভূমির ওপর কিছুটা হলেও স্বত্বাধিকার[৮৮] থাকতো[৮৯], ফলে রায়ত

৮৫. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., C. E. Buckland, C.I.E., pp. 246, Bengal under John Peter Grant, Dr. Ram Suresh Sharma, pp. 16; নীল বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা ২২; রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১১৭।

৮৬. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. 246-47

৮৭. নীল বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা ২২।

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২।

৮৯. রায়তি ভূমি স্থানীয় জমিদার-তালুকদার প্রভৃতির মালিকীয় হলে তাকে বলা হতো 'বে-এলাকা', এবং নীলকরগণের (দেশি-বিদেশি নির্বিশেষে) নিজস্ব ভূমি হলে তার নাম হতো 'এলাকা'।

সেখানে নীল চাষের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলও উৎপাদন করতে পারতো। তা সত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করি যে নীলের আবাদে বাঙালি চাষী (অন্যত্রও) আদৌ রাজি বা উৎসাহী হতো না।
এখন দেখা যাক, নীল চাষে কেন চাষী আগ্রহী ছিল না।
এর মূল কারণ দু'টি। প্রথমত দিনকে-দিন নীল চাষ সম্প্রসারণের ফলে এদেশের চাষীদের প্রধান ফসল ও খাদ্যশস্য -- 'ধান'-এর আবাদ সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। উল্লেখ্য, "By 1810, however, indigo appeared to have been entrenched as 'a great staple of Bengal'."[৯০] -- হিশেবেই শুধু আবির্ভূত হলো না, বরঞ্চ কোনও কোনও অঞ্চলে (জেলায় নয়) এই পর্বে ধানের বদলে নীলই হয়ে দাঁড়িয়েছিল উৎপাদন-তালিকায় এক-নম্বর চাষ-দ্রব্য। এর ফলে একদিকে সাধারণ রায়ত যেমন নীল চাষে আগ্রহী হতো না, তেমনি নীলকরদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে যখন প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হতো তখন রাগ করে চাষী তা অনেক সময় অনাবাদি ফেলে রাখতো। ফলে ভূমি থেকে আদৌ কোন উৎপাদন না-পাওয়ায়, এতে করে তাব জমিদারি খাজনাও সঙ্গত কারণে বাকি পড়তো। ড. চিত্তব্রত পালিত বলেন, 'Furthermore, the best lands, mainly highlands, fit for rice cultivation, were sown with indigo by force. This led to depreciation of land values and rent. Indigo had a very low return on such lands, especially in view of the rise in prices of rice and the ryots were against giving up rice for indigo. They deserted to avoid coercion and the landlord found it difficult to realise his rent."[৯১]
অন্যদিকে রায়তের ভোগ-দখলি জমিতে ধান চাষ করতে না-পারায় তাকে বাজার থেকে নগদ অর্থে বেশি দামে ধান-চাল ক্রয় করতে হতো; অথচ আবহমান বাঙালি চাষীসমাজ কখনই তা চাইতো না। কেননা এর সঙ্গে তার সামর্থ্য ও সামাজিক সম্মানের প্রশ্ন ছিল জড়িত।
দ্বিতীয়ত (এটাই প্রধান), -- নীল চাষ ছিল মূল চাষীর জন্য অত্যন্ত অলাভজনক একটি আবাদ। এখানে 'মূল চাষী' বলতে আমরা ইংরেজি 'peasant'-কে বুঝাচ্ছি, 'cultivator' বা 'farmer' নয়। এক্ষেত্রে 'cultivator' বা 'farmer' ছিল নীলকরেরা (দেশি-বিদেশি উভয়ই); এদের জন্য নীলচাষ অবশ্যই ছিল অত্যন্ত লাভজনক ও অর্থকরী ব্যবসা। ড. পালিত বলেন, 'The indigo investment brought money to the actual cultivator. ... The landlords, the village headmen and the factory assistants were the only people to benefit from indigo transactions."[৯২]
কিন্তু আসল উৎপাদক ও প্রান্তিক চাষী বা 'peasant' এ থেকে বার্ষিক নগদ ২-টাকা দাদন ছাড়া কিছুই পেতো না। উল্টো এতে তার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল খুবই বেশি। নিচের আলোচনা থেকে এর সত্যতা সম্যক উপলব্ধি করা যাবে।

এক. ১৮৬০-সালের 'নীল কমিশন'-এর কাছে রাণাঘাটের জমিদার জয়চন্দ্র পালচৌধুরী যে

৯০. The New Cambridge History of India: Peasant Labour and Colonial Capital, pp. 46.
৯১ Tensions in Bengal Rural Society, pp. 116.
৯২ Ibid., pp. 108-109.

বক্তব্য রেখেছিলেন (তাঁর ভাষায়) তা থেকে জানা যায়ঃ 'যেখানে আটখানা লাঙলের (মজুরসমতে) বাজার-দর ছিল এক টাকা, সেখানে নীলকরদের দাম ছিল মাত্র অর্ধেক অর্থাৎ টাকায় ১৬ খানা। ... সব নীলকরই ঐ দর দিত। সুতরাং আমিও তাই দিতাম। ... নীল-চাষে রায়তের কোনই লাভ থাকে না।'[৯৩] তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন, মোটামুটি একজন নীলচাষীকে দুই বিঘা জমিতে (রায়তি জমি) নীল চাষ করতে খুব কম করে হলেও ব্যয় করতে হতো ১০ টাকা ১৩ আনা, সেখানে সে পেতো মাত্র ৪ টাকা, অর্থাৎ নির্ঘাৎ দেখা যাচ্ছে এতে তার লোকসান হচ্ছে ৬ টাকা ১৩ আনা। এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, রায়ত তার মজুরি বাবদ কিছুই পাচ্ছে না, অর্থাৎ নীলকরের জন্য তাকে সারা বছর ধরে নিছক বেগার খেটে দিতে হচ্ছে (অধিকন্তু তার গাঁট থেকেই প্রচুর গচ্চা যাচ্ছে)।[৯৪] তিনি আরও জানিয়েছিলেন, নীলচাষের জন্য 'নীলকরকে খুব কম খরচ করতে হত'। বলাবাহুল্য জয়চাঁদ নিজেও ছিলেন একজন নীলকর, তথাপি বাস্তব সত্য লুকোনো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

দুই. 'নীল কমিশন'-এর পূর্বোক্ত রিপোর্টের ওপর মন্তব্য প্রসঙ্গে জন পিটার গ্রান্ট উল্লেখ করতে কসুর করেননি যেঃ 'The commissioners pronounce conclusively that the cultivation is unprofitable to the *raiyat*, supporting the conclusion by the consentaneous evidence of the planters themselves. This is indeed the one point upon which the whole indigo question turns, and it is not disputed. ... Rejecting all extreme cases, and giving indigo the benefit of all doublts, I cannot put the absolute loss to the *raiyat* at a low average, reckoning the net loss on the cultivation of indigo at the highest price now allowed, and the loss of the net profit the *raiyat* would make by any other ordinary crop at the market price, at less than Rs. 7 a *bigha*, equivalent at the least to 7 times the rent of the land.'[৯৫] বস্তুত ছোটলাট হয়েও তার পক্ষে সত্য গোপন করা সম্ভব ছিল না।
সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় এটা নিশ্চিত যে, '(রায়তি) চাষীর পক্ষে নীল-চাষ ছিল সম্পূর্ণ লোকসানের ব্যাপার এবং চাষীর পরিবারের পক্ষে নীল-চাষের অর্থ ছিল অনশন।'[৯৬]
এখন দেখা যাক, নীল চাষে অনাগ্রহী রায়তের ওপর নীলকরদের অত্যাচারের ধরন কী ছিল। আগেই বলে রাখি যে, এক্ষেত্রে রায়তি ও নিজ আবাদ -- উভয় প্রথার চাষীদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার-নিপীড়ন ছিল কমবেশি সমান প্রকৃতির। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মিন্টো-র

---

৯৩. রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১২৭।

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৭-২৮।

৯৫. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. 249.

৯৬. বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস (এবং সমকালীনও বটে, ১৮৫৮) প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' এ-ও দ্ব্যর্থহীন গলায় স্বীকার করা হয়েছে যে, '... প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে, কারণ ধান্যাদি বোনাতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠিতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন তাঁহার দফা একেবারে রফা হয়।'
(ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', পৃষ্ঠা ১০৬)।

সময়ে মফস্বলের ৪ জন অত্যাচারী নীলকরের লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিলসংক্রান্ত যে সরকারি সার্কুলার (১৩ই জুলাই) জারি করা হয়েছিল, তার প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল-ইন কাউন্সিল নীলকরদেব কয়েক ধরনের অত্যাচারের উল্লেখ করেছিলেন। সরকারের নিজস্ব স্বীকৃতি বিধায় এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এই অত্যাচারগুলিকে মোটা দাগে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল, সেগুলি নিম্নরূপ[৯৭]:-

১ আক্রমণাত্মক এমন ধরনের অপরাধ যেগুলিকে আইনের পরিভাষায় নরহত্যা বলা যায় না, তবে দেখা গেছে এই কাজে দেশীয়দের মৃত্যুর মত ঘটনা ঘটেছে;
২. প্রাপ্য বলে দাবিকৃত অর্থ আদায়ের অজুহাতে বা অনুরূপ কোন কারণে দেশীয়দের আটককরণ বিশেষত গুদাম-ঘরে কয়েদ রাখা;
৩. শত্রুভাবাপন্ন অন্য নীলকরদের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কুঠি বা কারখানায় কর্মরতদের ও ভাড়াটে গুণ্ডাদের একত্রিত কবা; এবং
৪. নীলচাষী ও অন্যান্য দেশীয়দের অন্যায়ভাবে শাস্তিদান বিশেষ করে বেত্রাঘাত বা ঐ জাতীয় কিছু।

নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করে ১৮২৩ সালে ঢাকার নাজিমউদ্দিন ও অন্য ৬৩-জন জজ সাহেবের কাছে যে অভিযোগ পত্র দাখিল করেছিলেন, এবং বিভিন্ন জেলা বিশেষত নদীয়া জেলা থেকে যে কিছু বেনামি আবেদন কর্তৃপক্ষ হস্তগত করেছিল -- তা থেকেও নীলকরদের অত্যাচারের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ছিল --'মারধোর, অবাধ্য প্রজাকে গুদাম ঘরে আটক রাখা, দাদন নিতে বাধ্য করা, সেরা জমিতে নীল বুনতে বাধ্য করা, জোর কবে নীল বোনা, ওজনে ঠকানো, ফসল কেটে নেওয়া, ঘরের মেয়েদের দিকে নজর দেওয়া, মিথ্যা মামলায় প্রজাকে সর্বস্বান্ত করা -- এর সঙ্গে ফাউ হিসাবে ছিল অশ্লীল গালিগালাজ'। এমন কি কেউ নীল বুনতে অস্বীকার করলে তার মাথায় কাদা লেপে সেখানে নীলের চারা বোনার চেষ্টা পর্যন্ত করা হতো বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল।[৯৮]
ফলত ইংরেজ নীলকরেরা যে এদেশীয়দের বিশেষত নীলচাষীদের আদৌ মানুষ বলে গণ্য করতো না, বরং তাদের সঙ্গে পশু বা ক্রীতদাসের মতোই ছিল তাদের আচরণ, এর উল্লেখ

৯৭ "The offences .... may be reduced to the following heads:
1st., --- Acts of violence, which, although they amount not in the legal sense of the word to murder, have occasioned the death of natives.
2nd., --- The illegal detention of natives in confinement, especially in stocks, with a view to the recovery of balances alleged to be due from them or for other causes.
3rd., --- Assembling, in a tumultuary manner, the people attached to their respective factories, and others, and engaging in violent affrays with other indigo planters.
4th., --- Illicit infliction of punishment, by means of a rattan or otherwise, on the cultivators or other natives." (Quoted from, Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. 239).

৯৮. গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, পৃষ্ঠা ১৪।

পাওয়া যায় সমকালীন বিখ্যাত পত্রিকা 'The Hindoo Patriot' থেকে।[৯৯]
এর ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৫৯ সালের এক সংখ্যায় অত্যন্ত খেদের সঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিলঃ '... the Indigo planters are a class of petty tyrants and that the ryots in the Indigo planting districts are treated no better that the cotton producers of the slave states.'
এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, আপামর নীলচাষীদের ওপর নীলকরদের এই জঘন্য ধরনের অত্যাচার-নিপীড়ন দিনকে-দিন বেড়ে চললেও এর প্রতিবিধানে কোম্পানির সরকার ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। উপরন্তু বলা যায় তাদের পরোক্ষ ভূমিকা ছিল নীলকরদেরই অনুকূলে। এ বিষয়ে যে সামান্য আইন ছিল (১৮৬০ সনের ১১নং আইন-এর কথা এক্ষেত্রে স্মর্তব্য[১০০]) বা বিভিন্ন সময়ে কোম্পানির সরকার যে কিছু সার্কুলার জারি করেছিল, তাও ছিল নীলচাষীদের স্বার্থের পরিপন্থী। নিম্নোক্ত তথ্যেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।
নীল চাষের সময় নীলকরদের সঙ্গে চাষীদের নীল-চুক্তি করতে হতো। এই চুক্তি যে চাষীদের

৯৯. উদ্ধৃতি সংগ্রহ, গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, পৃষ্ঠা ১৫।
অবশ্য পাষণ্ড নীলকরদের অত্যাচার-নিপীড়নের কথা যে পত্রিকাগুলিই শুধু লিখে প্রকাশ করছিল তা নয়। ইংরেজদেরই আরেক অংশ তথা খৃস্টান মিশনারিগণও তাদের অনাচারের বিষয়ে সোচ্চার হয়েছিল এবং তা সরকারের কাছে তুলে ধরেছিল। অর্থাৎ এদেশীয় গরিবশ্রেণীকে এরা ধর্মান্তকরণে ন্যক্কারজনক ভূমিকা রাখলেও কার্যত নীলের ব্যাপারে রায়তদের পক্ষ নিয়েছিল সে কথা স্বীকার করতে হবে।
ড. অভিজিৎ দত্ত বলেন, 'The significance of European missionary analysis of and interaction with secular European society in Bengal in the late eighteenth and nineteenth centuries lies in the fact that although hailing mostly from similar racial identities as the secular Europeans in the province, Christian missionaries were not blind to the faults of their secular racial brethren and sought to criticise them openly on the score. Secondly, as in the Indigo question, European Christian missionaries stood by the native ryots for the cause of justice against European Indigo planters.' (Nineteenth Century Bengal Society and the Christian Missionaries, Dr. Abhijit Dutta, pp 152).
যদিও সত্য যে এর পিছনে তাদের অসহায় রায়তদের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা ছিল, তথাপি স্বজাতির বিরুদ্ধে যে তারা দাঁড়িয়েছিল, এটা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। বাংলা-বিহারের রায়তদের নীল-আন্দোলনের ইতিহাসে তাই খৃস্টান মিশনারিদের কথা অতিঅবশ্যই এসে পড়ে।

১০০. এই আইনটি নীলচাষীদের ওপর নীলকরদের অত্যাচারের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যাপক কাজে লেগেছিল। ড. রাম সুরেশ শর্মা মন্তব্য করেন, 'But, with the help of Act XI, the planters had their way. They started terrorising the peasants. Hundreds of contract papers were forged and poor cultivators were fraudulently sent to prison with the connivance of the obliging English magistrates. 400 peasants were thrown into prison in the district of Nadia alone. Even blinds and invalids were not spared.' (Bengal under John Peter Grant, pp. 20-21).

জন্য বিপর্যয়কর ও অপমানজনক ছিল তা ব্লেয়ার বি. ক্লিং-এর উদ্ধৃত তথ্য থেকেই টের পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, 'তত্ত্বগতভাবে নীলচুক্তি ছিল রায়ত এবং নীলকুঠির সঙ্গে এমন এক চুক্তি যার দ্বারা রায়তকে -- (১) কুঠির কর্মচারীকে জমি মাপার অনুমতি দিতে হবে, (২) পরিমাপকৃত জমিতে লাঙল দিতে হবে, (৩) নীলকুঠি থেকে নীলের বীজ কিনতে হবে, (৪) বীজ বুনতে হবে, (৫) বাড়ন্ত ফসলের জমিতে নিড়ানি দিতে হবে, (৬) ফসল কাটতে হবে, এবং (৭) নিজ ব্যয়ে গাছের আঁটি কারখানায় পৌঁছে দিতে হবে।'[১০১]

যা হোক বাংলায় নীলচাষ ও নীলকরদের বিষয়ে আর বিশদ আলোচনা না করে এখানে, শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি, দেশি-বিদেশি নীলকরদের বিশেষ করে ইংরেজ নীলকর-প্লান্টারদের 'এই সমস্ত বর্বর সামন্তবাদী শোষণ ও বিদেশী সরকারের পুঁজিবাদী ট্যাক্সের জুলুম সহ্য করতে করতে যখন তা নেহাতই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেত, তখন কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠত'। ১৮৫৯-৬০ সালের বিখ্যাত নীল বিদ্রোহ ছিল নীলচাষীদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত রাগ, ক্ষোভ ও বঞ্চনার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

ড. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ বলেন, 'The cultivation of indigo universally provoked resistance. It assumed the most extensive form in 1860, and the indigo industry in Bengal proper very nearly collapsed under it.'[১০২]

১৮৬০-এর পরে নীলচাষ ব্যাপকভাবে কমে গেলেও এবং চাষীদের ওপর নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রা ও ধরনে কিছুটা পরিবর্তন এলেও তারপরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত নীল সরকারের জন্য একটা মাথা ব্যথার কারণ হয়ে ছিল -- 'The disputes connected with indigo cultivation in Bengal had long been a subject of anxiety to Government.'[১০৩] অতঃপর উনবিংশ শতকের শেষ দশকে, বলা যায় ইউরোপে উৎপাদিত রাসায়নিক নীল বাজারে এলে বাংলায় নীলচাষের একপ্রকার অবসান ঘটেছিল।

তথাপি সুদীর্ঘকালব্যাপী বাংলা ও বিহার, তথা ভারতীয় রায়ত সম্প্রদায়ের মাঝে তা যে ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি রেখে গিয়েছে তা স্মরণে এলে আজও মানুষের গা শিউরে ওঠে।

১০১. নীল বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা ৯১।

১০২. The History of Bengal (1757-1905), pp. 279.

১০৩. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. 184.

বঙ্গীয় খাজনা আইন, ১৮৫৯ ও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ খ্রিঃ

আগেই বলে রাখা দরকার যে, সরকারি কাগজপত্রে তথা আনুষ্ঠানিকতায় বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিতব্য প্রথমোক্ত আইনটি ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০নং আইন (Act X of 1859) হিশেবে পরিকীর্তিত হলেও সর্বসাধারণ্যে এটি পরিচিত ছিল 'বঙ্গীয় খাজনা আইন' বা 'The Bengal Rent Act' নামে।[১] অবশ্য আইনটিতে কিছু অস্পষ্টতা ছিল এবং এর নিজস্ব দুর্বলতা স্বীকার করেও বলতে হবে, বাংলার রায়তদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার নিয়ে সরাসরি আইন প্রণয়ন ব্রিটিশ শাসনামলে এই প্রথম। ড. চিত্তব্রত পালিত যথার্থই বলেন, 'The Rent Act of 1859 was the first direct intervention of the government in agrarian relations in favour of the ryot.'[২]

এ যাবৎ কোম্পানির বিভিন্ন আইন প্রণয়নের পিছনে প্রথম ও একমাত্র উদ্দেশ্য থাকতো রাজস্ব আয় -- সে যে কোন উপায়ে এবং যে কারও কাছ থেকে, যতোটুকু পরিমাণই হোক না কেন -- যেনতেন প্রকারে সেটা হাসিল করাই ছিল তাদের শাসনের শেষ কথা। কিন্তু এই প্রথম (এ পর্যায়েও রাজস্ব-ই ছিল তাদের বিবেচনার প্রধান ক্ষেত্র, কিন্তু একমাত্র নয়) কোম্পানির সরকার, নানা কারণে এখন বাধ্য হলো জমিদারদের পাশাপাশি রায়তদের স্বার্থ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ভাবতে। ড. শঙ্কর কুমার ভৌমিক, ১৭৯৩-পরবর্তী বিভিন্ন আইন-বিধি প্রণয়নের প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে বিষয়টি খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ 'For nearly seven decades since 1793, the government was primarily concerned with safeguarding its revenue. This was the background to all the legislation passed during this period, including 'Haptam' (Regulation VII of 1799) which vested unrestricted powers in the zamindars for seizing the crops and other personal property of the cultivators, even arresting them, in order to realize rent arrears. This unrestricted power of the zamindars coupled with complete denial of the customary rights of the cultivators created conditions of growing unrest among the cultivating peasantry in this period. ... Thus the government which had so far continued with its policy of neutrality was compelled to formulate the first tenancy legislation – the Rent Act of 1859 – so as to improve the

১. Bengal under John Peter Grant, pp. 14.
২. Tensions in Bengal Rural Society, pp. 176.

relation between the landlords and their tenants."[৩]

যা হোক এ পর্যায়ে ১৮৫৯ সালের 'খাজনা আইন' সম্বন্ধে বিস্তাবিত আলোচনার শুরুতে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আইনটির মুখবন্ধের উল্লেখ করে নেবো।

অবশ্য এখানে এটাও জানিয়ে রাখা উচিত যে, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে কোম্পানির সরকার যদিও প্রজার স্বার্থে ভবিষ্যতে যে কোন ধরনের আইন প্রণয়ন বা পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষিত রেখেছিল, কিন্তু ১৮৫৯-এর পূর্বে তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককালব্যাপী এই ব্যাপারে তারা কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ থেকে একপ্রকার বিরত ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

ড. সুগত বসু বলেন, 'Although the colonial government had reserved the right ever since 1793 to intervene in zamindar-raiyat relations to protect the latter, it had actually avoided doing so until the Rent Act of 1859."[৪]

তাই আলোচ্য আইন প্রণয়ন ছিল সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা বা পদক্ষেপ।

১৮৫৯ সনের বঙ্গীয় খাজনা আইনের মুখবন্ধ[৫]

> Whereas it is expedient to re-enact with certain modifications the provisions of the existing law relative to the rights of ryots with respect to the delivery of pottahs and the occupancy of land, to the prevention of illegal exaction and extortion in connection with demands of rent, and to other questions connected with the same; to extend the jurisdiction of Collectors, and to prescribe rules for the trial of such questions, as well as of suits for the recovery of arrears of rent, and of suits arising out of the distraint of property for such arrears; and to amend the law relating to distraint; It is enacted as follows:--

মূলত বকেয়া ভূমিরাজস্ব আদায় ও কালেক্টরদের প্রচলিত ক্ষমতা বৃদ্ধি -- এই দু'টিই ছিল 'খাজনা' আইন-প্রণেতাদের মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। তবে রায়তদের কল্যাণের ব্যাপাবেও কিছু কিছু সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকাব এতে ব্যক্ত হয়েছিল। এব পাশাপাশি আইনে বাংলার বিভিন্ন জমিদার-

৩. Tenancy Relations and Agrarian Development - A Study of West Bengal, Dr. Sankar Kumar Bhaumik, pp. 27.
৪. The New Cambridge History of India Peasant Labour and Colonial Capital : Rural Bengal since 1770, pp. 81.
৫. Quoted from, The Evolution of India and Pakistan (Select Documents: 1858-1947), C. H. Philips, pp. 624.

তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ কর্তৃক রায়তদের বাধ্যতামূলকভাবে 'পাট্টা' প্রদান, অবৈধ আবওয়াব আদায় প্রতিহতকরণ ও খাজনা সংগ্রহের নামে জমিদার প্রভৃতির দ্বারা রায়তদের ওপর উৎপীড়ন বন্ধ করার কথাও বলা হয়েছিল। তবে কার্যত এর অনেক কিছুই পরবর্তীকালে আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি।

'লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া' (Legislative Council of India)-য় বঙ্গীয় খাজনা আইন, ১৮৫৯ বিল আকারে উত্থাপিত হয়েছিল ১০ই অক্টোবর, ১৮৫৭ সালে।[৬] দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা ও কিছু কিছু বিষয়ে সংশোধনী আনয়ন এবং তা গ্রহণের মাধ্যমে আইন হিশেবে এটি পাশ হয়েছিল ২৯শে এপ্রিল, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে।[৭]

আইনের শিরোনাম নির্দিষ্ট হয়েছিল -- 'Act X of 1859 (to amend the law relating to the recovery of Rent in the Presidency of Fort William in Bengal) – an Act which has been called the Magna Charta of the raiyat --.' -- অর্থাৎ বকেয়া ভূমিরাজস্ব উসুলকরণই ছিল আইন-প্রণেতাদের আসল উদ্দেশ্য। এ সময় ভারতের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন লর্ড ভাইকাউন্ট ক্যানিং (Lord Viscount Canning) এবং বাংলার (বিহার, ওড়িশা ও বারাণসীসহ) লেফটেন্যান্ট-গভর্নর ছিলেন স্যার ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে (Sir Frederick James Halliday)।

১৮৫৯ সনের ১০নং আইন বা 'খাজনা আইনে'র অনুচ্ছেদওয়ারি বর্ণনার প্রথমেই উল্লেখ ছিল যে জমিদার, তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ, -- যাদের কাছ থেকে এরা খাজনা গ্রহণ করবে সেই রায়তদেরকে 'পাট্টা' প্রদান করবে (ধারা ২)। 'পাট্টা'য় নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১ ভূমির পরিমাণ ও সরকারকর্তৃক জরিপ হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে জমির দাগ নম্বর;
২. বার্ষিক দেয় খাজনার পরিমাণ;
৩ যে কয় কিস্তিতে খাজনা পরিশোধেয় তার উল্লেখ;
৪. ইজারা বা বন্দোবস্তের ধরন বা প্রকৃতি;
৫ শস্যে বা দ্রব্যে খাজনা পরিশোধেয় হলে সেক্ষেত্রে কী পরিমাণ, কখন ও কিভাবে খাজনা প্রদান করতে হবে তার বর্ণনা।

উল্লেখ্য রায়তদের যেমন ভূস্বামীকর্তৃক 'পাট্টা' প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল, তেমনিভাবে রায়তদেরও ভূস্বামীর অনুকূলে 'কবুলিয়ত' সম্পাদন করতে হতো (ধারা ৯)।

তবে আলোচ্য আইনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল, এর মাধ্যমে এই প্রথমবারের ন্যায় বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও বারাণসীর আপামর রায়তসাধারণকে ৩টি শ্রেণীতে বিভক্তিকরণ।[৮]

৬. Zemindari Settlement of Bengal, pp. 102.
৭. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. 59; The Evolution of India and Pakistan, pp. 624.
৮. The Economic History of India, R. C. Dutt, pp. 197; History and Incidents of Occupancy Right, pp. 79; The Rights and Liabilities of the Raiyats under the Bengal Tenancy Act, 1885 and The State Acquisition

এক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তনের পর এক নাগাড়ে ২০-বছরকাল যাদের দেয় খাজনা অপরিবর্তিত ছিল, এদেরকে চিহ্নিত বা সংজ্ঞায়িত করা হলো -- 'Ryots, who hold lands at fixed rates of rent' - অর্থাৎ স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট খাজনা প্রদায়ী রায়তকুল হিশেবে (ধারা ৩)। সমকালে প্রচলিত ভূমিরাজস্বের পরিভাষায় এদেরকে আমরা বলতে পারি কায়েমি' বা মোকাররারি বা ইসতিমরারিদার'[৯] রায়ত।

১৭৯৩ থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত যদিও ৫৬ বছরের পার্থক্য এবং এর মধ্যে রায়তের খাজনা জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি কর্তৃক পুনঃনির্ধারিত হয়ে থাকলেও অর্থাৎ কখনও বৃদ্ধি ঘটলেও যদি প্রমাণিত হয় যে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক নাগাড়ে তা (রায়তের দেয় খাজনার পরিমাণ বা হার) ২০-বছরকাল অবধি অপরিবর্তিত ছিল, তবে আইনে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয়া হলো, এক্ষেত্রে ধরা হবে যে ১৭৯৩-পরবর্তীকালে উক্ত খাজনার আর পরিবৃদ্ধি ঘটেনি (ধারা ৪)।

দুই. দখলি রায়ত (Ryots having rights of occupancy) -- এক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী রায়তের দখলিস্বত্ব অর্জিত হবে যদি দেখা যায়, রায়ত এক নাগাড়ে ১২-বছর কোন ভূমি বা ভূমিখণ্ড 'পাট্টা' মূলে বা অন্য কোন প্রথাপদ্ধতির অনুকূলে চাষাবাদ বা ভোগদখল করছে এবং উপরস্থ স্বত্বাধিকারী বা ভূস্বামীকে নিয়মিত খাজনা প্রদান করেছে, তবে সে সংশ্লিষ্ট ভূমির দখলি রায়ত হিশেবে পরিগণিত হবে (ধারা ৬)।

তবে আগে এই জাতীয় রায়তের খাজনা হারের কোন সুনির্দিষ্টতা ছিল না (not holding at fixed rates)। ফলে নতুন ব্যবস্থায় এরা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত (Fair and equitable) খাজনা নিরূপণের আওতাভুক্ত হলো। অন্যকথায় আগে যদি উপরস্থ স্বত্বাধিকারীগণ এদের কাছ থেকে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত খাজনা নিয়ে থাকেন তবে এখনও সেটাই তারা গ্রহণ করবে এবং সেই অনুযায়ী তাদেরকে 'পাট্টা' দেবে (ধারা ৫)। অবশ্য এই বাধ্যবাধকতা জমিদার-তালুকদারদের খামার, নিজ-জোত বা 'সির'[১১] ভূমির জন্য প্রযোজ্য ছিল না। এগুলির ইজারা বা বন্দোবস্ত হতো প্রধানত একসনাভিত্তিতে এবং জমিদার ও রায়তের পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে।

তিন. দখলিস্বত্ববিহীন রায়ত (Ryots not having rights of occupancy) -- ভূস্বামী ও দখলিস্বত্ববিহীন রায়তের মধ্যে মূলত পারস্পরিক সমঝোতার আলোকে বা চুক্তি বলে দেয় খাজনার হার বা পরিমাণ নির্ধারিত হতো যা এক বছরের জন্য বা কয়েক বছর মেয়াদের জন্যও হতে পারতো। স্বভাবতই এই ধরনের রায়তের ভূমিতে কোনরূপ স্বত্ব বা অধিকার গড়ে উঠতো না। তবে এরাও মেয়াদকালের জন্য 'পাট্টা' পাওয়ার হকদার ছিল (ধারা ৮)।

and Tenancy Act, 1950, Dr. Lutful Kabir, pp. 26; Bengal under John Peter Grant, pp. 14, Tenancy Relations and Agrarian Development – A Study of West Bengal, pp. 28; বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ১১৫।

৯. বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ১১৫।

১০. Tenancy Relations and Agrarian Development A Study of West Bengal, pp. 28.

১১. 'বাংলাদেশে জমিদার বা উর্ধতন ভূস্বামীদের ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার্য বা ভোগদখলকৃত ভূমিকে নিজ-জোত বা খামার' বা সির বলা হতো। সাধারণত 'জমিদারগণ এটি ভাড়াটে শ্রমিক বা স্বত্ববিহীন প্রজার মাধ্যমে চাষাবাদ করতেন'। (দেখুন, বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭১)।

এখানে বলা যেতে পারে যে, আগের প্রচলিত ব্যবস্থায় সমগ্র ব্রিটিশ শাসনব্যাপী বাংলার রায়ত ছিল প্রধানত দু'ধরনের -- ১. 'খুদকাস্ত' বা স্থায়ী বাশিন্দা রায়ত (Resident) ও ২. 'পাইকাস্ত' বা ভাসমান বা অস্থায়ী রায়ত (Non-resident)। ১৮৫৯ সালের ১০নং আইন বলে বস্তুত এদেরকেই দু'টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছিল -- স্বত্বদখলি ও স্বত্ববিহীন। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক R. H. Hollingbury বলেন, 'Until 1859, the cultivators were classed as resident and non-resident; since 1859, they have been classed as occupancy and non-occupancy ryots.'[১২] তিনি আরও বলেন, 'This change of classification involved a real change of status, .. .'[১৩]
বস্তুত কেবল এই এক কারণে হলেও আইনটি বাংলার ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় যুগান্তর নিয়ে এসেছিল। কারণ আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, মাত্র কয়েক দশক আগেই ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের তথাকথিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের নামে ভূমিতে রায়তদের এ যাবৎ কালের স্বত্বাধিকার একেবারে সমূলে বিনষ্ট করা হয়েছিল। সুতরাং এখন তাদের দখলি স্বত্বের স্বীকৃতি ছিল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ড. রাধারমন মুখার্জি বলেন,'With the introduction of Act X of 1859 dawned a new era in the history of the tenants in Bengal. By it the Government redeemed the pledge of protecting the raiyats that was given in the Proclamation of the Permanent Settlement. The main object of the Act originally was "to amend the law relating to the recovery of rent." But during the passage of the Bill through the Council important additions were made with the result that the Act as passed contained a more or less exact definition of the different classes of raiyats and of the rights which it was thought expedient to confer on them."[১৪]
ড. লুৎফুল কবিরও প্রায় অনুরূপ ভাষায় বলেন, 'With the introduction of the Bengal Rent Act, 1859 dawned a new era in the history of the tenancy law in Bengal. Sixty six years after the Permanent Settlement, Government took the first effective step to redeem its pledge to protect the *raiyats*, that had given in the proclamation mentioned above. The Act of 1859 was not originally intended by its authors to effect any radical change in the rights and status of the cultivating classes. ... But the draft Bill was subsequently amended by the Select Committee and, during the passage of the Bill through the Council, important additions were made. ... The Act introduced important changes in the substantive law of landlord and tenant."[১৫]

১২. Zemindari Settlement of Bengal, pp 102. .
১৩. Ibid., pp. 102.
১৪. History and Incidents of Occupancy Right, pp. 79.
১৫. The Rights and Liabilities of the Raiyats under ...., pp. 26

আইনটির আরও দু'টি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব ছিল। এক. খাজনা বৃদ্ধিসংক্রান্ত, এবং দুই. ভূমিরাজস্ব আদায়-মামলায় জেলা জজ-এর পাশাপাশি কালেক্টরের পুনঃসম্পৃক্তিকরণ।
১৭৯৩-পরবর্তী বিভিন্ন আইনে বিশেষত 'হপ্তম' ও 'পঞ্জাম' প্রবিধান দু'টিতে বকেয়া রাজস্ব আদায়ে জমিদার-তালুকদার প্রভৃতিকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। তার ফলে যখন তখন এরা খাজনা বৃদ্ধি ও বাকি খাজনার দায়ে রায়তদের বন্দি ও নির্যাতন করতে পারতো। কিন্তু আলোচ্য আইনে সেই অনাচার নিবৃত্তির চেষ্টা করা হলো। এখন থেকে উপরস্থ ভূস্বামীগণ আর ইচ্ছে করলেই রায়তের দেয় খাজনার পরিমাণ কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা কারণ ব্যতীত বৃদ্ধি করার অধিকারী ছিল না। নতুন ক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ (ধারা ১৭):-

১. যদি দেখা যায় যে প্রচলিত পরগণা-নিরিখ বা খাজনা হারের চেয়ে অর্থাৎ সন্নিহিত একই প্রকার জমির তুলনায় রায়তের দেয় খাজনার পরিমাণ কম রয়েছে, তবে উপরস্থ ভূস্বামী যুক্তিসঙ্গতভাবে এর খাজনা বৃদ্ধি করতে পাববে;
২. রায়তেব ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা খরচেব ফলে নয়, বরং প্রাকৃতিক কাবণে ভূমির উৎপাদনশীলতা বেড়েছে বা তাতে যে ফসল উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের বৃদ্ধি ঘটেছে, তবে এক্ষেত্রেও উপবস্থ ভূস্বামী যুক্তিসঙ্গতভাবে জমিব খাজনা বৃদ্ধি করতে পারবে;
৩. যদি সরেজমিন জরিপে প্রমাণিত হয়, রায়ত যে পরিমাণ ভূমি বা ভূমিখণ্ডের জন্য খাজনা প্রদান কবে, তার দখলে বাস্তবে তার চেয়েও বেশি ভূমি বিদ্যমান, তবে 'বাড়তি' জমির জন্য নতুনভাবে খাজনা ধার্য করা যাবে।

তবে একতরফাভাবে খাজনা বৃদ্ধিই যাতে শুধু না ঘটে, বরঞ্চ প্রকৃত কাবণে নির্ধারিত খাজনার হ্রাসও যাতে করা যেতে পারে সেই বিধানও রাখা হলো ১৮নং ধারায়। এখানে বলা হলোঃ
'Every ryot having a right of occupancy shall be entitled to claim an abatement of the rent previously paid by him, if the area of the land has been diminished by dilution or otherwise, or if the value of the produce or the productive powers of the land have been decreased by any cause beyond the power of the ryot, or if the quantity of land held by the ryot has been proved by measurement to be less than the quantity for which rent has been previously paid by him.'[১৬]

---

১৬. এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ভূমির খাজনা হ্রাসের জন্য প্রাচীন ও মধ্য যুগ, এমন কি আধুনিক কালেও যে কারণগুলিব প্রতি দৃষ্টি দেয়া হতো বা হয় তার মোটামুটি-সবই বর্ণিত ধারায় ব্যক্ত হলেও যেটি সবচেয়ে বেশী রায়তদের উৎপন্নের ক্ষতি করে সেই প্রাকৃতিক কারণটিকে অর্থাৎ খরা বা দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, বন্যা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির কোন উল্লেখই এখানে করা হয়নি। এর মূল কারণ অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন। আগেই দেখিয়েছি, সেখানে বলা হয়েছিল, একবার জমিদার প্রভৃতির দেয় বাৎসরিক রাজস্ব নির্ধারিত হয়ে গেলে তা আর পরবর্তীতে কোন কারণেই হ্রাস করা হবে না। জমিদাররা যেহেতু রায়তদের কাছ থেকে খাজনা উসুল করতো, সুতরাং তাদের (জমিদার) কথা চিন্তা করেই রায়তদের ক্ষেত্রেও এই সুযোগটি রাখা হলো না।
অথচ বাংলায় প্রাকৃতিক কারণেই রায়তেব ফসল বেশি 'মার' পড়ে তা কে না জানে।

সুতরাং এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনকালে যদিও বলা হয়েছিল যে, বাংলা, বিহার ও ওড়িশার ভূমিরাজস্ব স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করা হলো অর্থাৎ ভবিষ্যতে আর কখনও রাজস্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না. কিন্তু ১৮৫৯ সনের ১০নং আইন বলে সেই সরকারি ঘোষণা বা প্রত্যয় প্রত্যাহার বা বাতিল করা হয়েছিল।

এখন থেকে কোম্পানির সরকার এবং তার রাজস্ব আদায়ের দোসর বা প্রতিনিধি ভূস্বামীগণ খাজনা যেমন বৃদ্ধি করতে পারবে. তেমনি প্রয়োজনে কমাতেও পারবে -- এটাই হলো খাজনা নির্ধারণের মূল সূত্র। বলতে পারি, অতঃপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কথাটি সরকারি কাগজে-পত্রে একটি 'Vague Term' হয়েই রয়ে গিয়েছিল মাত্র।

'কর্নওয়ালিস-কোড'-এর বদৌলতে ১৭৯৩-পরবর্তীকালে রাজস্ব বিষয়ে কালেক্টরের ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল। সুনির্দিষ্ট করে বললে তাদের ক্ষমতা শুধু জমিদার. তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকদের সঙ্গে বার্ষিক ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত চুক্তি সম্পাদন ও নিয়মিত রাজস্ব আদায়করণের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছিল। খাজনা নিয়ে যে কোন বিরোধ-বিসম্বাদ বিশেষ করে জমিদার ও রায়তের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ-দ্বন্দ্ব, জমিদারে-জমিদারে বা জমিদারে-তালুকদারে সীমানা বিষয়ক জটিলতা ইত্যাদি নিরসনের ব্যাপারে এ সময় দিওয়ানি আদালত বা জেলা জজ সরাসরি জড়িত ছিল বিধায় কালেক্টরের এ ক্ষেত্রে কিছুই করার ছিল না। এখানে উল্লেখ্য যে, 'প্রকৃতি'গত কারণে দিওয়ানি আদালতে মামলা নিষ্পত্তির গতি ছিল দীর্ঘসূত্রতাবদ্ধ, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পরবর্তী বেশ কিছু প্রবিধান বিশেষত 'হপ্তম' ও 'পঞ্জাম' প্রবিধানের কুফল হিশেবে এই সময় দিনকে-দিন দিওয়ানি আদালতেব ওপব মামলার চাপ প্রবল বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, স্থিত প্রশাসনিক অবকাঠামোয় কালেক্টরের ন্যায় ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের মূল চালিকা-শক্তির প্রাতিষ্ঠানিক ও আদি ক্ষমতা অনেক কমে যাওয়ায় দেশীয় জনসাধারণের ওপর ও বিশেষ করে কার্যকর ভূমিবাজস্ব ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় শাসকদের (এক্ষেত্রে 'ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ) নিয়ন্ত্রণ পূর্বের তুলনায় ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ সমান্তরালভাবে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ও জেলাস্থ কালেক্টরের এই ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই চলে গিয়েছিল দিওয়ানি আদালতের সর্বোচ্চ সংস্থা 'সুপ্রিম কোর্ট' ও জেলাস্থ জজের ওপর। অথচ নিজেদের ঘোষিত বেনিয়া-নীতি ও স্বার্থের কারণে কোম্পানির নীতি-নির্ধারকদের কখনই তা কাম্য ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০নং আইনে ১৩ ও ১৯ ধারার সংযোজন ছিল কালেক্টরের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। তবে এর ফলে যে কালেক্টরের ওপর রাজস্ববিষয়ক মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপক দায়িত্ব বর্তেছিল তা নয়, ববং বকেয়া খাজনা আদায়ে জমিদার, তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকেরা যাতে রায়তদের ওপর অহেতুক অত্যাচার না করতে পারে, সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হলো, তারা এ ব্যাপারে কালেক্টরের আদেশ বা অনুমতি ছাড়া কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না -- 'Landholders were empowered to enforce payment of their rents by distraint of the property of defaulters and by preferring summary suits before the Collector. The Collector was also authorized to try summarily suits brought by under-tenants, to contest the demand of distrainers, and suits for damages for illegal distraint.'[১৭]

---

১৭. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. 54.

তবে এখানে একটা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা দরকার।

বস্তুত ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০নং আইন বলে জমিদার-রায়তের মধ্যকার এই চিরাচরিত বিরোধ নিষ্পত্তির প্রাথমিক স্তরে দিওয়ানি আদালতের জজের পাশাপাশি বা স্থলে কালেক্টরকে সম্পৃক্ত করা হবে কি-না, এ ব্যাপারে আইন-প্রণেতাদের মধ্যে যে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিতর্ক-মতবিরোধ হয়েছিল (স্মর্তব্য ১০ই অক্টোবর, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিল আকারে এটি 'লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অভ ইন্ডিয়া'য় উত্থাপিত হলেও আইন হিশেবে পাশ হয়েছিল ২৯শে এপ্রিল, ১৮৫৯ সালে) তাতে শেষ পর্যন্ত নানা কারণে ভূমিরাজস্ব বিষয়ক মামলা বিচারের প্রাথমিক বা আদি আদালত হিশেবে কালেক্টরকেই সংশ্লিষ্ট করার অধিকাংশ সদস্যের সুপারিশ ছিল।

ইংরেজ প্রশাসক-ঐতিহাসিক C. E. Buckland বলেন, 'The Act provided a Code of Procedure for the trial of suits between landlord and tenants. It was much discussed whether the adjudication of such suits should be by the ordinary Civil Courts or by the Collcetor's Courts. Messrs. Mills and Harington, in their Code of Civil Procedure, recommended that the Revenue Officers should have jurisdiction in all such cases; and they proposed that, in preference to the existing practice of a summary decision by the Collector, subject to a re-trial of the same matter by regular suit in the Civil Court, "the trial before the Revenue Court should constitute the original suit, in like manner as if the case had been brought as a regular Civil action, and that the summary decision passed in such cases shall be open to a regular appeal on the merits to the *zilla* Appeal Court."'[১৮] বলাবাহুল্য, 'This principle was adopted in Act X of 1859. The jurisdiction in all such cases was given to Collectors and certain of their Deputies and Assistants.'[১৯]

১০০-টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের সম্পত্তির মামলায় কালেক্টরের আদেশ ছিল চূড়ান্ত (Final) এবং ১০০-টাকার উর্ধে কিন্তু ৫,০০০-টাকার নিচে জেলা জজ এবং তদূর্ধ মূল্যের মামলা নিষ্পত্তি করতে পারতো সদর দিওয়ানি আদালত।[২০]

যা হোক, মোটামুটি এই ছিল ১৮৫৯ সালের 'খাজনা আইনে'র মূল প্রতিপাদ্য।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, আদতে এই আইন চালুর ফলে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার কোন গুণগত পরিবর্তন হয়েছিল কি-না? মূলত দু'ভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া যেতে পারে।

প্রথমত যদি আমরা ধরে নিই যে, 'The Bengal Tenancy Act of 1859 cancelled out all laws issued from 1799 to 1812, and prohibited the Bengali zamindars from driving the peasants from the land or raising rents.'[২১],

১৮ Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol I., pp. 55.

১৯ Ibid., pp: 55.

২০. Ibid., pp. 55-56.

২১. Agrarian India between the World Wars, Rostislav Ulyanovsky, pp. 30-31. Buckland-ও জানাচ্ছেন, 'Lastly, the Act greatly restricted, and at

তা হলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, 'হপ্তম-পঞ্জাম' প্রভৃতি কুখ্যাত কালাকানুন বাতিল হওয়ায় দৃশ্যত ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০নং আইন প্রজাদের রাজস্বসংক্রান্ত নানা রকম বোধ্য-দুর্বোধ্য আইনি মারপ্যাঁচ থেকে কিছুটা হলেও রেহাই দিয়েছিল বা বাঁচিয়েছিল।
দ্বিতীয়ত আইনসভার সদস্যদের প্রকাশ্য আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝা গিয়েছিল যে, ইংরেজ শাসক ও নীতি-নির্ধারকদের মাথায় এই প্রথমবারের ন্যায় উপেক্ষিত রায়তি স্বত্বের প্রশ্নটি বেশ ব্যাপকভাবে সংক্রামিত হয়েছে। এতে করে পরবর্তীকালে তারা ভূমিরাজস্ববিষয়ক যতো আইন-কানুনই প্রণয়নের চেষ্টা করেছিল না কেন, সেখানে রায়তদের স্বত্বাধিকারেব কথা তাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হয়েছিল। সত্যি বলতে ১৮৫৯-পূর্বে যা বরাবরই অস্বীকৃত হয়ে এসেছিল। বলাবাহুল্য এই চিন্তা-চেতনার চবম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' পাশের মধ্য দিয়ে।
বলাবাহুল্য এ ছিল আইনটির ইতিবাচক দিক।
কিন্তু নঞর্থক প্রতিফল বিবেচনা করলে এর কিছু খারাপ দিকও আমরা দেখতে পাবো।"
ড. শঙ্কর কুমার ভৌমিক যথার্থই বলেন, 'By providing occupancy right to only a section of the peasantry, the Rent Act of 1859 tried to separate them from the large section of non-occupancy ryots'"
ড. সিরাজুল ইসলামও বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, 'বলাই বাহুল্য যে, প্রথম শ্রেণীর রায়ত (তাঁর ভাষায়, 'সুবিধাভোগী কায়েমী রায়ত') ছিল সুবিধাভোগী এবং সীমিত

the same time imposed more effective checks on, the power of distraint vested in landholders – a power which appeared to have been grievously abused.'
(Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I . pp. 56).

২২. ১৮৫৯ সালের ১০নং আইন বা 'The Bengal Rent Act' পরবর্তীকালে (১৮৬৯) বাতিল হয়ে নতুন নামে (The Bengal Act VIII of 1869) আত্মপ্রকাশ করেছিল, যদিও নতুন আইন 'was reproduced ... almost *verbatim*.' (The Rights and Liabilities of the Raiyats under ..., pp. 51.), তথাপি নতুন বিল পাশের আলোচনায় যে বিদ্যমান আইনের আরও যুগোপযোগিতা সৃষ্টির দাবি প্রতিফলিত হয়েছিল তা জানা যায় ড. রাধারমন মুখোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে। তিনি বলেন, 'We need not pause to consider the Bengal Act VIII of 1869, which was only a new edition of Act X of 1859 with certain amendments of detail (not of principle) as regards the tenants' rights, and, although it was expressly confined to an amendment of the existing law in respect of procedure and jurisdiction, the discussion on the Bill which was passed into the Act, brought out numerous admissions as to the necessity which existed for revising the substantive law of 1859 in regard to the accrual of occupancy rights and the enhancement of rents.'
(History and Incidents of Occupancy Right, pp. 95).

২৩. Tenancy Relations and Agrarian Development, pp. 28.
আরও দেখুন, Development of Capitalist Relations in Agriculture, Drs. A Ghosh and K. Dutt, pp. 22.

সংখ্যক এবং পূর্ব থেকেই এরা এই সুবিধা ভোগ করে এসেছে। এ আইনের ফলে এদের প্রথাভিত্তিক সুবিধা আইনগত বৈধতা পেল। দ্বিতীয় শ্রেণীর রায়তই ('দাখিলা রায়ত') ছিল গ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী। এবং তৃতীয় শ্রেণীর রায়তও ('মেয়াদি রায়ত') ছিল বিপুল সংখ্যক এবং ভূমিতে তাদের কোনো অধিকারই স্বীকার করা হয়নি। জমিদারের অধিকার থাকে যে-কোনো সময় খাজনা বৃদ্ধি করার, এমনকি রায়তকে উৎখাত করার।"[২৪]

বস্তুত ১৮৫৯ সালের ১০নং আইন প্রবর্তনের ফলে এ অঞ্চলের রায়তদের মধ্যকার স্থিত আর্থ-সামাজিক বিন্যাস আরও সুস্পষ্ট ও সুচিহ্নিত হয়ে উঠেছিল এবং তা রায়তদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ-বিভাজন ও শ্রেণী-শত্রুতা বাড়িয়েছিল। এবং সত্যি বলতে আখেরে তা 'Divide and Rule' নীতির প্রবর্তক ও অনুসারী ইংরেজ শাসকদের হাতকে শক্তিশালী করেছিল।

দ্বিতীয়ত যদিও ড. পালিত উল্লেখ করেছেন, 'The importance of the Rent Act lay therefore in its provisions for rent control to allow capital formation and a growth of purchasing power at the grassroots level."[২৫] কিন্তু পরবর্তীকালে যে হারে রায়তের দারিদ্র্য বেড়েছে দেখতে পাই এবং তার সামাজিক অবস্থান ক্রমশ উপর-থেকে-নিচে নেমেছে এবং সর্বোপরি একের-পর-এক দুর্ভিক্ষ বাংলায় হানা দিয়েছে, তাতে করে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থাৎ 'grassroots level'-এ রায়তদের 'purchasing power' বেড়েছিল (growth) এটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় না।

তৃতীয়ত বলা হয়ে থাকে যে, 'The twelve years' rule for acquiring occupancy right became the *Magna Charta* of the cultivating classes in Bengal and the North Western Provinces [now (1919) the United Provinces of Agra and Oudh] to which Act X of 1859 applied, conferring as it did on them the inestimable blessing of fixity of tenure, a hereditary right, a protection from arbitrary eviction, undue enhancement and rack-renting."[২৬]; কিন্তু একাধিক্রমে ১২-বছর ভূমি ভোগ-দখলে থাকলে এবং নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করলে রায়ত যেহেতু সংশ্লিষ্ট ভূমিতে স্বত্বাধিকার দাবি করতে পারতো, সুতরাং এখন থেকে জমিদার-তালুকদার প্রভৃতি ছলে বলে কৌশলে চেষ্টা করতো রায়তকে তা একাধিক্রমে ১২-বছরকাল ভোগ-দখল করতে না-দিতে। 'পাট্টা' ছিল রায়তের ভোগ-দখল প্রমাণের একটা বড় ও অমোঘ প্রমাণ, ফলে উপরস্থ ভূস্বামীগণ আইনে থাকলেও সহজে রায়তকে আর 'পাট্টা' দিতে চাইতো না।

অন্যদিকে নানা কারণে রায়তকুলের অবস্থাও এ সময় ছিল অত্যন্ত শোচনীয় ও দুর্দশাগ্রস্ত। বলা যায় জমিদার-তালুকদারদের উপর তারা একান্তই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। কিছুটা অবস্থাপন্ন কেউ-বা কখনও জমিদারের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লেও কোর্ট-কাছারির চক্করে

---

২৪. বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ১১৬। ড. চিত্রব্রত পালিতও জানাচ্ছেন, 'The classification of ryots into occupancy and non-occupancy groups by itself excluded a vast majority of tenants-at-will, many of whom were actual cultivators.' (Tensions in Bengal Rural Society, pp. 163).

২৫ Tensions in Bengal Rural Society, pp. 164.

২৬ History and Incidents of Occupancy Right, pp. 85.

পড়ে পরিণামে তারাও হয়ে যেতো সর্বসান্ত। ফলে রায়তও তখন 'পাট্টা'র জন্য জমিদারের উপর আর চাপ সৃষ্টি করতে চাইতো না। বরং বেশী পীড়াপীড়ি করলে এতে তার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। কেননা তখনও পর্যন্ত চরিত্রগতভাবে জমিদার-তালুকদার ও স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসকশ্রেণী ছিল এক ও অভিন্ন এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট, বন্ধু।

'নীল কমিশন'-এর রিপোর্টেই দেখা গেছেঃ 'The report of the Commission also highlighted the fact that practically no administration existed in the rural Bengal ...' এবং 'local magistrates were unfair and the police were corrupt.'[২৭] অতএব আইনে যাই থাকুক, জমিদার, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ -- এই ত্রিভুজ দুষ্টচক্র মিলে রায়তকে যে কোন হেনস্থার মুখোমুখি করতে পারতো। রায়ত তাই সহজে এদেরকে ঘাটাতে সাহসী হতো না।

যা হোক, এই বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০নং আইন বা 'বঙ্গীয় খাজনা আইন' ছিল একার্থে 'the Magna Charta of the raiyats'। অথবা সেটাও যদি না বলি তবে অন্তত 'the Charter of the Bengal Cultivators'[২৮] যে ছিল সেটা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

এ পর্যায়ে আমরা সমগ্র ব্রিটিশ শাসনামলে রায়তের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল আইন, ১৮৮৫ সনের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' নিয়ে আলোচনা করবো।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫

এ আলোচনায় প্রথমেই ড. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করবো। তিনি যথার্থই বলেন, 'The two marginal years of the period (1859-1885) were the years of two outstanding pieces of agrarian legislation – the Rent Act X of 1859 and the Tenancy Act VIII of 1885. The two acts were landmarks in the agrarian history of Bengal,... .'[২৯]

পর্যালোচ্য সময়েরই শুধু নয়, বরঞ্চ সমগ্র ব্রিটিশ যুগের ভূমিরাজস্ববিষয়ক আইনের ইতিহাসে একটি যথার্থ 'Landmark' হিশেবে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫', পূর্বালোচিত ১৮৫৯ সালের 'খাজনা আইন' অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল, গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী বললে অত্যুক্তি হয় না। বস্তুত এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা এর আলোচনার চেষ্টা করবো।

২৭. Bengal under John Peter Grant, pp. 23.

২৮. The Economic History of India, pp. 197.

২৯. The History of Bengal (1757-1905), pp. 237. ড. লুৎফুল কবিরও উল্লেখ করেন, 'The Bengal Tenancy Act, 1885 was the most important agrarian measure which was passed since the Regulations of 1793. It was the outcome of prolonged research into the conditions of the *zemindars* and *raiyats* of Bengal by the Rent Law Commission, 1880 and the hard labour of a band of distinguished Councillors of the Viceroys and Governor Generals of India, urged on by the excellent intention of the British Government at home.' (The Rights and Liabilities ..., pp. 409).

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের 'খাজনা আইন' পাশ করে সরকার আশা করেছিল, এর মাধ্যমে তাদের ভূমিরাজস্ব আদায় আগের তুলনায় সুনিশ্চিত হবে, এবং জমিদার ও রায়তের মধ্যকার চিরাচরিত বিরোধের অবসান ঘটবে, অন্তত খানিকটা হলেও তাদের সম্পর্কের উন্নতি হবে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১৮৬৯ সালে বিদ্যমান আইনের যে সংশোধনী আনীত হয়েছিল এবং যাতে কালেক্টরের খাজনাসংক্রান্ত বিরোধ বা মামলা বিচারের প্রাথমিক দায়িত্ব পুনঃ জেলা জজের কাছে তথা দিওয়ানি আদালতের ওপর সরাসরি ন্যস্ত হয়েছিল[৩০]; কিন্তু সরকারের সেই আশা পূরণ হলো না। পরন্তু তা বিদ্যমান জটিলতা আরও বাড়িয়ে তুললো। ঐতিহাসিক C. E.Buckland বলেন, 'Act X of 1859 rather added to the difficulty than removed it.'[৩১] তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'On the one hand, this Act made it almost impossible for the *raiyat* to establish a right of occupancy: on the other hand, it placed insuperable obstacles in the way of the *zamindar* who sued for an enhancement of his rent.'[৩২]

'খাজনা আইনে'র সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল এর কিছু কিছু ধারা বা শব্দের ও বিষয়ের অস্পষ্টতা, বিশেষত আইনে দখলি রায়তের অধিকার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা থাকলেও অর্থাৎ এক নাগাড়ে ১২-বছর কোন ভূমি ভোগ-দখলে রাখতে পারলে রায়ত সংশ্লিষ্ট ভূমিতে স্বত্বাধিকার পাবে; কিন্তু এই ভোগ-দখল প্রমাণ রায়তের জন্য সত্যিই খুব কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার ছিল। এ বিষয়ে প্রথম যে প্রমাণ সে দেখাতে পারতো, তা জমিদারকর্তৃক প্রদত্ত 'পাট্টা'। আগেই বলেছি জমিদার পূর্বে যা-ও কিছু কিছু 'পাট্টা' দিতো, ১৮৫৯ সালের ১০নং আইন জারির পর সেটাও তারা অনেকাংশে বন্ধ করে দিয়েছিল। অন্যদিকে রায়ত নিয়মিত জমিদারের দেয় খাজনা পরিশোধ করে এসেছে, এটা প্রমাণের জন্য রায়তের দরকার ছিল জমিদারের কাছারি থেকে প্রাপ্ত রশিদ বা দাখিলা (Rent Receipt)। আইনত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে জমিদার, তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ তা রায়তকে সর্বদাই দিতে বাধ্য ছিল। এখন সেটাও তারা দিতে গড়িমসি করতে লাগলো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রায়ত যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাভাবে আদালতে তার এই ভোগ-দখল প্রতিষ্ঠিত করতে পারছিল না।

অন্যদিকে উৎপন্ন ফসলের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পেলে জমিদার-তালুকদার তথা উপরস্থ ভূস্বামীশ্রেণী এর একটা হিস্যা (বর্ধিত খাজনার হারে) লাভ করবে -- ১৮নং ধারায় সরকারের এই অঙ্গীকার থাকলেও, কার্যত কীভাবে সেই মূল্য বৃদ্ধি নিরূপিত বা পরিমাপকৃত হবে তার কোন সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা বা ব্যাখ্যা আইনে ছিল না। ফলত এই ব্যবস্থা উপরস্থ ভূস্বামীদের রায়তের উপর বাজারে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে অজুহাতে যখন-তখন খাজনা বাড়ানোর স্বেচ্ছাচারী সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। এটি রায়তের সঙ্গে জমিদার-ভূস্বামীদের বাদানুবাদ আরও নিত্যনৈমিত্তিক করে তুলেছিল।

১৯২১-২২ সালের 'Report on the Administration of Bengal'-এও আইনের এই ক্রটির কথা স্বীকার করা হয়েছে। প্রতিবেদনের ভাষায়, 'The principal defects of Act

৩০. Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp 87; The History of Bengal (1757-1905), pp. 299
৩১. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. II., pp. 812.
৩২ Ibid., pp. 812

X of 1859 were that it placed the right of occupancy which it recognized in the tenant, and the right of enhancement which it recognized in the landlord, on a precarious footing. It gave, or professed to give, the raiyat a right which he could not prove, and the landlord one which he could not enforce. The courts of law, with rigid impartiality, required the raiyat to establish his occupancy right by showing that he had cultivated the same plot of land for twelve successive years, and demanded from the landlord the impossible proof that the value of the produce had increase in the same proportion in which he asked that his rent should be enhanced. The party upon whom lay the burden of proof was almost certain to fail.'[৩৩]
মূলত 'খাজনা আইনে'র এই অস্পষ্টতার সুযোগে -- 'রায়তেরা যাতে জমির অধিকার না পায় এবং যাতে ইচ্ছামত খাজনা বাড়ানো যায়, সেই উদ্দেশ্যে ভূস্বামীরা আগের মতোই উচ্ছেদ, ঘন ঘন বদলি, বলপ্রয়োগ, লাঞ্ছনা, অবৈধভাবে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, জোর ক'রে টাকা আদায় ইত্যাদি চালিয়ে যেতে লাগলেন। একই সঙ্গে তারা এ অভিযোগও করতে লাগলেন যে, ১৮৫৯ এবং ১৮৬৯ সালের খাজনা আইনের ফলে তাদের পক্ষে খাজনা আদায় দুরূহ হয়ে উঠেছে এবং ন্যায্য কারণেও খাজনা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না।'[৩৪]
সরকারের কাছে জমিদারেরা শুধু উপরিউক্ত অভিযোগ দায়ের করেই ক্ষান্ত হলো না, '১৮৭০ সাল হইতে জমিদারগণ উচ্চতর হারে খাজনা ও অবৈধ আবওয়াব আদায়ের প্রচেষ্টা'ও নিলো।[৩৫] অন্যদিকে এই সময় বিভিন্ন কৃষক সভা-সমাবেশের উদ্যোগ-তৎপরতার কারণে বাংলার কোনও কোনও অঞ্চলের রায়তসাধারণও কিছুটা সংগঠিত হয়েছিল। স্বভাবত তারা জমিদার-ভূস্বামীদের এই অবৈধ দাবির বিরোধিতা ও কোথাও কোথাও বর্ধিত হারে খাজনা দিতে অস্বীকার করলো। সঙ্গত কারণে শুরু হলো জমিদার-রায়তের বিরোধ, 'রায়ট'।
যা হোক ১৮৭২-৭৬ কাল-পর্বে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জেলা বা অঞ্চলে এই বিরোধ-সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠেছিল। এর মধ্যে পাবনা ও বগুড়া জেলার (১৮৭২-৭৩) বিরোধ ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ ও 'কৃষক-অভ্যুত্থান'-ধর্মী।[৩৬] উল্লেখ্য এই বিরোধ-সংঘর্ষেরই তাৎক্ষণিত ফল হিশেবে সরকার অনতিবিলম্বে 'ভূমিসংক্রান্ত বিরোধ আইন' (The Agrarian Disputes Act, 1876) জারি করে পরিস্থিতি কিছুটা সামলানোর চেষ্টা করে। অবশ্য সরকার তখন বিহারের ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ-উত্তর পরিস্থিতি নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকায় এ বিষয়ে আর বেশি অগ্রসর হতে পারেনি।[৩৭]

---

৩৩. pp. 87.
৩৪. ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, পৃষ্ঠা ৩০৫।
৩৫. ভূমি আইন ও আলোচনা, ড. মোঃ নূরুল হক, পৃষ্ঠা ১৮।
৩৬. তবে আইনটি (এর দ্বারা মূলত দিওয়ানি আদালতের কাজের কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিল) আদৌ কখনও কার্যকর হয়নি। ড. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহের ভাষায়, 'The new law - The Agrarian Disputes Act (1876) -- was intended to be an exceptional one, and in fact it was removed from the statute book before any use was made of it.' (The History of Bengal, 1757-1905, pp. 301).
৩৭. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol II., pp 807.

তবে এতে যে শুধু বাংলা সরকারের নয়, ভারত সরকারেরও টনক নড়েছিল তা অনস্বীকার্য। কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট অনুভব করেছিল যে, বিদ্যমান অবস্থায় সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ ও জমিদার-রায়তের সম্পর্ক উন্নয়নে ১৮৫৯ বা ১৮৬৯ সালের 'খাজনা আইন' পুরোপুরি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, এই মুহূর্তে তাই নতুন ও যুগোপযোগী আইন দরকার ('an amendment of the law imperative')।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রিটিশ সরকারের তৎকালীন প্রতিনিধি বা 'Secretary of State to the Government of India' লর্ড হারটিংটন (Lord Hartington)-ও ভারত সরকারকে লিখিত তাঁর ১৭ই আগস্ট, ১৮৮২ সালের আনুষ্ঠানিক পত্রে (এটি ব্রিটিশ সরকারের পরিস্থিতি উপলব্ধির পরবর্তীকালের লিখিত প্রমাণ, এবং সত্যি বলতে বাংলা ও ভারত সরকার ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছিল, তথাপি এটির উল্লেখ দ্বারা আমরা বুঝাতে চাচ্ছি, এ সময় খোদ ইংল্যান্ডেই শুধু সরকারি মহলে নয়, বুদ্ধিজীবী ও বেসরকারি স্তরেও এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছিল, যার প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন 'ভারত-সচিব' তাঁর বক্ষ্যমাণ পত্রে) ১৮৫৯ সালের আইনের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ '4.Without entering upon the debated question of what were the precise intentions of the Government of Lord Cornwallis, I consider it fully established that the reservations made at the time of the Permanent Settlement give you the full right of interposition for the amelioration of the condition of the Bengal peasantry, and that legislative interposition at this time is justified by the facts disclosed :-- ... II. By the fact that Act. X. of 1859 has failed to ensure to the ryots that security of tenure which it was intended to secure to them.'[৩৮]

১৮৫৯-এর আইনে দিওয়ানি আদালতও যে প্রকৃত ন্যায়বিচার করতে পারছিল না সেটাও তাঁর পত্র থেকে অবগত হওয়া যায় -- 'III. By the fact that the Courts have proved unequal to discharge the duty of determining rents thrown upon them by the existing law.'[৩৯]

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই সরকার 'খাজনা আইন' পরিবর্তনের কাজ শুরু করেছিল। ড. বিপান চন্দ্রের ভাষায়, '১৮৭৬ সালের পর থেকে বাংলা সরকার এবং ভারত সরকার চেষ্টা শুরু করে পতনোন্মুখ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর অবয়বটা আইন পাস করে টিকিয়ে রাখতে এবং এই (*বাংলা*) প্রেসিডেন্সিকে সম্ভাব্য কৃষিবিপ্লবের হাত থেকে বাঁচাতে। কারণ, তা না হলে ইংরেজ রাজত্বের পক্ষে গুরুতর রাজনৈতিক বিপদের সম্ভাবনা ছিল।'[৪০] অবশ্য ঐ মুহূর্তে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগহীনতা সরকারের রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনতো কি-না সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, এটা ঠিক যে সরকার নিজেদের কায়েমি স্বার্থেই তা করতে বাধ্য ছিল।

যা হোক নতুন আইন প্রণয়নে সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বরাবরের মতো ভূমিরাজস্বের নিশ্চয়তা বিধান এবং জমিদার ও রায়তের মধ্যকার বিরোধ অবসান তথা তাদের মধ্যে একটা

৩৮. The Evolution of India and Pakistan, pp. 631.

৩৯ Ibid., pp. 632.

৪০. ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, পৃষ্ঠা ৩০৫-৬।

স্থিতিশীল ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। অন্যকথায় এমন এক আইন তৈরি যা যুগপৎ ব্রিটিশ স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষণ করবে, এবং বাংলার আপামর রায়তকুলকে খুশী করবে অথচ জমিদার-ভূস্বামীশ্রেণীও বিক্ষুব্ধ হবে না। তবে এটা যে খুব সহজ ও তড়িঘড়ির কাজ ছিল না তা বলাইবাহুল্য। বরং এ জন্য প্রয়োজন ছিল কর্তৃপক্ষীয় স্তরে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা-পর্যালোচনার। বস্তুত এরই প্রতিফলন দেখবো আমরা নিচের আলোচনায়।

এ বিষয়ে বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট-গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple, 1874-77) ১৮৭৬ সালে 'বেঙ্গল কাউন্সিলে' (Bengal Council) একটি বিল আনেন যাতে তিনি প্রস্তাব করেন, খাজনা স্থায়ীকরণ[৪১] এবং স্থিতিবান ও মধ্যস্বত্বাধিকারীগণের (Tenure-Holders) অধিকার নিশ্চিত করার।[৪২] কিন্তু ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে টেম্পল, পরবর্তী লেফটেন্যান্ট-গভর্নর স্যার অ্যাশলে ইডেন (Sir Ashley Eden, 1877-82)-এর কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ায় এবং সরকারের অন্যবিধ ব্যস্ততার কারণে ১৮৭৮ সালের আগে আর সেই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়নি। ঐ বছর বাংলা সরকার, 'কাউন্সিলে', 'বকেয়া খাজনার দ্রুত আদায়' (speedy realisation of arrears of rent) নিশ্চিত করণার্থ নতুন একটি বিল আনয়ন করে। কিন্তু 'কাউন্সিল' ও এ সংক্রান্ত গঠিত 'সিলেক্ট কমিটি', রাজস্ব ছাড়াও সমগ্র খাজনা আইন যথাযথভাবে পুনর্নিরীক্ষণ করার পক্ষে মত দেয়ায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়।
তবে এরই প্রেক্ষিতে, 'সিলেক্ট কমিটি'র অধিকাংশ সদস্যের সুপারিশে (ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯) ও স্যার অ্যাশলে ইডেনের সমর্থনে ভারত সরকার ১৮৭৯ সালের এপ্রিল মাসে একটি 'কমিশন' গঠনের অনুমোদন দেয়, যা নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে[৪৩] স্যার অ্যাশলে ইডেনকর্তৃক গঠিত[৪৪] ও 'The Rent Law Commission' নামে আবির্ভূত হয়।

এইচ. এল. ড্যাম্পিয়ের[৪৫]	চেয়ারম্যান
সি. ডি. ফিল্ড	সদস্য
এইচ. এল. হ্যারিসন	,,
আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি	,,
জে. ও. কাইনিয়ালি	,,
মোহিনী মোহন রায়	,,
পিয়ারী মোহন মুখার্জি	,,
ব্রজেন্দ্র কুমার শীল	,,

'রেন্ট ল কমিশন'-এর কার্য-পরিধি ঠিক হলো দু'টি। যথা: -- (১) এ যাবৎ প্রচল সকল খাজনা আইন বিশ্লেষণ করে একটি 'ডাইজেস্ট' (Digest) প্রণয়ন, ও (২) বিদ্যমান খাজনা আইনের

৪১. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. II., pp. 808.
৪২. ভূমি আইন ও আলোচনা, পৃষ্ঠা ১৯।
৪৩. বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী), ড. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৮।
৪৪. The Agrarian System of Bengal, Vol. II., Dr. A. C. Banerjee, pp. 204.
৪৫. ইনি ছিলেন তৎকালীন 'বোর্ড অব রেভেন্যু'-এর অন্যতম সদস্য।

পরিবর্তনের সুপারিশ করে একটি নতুন বিল-প্রস্তাবনা পেশ।[৪৬]

বছর খানেকের বেশি কাজ করে 'কমিশন' ১৮৮০ সালের জুলাই[৪৭] মাসে তাদের রিপোর্ট এবং একটি খসড়া বিলের প্রস্তাব দাখিল করে। এতে বিদ্যমান খাজনা আইনের অধিকতর সংশোধনী প্রস্তাবের পাশাপাশি রায়তদের অধিকার ও জমিদার-রায়তের সুসম্পর্ক স্থাপনের জোর সুপারিশ করা হয়েছিল। লেফটেন্যান্ট-গভর্নর স্যার অ্যাশলে বিলটি গ্রহণ এবং তা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর সদস্য এইচ. জে. রেনল্ডস্ (H. J. Reynolds)-এর কাছে দিলেন। অবশ্য ইতোমধ্যে বিলটি নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি মহলে প্রচুর আলোচনা-বিতর্ক শুরু হয়েছিল।[৪৮]

যা হোক মিঃ রেনল্ডস্ ১৮৮১ সালের মে মাসে বিলের দ্বিতীয় খসড়া পেশ করেন। একই বছর জুলাই নাগাদ স্যার অ্যাশলে বিলটির তৃতীয় খসড়া তৈরি এবং সেটি 'Finally settled by him' প্রত্যায়নকরত ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন। পরে ভারত সরকার এতে তাদের নিজস্ব মতামত সংযোজনান্তে বিলটি ইংল্যান্ডে 'ভারত-সচিব'-এর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে (মার্চ, ১৮৮২)। আগেই বলেছি তৎকালীন 'ভারত-সচিব' ছিলেন লর্ড হারটিংটন (১৮৮-৮২)। তিনি স্বীয় অভিমত বা পরামর্শ দিয়ে বিলটি ফেরত পাঠান (Revenue Despatch to India, 1882, No. 3. India Office Library)।

প্রসঙ্গত আলোচনার উপর্যুক্ত ধারাবাহিকতায় ইংরেজ প্রশাসক-ঐতিহাসিক C. E. Buckland-বর্ণিত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা বিষয়ের উল্লেখ এখানে জরুরি মনে করছি। তিনি বলেন, 'The Rent Commission had desired to maintain the existing rule by which occupancy right was acquired by 12 years' continuous possession. The Government of Sir A. Eden had recommended that the occupancy right should be enjoyed by all resident *raiyats*. But the Government of India proposed to take the classification of lands instead of the status of the tenant as the basis on which the recognition of the occupancy right should be effected, and to attach the right to all *raiyati* lands. It appeared to the Secretary of State that this involved a great and uncalled-for departure from both the ancient custom and the existing law of the country, and he declined to sanction it. The Government of India defended their proposals in a subsequent despatch written in October 1882, but the Secretary of State adhered to his former opinion, though he expressed his

---

৪৬. 'to prepare a digest of the existing law and to draw up a consolidating enactment.' (Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. II., pp. 808). আরও দেখুন, 'Bengal Land Revenue Report for 1904-1905'.

৪৭. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. II., pp. 808. তবে ড. লুৎফুল কবির (The Rights and Liabilities of the Raiyats under ... , pp. 32), ড. মোঃ নূরুল হক (ভূমি আইন ও আলোচনা, পৃষ্ঠা ১৯) 'জুন' মাসের উল্লেখ করেছেন।

৪৮. ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, পৃষ্ঠা ৩০৬।

willingness to assent to the introduction of the Bill in the form which the Government of India preferred."[৪৯]

স্যার সি. পি. ইলবার্ট (C. P. Ilbert) ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২রা মার্চ সংশোধিত বিলটি (একে মূল আইনের খসড়া বলাই শ্রেয়) 'লেজিসলেটিভ/ ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'য় পেশ করেছিলেন। খসড়া বিলে মোটামুটি ৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব[৫০] ছিল, যেগুলি --

এক. যে সকল রায়ত একই গ্রামে বা জমিদারিতে একটানা ১২-বছর ভূমি ভোগ-দখল বা অধিকার করছে প্রমাণিত হবে তাদেরকে ভূমিতে দখলি-স্বত্ব দেয়া হবে। এমন কি ঐ ১২ বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রায়ত যদি অন্যত্রও ভিন্ন জমি চাষাবাদ করে তবে পূর্বোক্ত জমির ওপর তার ভোগ-দখল অ-প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তাবে সংশ্লিষ্ট জমিদার-ভূস্বামীর ওপর, রায়তের কাঁধে নয়।

দুই. দখলি-স্বত্ব হবে বংশ-পরম্পরা তথা পুরুষানুক্রমিক, এবং জমিদার-ভূস্বামীর অগ্র-ক্রয়াধিকার (Right of Pre-emption) সাপেক্ষে হস্তান্তরযোগ্য। দখলি-স্বত্বাধিকারী রায়ত প্রয়োজনে ভূমি অন্য রায়তের কাছে পত্তনি দিতে পারবে।

তিন. খাজনা সম্বন্ধে বলা হলো, দখলি-স্বত্বাধিকারী রায়ত যে খাজনা দেবে তা মোট উৎপাদিত শস্যের মূল্যের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হবে না, এবং কোন অবস্থায়ই দ্বিগুণ হতে পারবে না ও খাজনা বৃদ্ধি ১০-বছর ব্যবধান ছাড়া করা যাবে না। অন্যদিকে দখলি-স্বত্ববিহীন রায়তের খাজনা বৃদ্ধি করতে হলে সেটিও মোট উৎপন্নের ৫/১৬ ভাগের বেশি হতে পারবে না।

চার. কোন দখলি-স্বত্ববিহীন রায়তকে তার দখল থেকে উচ্ছেদ করতে হলে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

পাঁচ. জমিদার-ভূস্বামীদের প্রধান অভিযোগ বা মামলা নিষ্পত্তির জন্য সংক্ষিপ্ত ও সহজ বিচার প্রক্রিয়া অনুসৃত হবে এবং আদালতের রায় বা আদেশ ছাড়া রায়তের শস্য ক্রোক ও বিক্রি করা যাবে না।

অধিকন্তু 'প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা ঠিকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা (তা) দেখার জন্য দেওয়ানি আদালত এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেওয়া' হবে।[৫১]
'ভারতীয় আইন সভা'য় আলোচনার এক পর্যায়ে সদস্য স্যার স্টিউয়ার্ট কলভিন বেইলি বা বেলী (Sir Steuart Colvin Bayley)-এর প্রস্তাবে (১২ই মার্চ) বিলটি পুনঃপরীক্ষার জন্য একটি 'সিলেক্ট কমিটি' (Select Committee)-র কাছে প্রেরিত হয়েছিল (১৪ই মার্চ)। 'সিলেক্ট কমিটি'র সদস্য ছিলেন ১২-জন। তাঁরা[৫২] -- (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

---

৪৯. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. II., pp. 808-9.

৫০. ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, পৃষ্ঠা ৩০৬-৭।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৭।

৫২ কমিটির চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট-গভর্নর স্যার অগাস্টাস রিভার্স থম্পসন (Sir Augustus Rivers Thompson, 1882-87)-এর বাইরে স্ব স্ব ক্ষেত্রে এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সমকালে বেশ খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী।

স্যার অগাস্টাস রিভার্স থম্পসন	চেয়ারম্যান
স্যার স্টিউয়ার্ট কলভিন বেইলি	সদস্য
মিঃ সি. পি. ইলবার্ট	,,
মিঃ ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার	,,
মিঃ কুইনটন (Quinton)	,,
বাবু কৃষ্ণ দাস পাল[৫৩]	,,
দ্বারভাঙ্গার মহারাজা	,,
মিঃ এইচ. জে. রেনল্ডস	,,
মিঃ ইভান্স (Evans)	,,
মেজর বেয়ারিং (Baring)	,,
মিঃ টি.এম.গিবন* (Gibbon)	,,
সৈয়দ আমির আলি*	,,

'সিলেক্ট কমিটি', ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ নাগাদ সংশোধিত বিলের খসড়া উপস্থাপন করে। পুনরায় বিলের উপর শুরু হয়েছিল 'কাউন্সিল'-সদস্যদের আলোচনা-পর্যালোচনা। অন্যদিকে খসড়া বিলের খুঁটিনাটি বিষয়াদি নিয়ে সরকারি কর্মচারী-মহলে বিশেষত বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মাঝেও -- তাদের বিভিন্ন সভা-সমিতি থেকে পক্ষে-বিপক্ষে প্রচুর মতামত আসতে লাগলো।

এ সব মতামত ও 'কাউন্সিলে'র আলোচনার ফল সন্নিবেশিত করে বাংলা সরকারের পক্ষে স্যার অগাস্টাস রিভার্স থম্পসন[৫৪] বিলটি চূড়ান্ত পাশের জন্য প্রেরণ করলেন ভারত সরকারের কাছে

৫৩. এঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর, তদস্থলে উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার রাজা পিয়ারী মোহন মুখার্জি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।
এঁরা পরবর্তীকালে কমিটিতে 'কো-অপ্ট' হন।

৫৪. চূড়ান্ত পর্যায়ে বিলটি পাশের সপক্ষে সুপারিশ করে স্যার রিভার্স থম্পসন যে প্রস্তাব প্রেরণ করেছিলেন তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, C. E. Buckland-এর ভাষায়ঃ 'Among other points of less important, Sir R. Thompson proposed to allow the free transfer of occupancy holdings of Bengal, giving the landlord, however, a veto if the transfer were to any but an agriculturist; to leave such transfers in Bihar to be regulated by custom; to omit the clauses of the Bill which gave the landlord a right of pre-emption; to abandon the provisions for enhancement on the grounds of the prevailing rate, or of the increased productive powers of the land; to withdraw all limitations upon enhancement by suit, but to maintain them in cases of enhancement by contract; to restore the check which limited enhancements to a certain proportion of the gross produce; to provide that tables of rates should be prepared only on the application of parties; to retain substantially the existing law of distraint; and to provide for a cadastral survey and the preparation of a record of rights.' (Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. II., pp. 809-810).

(১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪)।

এ সময়-পর্বে ভারতের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন লর্ড রিপন (Lord Ripon, 1880-1884) ও লর্ড ডাফরিন (Lord Dufferin, 1884-1888)। ভারত সরকারের পক্ষে তদীয় 'সিলেক্ট কমিটি' বিলটি নিয়ে আলোচনায় বসে নভেম্বর, ১৮৮৪ নাগাদ (আগাগোড়া কমিটি সর্বমোট ৬৪টির মতো বৈঠক করেছিল[৫৫]) এবং চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয় ১৮৮৫ সালের প্রথম দিকে।

অতঃপর স্যার স্টিউয়ার্ট বেইলিকর্তৃক 'লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'য় ১৮৮৫ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি বিলটি উত্থাপিত এবং 'After an exhaustive debate' ও প্রায় ২০০ সংশোধনী প্রস্তাব (এর অধিকাংশই পরে প্রত্যাহৃত বা বাতিল হয়েছিল[৫৬]) আনয়ন শেষে ১১ই মার্চ, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে পাশ হয়েছিল এবং ১৪ই মার্চ গভর্নর-জেনারেলের আনুষ্ঠানিক সম্মতি লাভের পর 'Act VIII of 1885' বা 'The Bengal Tenancy Act' নামে আইনি মর্যাদা লাভ করে। তবে এটি বলবৎ হতে আরও কয়েক মাস সময় লেগেছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৮৮৫ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত 'কলকাতা গেজেট' (৯ম সংখ্যা, প্রথম অংশ, পৃষ্ঠা ৮৭৪)-এর এক প্রজ্ঞাপন বলে ১লা নভেম্বর, ১৮৮৫ থেকে তা কার্যকর হয়েছিল। শুরুতে এর অধিক্ষেত্র ছিল কলকাতা, ওড়িশা ও তফসিলি জেলা ব্যতীত তৎকালীন সমগ্র বাংলা।

আসলে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫' এর পাশের প্রেক্ষাপট এতো বিস্তৃত বর্ণনার পিছনে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, আমরা মূলত দেখাতে চাচ্ছি যে, চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত-উত্তর সমগ্র ব্রিটিশ শাসনামলের সর্বাপেক্ষা আলোচিত, গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী আইনটি প্রণয়নে কর্তৃপক্ষ কতো দীর্ঘ সময়, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মেধা ও শ্রম নিয়োজিত করেছিল। এবং তারপরও বলা যাবে না যে, এতে কোন অসঙ্গতি বা অপূর্ণতা ছিল না, বা তা পুরোপুরি যুগোপযোগী ছিল। বস্তুত কোন আইন-ই এককালে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ আইনও তা ছিল না।[৫৭]

এ পর্যায়ে আমরা আইনটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারা ও অংশ নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করবো।

তার আগে জানিয়ে রাখি যে, ১৮৮৫ সনের ৮নং আইন তথা 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে'র ঘোষিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল মোটামুটি তিনটি।

'Bengal Administration Report'-এর ভাষায় বলতে পারি, 'The principle of the Act may be said to be based upon a system of fixity of tenure at judicial rents, and its three main objects are – *firstly*, to give the settled raiyat the same security in his holding as he enjoyed under the old customary law; *secondly*, to ensure to the landlord a fair share of the increased value of the produce of the soil; and *thirdly*, to lay down rules by which all disputed questions between landlord and tenant can

৫৫. Politics and Society in Bengal, Dr. Shawkat Ara Husain, pp. 9.

৫৬. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. II., pp. 810.

৫৭. খোদ ব্রিটিশ আমলেই ১৮৯৮, ১৯০৭, ১৯৩০, ১৯৩৮ ও ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে এর বেশ কিছু সংশোধনী পাশ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও Dr. Bikram Sarkar-এর ভাষায় বলা যায়, 'None of the Amendment proved useful.' (দেখুন, Land Reforms in India, pp. 25).

be reduced to simple issues and decided upon equitable principles."[৫৮] সংক্ষেপে এই আইনের মূলনীতিগুলিকে নিম্নোক্তভাবে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

> '(ক) ক্রোক আইনের সংস্কার ও রায়তের স্বার্থ বজায় রাখার ব্যবস্থা, (খ) জমিদার-প্রজার আইন সম্পর্কিত নানা সংজ্ঞার ব্যাখ্যা, (গ) প্রথা ও প্রথাসম্ভূত অধিকারের স্বীকৃতি, (ঘ) প্রজার শ্রেণী বিভাগ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বিশিষ্টতা বর্ণনা, (ঙ) আদালতের ডিক্রি ব্যতীত প্রজা উচ্ছেদ বন্ধ, (চ) খাজনা বৃদ্ধির কারণ সবিশেষভাবে নির্ধারণ ও (ছ) রায়তের জমি ও স্বত্ব বিবৃতির ব্যবস্থা।'[৫৯]

এখানে প্রথমেই আলোচনা করবো এর মূল বিষয় তথা কৃষি-প্রজা (Tenants) নিয়ে।

কৃষি-প্রজার শ্রেণী

'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫'-এর ৪ ধারায়[৬০] (দ্বিতীয় অধ্যায়) বাংলার সকল কৃষি-প্রজাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল।

১. মধ্য-স্বত্বাধিকারী[৬১] (tenure-holders), যার মধ্যে উপ-মধ্য-স্বত্বাধিকারীও (under-tenure-holders) অন্তর্ভুক্ত;
২. রায়ত (*raiyats*), ও
৩. অধীন বা কোর্ফা-রায়ত (under-*raiyats*); অর্থাৎ মূল রায়তের অধীনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূম্যধিকারী রায়ত।

---

৫৮. pp 87. রমেশ দত্ত, এর দু'টি লক্ষ্য ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'The Tenancy Act, as passed in 1885, gave the needed protection to cultivators without infringing in any way on the just rights of landlords The two main objects of the new law were to extend the *right of occupancy* to settled cultivators, and to extend adequate protection to *non-occupancy cultivators*.' (The Economic History of India, pp. 344).

৫৯. শ্রীশচীন সেন প্রণীত 'বাংলার রায়ত ও জমিদার' (পৃষ্ঠা ১৪) এর সূত্রে ড. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। [দেখুন, বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৩৪]।

৬০ মূল ৩ ধারায় এটি বর্ণিত। আগেই জানিয়েছি 'আইন'টির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ সংশোধনী হয়। ফলে এর মূল অধ্যায় বিভাজন ও ধারা-ক্রম (Serial of Sections) পরিবর্তিত হয়েছিল বিধায় আমরা এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধ্যায় ও ধারাওয়ারি আলোচনা না-করে অন্তর্ভুক্ত মৌল ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করবো। উল্লেখ্য, আমরা এখানে অনুসরণ করেছি, 'The Bengal Tenancy Act, 1885, as modified upto the 31st December, 1853, East Bengal Government Press, Dacca, 1954 '

৬১ আসলে ইংরেজি 'Tenure-holder' শব্দের উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা সম্ভব নয়। অনেকেই এর বিভিন্ন রকম বাংলা করেছেন। যেমন বাংলাদেশের প্রখ্যাত আইনজ্ঞ এ. এ. খান, এর বাংলা করেছেন -- 'রায়তীস্বত্বের দখলদার' (ভূমি আইন ও ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়েল, পৃষ্ঠা ৬২৬, ৬২৭)। অন্যদিকে ড মোঃ নূরুল হক করেছেন -- 'মধ্যস্বত্বের অধিকারী' (ভূমি আইন ও আলোচনা, পৃষ্ঠা

সাধারণ 'রায়ত'-এর আবার ৩টি উপ-বিভাগ ছিল। সেগুলি:-

ক. স্থায়ী বা কায়েমি-রায়ত (*raiyats* holding at fixed rates or rents) তথা নির্ধারিত খাজনায় চিরস্থায়ীভাবে বা খাজনার নির্ধারিত হারে চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত-দখলকার রায়ত;

খ দখলি-স্বত্বাধিকারী রায়ত (occupancy-*raiyats*) অর্থাৎ ইতোমধ্যে ভোগ-দখলে থাকা ভূমিতে দখলি-স্বত্বসম্পন্ন রায়ত, ও

গ. দখলি-স্বত্ববিহীন বা 'ওঠ্‌বন্দি' রায়ত (non-occupancy *raiyats*), অর্থাৎ ভূমিতে যাদের কোনরূপ স্বত্ব বা অধিকার নেই।

এখন দেখা যাক, 'মধ্য-স্বত্বাধিকারী' বলতে কোন্ ধরনের প্রজাকে বুঝানো হয়েছিল। এ বিষয়ে আইনের ৫(১) ধারায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, "Tenure-holder" means primarily a person who has acquired from a proprietor or from another tenure-holder a right to hold land for the purpose of collecting rents or bringing it under cultivation by establishing tenants on it, and includes also successors-in-interest of persons who have acquired such a right.'

'মধ্য-স্বত্বাধিকারী'র একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, এরা ন্যূনতম ১০০ মান-বিঘা (Standard bighas) ভূমি অধিকার করতেন অর্থাৎ ১০০ মান-বিঘারও বেশী হতো এদের দখলকৃত ভূমি। অধিকন্তু এদের ভোগ-দখলাধীন ভূমির খাজনা বৃদ্ধিকরণ সম্বন্ধে বলা হলো, এরা যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-অব্যবহিত পরবর্তীকাল থেকে ভূম্যধিকার করে এসেছে বলে প্রতীয়মান হয়, তবে নিম্নবর্ণিত দু'টি ক্ষেত্র ছাড়া এদের ভূমির খাজনা বৃদ্ধি করা যাবে না।

প্রথমত যে জমিদার বা ভূস্বামীর অধীনে কৃষি-প্রজার ভোগ-দখলি ভূমি অবস্থিত, তিনি, স্থানীয় প্রথা (local custom) অনুসরণে বা খাজনা বৃদ্ধির শর্তে ভূমি-বন্দোবস্ত হয়ে থাকলে সে অনুযায়ী এর খাজনা বৃদ্ধি করতে পারবেন; এবং

দ্বিতীয়ত দখলকৃত ভূমির পরিমাণ হ্রাস ছাড়া অন্য কোন কারণে ইতোমধ্যে যদি 'মধ্য-স্বত্বাধিকারী'র দেয় খাজনার পরিমাণ লোপ পেয়ে থাকে, এবং নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, খাজনা বৃদ্ধি হলে তা প্রদান সংশ্লিষ্টের পক্ষে অসম্ভব হবে না অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ভূমিজ উৎপাদন তা বহন করতে সক্ষম, তবে জমিদার এর খাজনা বৃদ্ধির অধিকারী হবেন।

---

২৭)। একার্থে উভয়ের পরিভাষা-ই সঠিক। কেননা আইনে যেহেতু 'কৃষি-প্রজার শ্রেণীবিভাগে'র অধ্যায়ে এটি অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এর দ্বারা রায়তি-স্বত্বের অধিকারী বুঝাতে কোন দোষ নেই। আবার 'tenure-holder'-এর সংজ্ঞা যখন বিশ্লেষণ করি (৫/১ উপধারা দ্রষ্টব্য), এবং দেখি যে 'ইনি', অন্য রায়তের কাছ থেকে 'খাজনা' আদায়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তখন তাকে মধ্যস্বত্বাধিকারী বলতে দ্বিধা থাকার সুযোগ আছে বলে হয় না। ফলত আলোচ্য ক্ষেত্রে আমরা এর কাছাকাছি বোধগম্য প্রতিশব্দ হিশেবে, ড. হকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 'মধ্যস্বত্বাধিকারী'ই রাখার পক্ষপাতী।

তবে এই খাজনা বৃদ্ধিও জমিদার বা উপরস্থ ভূস্বামী স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে করতে পারতেন না। তাকে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতির অধীনে এই খাজনা বৃদ্ধির অধিকার দেয়া হয়েছিল।

১. খাজনা বৃদ্ধি হবে উভয়পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত মোতাবেক এবং বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ঐ এলাকায় অবস্থিত একই ভূমি বা ভূমিখণ্ডের জন্য অন্যবা যে হারে খাজনা প্রদান করে আসছে অর্থাৎ প্রচলিত প্রথাভিত্তিক।
২. তবে অনুরূপ কোন প্রচলিত হার বা পরগণা-নিরিখ তথা স্থানীয় প্রথা-পদ্ধতির অনুপস্থিতিতে আদালতকর্তৃক তা সঠিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্ধারিত হবে।

'মধ্য-স্বত্বাধিকারী'র আরও কয়েকটি অধিকার বা বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন, চুক্তির শর্ত ভঙ্গ না-করলে জমিদার-ভূস্বামীগণ তাকে উচ্ছেদ করতে পারতো না (১০ ধারা)। সে, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি-বাটার অনুরূপ ভোগ-দখলি ভূমি হস্তান্তর ও উইল করতে পারতো (১১ ধারা)।

সাধারণ 'রায়ত'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ৫ এর ২ উপধারায় বলা হলোঃ "*Raiyat*" means primarily a person who has acquired a right to hold for the purpose of cultivating it by himself, or by members of his family or by *hired servants*[৬২] or with the aid of partners, and includes also the successors-in-interest of persons who have acquired such a right.'
রায়ত হতে গেলে তাকে অবশ্যই কোন-না কোন প্রকৃত স্বত্বাধিকারী (proprietor) বা 'মধ্য-স্বত্বাধিকারী'র অধীনে প্রত্যক্ষভাবে ভূম্যধিকার করতে হবে (৫ এর ৩ উপধারা)। অন্যথায় তাকে রায়ত বলে গণ্য করা যাবে না (shall not be deemed to be a *raiyat*)।
প্রসঙ্গত আমরা প্রাক-'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' ও অব্যবহিত পরবর্তীকালের বাংলায় রায়তের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে ইংরেজ প্রশাসক ও আইনজ্ঞ বিশেষ করে আদালতের বিচারকবৃন্দ, সমকালীন বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ও ঐতিহাসিক তথা বিভিন্ন স্তরে যে আলোচনা-পর্যালোচনা চলেছিল এবং তাঁরা এর যে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার কয়েকটিকে এখানে উদ্ধৃত করবো।

আরবি রায়ত বা রাইয়ত শব্দের অর্থ 'প্রজা' বা 'চাষী'।[৬৩] বস্তুত আভিধানিক মানে য্যাই থাকুক না কেন, এর প্রায়োগিকার্থ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও ক্ষেত্রত কিছুটা বিভ্রান্তিকর। বিভ্রান্তিকর ও জটিল এই জন্য যে, অনেক সময়ে বিভিন্ন জনের দ্বারা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যার ফলে এর যে প্রচলিত মানে দাঁড়িয়েছিল তা মূলার্থের সীমানা ছাড়িয়ে কখনও কখনও সাধারণ জনমণ্ডলীকেও (subjects) স্পর্শ করে ফেলতো বা ফেলেছিল।
১৮৮৫ সালের 'প্রজাস্বত্ব আইন' পাশের শতাব্দীকালেরও আগে, ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজস্ব বন্দোবস্ত সঠিকভাবে সম্পন্নার্থ গঠিত কমিশন (David Anderson, Charles Croftes ও George Bogle সমন্বয়ে) যে রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিল (১৭৭৮) তাতে 'রায়ত' বলতে

৬২. পরবর্তীকালে, 'The Bengal Tenancy (Amendment) Act, 1928' বলে এর প্রতিবর্তে 'servants or labourers' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল।
৬৩. বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ, ড. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, পৃষ্ঠা ৩৩২।

নির্দেশ করা হয়েছিলঃ '.. the immediate occupant of the soil, whether he is considered as proprietor or tenant. ... The word 'ryot' in its most extensive signification means a subject, but it is usually applied to the numerous and inferior class of people, who hold and cultivate small spots of land on their own accounts.'[৬৪]

এর একযুগ পরে (১৭৯১) C. W. B. Rouse 'রায়ত'-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেনঃ 'The Arabic word '*Rayet*' or '*Ryot*' strictly means no more than (a) subject, and its plural *Raaya* (Ruaya), which is the term mostly used in the Acts of Government or political disquisitions, signifies in a collective sense the people or subjects; applying however more particularly to the inferior classes, but not necessarily cultivators, nor any tenants at all to the King, or any other persons.'[৬৫] প্রায় একই সময়ে (১৭৯৫) ঐতিহাসিক H. T. Colebrooke 'রায়ত' বলতে বুঝিয়েছিলেন, 'For the term *ryot* though properly intending a subject generally, is restricted to mean citizens contributing directly to the revenue of the State, whether as tenants of land paying rent, or as traders and artificers paying taxes.'[৬৬]

বলাবাহুল্য যে, উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলিতে কমবেশি কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত প্রজাদেরকে 'রায়ত' শ্রেণীভুক্ত করা হলেও বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়, যখন 'Pitt's India Act, 1784'-এ বলা হয়ঃ '.. all who reside within the limits of any person's territory are that person's ryots.'[৬৭] কিংবা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক যখন বলেন, 'the term Ryot comprises the whole agricultural community.'[৬৮]

অবশ্য ১৮৬৪ সালে হাইকোর্টের 'Puisne Judges', W. S. Seton-Karr ও L. S. Jackson তৎকালে বেশ আলোচিত 'ধনপুত ও গুমান' মামলায় কিছুটা সংশয়ান্বিত সুরে

---

৬৪. The Report of Messrs Anderson, Croftes and Bogle, dated 25th March, 1778. Quoted from. The Rights and Liabilities of the Raiyats under the Bengal Tenancy Act, 1885 & ..., pp. 34.

৬৫. Dissertation on Landed Property of Bengal, pp. 73-74. Quoted from, The Rights and Liabilities of the Raiyats under the Bengal Tenancy Act, 1885 & ..., pp. 33. Also see, Bengal Ryots : Their Rights and Liabilities, Sunjeeb Chunder Chatterjee, pp. 1.

৬৬. Remarks on the Present State of the Husbandry and Commerce of Bengal, pp. 33. Quoted from, The Rights and Liabilities of the Raiyats under the Bengal Tenancy Act, 1885 & .., pp. 34.

৬৭. An Elementary Analysis of the Laws and Regulations enacted by the Governor-General in Council, Vol. III., J. H. Harington, pp. 227. Quoted from, The Rights and Liabilities of the Raiyats ..., pp. 34.

৬৮. Governor General's Minute of 26th September, 1832, para 18. Quoted from, Bengal Ryots : Their Rights and Liabilities, pp. 1.

'রায়তে'র একটি ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের ভাষায়, 'It is very difficult to lay down any general interpretation of the word 'ryots'. As a general rule, they are the cultivating tenants, but they may not be cultivators at all themselves; they may cultivate their land by hired labour or by under tenants."[৬৯]
ফলত রায়তের এই বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের[৭০] বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে এর একটি যথার্থ ও সর্বজনগ্রাহ্য আইনি সংজ্ঞা নির্ধারণ ছিল সময়ের দাবি। নতুন প্রজাস্বত্ব আইনে সেই চেষ্টাই করা হয়েছিল তা বলা যেতে পারে।

অন্যদিকে আলোচ্য আইনে 'অধীন বা কোর্ফা রায়ত' সম্বন্ধে বিধান সন্নিবেশিত হলো (৪৮ ধাবা), নবপ্রণীত আইনের আওতায় তারা যে মুহূর্ত থেকে ভূমি ভোগ-দখল করবে, তখন থেকে খাজনা দেবে। এই খাজনার পরিমাণ বা হার নির্দিষ্ট হবে জমিদার ও তার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত বলে। এদের খাজনা বৃদ্ধিও হবে নিবন্ধিত চুক্তির ভিত্তিতে।

'স্থায়ী' বা 'কায়েমি রায়ত'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হলো (১৮ ধারা)ঃ সে হলো -- 'A *raiyat* holding at a rent, or rate of rent, fixed in perpetuity."[৭১]
'মধ্য-স্বত্বাধিকারী'র মতো তারও অধিকার থাকবে ভূমি বিলি-বন্টনের ও উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তা দায়যোগ্য করার। উপরন্তু জমিদার বা ভূস্বামীর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ না করলে তাকে উচ্ছেদ করা যাবে না। এছাড়া আইনের ২০ ধারায় বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করলে তাকে 'বন্দোবস্ত বা মীমাংসিত বা বাশিন্দা রায়ত' (settled raiyat)-রূপেও গণ্য করা হবে।
তবে একই সঙ্গে তাকে কিছু সুযোগ-সুবিধাও দেয়া হয়েছিল, যেগুলি --

১ গাছ লাগানো;
২. সংশ্লিষ্ট ভূমির ফুল, ফল ও অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্য ভোগ;
৩. পুকুর খনন;
৪. তার নিজের জন্মানো যে কোন গাছ কাটা, কাঠ ব্যবহার বা হস্তান্তর।

'দখলি-স্বত্বাধিকারী রায়ত' সম্বন্ধে বলা হলো, এইরূপ রায়তগণ প্রথাগত বা অন্য কোন প্রকারে কোন আইন-বিধির কার্যকারিতার মাধ্যমে কোন ভূমিতে দখলি-স্বত্বে স্বত্ববান হয়ে থাকলে ঐ জমিতে তার দখলি-স্বত্ব বজায় বা বহাল থাকবে (১৯ ধারা)।
এরই পাশাপাশি এটাও বলা হলো (এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা) যে, 'প্রত্যেক ব্যক্তি যে এই আইন জারি হওয়ার আগে বা পরে কোন গ্রামে অবস্থিত রায়তি ভূমি একাদিক্রমে ১২-বছর কোন ইজারা বা অন্য কোন চুক্তির আওতায় পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ভোগ-দখলে রেখে

৬৯. (1864) W. R. Gap. Vol. (Act X) 61. Quoted from, The Rights and Liabilities of the Raiyats under the Bengal Tenancy Act, 1885.., p. 35.
৭০. এ সম্পর্কে আরও জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৮।
৭১. এটি ১৮৫৯ সালের 'বঙ্গীয় খাজনা আইনে'র ৩ ধারার অনুরূপ ছিল।

থাকলে, মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরে সে ঐ গ্রামের একজন 'বন্দোবস্ত বা মীমাংসিত বা বাশিন্দা রায়ত' ('settled *raiyat*') বলে পরিগণিত হবে (২০/১ ধারা)।'

'দখলি-স্বত্বাধিকারী রায়ত', জমিদার বা উপরস্থ ভূস্বামীকে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা প্রদানের শর্তে (২৪ ধারা) স্বীয় দখলাধীন ভূমি নিজের পছন্দ মতো যে কোন ভাবে ভোগ-ব্যবহারের অধিকারী হবে (২৩ধারা), যেমন (২৩ক ধারা):-

১. গাছ লাগানো;
২. সংশ্লিষ্ট ভূমির ফুল, ফল ও অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্য ভোগ;
৩. পুকুর খনন;
৪. তার নিজের জন্মানো যে কোন গাছ কাটা, কাঠ ব্যবহার বা হস্তান্তর।

নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট কারণে উচ্ছেদের জন্য প্রদত্ত 'ডিক্রি' বাস্তবায়নের প্রসঙ্গ ছাড়া 'দখলি-স্বত্বাধিকারী রায়ত'কে উচ্ছেদ করা যাবে না (২৫ ধারা):-

১ দখলি ভূমি এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে তা আইনের আওতায় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।
২. আলোচ্য আইনেব বিধি-বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোন শর্ত ভঙ্গ করলে, বা জমিদারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘন করলে, তাকে উচ্ছেদে কোন আইনি বাধা থাকবে না।

'দখলি-স্বত্বাধিকারী রায়তে'র স্থিত খাজনা হার সংরক্ষণ, বা প্রয়োজনে বৃদ্ধিকরণ সম্বন্ধে আরও সুনির্দিষ্ট বিধান রাখা হলো এভাবে যে, আইন জারির প্রাক্কালে সে যে খাজনা প্রদান করছে সেটাকেই সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত ধরা হবে যদি ভিন্ন রূপ কিছু জমিদার বা ভূস্বামীগণ প্রমাণ করতে না-পারেন (২৭ ধারা)।
উপরন্তু সে যদি খাজনা নগদ অর্থে দেয় (২৮ ধারা), তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র (২৯ ধারা) ছাড়া তার প্রদেয় খাজনা বৃদ্ধি বারিত করা হবে।

১. জমিদার ও রায়তের মধ্যে সম্পন্ন চুক্তি বলে খাজনা বৃদ্ধি করা যাবে। তবে এই চুক্তি হতে হবে লিখিত ও নিবন্ধিত।
২. প্রদেয় খাজনার হার সর্বোচ্চ টাকায় ২ আনা বৃদ্ধি করা যাবে।
৩. চুক্তির দিন থেকে পরবর্তী ১৫-বছরের মধ্যে এই খাজনা আর বৃদ্ধি করা যাবে না।

'দখলি-স্বত্ববিহীন রায়ত', যে মুহূর্ত থেকে কোন ভূমি ভোগ-দখল শুরু করবে তখন থেকেই তাকে খাজনা দিতে হবে। এই খাজনা নির্ধারিত হবে তার ও জমিদারের মধ্যে সম্পন্ন চুক্তির ভিত্তিতে (৪২ ধারা)। যদিও এর পরিচিতি ছিল দখলি-স্বত্ববিহীন, কিন্তু জমিদার বা উপরস্থ ভূস্বামী ইচ্ছে করলেই তাকে উচ্ছেদ করতে পারবো না।
এ জন্য তাকে আদালতে নিম্নবর্ণিত বিষয় প্রমাণ করতে হবে (৪৪ ধারা) (পরের পাতায় দ্রষ্টব্য)ঃ

১. দখলি ভূমি সে এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে তা আইনের আওতায় ভবিষ্যতে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে, বা, আলোচ্য আইনের বিধি-বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোন শর্ত ভঙ্গ, বা জমিদারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘন করলে, তাকে উচ্ছেদ করা যাবে।
২. কোন নিবন্ধিত চুক্তির আওতায় ইজারা মেয়াদ শেষ হলে।
৩. সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা প্রদানে 'দখলি-স্বত্ববিহীন রায়তে'র অস্বীকৃতি, বা যে হারে বর্তমানে রায়ত খাজনা দিচ্ছে তার মেয়াদ শেষ হলে।

আলোচ্য আইনের ৩৩ ধারায় জমিদার বা ভূস্বামীকর্তৃক উন্নয়ন কাজের কারণে খাজনা বৃদ্ধির সুযোগ রাখা হয়েছিল। বলা যায় সকল যুগেই এটি ছিল খাজনা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত। ফলে এখানে সেগুলি উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি --

'(১) যেইক্ষেত্রে ভূস্বামীকর্তৃক উন্নয়ন কাজের কারণে খাজনা বৃদ্ধির দাবি করা হয় --

(ক) এই আইন অনুযায়ী ঐ উন্নয়ন কাজ রেজেষ্ট্রিকৃত না হইলে আদালত বৃদ্ধির দাবি মঞ্জুর করিবে না;
(খ) বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণকালে আদালত নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করিবে:-
(i) উন্নয়নের মাধ্যমে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি অথবা বৃদ্ধির সম্ভাবনা,
(ii) উন্নয়ন কাজের খরচ,
(iii) উন্নয়ন কাজে লাগাবার জন্য চাষাবাদের খরচ, এবং
(iv) বর্তমান খাজনা এবং উচ্চতর খাজনা বহনে জমির সামর্থ্য।'[৭২]

খাজনা বা খাজনার কিস্তি প্রদানের নিয়ম করা হলো (৫৩ ধারা) -- উভয়পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বা প্রচলিত প্রথানুসারে কৃষি-প্রজা ৪ কিস্তিতে তা প্রদান করতে পারবে, তবে কৃষি-বছরের প্রতি তিন মাসের শেষদিবসে (on the last day of each quarter of the agricultural year) তাকে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। আরও বলা হলো:-

প্রত্যেক কৃষি-প্রজা উক্ত শেষদিবসের সূর্যাস্তের পূর্বে কিস্তি পরিশোধ করতে পারবে নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহে --
৫৪/২ (i) জমিদারের গ্রাম্য কাছারি অথবা তার দ্বারা নির্দেশিত অনুরূপ কোন উপযুক্ত স্থানে;
(ii) সরকারকর্তৃক নির্ধারিত পন্থায়, ডাক-যোগে; অথবা কোন কারণে আদালতে দিতে চাইলে সেক্ষেত্রে আদালতে তা জমা করে জমিদারকে জানাবে।

৭২. আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার অনুবাদ, এ এ খান, ভূমি আইন ও ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়েল, পৃষ্ঠা ৬৪৮

৫৪/৫ কোন কিস্তি বা তার অংশবিশেষ নির্ধারিত তারিখে পরিশোধে কৃষি-প্রজা ব্যর্থ হলে ধরে নেয়া হবে যে, তা বাকি পড়েছে বা বকেয়া (Arrear) হয়েছে।

কৃষি-প্রজা কিস্তি প্রদানের সময় অবশ্যই লিখিতভাবে জানাবে যে, সে কোন্ বছরের খাজনা পরিশোধ করলো বা করতে চায়, জমিদার বা উপরস্থ ভূস্বামী সে অনুযায়ী তা উশুল করবে। তবে কৃষি-প্রজা কখনও তা জানাতে ব্যর্থ হলে, সেক্ষেত্রে জমিদার নিজের ইচ্ছে মতো উশুল করতে পারবে (৫৫ ধারা)।
এছাড়া কৃষি-প্রজা খাজনা দেয়া মাত্র জমিদার বা উপরস্থ ভূস্বামীগণ তাকে খাজনার দাখিলা (Rent Receipt) দিবেন, যাতে তার বা তাদের স্বাক্ষর থাকবে, এবং এর একটা অংশ (Counterfoil of the receipt) তার জিম্মায় তথা কাছারিতে সংরক্ষিত হবে (৫৬ ধারা)। অন্যদিকে যে কোন কৃষি-প্রজা নিম্নোদ্ধৃত কারণে খাজনা আদালতে জমা করতে পারবে বলে বিধান রাখা হলো ৬১ ধারায়।

১. জমিদার বা ভূস্বামী যখন তার দেয় খাজনা যে কোন কারণে গ্রহণে বা দাখিলা দিতে অস্বীকৃতি জানাবে।
২. পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে যদি সে (কৃষি-প্রজা) স্পষ্ট অনুভব করে বা তার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, জমিদার বা উপরস্থ ভূস্বামী তা গ্রহণ করবে না বা খাজনার দাখিলা দিতে চাইবে না।
৩. উপরস্থ ভূস্বামী বা জমিদারের যদি একাধিক অংশভোগী থাকে (Co-sharers), এবং আইনত কাব কাছে খাজনা প্রদেয় তা সুনির্দিষ্ট নয়, তবে সেক্ষেত্রে কৃষি-প্রজা আদালতের আশ্রয় নিতে পারবে।

আলোচ্য আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই যে, এর ৭৪ ধারা জারির মাধ্যমে রায়তদের কাছ থেকে জমিদার প্রভৃতি উপরস্থ ভূস্বামীকর্তৃক 'আবওয়াব' গ্রহণ বা আদায় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১নং প্রবিধান বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে (১৭৯৩ সালের ৮নং প্রবিধান বা দশসালা বন্দোবস্ত-এর ধারা ৫৪, ৫৫ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) জমিদারকর্তৃক 'আবওয়াব' গ্রহণ স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও সেটি যে তখনও পর্যন্ত (১৮৮৫) বহাল তবিয়তে প্রচল এবং রায়তদের মাথায় একটি বাড়তি খড়্গ হয়ে ঝুলছিল, এই নতুন নিষেধাজ্ঞা জারির মধ্য দিয়ে তা আরেকবার প্রমাণিত হলো।
তবে এখানেও এটাও বলে রাখি যে, জমিদার বা উপরস্থ ভূস্বামীশ্রেণী এই অবৈধ আদায় তথা 'আবওয়াব' গ্রহণ থেকে তারপরও বিরত ছিল না।
ড. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেন, "১৮৮৫ সনের ৮ আইনে বাংলার কৃষকদের ওপর বে-আইনি কর স্থাপন বন্ধ হয়নি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পাবনার কালেক্টর মন্তব্য করেন যে 'জমিদার শ্রেণীর জবরদস্তি আদায়ের সীমা নেই।' অনুপস্থিত জমিদারদের জমিদারিতে বে-আইনি কর আদায় তুলনামূলকভাবে বেশি হত। আবার বৃহদায়তন জমিদারিতে জবরদস্তি কর আদায়ের ঘটনা ছোট জমিদারি অপেক্ষা বেশি ঘটত।"[৭৩]

---

৭৩. বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৩৭।

যা হোক, নতুন প্রজাস্বত্ব আইনে এ ব্যাপারে যে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো তা এ রকমঃ 'All impositions upon tenants under the denomination of *abwab, mathat* or other like appellations, in addition to the actual rent, shall be illegal, and all stipulations and reservations for the payment of such shall be void.'

আইনে 'উন্নয়ন' সম্পর্কেও কিছু নতুন ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। সুষ্ঠু ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনার সঙ্গে এর সম্পৃক্তি বা সম্বন্ধ অনস্বীকার্য বিধায় আইনের ভাষাতেই তা হুবহু তুলে ধরা হলো (৭৬ *ধারা*)[৭৪]:-

'(১) এই আইনের নিমিত্ত 'উন্নয়ন' শব্দটি (*রায়তের**) হোল্ডিং প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হইয়াছে এই অর্থে যে, যে কোন কাজ যাহা হোল্ডিংয়ের মূল্যমান বৃদ্ধি করিবে, যাহা হোল্ডিংয়েব পক্ষে উপযুক্ত এবং যে উদ্দেশ্যে ইহা ভাড়া দেওয়া হইযাছে উহার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যাহা হোল্ডিং-এর উপর বাস্তবায়িত না হইলেও হয সরাসরি উহার কল্যাণের জন্য বাস্তবায়িত, নতুবা বাস্তবায়নের পরে সবাসরি উহার কল্যাণ সাধন করিবে।

(২) বিপরীত কোন কিছু প্রদর্শন করা না হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই ধারার অর্থের আওতায় উন্নয়নমূলক কাজ বলিয়া ধরিতে হইবে:-

(ক) কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে ('*অথবা খাবার পানির জন্য*') কিম্বা কৃষিকার্যে নিয়োজিত মানুষ ও গবাদি পশুর ব্যবহারের জন্য কূপ, পুকুব, খাল নির্মাণ (*খনন*) এবং পানি মজুত, সরবরাহ ও বিতবণের কাজ**,

(খ) সেচকার্যেব জন্য জমি প্রস্তুত করা;

(গ) পানি নিষ্কাশন, নদী বা অন্যান্য জলাভূমি হইতে জমি উদ্ধার অথবা বন্যা হইতে বা ভাঙ্গন হইতে অথবা কৃষিব জন্য ব্যবহৃত জমি কিম্বা আবাদযোগ্য পতিত জমি পানিব অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি হইতে রক্ষার জন্য রক্ষামূলক ব্যবস্থা;

(ঘ) কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে জমি উদ্ধার, জঞ্জাল মুক্ত করা, বেড়া দেওয়া বা স্থায়ী উন্নয়নের কাজ;

(ঙ) পূর্বোক্ত যে কোন একটি কাজ নবায়ন বা মেরামত; অথবা উহাতে কিছু রদবদল বা সংযোজন, এবং

(চ) প্রজা বা তাহাব পরিবারের জন্য ইট, কাঠ, পাথর অথবা অন্য যে কোন উপকরণে বাসগৃহ নির্মাণ, (*ও*) সেই সঙ্গে সকল প্রয়োজনীয় বহির্বাটি নির্মাণ***।

---

৭৪. অনুবাদ, এ এ খান, ভূমি আইন ও ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়েল, পৃষ্ঠা ৬৫০-৫১।

* ১৯২৮ সালের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন'-এর ৪৮(ক) ধারা বলে 'রায়ত' শব্দ বাদ দেয়া হয়। অতঃপর শুধু 'হোল্ডিং' শব্দ প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

** 'ব্যাখ্যা:- কৃষি জমিতে অনুরূপ নির্মাণ কাজ জমির মূল্যমান ক্ষতিগ্রস্ত করা অথবা প্রজাস্বত্বের নিমিত্ত অনুপযুক্ত করার কাজ বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।'

*** '(৩) কিন্তু এই আইনের নিমিত্ত হোল্ডিংয়ের রায়ত (*পরবর্তীকালে 'প্রজা' শব্দ প্রতিস্থাপিত*) কর্তৃক বাস্তবায়িত কোন কাজ উন্নয়ন বলিয়া গণ্য হইবে না যদি উহা তাহার ভূস্বামীর সম্পত্তির মূল্যমান হ্রাস করে।'

উন্নয়ন সম্পর্কে কালেক্টরকে ক্ষমতা দেয়া হলো এই মর্মে যে, কোন উন্নয়নমূলক কাজ করা, বা কোন বিশেষ কাজ উন্নয়নমূলক গণ্য হবে কি না, সে সম্বন্ধে রায়ত বা অধীন-রায়তের সঙ্গে জমিদার বা উপরস্থ ভূস্বামীর কোনরূপ বিরোধ দেখা দিলে, তা নিষ্পত্তি করবেন জেলা কালেক্টর, এবং এক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত বা আদেশ হবে চূড়ান্ত (his decision shall be final)।
অন্যদিকে আলোচ্য আইনে কৃষি-প্রজার ধার্য খাজনা বিলোপ বা হ্রাস, তৎকর্তৃক বসতি বা আবাস-স্থান ত্যাগ, প্রজাস্বত্বের বিভক্তি ইত্যাদি সম্পর্কেও বেশ কিছু দিক-নির্দেশনা ছিল। পরবর্তীকালের বহুল আলোচিত, এবং অদ্যাবধি বাংলাদেশে প্রচল 'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০' (The State Acquisition and Tenancy Act, 1950)-এর সঙ্গে এই বিধানগুলির গভীর সাযুজ্য থাকায় এখানে তা আলোচনা করা হলো (১৯৫০ সালের আইনের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী তথা শেষ খণ্ডে দ্রষ্টব্য)।

৮৬ক ধারা	কোন ভূস্বত্ব (tenure) বা জোত (holding) বা তার অংশবিশেষ যদি প্লাবনে অবলুপ্ত হয় (নদী বা সমুদ্র গর্ভে শিকস্তি অর্থে), সেক্ষেত্রে অনুরূপ স্বত্বের জন্য ধার্য খাজনা হারাহারিভাবে হ্রাস পাবে বা মওকুপ হবে।
৮৭ ধারা	ভূস্বামীকে আগেভাগে না-জানিয়ে, এবং দেয় খাজনা প্রদানের কোনরূপ ব্যবস্থা না-করে রায়ত যদি বসতিস্থল পরিত্যাগ কবে, বা নিজে বা অন্য কারো দ্বারা চাষাবাদ করা থেকে বিরত থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট জমিদার বা ভূস্বামী, যে কৃষি-বছরে রায়ত উক্তরূপ কাজ করে সেই বছর শেষে তা (ভূমি) দখলে নিতে এবং অন্য কাউকে বন্দোবস্ত দিতে পারবেন। তবে এ ব্যাপারে জমিদার লিখিতভাবে জেলা কালেক্টরকে অবগত করবেন।
৮৮ ধারা	আলোচ্য আইনের অন্যান্য ধারায় যাই বলা থাক না কেন, জমিদার বা ভূস্বামী, বা যেক্ষেত্রে একাধিক জমিদার বা তার অংশীদার থাকে -- তিনি বা তারা সকলে অথবা তৎকর্তৃক বৈধভাবে নিয়োজিত এজেন্ট চাইলে, এবং কৃষি-প্রজা বা প্রজাদের সম্মতিক্রমে -- কোন ভূস্বত্ব বা জোত বিভক্ত করা যাবে অথবা খাজনার বিভাজন হবে।

উল্লেখ্য, কৃষি-প্রজার জন্য আলোচ্য আইনের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ হিশেবে যে ধারাটি সন্নিবেশিত হয়েছিল, তা ৮৯। সত্যি বলতে এটি ছিল আইনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও রায়ত-কল্যাণধর্মী একটি সংযোজন। এই ধারায় অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলা হলোঃ 'No tenant shall be ejected from his tenure or holding except in execution of a decree.' অর্থাৎ '(আদালতের) কোন ডিক্রি কার্যকর ব্যতীত কোন প্রজাকে তাহার রায়তীস্বত্ব বা হোল্ডিং হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।'
বস্তুত আইনের এই বলিষ্ঠ রক্ষাকবচ যে অনেকখানি কার্যকর ও ক্ষেত্রত অব্যর্থ প্রতীয়মান হয়েছিল তা আইন প্রণয়নকালে জমিদারদের এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন[৭৫] এবং

৭৫. ড. বিপান চন্দ্র বলেন, 'জমিদারেরা ১৮৮৩ সালের (স্মর্তব্য, তখন বিলের পক্ষে-বিপক্ষে তুমুল আলোচনা চলছিল) এই প্রজাস্বত্ব বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।' (ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, পৃষ্ঠা ৩০৭)।

পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এর কঠোর সমালোচনা ও কোথাও কোথাও তা প্রতিহতকরণের চেষ্টা থেকে প্রমাণিত।

আগে যেখানে 'হপ্তাম' ও 'পঞ্জাম' আইনের বদৌলতে তারা বকেয়া খাজনা আদায়ের নামে যখন-তখন প্রজা-রায়তদের গোমস্তা-বরকন্দাজ-লাঠিয়াল পাঠিয়ে ধরে আনতে, দিনের-পর দিন কয়েদখানায় আটক রেখে নানারূপ শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দিতে, এমন কি তাদেরকে ভিটেমাটি ছাড়া তথা উচ্ছেদ করতে পারতো, বর্তমান আইনে সেই সুযোগ তিরোহিত হওয়ায়, প্রকৃত অর্থে এটি তাদের প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অবমূল্যায়নের সম্মুখীন হয়েছিল তা বলাইবাহুল্য।

এ পর্যায়ে এই আইনের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন যথা স্বত্বের রেকর্ড প্রণয়ন ও খাজনা নিরূপণ বা নিষ্পত্তির কাজে রাজস্ব কর্মকর্তার ভূমিকা এবং তৎসহ বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যা ও জটিলতা নিরসনে দিওয়ানি আদালতের ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগাধিকার (মূলত অধ্যায় ১৩, ও আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারায় প্রদত্ত) সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত বলে মনে করি। কিন্তু যেহেতু দিওয়ানি আদালতের বা বিচার বিভাগীয় কার্যপদ্ধতি আইনে অত্যন্ত বিস্তৃত এবং পর্যালোচ্য ক্ষেত্রে তা খুব জরুরি না-হওয়ায়[৭৬] আমরা শুধু স্বত্বের রেকর্ড প্রণয়ন ও খাজনার বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নিষ্পত্তিতে রাজস্ব কর্মকর্তার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবো।

আইনের ১০১ ধারায় বলা হয়েছিল, লেফটেন্যান্ট-গভর্নর (পরবর্তীকালে 'প্রাদেশিক সরকার' শব্দযুগল প্রতিস্থাপিত) প্রয়োজন মনে করলে -- '.... make an order directing that a survey be made and a record-of-rights be prepared by a Revenue-officer, in respect of lands (পরবর্তীকালে 'ভূমি' স্থলে 'সকল ভূমি' বা '*all lands*' কথাটি প্রতিস্থাপিত) in any local area, estate or tenure or part thereof: .. .' নিঃসন্দেহে এই নতুন নির্দেশনা বা অন্তর্ভুক্তি প্রচলিত জরিপ আইন -- 'The Bengal Survey Act, 1875' (Bengal Act V of 1875) আইনের এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলির প্রস্তাবনাকে আরও দৃঢ়ীভূত করেছিল। আগের আইনে বলা হয়েছিলঃ 'Whereas it is expedient, with a view to the definition and identification of lands, the better security of landed property and the prevention of encroachments and disputes, to provide for the survey of lands and for the establishment and maintenance of marks to distinguish boundaries (Preamble দ্রষ্টব্য); ...The Lieutenant-Governor (পরবর্তীকালে *Provincial Government* প্রতিস্থাপিত) may, whenever he (*it*) shall think fit, order that a survey shall be made of the land situated in any district or in any part of a district or in any specified tract of country, and that the boundaries of estates, tenures, *mauzas* or fields be demarcated on the lands so to be surveyed (Section 3).'

---

৭৬ এ কথা অনস্বীকার্য যে, 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫'-তে বিভিন্ন বিষয়ে বিচার করবার, জমিদার ও রায়তের মধ্যকার খাজনা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিরোধ-মামলা মিমাংসা বা নিষ্পত্তির ব্যাপারে দিওয়ানি আদালতের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। কিন্তু আমাদের আলোচনা যেহেতু মূলত ভূমিরাজস্ববিষয়ক, সুতরাং এ বিষয়ে আদালতের অধিক্ষেত্র বা ক্ষমতা, দীর্ঘ কার্য-পদ্ধতি প্রভৃতি তুলে ধরে এ আলোচনা ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

আলোচ্য আইনে রাজস্ব কর্মকর্তাকর্তৃক প্রণীতব্য স্বত্বের রেকর্ড বা খতিয়ানে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রাখা হয়েছিল (১০২ ধারা)। যথা: -

১. কৃষি-প্রজা বা দখলকারের নাম;
২. কৃষি-প্রজাব শ্রেণী, যেমন সে মধ্য-স্বত্বাধিকাবী, কায়েমি কি বাশিন্দা রায়ত, ইত্যাদির বর্ণনা;
৩. কৃষি-প্রজা বা দখলকার রায়তের ভূমিব প্রকৃতি, পরিমাণ ও সীমানা;
৪. তাদেব উপরস্থ ভূস্বামীর নাম,
৫ প্রদেয় খাজনাব বিবরণ;
৬. প্রদেয় গো-চারণ কর, বন-কর, জল-কর ইত্যাদির বিববণ;
৭. খাজনা দেয়াব পদ্ধতি;
৮. ক্রম-বর্ধমান খাজনার চুক্তি হয়ে থাকলে তার সময় ও কিভাবে নিরূপিত হলো তৎবিষয়ক বর্ণনা;
৯ অন্য কোন শর্ত বা ঘটনা যদি থাকে, তাব বিবরণ;
১০. দখলি ভূমি বা স্বত্ব নিষ্কর হয়ে থাকলে সেই তথ্য, প্রভৃতি।

১০৩ ধারায় আরও বিধান রাখা হয়েছিল, কোন এলাকার এক বা একাধিক স্বত্বাধিকারী বা মধ্য-স্বত্বাধিকারী বা রায়তদের একটি বড় অংশ যদি, ভূমি জরিপসংক্রান্ত সকল ফিস সরকারি কোষাগারে জমা করে স্থানীয় রাজস্ব কর্মকর্তার কাছে সংশ্লিষ্ট এলাকা বা তার অংশবিশেষ জরিপের (Land survey) জন্য আবেদন করে, তবে তিনি (রাজস্ব কর্মকর্তা) প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে, উপরিউক্ত তথ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত জরিপ-কর্ম সম্পন্ন তথা স্বত্বের রেকর্ড বা খতিয়ান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের নির্ধারিত কর্ম-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত খতিয়ানের একটি খসড়া (draft record-of-rights) তিনি এলাকার সংশ্লিষ্টদের অবগতি ও কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি থাকলে সে সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ দিবেন, এবং আইনেব আলোকে সেগুলির নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত খতিয়ান (final records) প্রস্তুত ও জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন।
এর পাশাপাশি ১০৪ ধারা বলে কৃষি-প্রজাদের দেয় খাজনা সঠিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্ধারণ করে রাজস্ব কর্মকর্তা যে 'জমা-বন্দি' (Settlement Rent-roll) প্রস্তুত করবেন তাতে নিম্নলিখিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয় --

১ বিভিন্ন শ্রেণীর জমি বা ভূমির মাটির প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সেচ পদ্ধতি ও অনুরূপ কোন বর্ণনা যা রাজস্ব কর্মকর্তার কাছে উল্লেখযোগ্য বা বিবেচনাযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়, এবং
২. যে সকল কৃষি-প্রজার দেয় খাজনা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তনযোগ্য, তার সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত খাজনাব হারের বর্ণনা।

অতঃপব এরই ভিত্তিতে জমিদার, তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ কৃষি-প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করবেন, এবং এই উপরস্থ ভূস্বামীগণের কাছ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তিতে ভূমিবাজস্ব গ্রহণ করবেন সরকারের পক্ষে জেলা কালেক্টর।

যা হোক, এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' বাংলার আপামর রায়তসাধারণের কতোখানি উপকারে এসেছিল? অন্যকথায় পর্যালোচ্য আইনের ফলাফল পরবর্তী প্রেক্ষাপটে কী ছিল?

দু'ভাবে এর উত্তর দেয়া যেতে পারে। প্রথমত ব্যাপকার্থে রায়ত বা আইনের সংজ্ঞায় 'কৃষি-প্রজা'র স্বার্থ এর দ্বারা রক্ষিত হয়েছিল কি-না, এবং দ্বিতীয়ত রায়তগণ আগের তুলনায় জমিদার প্রভৃতি উপরস্থ ভূস্বামীর নিপীড়ন-নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল কি-না? -- বস্তুত এই বিষয়গুলি আলোচনা করে আমরা এর ভালোমন্দ দিক সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে পারি।

বিস্তারিত আলোচনার আগে এখানে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫'-এর ফলাফল সম্বন্ধে আধুনিক লেখক-ঐতিহাসিকদের দু'-একটি মন্তব্য উল্লেখ করা হলো।

ড. বিনয় কে. চৌধুরী বলেন, 'The Rent Bill as it was ultimately passed was much less favourable to peasants than the earlier drafts* of the Bill. Yet, from the point of view of peasants, it was a considerable improvement on the Rent Act of 1859. The acquisition of occupancy rights was a much easier process now. ... The Act deprived zamindars of their old power of ejecting peasants for arrears of rent alone.'[৭৭]

ড. চিত্ত পাণ্ডা আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'Once the Act became operational, it overwhelmingly strengthened the position of the peasants, both tenure-holders and occupancy tenants.'[৭৮]

এ পর্যায়ে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে, এ সময় বাংলা তথা ভারতের প্রত্যক্ষ শাসন ক্ষমতা ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ইংল্যান্ডের সরকার গ্রহণ করলেও তদাবধি তাদের শাসনকার্যের মূল বেনিয়া নীতি, অর্থাৎ রাজস্ব আয় এবং বিভিন্ন পথে তা স্বদেশে পাচার - এই অন্তর্দর্শন তখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত ও সক্রিয় ছিল।

বলাবাহুল্য এই প্রবণতা এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং সেই

---

* পাশকৃত আইনের চেয়ে 'বেঙ্গল রেন্ট ল কমিশন' এর প্রস্তাবিত বিল রায়তদের জন্য অধিক কল্যাণধর্মী ছিল। এ সম্পর্কে ড. বিনয় চৌধুরী বলেন, 'The Rent Bill drafted by the Rent Commission (1880) was a landmark in the history of rent legislation. After 1859 it was the first official attempt at a reconstruction of the whole rent law with a strong emphasis on the need to protect the rights of peasants and of a numerous intermediate group' [Dr. Benoy K. Chowdhury in a treatise titled Agrarian Economy and Agrarian Relations in Bengal (1859-1885), in, The History of Bengal (1757-1905), Ed. by Dr. N. K. Sinha, pp. 304]. যদিও এর ভিত্তিতে চূড়ান্ত পর্যায়ে সংশোধিত যে আইন পাশ হয়েছিল তা এ যাবৎকালের সর্বোৎকৃষ্ট ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

৭৭. Dr. Benoy K. Chowdhury in, The History of Bengal (1757-1905), pp. 304.

৭৮. The Decline of the Bengal Zamindars : Midnapore (1870-1920), Dr Chitta Panda, pp. 140

রাজস্ব আদায় -- অন্তত বাংলার ক্ষেত্রে যেহেতু জমিদারদের মাধ্যমে সবচেয়ে সহজ, নিশ্চিত ও সুচারু উপায়ে সম্পন্ন হতে পারতো, ফলে ১৮৮০-৮৫ পর্বে যখন বহুল প্রত্যাশিত 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' প্রবর্তিত হয়, তখনও জমিদার-তোষণ নীতি বর্জন করা সরকারের পক্ষে আদৌ সম্ভব হয়নি, বা সম্ভব ছিল না। ফলত এই আলোকেই -- জমিদারদের যতোটা সম্ভব ছাড় দিয়ে, এবং তাদেরকে কোনভাবেই ব্রিটিশ-বৈরী না-করে রায়তসাধারণেব মঙ্গল করা ছিল 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫' প্রবর্তনের পিছনে রিভার্স থম্পসনের সবকারেব মূল চিন্তা-ভাবনা।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথমেই উল্লেখ করতে পারি যে, ১৮৫৯ সালের (পরবর্তীকালে ১৮৬৯ সনের সংশোধনী সত্ত্বেও) 'খাজনা আইন' অপেক্ষা ১৮৮৫ সালের ৮নং আইন এ অঞ্চলের প্রজাস্বার্থের বেশি অনুকূল হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।[৭৯] কারণ আমরা দেখেছি, বর্তমান আইন প্রবর্তিত হওয়ায় 'কৃষি-প্রজা' বা রায়তশ্রেণী যে সকল সুবিধা পেয়েছিল যেমন, -- কোন গ্রামে ১২-বছর এক নাগাড়ে ভূমি ভোগ-দখল করলে সংশ্লিষ্ট ভূমিতে রায়তের দখলি-স্বত্ব অর্জন, উক্ত ভূমি বিলি-বণ্টনের অধিকার (কতিপয় বিধি-নিষেধের আওতায়), জমিদারের স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খাজনা বৃদ্ধির অধিকার খর্ব, বা আদালতের আদেশ ব্যতীত বাকি খাজনার দায়ে রায়তকে ভোগ-দখলি ভূমি থেকে উৎখাত করতে না-পারা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত যুগোপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই বা থাকা উচিত নয়। এর কিছু কিছু সুফল পরবর্তীকালে রায়তগণ কমবেশি ভোগ করেছিল। যদিও অনেকে বিশেষত বামপন্থী লেখকগণ তা মোটেও স্বীকার করতে চান না।[৮০]

একই সঙ্গে যখন আমরা লক্ষ্য করি, রায়তদের কয়েকটি চিহ্নিত শ্রেণীকে রায়তি-স্বত্বাধিকার অর্পণ করলেও সমকালীন বাংলার ভূমিব্যবস্থা ও কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত কোনও কোনও শ্রেণী বা স্তরকে, যেমন অধীন বা কোর্ফা রায়ত (under-raiyats), অস্থিতিবান বা ওঠবন্দি রায়ত (non-occupancy ryots/ tenants at will), বর্গাদার (Bargadar or sharecroppers) প্রভৃতির স্বার্থ-স্বত্ব কিভাবে নিরূপিত ও নিশ্চিত হবে সে সম্বন্ধে এ আইন আদৌ কোন উচ্চবাচ্য করে না, তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে আইন-প্রণেতাদের প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও সদেচ্ছা সম্পর্কে সন্দিহান না হয়ে পারা যায় না।

উপরন্তু কৃষি-প্রজা বা রায়তের অধীনে (হোক তা মৌখিক চুক্তিভিত্তিক) দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এরা ভূমিতে কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন তথা প্রত্যক্ষভাবে ভূমি দখলে রাখলেও ভূমিতে এদের কোনরূপ স্বত্ব স্বীকার করা হয়নি বা দেয়া হয়নি। অথচ আজকের দিনের মতো এরা না ছিল প্রকৃত কৃষি-মজুর, না মোগল বা নবাবি আমলের পাইকাস্ত শ্রেণীর রায়ত। এখনকার কৃষি-মজুর যেমন দৈনন্দিন ভিত্তিতে অর্থের বিনিময়ে মালিকের জমি চাষ করে সুতরাং জমিতে তার কোন প্রত্যক্ষ দায় থাকে না, তেমনি মোগল বা নবাবি যুগে পাইকাস্ত রায়তগণ ভূমি প্রত্যক্ষভাবে চাষাবাদ করলেও তারা শ্রেণীগতভাবেই যেহেতু ছিল অস্থিতিবান, অর্থাৎ ওঠবন্দি বা ভ্রাম্যমান প্রকৃতির, ফলে তাদেরও ভূমির প্রতি কোন তীব্র আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয় না (!)। কিন্তু

৭৯. বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৩৪।

৮০. বদরুদ্দীন উমর বলেন, '১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রজাস্বত্ব আইন কৃষকদের দুই প্রধান সমস্যা -- জমিদার কর্তৃক ইচ্ছেমতো খাজনাবৃদ্ধি এবং জমি থেকে উচ্ছেদের হাত থেকে তাদের বিন্দুমাত্র রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি।' (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, পৃষ্ঠা ৩৪)।

পর্যালোচ্য সময়ে এই অবস্থার সমূহ পরিবর্তন ঘটেছিল। বিশেষ করে বর্গাদারেরা বছরের পর বছর ভূমি চাষাবাদে রাখা সত্ত্বেও তাদের স্বত্বের প্রশ্নটি উপেক্ষিত হওয়া ছিল নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক ও দুর্ভাগ্যজনক। ফলে এক্ষেত্রে আইনটি ছিল একপেশে ও অসম্পূর্ণ।

অধিকন্তু আলোচ্য আইন প্রচলিত হওয়ার পরও বাংলার ভূমি ও ভূমিরাজস্বসম্পর্কিত বেশ কিছু আইন তদাবধি প্রচলিত[৮১] বা কার্যকর থাকায় (যেমন ১৮৮২ সনের 'সম্পত্তি হস্তান্তর আইন') আলোচ্য আইনে প্রদত্ত ভূমি বিলি-বন্টনের অনেক ধারা-উপধাবা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হতে পারেনি। ড. হক বলেন, 'অত্র আইন বলবৎ হওয়া অবধি জমির খাজনার পরিমাণ নিরূপণে ব্যর্থতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। অত্র আইনটি প্রবর্তনের সময় এমন কিছু আইন প্রচলিত ছিল যাহার জন্য এই আইনটি কার্যকর করার কোন সুযোগ ছিল না। এই আইন দ্বারা উক্ত আইন কোনভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে নাই। মোটকথা এই আইনের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রচলিত আইনের কোন পরিবর্তন সাধন করা হয় নাই। (*এছাড়া*) অত্র আইনে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে চুক্তি আইনের সাধারণ বিধি-বিধান ও ন্যায়-নীতি ও ন্যায় বিচারের নিয়ম অনুসরণের সুস্পষ্ট সম্মতি প্রদান কবা হয় নাই। সুতরাং ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন ছিল না।'[৮২]

তবে আইনের সবচেয়ে অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ ও ফলত অ-স্পৃষ্ট দিক যেটি তা হলো, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের তথাকথিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের নিকৃষ্টতম প্রতিফল বা উপসর্গ হিশেবে ইতোমধ্যে বাংলার আপামর কৃষকসমাজের মাথার ওপর পিরামিডসদৃশ যে সংখ্যাতীত মধ্যস্বত্ব-ভোগী জেঁকে বসেছিল, তাদের অবস্থান বিষয়ে এ আইন বিন্দুমাত্র টু-শব্দ করেনি।

ড. অমলেন্দু দে-র ভাষায় বলতে পারি, '১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আইনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট পত্তনীপ্রথা, যা জমিদার ও কৃষকের মাঝখানে নানা স্বত্বেব (Sub-infeudation) সৃষ্টি করে, তার কোনও পরিবর্তন সাধন করেনি। অর্থাৎ ভূমি ব্যবস্থার মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে রায়তের কয়েকটি অধিকার স্বীকৃত হয়। তাই রায়তের অবস্থার কোনও মৌলিক পরিবর্তন হয়নি।'[৮৩] ড. শঙ্কর কুমার ভৌমিকও বলেন, '... in effective terms, the Bengal Tenancy Act of 1885 could do very little towards altering the prevailing agrarian structure.'[৮৪] তা সত্ত্বেও আমবা নিঃসঙ্কিপ্ন গলায় বলবো যে, 'Yet 1885 marked a decisive turning point in a slow but sure movement towards the strenthening of the property component in the raiyati right and its withering in the zamindari right to land.'[৮৫]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা ভূমিতে জমিদার, তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণকে যে নিরঙ্কুশ অধিকার ও অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রদান করেছিল, ৯-দশক পরে, এই আইনে কৃষি-প্রজাকে প্রদত্ত কিছু কিছু স্বত্বাধিকার প্রদান সামান্য হলেও তার, জমিদারদের সেই অপ্রতিহত

৮১. আলোচ্য আইন বলবৎ হওয়ার পর যে সব প্রচলিত আইন পুরোপুরি বা আংশিক বাতিল হয়েছিল তার তালিকা দেখা যেতে পারে, সংশ্লিষ্ট আইনের তফসিল /১-তে।
৮২. ভূমি আইন ও আলোচনা, পৃষ্ঠা ১৯-২০।
৮৩. বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা ১১৭-১৮।
৮৪. Tenancy Relations and Agrarian Development, pp. 29.
৮৫. Peasant Labour and Colonial Capital: Rural Bengal since 1770, pp 82.

অধিকারের মূলে আঁচড় কাটতে পেরেছিল, সত্যি বলতে এটিই আলোচ্য আইনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

আগে রায়ত এক নাগাড়ে ১২-বছর যাতে কোন ভূমি ভোগ-দখলে রাখতে না পারে সে জন্য জমিদারগণ ঘন ঘন তার পত্তন (পাট্টা) পরিবর্তনের চেষ্টা করতো, বা একই ভূমি একবার একে তো পরের বার অন্যকে দিতে কসুর করতো না (বিহার অঞ্চলে এই প্রবণতা ছিল অত্যধিক)[৮৬], নতুন আইনে জমিদারদের সেই অপচেষ্টা নিরোধ হয়েছিল। ২০ ধারা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিয়েছিল, রায়ত যে গ্রামেই ভূমি ভোগ-দখল করুক না কেন, একাদিক্রমে তা ১২-বছর অতিক্রান্ত হলেই তাতে তার দখলি-স্বত্বাধিকার জন্মাবে। অধ্যাপক জি. আর. খান ও জলিল খান-এর ভাষায় বলতে পারি, "This provision defeated the whims of the zamindars who generally changed the possession of a plot of land from one ryot to another."[৮৭]

সরকারের দিক থেকেও এই আইনের গুরুত্ব ছিল অনেক। বিশেষ করে ১৮৭৫ সালের 'বঙ্গীয় জরিপ আইন' চালু থাকা সত্ত্বেও 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে'র দশম অধ্যায় মূলে সমুদয় ভূমিখণ্ডের স্বত্বের রেকর্ড প্রণয়নের ক্ষমতা যখন সরকারের ওপর অর্পিত হলো, তখন নিজস্ব স্বার্থেই ক্ষমতাসীনরা শুধু খতিয়ান-পর্চা প্রস্তুত করে নিজেদের ভূমিরাজস্ব আয় প্রাপ্তি নিশ্চিত করলো না, তারা বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামে, প্রতিটি ভূমি থেকে ভূমিখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ার দুর্লভ সুযোগও লাভ করেছিল। ড. পাণ্ডা বলেন, "The record of rights made through survey and settlement operations implied that the state machinery now penetrated deep into the country-side. The relevant exercise initiated a tripartite discussion among the settlement officer, the peasants and the proprietors (zamindars) on the information available for entry and questioned the authenticity of the zamindari papers, the usual basis for the rental demand. For the zamindars, this was the first round of a bitter encounter. The Government evidently attributed a great deal of importance to their operation."[৮৮] এদেশকে আরও কাছে থেকে জানতে এবং আরও নিশ্ছিদ্রভাবে শোষণ করতে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাদের পরবর্তীকালে কাজে লেগেছিল।

আসলে, 'Act VIII of 1885, though not professing to be an exhaustive code of the law of landlord and tenant, is nevertheless a .... self-contained enactment so far as the most important agrarian relations are concerned. Since it was passed in 1885, it has undergone various important amendments; but the principles on which the Act was founded have remained unaltered."[৮৯]

১৮৮৫-পরবর্তী সংশোধনীগুলির মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

৮৬. The History of Bengal, pp. 304.
৮৭. An Anatomy of Pak Economy, G.R.Khan & M.A.Jalil Khan, pp. 118.
৮৮. The Decline of the Bengal Zamindars, pp. 14J.
৮৯ Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 88.

১৮৮৫ সালের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' পরবর্তী প্রায় ৬১/৬২ বছর তথা এদেশে ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিন (১৪-১৫ আগস্ট, ১৯৪৭) পর্যন্ত কার্যকর ছিল।[৯০]

এই দীর্ঘ কয়েক দশকে প্রথমত যুগের প্রয়োজনে এবং প্রধানত সরকারি স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে এটি সংশোধিত হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংশোধনী -- ১৮৮৬ সালের ৮নং আইন (স্থায়ী ভূস্বত্ব বা 'tenure' হস্তান্তর সম্পর্কিত মূল আইনের ধারার কিছুটা সংশোধনী), ১৮৯৪ সালের ১নং আইন (স্বত্বের রেকর্ড প্রণয়ন বিষয়ক মূল আইনের ১০ম অধ্যায়ের সংশোধনী), ১৮৯৮ সালের ৩নং আইন (এই সংশোধনী দ্বারা ১০ম অধ্যায়টিকে দু'টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল। রাজস্ব বন্দোবস্ত-হয়েছে এবং বন্দোবস্ত-হয়নি এমন তথ্যসম্বলিত স্বত্বের রেকর্ড প্রণয়ন করে যাতে রাজস্ব অফিসার প্রতিটি কৃষি-প্রজার ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত খাজনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে পারেন সেই বিধান সংযোজিত হয়), ১৯০৭ সালের ১নং আইন (খাজনার হ্রাস-বৃদ্ধিকরণ সম্পর্কিত সংশোধনী), ১৯১৮ সালের ২নং আইন (বীরভূম, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলের আদিবাসী সাঁওতালদের ভূমির সহজ ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা) এবং ১৯১৯ সালের ৩নং আইন (আবওয়াবের মতো 'সেস' আদায়ের অনুমতি)। তবে ১৮৮৫-১৯৪৭ পর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী ছিল ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সালের আইন দু'টিতে।

বস্তুত এই সংশোধনী দু'টি দ্বারা এ যাবৎ কমবেশি সংশোধিত মূল 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে' এমন কিছু পরিবর্তন বা বিধানাবলির অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল যা সময়ের প্রয়োজন সূচিত এবং রায়ত ও কৃষি-প্রজার নির্ভেজাল স্বত্ব ও অধিকার-ই শুধু প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকার করেনি, একই সঙ্গে এ সত্যও উন্মোচিত করেছিল যে, বাংলার আপামর কৃষক সমাজের কাঁধের উপর 'সিন্দাবাদের বৃদ্ধে'র মতো চেপে বসা জমিদার-তালুকদার-পত্তনিদার প্রভৃতি বহুস্তরবিশিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার ও খাজনা আদায়ের নামে শোষণ-নির্যাতনের দিনও শেষ হয়ে আসছে।

যা হোক, একটি কথা বলা দরকার যে, 'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০'-এর প্রণয়ন ও প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী খণ্ডে যেহেতু এটি আমরা সবিস্তার আলোচনার আশা রাখি, সুতরাং ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সালের আইন দ্বারা বিদ্যমান প্রজাস্বত্ব আইনের যে সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছিল তাকেই শুধু নিচে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

১৯২৮ সালের সংশোধনী	১৯৩৮ সালের সংশোধনী
(১) দখলি-স্বত্বাধিকারী রাযতদের (Occupancy ryots) স্বত্ব স্থায়ী ও উত্তরাধিকারযোগ্য ঘোষণা করা হয়। রাযত দখলি ভূমি সম্পূর্ণ বা আংশিক বিক্রি, বন্ধক প্রভৃতি উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবে। তবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উপরস্থ ভূস্বামীকে বিক্রীত মূল্যেব ২০% অথবা	(১) দখলি-স্বত্বাধিকারী রায়তদের ভোগ-দখলি ভূমির বিক্রয়ের ওপর থেকে পার্শ্বোক্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হয়, অর্থাৎ তাদের এ ধরনের দায়মুক্তি ঘটেছিল। ভূস্বামীর অগ্র-ক্রয়াধিকার বাতিল হয় এবং উক্ত অধিকার সংশ্লিষ্ট ভূমির অংশীদারদের দেয়া হয়।

৯০. শুধু তাই নয়, সত্য কথা এই যে, বাংলাদেশের পরবর্তী বিখ্যাত প্রজাস্বত্ব আইন --'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০' প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা চালু ছিল।

	তৎকর্তৃক দেয় খাজনার ৫ গুণ অর্থ দিতে হবে। অন্যদিকে ভূস্বামী সমুদয় বিক্রয় মূল্য ও তাব ওপর ১০% অতিরিক্ত অর্থ ক্রেতাকে প্রদান সাপেক্ষে রায়তেব বিক্রীত ভূমি অগ্র-ক্রয় (Pre-emption) কবতে পারবে। জোতেব অংশবিশেষ বিক্রি হলে ভূস্বামী তাব ওপব ফি ধার্য করাব অধিকাবী হবে।		
(২)	দখলি-স্বত্বাধিকাবী বাযত এককালীন ১৫-বছবের অধিক কোন ভূমি খাই-খালাসি বন্ধক রাখতে পারবে না।	(২)	খাই-খালাসি বন্ধকেব ক্ষেত্রে পার্শ্বোক্ত ১৫-বছরের সময়-সীমা তুলে নেয়া হয়।
(৩)	দখলি-স্বত্বাধিকাবী রায়ত ভূমিজ দ্রব্যের সকল প্রকার ভোগ-ব্যবহাব, যেমন গাছ লাগানো, পুকুব খনন, ফুল ও ফল ভোগ ইত্যাদি (আগেই আলোচিত) করতে পারবে।	(৩)	বকেয়া খাজনা আদায়কালে ৬.২৫% হারে সুদ ধার্য করার বিধান সংযোজিত হয়; তবে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধার্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
(৪)	দ্রব্যে প্রদত্ত খাজনাব নগদ অর্থে গণনা বা পরিবর্তনকরণ প্রবণতা বোধ করা হয়।	(৪)	দাখিলা প্রদান ব্যতিরেকে খাজনা আদায় নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য করা হয়।
(৫)	অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে ৩টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে অধীন বা কোর্ফা বায়তদেরকে ভূমিতে স্বত্বাধিকার দেযা হয়।	(৫)	মাবওয়াব গ্রহণ শুধু বে-আইনিই ঘোষণা করা হয়নি, উপরন্তু তা শাস্তিযোগ্য অপরাধও করা হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, যদিও বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা শুরু হয়েছিল ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের 'বঙ্গীয় খাজনা আইন' দিয়ে এবং শেষ হচ্ছে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫' এর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সংশোধনী (১৯৩৮ সালের আইন) দ্বারা, তথাপি একটি সত্য নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হবে যে, 'During the period (1859-1938) ... , the main provisions of Permanent Settlement were kept intact while, some alterations were made to improve the conditions of various classes of ryots without touching the basic problem, namely the abolition of Permanent Settlement.'[৯১]

৯১. An Anatomy of Pak Economy, pp. 121.

সপ্তম অধ্যায়

ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অবকাঠামো (১৭৯৩-১৯৪৭)

শুরুতেই বলে রাখা দরকার, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর, 'কর্নওয়ালিস-কোড' মারফত ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের যে মূল অবকাঠামো কর্নওয়ালিস দাঁড় করিয়ে গিয়েছিলেন, তৎ-পরবর্তী সকল গভর্নর-জেনারেলই সেটা কমবেশি অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন, অন্তত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর সেই মৌলিক পরিকাঠামোর ওপর পরবর্তী শাসকশ্রেণী[1] যুগের প্রয়োজনে ও প্রধানত সুষ্ঠু রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে যে সব সংস্কার বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন, তার মধ্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার ছিল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের। 'Report on the Administration of Bengal (1921-22)'-এ বলা হয়েছেঃ 'The system introduced by Cornwallis ..... lasted during successive administrations, with only the necessary modifications engrafted on it by time and circumstances; but under Lord William Bentinck extensive changes were again effected.'[2]

১৭৯৩-উত্তর বাংলার ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামো বলতে তাই আমরা বুঝি লর্ড মার্কুইস কর্নওয়ালিস ও লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিস বেন্টিঙ্কের এক মহৎ যৌথ সৃষ্টিকে।

তবে অবশ্যই স্বীকার্য যে, এই ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোর মধ্যে সাধারণ প্রশাসন ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসন মৌলত একীভূত ছিল অর্থাৎ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগ বা স্তরগুলি একই সঙ্গে দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার পাশাপাশি ভূমিরাজস্ব প্রশাসনেরও দায়িত্ব-কর্তব্য নির্বাহ করতো (নিতান্ত দু'একটি ক্ষেত্রে কোন কোন বিভাগ ভূমিরাজস্ব, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে 'রাজস্ব' নিয়ে কাজ করতো, যেমন 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'); ফলে এখানে যে আলোচনা করা হবে তা অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ প্রশাসনেরও আলোচনা বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে আমরা চেষ্টা করবো বর্তমান আলোচনা ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অবকাঠামোর স্তরেই যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ রাখতে।

এখানে গোটা অধ্যায়কে মোটামুটি কয়েকটি উপ-শিরোনামে বিভক্ত (প্রশাসনিক স্তরওয়ারি) করে আলোচনার চেষ্টা করবো। যথা -- (ক) কেন্দ্রীয় প্রশাসনযন্ত্র বা সাধারণ ও ভূমিরাজস্ব

---

১ ১৭৯৩-পরবর্তী তথা লর্ড কর্নওয়ালিস-এর যুগ থেকে শুরু করে বাংলা বা ভারতের শেষ গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন পর্যন্ত প্রায় ৫০ জন (কর্নওয়ালিস-এর দ্বিতীয়বারের শাসন ও ভারপ্রাপ্তদের দায়িত্বকাল নিয়ে) ব্রিটিশ শাসক এদেশ শাসন করেছিলেন। (দেখুন, A History of India, Michael Edwardes, pp. 326-27).

২ pp. 52. আরও দেখুন, A Constitutional History of India (1600-1935), Dr Arthur Berriedale Keith, pp. 125.

প্রশাসনের মূল[৩] নীতি-নির্ধারক স্থানীয় প্রধান কর্তৃপক্ষ বা গভর্নর-জেনারেল ও তদীয় কাউন্সিল (Governor-General and his Council); (খ) বোর্ড অফ রেভেন্যু (Board of Revenue); (গ) বিভাগীয় স্তর বা কমিশনার-এর দপ্তর (Division and the Commissionerate) ও (ঘ) জেলা স্তর বা কালেক্টরের দপ্তর (District and Collectorate, the District Officer or Collector/ Collector and Magistrate or Magistrate and Collector/ Deputy Commissioner).

গভর্নর-জেনারেল ও তদীয় কাউন্সিল

এ পর্যায়ে আমরা মূলত উপস্থাপন করতে চেষ্টা করবো ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় কুঠির অধ্যক্ষ শুরুতে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের মুখ্যাধিকারিকরূপে দায়িত্ব পালন করলেও, পরবর্তীকালে 'পদবি' পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্রের (Powers and jurisdiction) যে বিবর্তন ঘটেছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু ধারাবাহিক ইতিহাস। অবশ্য ১৭৯৩-পরবর্তী এই পরিবর্তন-পরিবর্ধন আলোচনায় প্রাক-সূত্র হিশেবে ১৭৯৩-পূর্ব সময়ের প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্যও তুলে ধরা জরুরি হবে (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আগে হয়েছে)।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের 'নিয়ন্ত্রক আইন' এবং ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিটস-এর 'ভারত আইন' বলেই আনুষ্ঠানিকভাবে এদেশে ব্রিটিশ কেন্দ্রীয় ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের মুখ্যাধিকারিক বা গভর্নর-জেনারেলের পদবি ও ক্ষমতা-বলয়ের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।[৪] উল্লেখ্য যে, এ যাবৎ যারা[৫] এই দায়িত্ব পালন করেন তারা একই সঙ্গে বাংলা, বিহার ও ওড়িশা (ওড়িশার ভূখণ্ড ছিল নামেমাত্র) -- এই ৩ মোগল-সুবার অধিক্ষেত্রভুক্ত ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের ওপর এক্তিয়ার প্রয়োগ করলেও, তাদের সরকারি পদবি ছিল 'গভর্নর', মূলত 'বাংলার গভর্নর' (Governor of Bengal)।[৬] এমতাবস্থায় 'নিয়ন্ত্রক আইন' শুধু কোম্পানির গঠনতন্ত্রই পরিবর্তিত করলো না, একই সঙ্গে তা গভর্নরের পদবি পাল্টে নতুন অভিধা দিলো 'Governor-General of the Fort William in Bengal' এবং '... in conjunction with his Council of four other members, he was entrusted with the duty of superintending and controlling the Governments of Madras and Bombay, so far as

---

৩. 'মূল' শব্দটিকে এখানে আপেক্ষিক অর্থে নিতে হবে। এটা ঠিক যে, বাংলা ও ভারতে অনুসরণীয় কোম্পানির নীতি-নির্ধারণী যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূল নির্দেশনা বা 'guide line' দিতো ইংল্যান্ডস্থ কোম্পানির প্রভূত ক্ষমতাধর 'কোর্ট অফ ডিরেক্টরমণ্ডলী', তথাপি স্থানীয়ভাবে প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের প্রতীক গভর্নর বা গভর্নর-জেনারেল পদাধিকারীকেই আমরা এখানে মূল নীতি-নির্ধারক কর্তৃপক্ষ হিশেবে বর্ণনা করার পক্ষপাতী।

৪ A History of India, Vol. 2, Dr. Percival Spear, pp 94.

৫. এরা হলেন -- (১) লর্ড ক্লাইভ (১৭৬৫-১৭৬৭), (২) হেনরি ভেরেলস্ট (১৭৬৭-১৭৬৯), (৩) জন কার্টিয়ার (১৭৬৯-১৭৭২) ও (৪) ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৭৪)।

৬ The Imperial Gazetteer of India · The Indian Empire (Historical), Vol. II., pp. 514

৭. ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, এ কে এম আবদুল আলীম, পৃষ্ঠা ৩৯৭।

regarded questions of peace and war; ... a power of making rules, ordinances, and regulations was conferred upon the Governor-General and his Council."[৮] অন্যদিকে, 'Pitt's Act of 1784, ... established the Board of Control in England, vested the administration of each of the three Presidencies in a Governor and three Councillors, including the Commander-in-Chief of the Presidency army. At the same time the control of the Governor-General-in-Council over Madras and Bombay was somewhat extended..."[৯]

কাগজে-পত্রে অন্য দু'টি প্রেসিডেন্সির ওপর বাংলার গভর্নরের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়লেও বাস্তবে তা প্রধানত মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের তৎকালীন গভর্নর ও তার কাউন্সিলরদের অসহযোগিতামূলক মনোভাব এবং দূরত্বের দরুণ কার্যকর হতে পারেনি। ফলে গভর্নর-জেনারেল হয়েও একার্থে তিনি ছিলেন বাংলা সুবা'রই গভর্নর। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের 'Charter Act' দ্বারা কোম্পানির বাংলা ও ভারতবর্ষীয় অধিক্ষেত্র ও স্থাপনাসমূহের (Acquisitions) উপর ইংল্যান্ডের রাজা/রাণীর একচ্ছত্রাধিপত্য ও 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল'-এর ক্ষমতা-বলয় সম্প্রসারিত হয়েছিল।[১০] তবে সত্যি কথা বলতে ১৮৩৩ সালের আগ পর্যন্ত 'Governor-General'-এর পদ-পদবির প্রকৃত গুরুত্ব তেমন দৃষ্টিগোচর ছিল না। 'The Charter Act of 1833'-ই সর্বপ্রথম 'Governor-General of Fort William in Bengal'-কে 'Governor-General of India'-রূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল।[১১] যে কোন বিবেচনায় এই স্বীকৃতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশাসনিক সংস্কার। কেননা নামে এবং কাজে এখন গভর্নর-জেনারেল প্রকৃতই ব্রিটিশ ভারতের তথা বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এবং অপরাপর কিছু অঞ্চলের[১২] গভর্নর-জেনারেল (এ সময় গভর্নর-জেনারেল ছিলেন লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিস বেন্টিঙ্ক) হয়েছিলেন।

১৮৩৩ সনের সনদ একদিকে যেমন ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পরবর্তী ২০-বছরব্যাপী এদেশে নির্বিঘ্নে বাণিজ্য পরিচালনা ও অধিকৃত অঞ্চলসমূহ ইংল্যান্ডের রাজা/রাণীর পক্ষে শাসন করার[১৩] অধিকার দিয়েছিল, তেমনি গভর্নর-জেনারেল-কে -- '.... it gave the Governor-General-in-Council a control over the other Presidencies in all points

---

৮ The Imperial Gazetteer of India : The Indian Empire (Historical), Vol. II., pp. 514.

৯. The Imperial Gazetteer of India : The Indian Empire (Administrative), Vol IV., pp. 15

১০. Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 149.

১১. The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 20.

১২. ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'ব্রিটিশ ভারত' বলতে মূলত ৩টি প্রেসিডেন্সিকেই বুঝাতো। এগুলি -- (ক) বাংলা, (খ) মাদ্রাজ ও (৩) বোম্বাই। (দেখুন, A Comprehensive History of India, Vol. Eleven : The Consolidation of British Rule in India, 1818-1858, Ed. Drs. K. K. Datta & V. A. Narain, pp 615). তবে এর সঙ্গে ছোট-বড় কিছু 'নন-রেগুলেশন' অঞ্চল এবং ছিটমহলও ছিল।

১৩. মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ড. আসকার ইবনে শাইখ, পৃষ্ঠা ২৬৯।

relating to the civil or military administration."[১৪]
এখানে 'সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশান' কথাটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়।
ভূমিরাজস্ব প্রশাসন যেহেতু 'সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশান'-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা অংশ, এবং গভর্নর-জেনারেল ছিলেন সেই প্রশাসনের প্রথম ও প্রধান ব্যক্তিত্ব, সুতরাং তার এ সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করলেই এ যুগের ব্রিটিশ কেন্দ্রীয় ভূমিরাজস্ব প্রশাসনযন্ত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে সম্যক অবগত হওয়া যাবে বলে মনে করি।
পদাধিকারবলে গভর্নর-জেনারেল বাংলা (বিহার, ওড়িশা প্রভৃতিসহ), মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের আইনত একচ্ছত্র শাসনাধিপতি হলেও বাস্তবে তার 'general control and supervision'-এর মধ্যে থেকেই মাদ্রাজ ও বোম্বাই শাসিত হতো স্ব স্ব স্থানীয় গভর্নর-কর্তৃক। তাকে সহযোগিতা করতো ৩-জনের একটি পরামর্শক-পর্ষৎ বা কাউন্সিল। অন্যদিকে বাংলা, স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি হলেও যেহেতু 'Governor-General of India'-র সদর-দপ্তর ছিল অবিভক্ত বাংলার কলকাতাস্থ 'ফোর্ট উইলিয়ামে', ফলে এখানে গভর্নর-জেনারেল-কেই 'ex-officio' গভর্নরের দায়িত্ব পালন করতে হতো।[১৫]
উল্লেখ্য যে, ১৭৯৩ থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত বাংলার গভর্নরের অধিক্ষেত্র (Bengal Presidency) বলতে নিম্নবর্ণিত জেলা ও অঞ্চলসমূহকে বুঝাতো।[১৬]

১. সিলেট জেলা ও আসামের গোয়ালপাড়া;
২ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরের অর্ধেকাংশ ও অনুরূপ কিছু এলাকা এবং ওলন্দাজ-ফরাসি-দিনেমার শাসিত উপনিবেশসমূহ ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ জেলা;

---

১৪. The Imperial Gazetteer of India : The Indian Empire (Historical), Vol. II., pp. 514. একই গেজেটীয়ার সিরিজের অন্যত্রও বলা হয়েছেঃ 'The same Act vested the direction of the entire civil and military administration and the sole power of legislation in the Governor-General-in-Council, now for the first time styled 'of India', and defined more precisely the nature and extent of the control to be exercised over the subordinate Governments. These consisted as yet only of Madras and Bombay; but the Act provided for the creation of a Presidency of Agra, which was constituted, in a modified form, as the Lieutenant-Governorship of the North-Western Provinces, in 1836.' [The Imperial Gazetteer of India : The Indian Empire (Administrative), Vol. IV., pp. 15-16]. প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা যায় যে ভূমিরাজস্ব প্রশাসন পরিচালনায় লোক নিযুক্তির ক্ষেত্রে এই সনদের একটি আলাদা গুরুত্ব ছিল -- 'It nominally opened up administrative offices in India to the natives, irrespective of caste, creed, or race.'
[দেখুন, The Imperial Gazetteer of India : The Indian Empire (Historical), Vol. II., pp. 514.]. এ বিষয়ে আরও আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।
১৫. The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 20.
১৬. A Comprehensive History of India, Vol. Eleven, pp. 614.

৩. বিহার ও ছোট বা ছুটিয়া নাগপুর;
৪. ওড়িশার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহ;
৫. অযোধ্যা ব্যতীত বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশ;
৬. দিল্লির সন্নিহিত কিছু অঞ্চল;
৭. ভোঁসলা রাজাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সৌগড় ও নর্বদা (Narbada)।

১৮১৮-পরবর্তী চল্লিশ বছরে (১৮১৮-১৮৫৮) বাংলা প্রেসিডেন্সির সঙ্গে আরও যে সকল অঞ্চল অধিভুক্ত হয়েছিল, সেগুলি[১৭]:-

১. আসাম (১৮২৬), আরাকান ও বর্মি রাজাদের কাছ থেকে হস্তগত 'টেনাসেরিম' (Tenasserim) এলাকা;
২. ১৮২৪ সালে লন্ডনে, ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত ফলতা, চিঁচুড়া, কালিকাপুর, বালাশোর, পাটনা ও ঢাকাস্থ ওলন্দাজ উপনিবেশসমূহ;
৩ বহুল খ্যাত শ্রীরামপুর শহর (১৮৪৫ সালে দিনেমার-রাজার কাছ থেকে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকর্তৃক ক্রীত);
৪. ১৮৩৫ সালে তৎকালীন সিকিম-রাজকর্তৃক কোম্পানির সরকারকে উপহৃত সিকিমের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিটমহল (Enclave), যা পরবর্তীকালে 'দার্জিলিং' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৫০ সাল নাগাদ দার্জিলিঙের দক্ষিণের কিছু ভূভাগও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল;
৫. সিলেটের কাছাড় (১৮৩২) ও জয়ন্তিয়া[১৮] (১৮৩৫),
৬. সম্বলপুর ও ঝাঁসি (১৮৪৯) এবং নাগপুর (১৮৫৯);
৭. অযোধ্যার নবাবের শাসনাধীন অঞ্চলসমূহ (১৮৫৬);

এ ছাড়াও এই সময়-পর্বে বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয় -- পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (১৮৪৬-৪৯ সালে অধিকৃত) ও নিম্ন-বর্মার পেগু বা মন (১৮৫৩ সালে অধিকৃত)।[১৯]

যা হোক, এ সকল তথ্যাবলি এতো সবিস্তার তুলে ধরার আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, আমরা মূলত দেখাতে চাচ্ছি, পর্যালোচ্য যুগে বাংলার গভর্নরগণ তাদের সাধারণ ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগের জন্য যে সুবিস্তৃত অঞ্চল বা অধিক্ষেত্র লাভ করেছিলেন, এবং এগুলিতে তারা, ইংল্যান্ডস্থ 'কোর্ট অফ ডিরেক্টরস' ও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষে বিভিন্ন সময়ে যে সব প্রথা-পদ্ধতি ও অবকাঠামো প্রবর্তন করেন, বিশেষত জেলা ও বিভাগীয় স্তরে, তার আদত উৎপত্তি-স্থল ও পীঠভূমি ছিল বাংলা।

---

১৭. The Cambridge History of India, Vol. VI, pp. 20; A Comprehensive History of India, Vol. Eleven, pp 614.
১৮ ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে মেজর হেনিকার (Major Henniker)-এর নেতৃত্বে জয়ন্তিয়ায় প্রথম ব্রিটিশ অভিযান প্রেরিত হয়েছিল, তবে তা স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।
(দেখুন, Assam District Gazetteers, Vol. II., Sylhet, B. C. Allen, p. 31).
১৯. A Comprehensive History of India, Vol. Eleven, pp. 614-15

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা প্রেসিডেন্সি [মোটা দাগে তখনও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল আসাম, বারাণসী ও অপরাপর হস্তান্তরিত ও নববিজিত বা ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলসমূহ ("the Ceded and Conquered provinces")] 'Governor-General-in-Council'-এর সরাসরি প্রশাসনিক কর্তৃত্বে ছিল (directly administered)। আগেই দেখিয়েছি ১৮৩৩ সালের 'সনদ' বলে 'Governor of the Presidency of Fort William in Bengal' যখন 'Governor-General of India' হন, এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই -- দু'জন স্বতন্ত্র গভর্নরের অধীনে ন্যস্ত হলেও বাংলা শাসনের ভার গভর্নর-জেনারেল নিজ হাতে রাখেন, তখনই তাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল বাংলা প্রেসিডেন্সির জন্য একজন 'ডেপুটি গভর্নর' নিয়োগ করার।

Buckland বলেন, 'By'... section 69 (of the Statute or the Government of India Act, 1833) the Governor-General-in-Council was authorised, as often as the exigencies of the public service might appear to him to require, to appoint one of the ordinary Members of the Council of India, as he might think fit, to be Deputy Governor, but with no additional salary."[২০]

'ডেপুটি গভর্নর'কে এ ক্ষমতাও দেয়া হয়েছিল -- '.. Deputy Governor ... would be invested with all the powers and perform all the duties of the Government during his (Governor-General) absence."[২১] কিন্তু ততোদিনে বাংলার ভূখণ্ডগত বিশালত্ব ও প্রশাসনিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতা থেকে একজন মাত্র ডেপুটি গভর্নরের পক্ষে সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করা দুঃসাধ্য হওয়ায় নীতি-নির্ধারক মহল বাংলাকে ভাগ করে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছিল।

প্রথম পর্যায়ে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাকে খণ্ডিত করে, 'Fort William in Bengal' ও 'Agra' -এই দুই নামের দু'টি প্রেসিডেন্সিতে বিভক্ত করার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তৎকালীন প্রভাবশালী গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল, স্বনামখ্যাত লর্ড ক্যাভেন্ডিস বেন্টিঙ্কের আপত্তির কারণে ১৮৩৫ নাগাদ তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।[২২] তবে বেন্টিঙ্ক পরের বছর (১৮৩৬) এই প্রস্তাব মেনে নেন। অবশ্য 'Presidency or Government of Agra' নাম বাদ দিয়ে নতুন প্রেসিডেন্সির নাম রাখা হলো 'উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ'[২৩] (The North Western Provinces)। অন্যদিকে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা প্রেসিডেন্সি (Lower Bengal) তো ছিলই। যা হোক, এককথায় বাংলার এই বিভাজন -- 'This reduced the extent of Bengal and paved the way for the better administration of the detached areas."[২৪]

আসলে এভাবেই শুরু হয়েছিল বৃহৎ বাংলাকে খণ্ড-বিখণ্ড করার প্রক্রিয়া।

---

২০ Bengal under the Lieutenant-Governors. Vol. I., pp xi.

২১. Report on the Administration of Bengal (1921-22), pp. 58.

২২. The New Province of Eastern Bengal and Assam, Dr. Molla, pp. 9.

২৩ একে 'The Upper Provinces of Bengal'-ও বলা হতো। (দেখুন, British Paramountcy and Indian Renaissance, Part I., pp. 323).

২৪. The New Province of Eastern Bengal and Assam, pp. 9.

'প্রেসিডেন্সি অফ আগ্রা', বা 'উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ'-এর শাসনের দায়িত্বে একজন 'ছোটলাট' বা 'লেফটেন্যান্ট-গভর্নর' নিযুক্ত করা হয় (২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৬)। একই সঙ্গে বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক কাজকর্ম পরবর্তী দু'-দশক পর্যন্ত 'ডেপুটি গভর্নর'[২৫] দিয়েই চালানো হয়েছিল। এখানে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ১৮৩৭ থেকে ১৮৫৩ পর্যন্ত যারা ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাদের নামোল্লেখ করা হলো। এরা[২৬] --

বাংলার ডেপুটি-গভর্নরগণ (১৮৩৭-১৮৫৩)	
আলেকজান্ডার রস (সিনিয়র)	২০শে অক্টোবর, ১৮৩৭
কর্নেল উইলিয়াম মরিসন	১৫ই অক্টোবর, ১৮৩৮
টমাস ক্যাম্পবেল রবার্টসন	১৭ই জুন, ১৮৩৯
স্যার টমাস হারবার্ট ম্যাডক (নাইট)	২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৫- ১১ই অক্টোবর, ১৮৪৮
মেজর-জেনারেল স্যার জে এইচ লিটলার	১২ই মার্চ, ১৮৪৯
অনারেবল জে এ ডবিন	৯ই ডিসেম্বর, ১৮৫৩

পরবর্তীকালে ১৮৫৩ সালের 'সনদ' (The Charter Act of 1853) দ্বারা আরেকবার বাংলার প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটলো।
এই আইন বা সনদের ১৬ ধারায় 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীকে ক্ষমতা দেয়া হলো --

১. ভারতের গভর্নর-জেনারেলকে, 'গভর্নর অফ দ্য প্রেসিডেন্সি অফ ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল'-এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে (অন্য দু'টি প্রেসিডেন্সির সার্বিক দেখভালও যেহেতু তাকে করতে হতো, ফলে তার কাজের চাপ আগের তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল) তদস্থলে একজন স্বতন্ত্র গভর্নর নিয়োগের; এবং
২. যে পর্যন্ত-না বাংলায় একজন গভর্নর নিয়োগ করা সম্ভব হবে তদাবধি গভর্নর-জেনারেল কোম্পানির কর্মে ১০-বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের মধ্য থেকে লেফটেন্যান্ট-গভর্নর নিযুক্ত করতে পারবেন।[২৭]

---

২৫. পদবিতে 'ডেপুটি গভর্নর' হলেও এদের সরকারি বা আনুষ্ঠানিক পদমর্যাদা (Warrant of Precedence) ছিল মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গভর্নরদের উপরে। বাকল্যান্ড বলেন, 'In the Warrant of Precedence, the Deputy Governor of Bengal came next after the Governor-General, and before the Governors of Madras and Bombay.' (Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. xi.) বাংলা খণ্ডিত হলেও তখনও পর্যন্ত নীতি-নির্ধারকদের কাছে এর মর্যাদা আদৌ হ্রাস পায়নি, এটা তাই প্রমাণ। এই মর্যাদার পিছনে বাংলার রাজস্বের যে একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল তা না বললেও চলে। কারণ তখনও বাংলা থেকে তাদের আয়-রোজগার ছিল ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বা অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং একে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ ছিল না।

২৬ Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp xi

২৭. Ibid., pp xvi-vii.

এই আইন দ্বারা গভর্নর-জেনারেলের ডেপুটি-গভর্নর নিয়োগের ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হয়।[২৮]
যা হোক, বাংলার প্রথম লেফটেন্যান্ট-গভর্নর নিযুক্ত হলেন স্যার ফ্রেডারিক জেম্‌স হ্যালিডে (Sir Frederick James Halliday)।[২৯] ১৮৫৫ সালের ২৬ জানুয়ারিতে জারিকৃত সরকারি প্রজ্ঞাপনে তার ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়েছিল এভাবেঃ 'the authority of the Lieutenant-Governor extended to all matters relating to civil administration previously under the authority of the Governor of Bengal, and that the territorial jurisdiction of the Lieutenant-Governor was co-extensive with the jurisdiction exercised by the Governor of Bengal on the previous 28th April, with the exception of the Tenasserim Provinces and Fort William.'[৩০]
এই সময় (১৮৫৫-৫৬) লেফটেন্যান্ট-গভর্নর-এর অধীনে বাংলা প্রেসিডেন্সি বলতে যে ভূখণ্ড বা ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ বুঝাতো তা এ রকম[৩১] :-

বাংলা (মূলত নিম্ন-বঙ্গ)	৮৫,০০০	বর্গমাইল
ছোট নাগপুর ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তবর্তী করদ-রাজ্যসমূহ	৬২,০০০	"
বিহার	৪২,০০০	"
আসাম	২৭,৫০০	"
ওড়িশার করদ-মহাল	১৫,৫০০	"
আরাকান	১৪,০০০	"
ওড়িশা	৭,০০০	"
মোট ৭টি অংশে বা অঞ্চলে বিভক্ত	২,৫৩,০০০	বর্গমাইল

বলাবাহুল্য বাংলার জন্য স্বতন্ত্র লেফটেন্যান্ট-গভর্নর নিযুক্ত হওয়ায় প্রশাসনিক কাজের গতি ও সুষ্ঠুতা যে অনেক বেড়েছিল তা অনস্বীকার্য। কারণ এ যাবৎ প্রথমে গভর্নর-জেনারেল স্বয়ং এবং ১৮৩৭ থেকে ১৮৫৩ পর্যন্ত যারা ডেপুটি-গভর্নরের দায়িত্ব ভার নির্বাহ করেন, আগেই বলেছি এদের মধ্যে গভর্নর-জেনারেল-কে যেহেতু একই সঙ্গে বাংলার পাশাপাশি মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের

---

২৮. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. xvii.
শুধু তাই নয়, '...and the Governor-General was no longer to be the Governor of the Presidency of Fort William in Bengal.'
(Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. xviii).

২৯. ১২ই অক্টোবর, ১৮৫৩ সালে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীর অনুমোদনে ও 'হোম ডিপার্টমেন্টে'র ২৮শে এপ্রিল, ১৮৫৪ তারিখের ৪১৫ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী তাকে এই নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। [Report on the Administration of Bengal (1921-22), pp, 58].
ঐ তারিখেই তিনি দায়িত্ব বুঝে নেন। (দেখুন, The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 22) যদিও ড. আসকার ইবনে শাইখ, তার দায়িত্ব গ্রহণের দিন উল্লেখ করেছেন, ১লা মে, ১৮৫৪ বলে। (দেখুন, মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, পৃষ্ঠা ২৭০)।

৩০. Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. xviii-xix.

৩১. Ibid., pp. 5.

সার্বিক প্রশাসনিক বিষয়াদিও দেখাশুনা করতে হতো এবং অন্যরা অর্থাৎ গভর্নর-জেনারেলের ডেপুটিরা ছিল নিতান্তই গভর্নর-জেনারেলের আজ্ঞাবহ এবং যখন-তখন প্রত্যাহারযোগ্য, স্বভাবতই এ সময়কালের প্রশাসনের কাজেকর্মে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা তেমন ছিল না। অবশ্য এখানে জবাবদিহিতা বলতে জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধতা বুঝানো হচ্ছে না, বরং শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার উপর কর্তৃপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণহীনতাকেই নির্দেশ করা হচ্ছে।

ফলে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের মতো (এ দু'টিতে ছিল গভর্নর) বাংলায় একজন স্বতন্ত্র লেফটেন্যান্ট-গভর্নর নিযুক্ত হওয়ায় প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনা অপেক্ষাকৃত সহজ হয় এবং প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার কাজে সুষ্ঠুতা অনেকখানি ফিরে এসেছিল।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেন, 'বাংলা দেশের জন্য পৃথক একজন শাসনকর্তার নিয়োগে যে আভ্যন্তরিক শাসন ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ইহার পূর্বে সপারিষদ্ বড়লাট রাজ্যশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেও এ বিষয়ে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারেন নাই। নবনিযুক্ত লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর বা ছোটলাট কেবলমাত্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন, সুতরাং পূর্বাপেক্ষা শাসনকার্য অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন হইত।'[৩২]

এ সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, বাংলা প্রেসিডেন্সির সুবিশাল আয়তন তখনও একজন মাত্র শাসনকর্তার পক্ষে যথাযথ মনোযোগ ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ধীশক্তি আরোপ করে শাসনের যথেষ্ট অনুকূল ছিল না -- 'The position of the Lieutenant-Governor of Bengal is, in many respects, a difficult one. He is charged with the administration of an extensive and highly important Presidency, and has to attend to a vast amount and a great variety of business, without being allowed the assistance of a Council, such as is attached to the Governments of the other Presidencies, or of a Secretariat[৩৩] equal to those of Madras and Bombay. He is, therefore, necessarily overburdened with the details of daily work, and must have less time and less energy to devote to questions which are not absolutely forced upon his attention than the Governors of other Presidencies are able to command.'[৩৪]

অবশ্য পরবর্তী প্রশাসনিক ও অধিক্ষেত্রগত পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার আগে বাংলা ও ভারতে কোম্পানির শাসন-ব্যবস্থায় এক ব্যাপক ও যুগান্তকারী পালাবদল ঘটেছিল।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ -- এই এক শতাব্দীর ব্রিটিশ কালো শাসনে-শোষণে, নিপীড়নে-নিষ্পেষণে

৩২. বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, আধুনিক যুগ, পৃষ্ঠা ৮৮।

৩৩. ১৮৪৩ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সির জন্য প্রথম সেক্রেটারি নিয়োগ শুরু হয়েছিল। (দেখুন, বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৯)। তবে আলোচ্য সময়ে বাংলার 'ডেপুটি-গভর্নর'-এর অধীনে মাত্র ১জন সেক্রেটারি ও ২জন আন্ডার-সেক্রেটারি ছিল।
(দেখুন, Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. xii).

৩৪. Aspects of Administration in Bengal, 1898-1912, Dr. Dipasri Banerjee, pp. 8 উদ্ধৃতি সংগ্রহ, মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, পৃষ্ঠা ২৭১।

ত্যক্ত-বিরক্ত এদেশের জনসমাজের নানা স্তরে যে সুগভীর অসন্তোষ ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তারই চরম বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৮৫৭ সালের ভারতীয় প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে।[৩৫] যদিও সত্য, এই যুদ্ধ ক্ষমতার পালাবদল আদৌ ঘটাতে পারেনি, কিন্তু তা কোম্পানির শাসনের ভিত্‌কে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী ও তাদের স্বদেশি নিয়ন্তাকুল এ কথা খুব ভালোভাবেই টের পেয়েছিল, বিগত একশ বছরে বাংলাসহ ভারতে ব্রিটিশ শাসন-অধিক্ষেত্রের যে বিপুল বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ ঘটেছে তাতে করে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ন্যায় একটি নিতান্ত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর[৩৬] পক্ষে আর তা শাসনের উপযোগী নয়। বরং এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতার আরও কেন্দ্রীভবন, আরও দৃঢ়ীকরণ; একটি নিয়মিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সরকার ছাড়া যা আদৌ সম্ভব নয়। নীতি-নির্ধারকমহল এটা ভালো করেই বুঝতে পারলো।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই অতঃপর ব্রিটিশ সরকার সরাসরি বাংলা তথা ভারতের শাসন ক্ষমতা অধিগ্রহণ করলেন।[৩৭] এ ব্যাপারে রাণীর পক্ষে তৎকালীন ভারতের গভর্নর-জেনারেল, লর্ড ভাইকাউন্ট ক্যানিং, ১লা নভেম্বর, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদের বিশাল দরবার হলে যে 'রাজকীয় ঘোষণাপত্র' পাঠ করেন, তার মূল প্রতিপাদ্য ছিল (ঘোষণাপত্রের ভাষায়)[৩৮]ঃ

'We have resolved ... to take upon ourselves the government of the territories of India , heretofore administered in trust for us by the

---

৩৫. অনেক ঐতিহাসিক একে 'সিপাহি বিপ্লব বা বিদ্রোহ' নামে চিহ্নিত করেছেন, বিশেষত ইংরেজ লেখককুল । এ বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সুযোগ থাকলেও এখানে সে আলোচনা অবান্তর।

৩৬. অবশ্য এ কথা বলা আদৌ ঠিক হবে না যে, এই সময় ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ শুধু কোম্পানির স্বদেশি নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠী তথা 'কোর্ট অফ ডিরেক্টর'মণ্ডলীর হাতেই ছিল। বরং ইত্যবসরে ব্রিটিশ সরকার তাদের ক্ষমতা নানাভাবে সঙ্কুচিত করে কোম্পানির ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ অনেকখানিই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৩৭. প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক P. E Roberts বলেন, 'Thus ended the Honourable East India Company (The Company for purposes of liquidation and legal requirements maintained a formal existence until 1874) , not so much from any special responsibility for the Mutiny, for in political matters it had been for many years absolutely controlled by the state, but because it was felt to be an anarchronism that a private corporation should, even though it were only in name, administer so vast a dominion.'
(History of British India under the Company and the Crown, p. 385).

৩৮. Quoted from, Readings from Indian History, Part II., Ethel R. Sykes, pp. 159-60. এই ঘোষণায় আরও উল্লেখ ছিলঃ 'We desire no extension of our present territorial possessions. ... We declare it to be our Royal will and pleasure that none be in any wise favoured, none molested or disquieted, by reason of their religious faith or observations, but that all shall alike enjoy the equal and impartial protection of the law...' (Readings from Indian History, Part II., pp. 160). সত্যি বলতে পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়গণ মহারাণীর এই ঘোষণার অন্যতম অঙ্গীকার বিশেষত রাজ্য জয় থেকে বিরত থাকা ও প্রজাদের ছলে-বলে-কৌশলে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা থেকে আদৌ বিরত

Honourable East India Company. ... We call upon all our subjects within the said territories to be faithful and to bear true allegiance to us, our heirs and successors. ...'

গভর্নর-জেনারেলের পদবি পরিবর্তিত হয়ে নতুন অভিধা লাভ করলো -- 'গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়' (Governor-General and Viceroy) নামে। ক্যানিংই ছিলেন এই পদের প্রথম অধিকারী।

এ অবস্থায় ১৮৭৪ সালে বাংলাকে আবার খণ্ডিত করা হলো।

উল্লেখ্য উত্তর-দক্ষিণে ৭৫০ ও পূর্ব-পশ্চিমে ৮০০ মাইল চৌহদ্দিবিশিষ্ট যে সুবিস্তৃত ভূখণ্ড বাংলা প্রেসিডেন্সির ছিল, তা থেকে সাড়ে সাতাশ হাজার বর্গমাইলেরও বেশি আয়তনসমন্বিত আসাম[৩৯] কেটে নিয়ে একজন 'চীফ কমিশনার' (Chief Commissioner)-এর অধীনে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ করা হলো।[৪০] শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে জুড়ে দেয়া হলো বাংলাভাষী জেলা শ্রীহট্ট বা সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া।[৪১] ১৮৯৮ সালে একটি ক্ষুদ্র সামরিক ও বেসামরিক কমিটির সুপারিশে লুসাই পর্বতমালাও আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হলো।[৪২] এর ফলে 'চীফ কমিশনার অফ আসাম'-এর অধীনে মোট ভূমির পরিমাণ দাঁড়ালো প্রায় ৪১,৭৯৮ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪১,৩২,০১৯ জন।[৪৩]

সত্যি বলতে, 'From this time the civil history of Bengal, Bihar and Orissa becomes entirely separate from that of the Upper Provinces on the one hand and that of Assam on the other.'[৪৪]

অন্যদিকে বাংলা প্রেসিডেন্সির লেফটেন্যান্ট-গভর্নর-এর নিয়ন্ত্রণে তখনও যে বিস্তৃত ভূখণ্ড ও প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র ছিল, সেটিও নিতান্ত কম ছিল না। ড. এম কে ইউ মোল্লার ভাষায়, 'Even after the separation of Assam, Bengal remained a big and populous province. It embraced Bengal proper, Bihar, Chota Nagpur and Orissa . Altogether Bengal contained , prior to 1905 , 48 districts,

---

ছিল না, তথাপি রাণীর এ ঘোষণার আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব ছিল অনেক।

অধ্যাপক মোজাম্মেল হক যথার্থই বলেন, 'এ ঘোষণা ছিল গুরু গম্ভীর। চমৎকার ভাষায় রচিত, মহত্ত্ব, ন্যায় নীতির ভাবধারায় পুষ্ট, এবং ভারতীয়দের প্রতি বন্ধুত্বের বাণীতে সমৃদ্ধ। ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও জনগণের প্রতি নিশ্চয়তা ও প্রতিশ্রুতিতেও এই ঘোষণা ছিল পরিপূর্ণ।' (বৃটিশ-ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ১৮৫৭-১৯৪৭, পৃষ্ঠা ৫০)।

৩৯. আসাম বলতে তখন মোটামুটি কামরূপ বা কামরূপ, দাররং, নওগং, শিবসাগর; লখিমপুর, গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া ও নাগা পর্বতকে বুঝাতো। (দেখুন, The New Province of Eastern Bengal and Assam, Dr. M. K. U. Molla, pp. 22, fn.)।

৪০. বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, আধুনিক যুগ, পৃষ্ঠা ৯৩।

৪১. Report on the Administration of Bengal (1921-22), pp. 53; বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, মুক্তিসংগ্রাম, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা ২১।

৪২. Report on the Administration of Bengal (1921-22), pp. 53; বৃটিশ-ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ১৮৫৭-১৯৪৭, পৃষ্ঠা ১৯১।

৪৩. The New Province of Eastern Bengal and Assam. pp. 22, fn.

৪৪. Report on the Administration of Bengal (1921-22), pp. 53.

'an area of 189,000 square miles with a population of 78,000,000 and a gross revenue of 7,5000,000 (PS)'. So the question of Bengal's territorial burden remained an issue ...'[৪৫]

সুতরাং নানা কারণে শাসকগোষ্ঠীর বাংলা খণ্ডিতকরণের প্রচেষ্টা তখনও অব্যাহত ছিল। এই প্রক্রিয়ার পরবর্তী সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল বহুল আলোচিত 'বঙ্গ-ভঙ্গ'-এর মাধ্যমে (১৯০৫)। নতুন এই বিভক্তির পক্ষে কর্তৃপক্ষের দিক থেকে সবচেয়ে বড় যুক্তি ছিল -- 'The enormous area included in the province, the growth of the population, the constantly increasing number and complexity of problems pressing for solution, the ever-growing importance of Calcutta, the increasing congestion of business in the Bengal Secretariat, the urgency of new administrative needs and the demands for progress in all directions, all these made increasing calls upon the time and energy of the Lieutenant-Governor, and made it absolutely necessary to grant him some relief.'[৪৬]
কাগজে-পত্রে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে প্রশাসনিক গুরুদায়িত্ব-ভার থেকে পরিত্রাণ দেয়ার কথা বলা হলেও প্রকৃত ঘটনা ছিল রাজনৈতিক।[৪৭] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে না থাকায় এটুকুই শুধু উল্লেখ করা হলো যে, অবিভক্ত বঙ্গ-প্রদেশে হিন্দুদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক একচেটিয়া প্রভাব ক্ষুণ্নকরণ[৪৮] তথা হিন্দু-মুসলমান -- উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে[৪৯] ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ভারতের গভর্নর-জেনারেল

---

৪৫. The New Province of Eastern Bengal and Assam, pp. 22.
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়, 'বঙ্গদেশের অবশিষ্ট অংশের পরিমাণ ছিল ১৮৯,৯০০ বর্গমাইল; ইহার লোকসংখ্যা ছিল সাত কোটি পঁচাশী লক্ষ, এবং ইহার রাজস্বের পরিমাণ ছিল এগারো কোটি টাকারও বেশী।' (বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, মুক্তিসংগ্রাম, পৃষ্ঠা ২১)।

৪৬. Report on the Administration of Bengal (1921-22), pp. 59.

৪৭. ড. এমাজউদ্দীন আহমদ-এর প্রবন্ধ, '১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ : একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ'। (দেখুন ড মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা, ১৯৮১)।

৪৮. অবশ্য ইংরেজ ঐতিহাসিক P. Hardy বঙ্গ বিভাগের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিমের স্থলে বাঙালির বিভক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এক হিশেবে তাঁর বক্তব্যও সঠিক। তিনি বলেন, 'Lord Curzon had not intended to divide Hindus and Muslims, only Bengalis.' (The Muslims of British India, pp. 148).
এর কারণও ছিল। ড. অমলেশ ত্রিপাঠী বলেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরেজ আমলাদের প্রচণ্ড বাঙালি বিদ্বেষ (*মূলত বাঙালিদের ইংরেজ বিরোধী চরমপন্থী আন্দোলনের কারণে*), আর বাংলার ভৌগোলিক এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিজাত অতি জরুরী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা থেকেই এর উদ্ভব।' (ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

৪৯. ড. ইসতিয়াক হুসাইন কুরেশী বলেন, 'Ulterior motives were imputed to Curzon: he had deliberately tried to divide the Hindus and the Muslims by drawing the line between Hindu and Muslim halves of Bengal; he had

ও ভাইসরয়, লর্ড কার্জন (Lord Curzon) বিদ্যমান বাংলা প্রেসিডেন্সি বিভাজনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই বিভক্তি যে কার্জনের একার কীর্তি (!) ছিল না, বরং নীতি-নির্ধারক মহলের দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার ফল ছিল তা নিচের আলোচনা থেকেই বুঝা যাবে।
'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫'-এর অধীনে ১৮৯০ সালে যখন 'কিস্তোয়ার জরিপ' বা 'ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে' চালু হয়েছিল, এবং এক পর্যায়ে তা বাংলার চট্টগ্রাম জেলায় সম্প্রসারিত হয়, এরই শেষ পর্যায়ে জরিপ কাজের স্বার্থের দোহাই দিয়ে ও সেই সঙ্গে মুসলিম-অধ্যুষিত জনসাধারণ একটি একক ভূখণ্ডে বসবাসের সুযোগ পাবে -- এই অজুহাতে চট্টগ্রামের তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার W. B. Oldham, চট্টগ্রামকে ও সেই সঙ্গে ঢাকার কিছু অংশ আসামের সাথে সমন্বিত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন (১৮৯৬)। তার এই প্রস্তাব 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য সমর্থন করেন।[৫০] একই সময়ে আসামের 'চীফ কমিশনার' Sir William Erskine Ward (ইতোমধ্যে এখানে তিনি ৫-বছর কর্মাভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, ১৮৮৫-৮৭, ১৮৯১-৯৬ -- দেখুন, A History of Assam, E. A. Gait, pp. 333), শুধু চট্টগ্রামই নয়, গোটা ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সঙ্গে একীভূত করার প্রস্তাব দেন। এতে করে আসামের আয়তন বা মোট ভূমির পরিমাণ হবে ৮০,৯৫০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ১,৫৫,৭৯,৭৫৬। ওয়ার্ড-এর প্রধান যুক্তি ছিল, '..the enlargement of the province of Assam would make possible the creation of separate services for the provinces."[৫১]
কিন্তু এদের এই পরিকল্পনা বা প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করলেন ওল্ডহ্যাম-পরবর্তী চট্টগ্রামের সবচেয়ে কীর্তিমান বিভাগীয় কমিশনার হেনরি কটন (Sir Henry John Stedman Cotton). অবশ্য তিনিও যে খুব নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বিরোধিতা করেছিলেন তা বলা যাবে না। তবে তাঁর বক্তব্যের মৌল প্রতিপাদ্য ছিল, চট্টগ্রাম একটি অগ্রসর প্রদেশ এবং ব্রিটিশরা অনেক আগে থেকেই এখানে আছে। অপরদিকে আসাম নব-অধিকৃত ও তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকা ভূখণ্ড। সুতরাং এর সঙ্গে চট্টগ্রামের সংযুক্তি অনুচিত। তাছাড়া এটা করা হলে স্থানীয় বিশেষত চট্টগ্রাম ও নিম্নবঙ্গের শিক্ষিত জনসমাজের মধ্যে তা প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। তখনকার মতো বাংলা বিভক্তিকরণ স্থগিত রাখা হয়েছিল।
ইত্যবসরে অবশ্য আরেকটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর স্যার অ্যান্ড্রু

favoured the Muslims by giving them a new province in which they were in a clear majority; he had "vivisected" the Bengali homeland, he had struck a deadly blow at Bengal "nationally"; he had sought to weaken the "nationalist" and "patriotic" movement of the people of India which had its strongest centre in Bengal; he was the upholder of the devilish official policy of divide and rule.'
(The Struggle for Pakistan, Dr. Ishtiaq Husain Qureshi, pp. 26-27).

৫০ Oldham to Government of Bengal, 7th February, 1896; Public Letters, 1897, Letter No. 722G, para 17.

৫১. দেখুন, Chief Commissioner of Assam to Government of India, 25th November, 1896; Public Letters, 1897, No. 583/4930P., paras 2-19.

ফ্রেজার (Sir Andrew Fraser)-এর পক্ষ থেকে। তিনি আসামের সঙ্গে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগকেই শুধু নয়, পাবনা, বগুড়া এবং রংপুরকেও একীভূত করতে বলেন।[৫২]
যা হোক, বাংলা বিভক্তির এই চাপা পড়া বিষয়টি পুনরায় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয় লর্ড কার্জনের সময়ে (১৮৯৮/৯৯-১৯০৫)। ১৯০৩ সালের শেষভাগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সঙ্গীভূত হবে।[৫৩]
কিন্তু 'ইহার ফলে বাংলা যাহাদের মাতৃভাষা তাহারা দুইটি পৃথক দেশের অধিবাসী হইবে -- এই কারণে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হয়। রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ, জমিদারশ্রেণী এবং হিন্দু-মুসলিম (*সঙ্গত কারণে মুসলমানদের বিরোধিতা অবশ্য খুব ব্যাপক ও জোরালো ছিল না*[৫৪]) নির্বিশেষে বাংলার জনসাধারণ সকলেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সমগ্র দেশে, নগরে ও গ্রামে সভা সমিতিতে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হয়।'[৫৫]
প্রসঙ্গত এখানে এই সময়কার বাংলার প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। বস্তুত একাধিকবার খণ্ডিত হলেও, এ পর্যায়ে বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গমাইল ও জনসংখ্যা কমবেশি ৭ কোটি ৮০ লক্ষের মতো। কিন্তু প্রধানত প্রশাসনিক কর্মব্যস্ততা ও রাজধানী (কলকাতা) হতে দূরত্বের কারণে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরগণ তাদের ৫-বছরের কর্মকালে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বিভাগীয় সদরে বছরে দু'একবার যেতে সক্ষম হলেও পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের অন্যত্র বিশেষত জেলা শহরগুলিতে তাদের পদার্পণ ঘটতো নিতান্ত কালে-ভদ্রে। এতে করে পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের প্রশাসন একদিকে যেমন উপেক্ষিত হচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনি পূর্ব-বাংলার পশ্চাদপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অরক্ষিত নদীপথে সংগঠিত জলদস্যুদের উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায়[৫৬] ঢাকাকেন্দ্রিক প্রশাসনের সদর-দপ্তর প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।[৫৭] অবশ্য এ থেকে ধারণা করা ঠিক হবে না যে শাসকশ্রেণী

৫২ The New Province of Eastern Bengal and Assam, pp. 36.

৫৩. কার্জনের মূল পরিকল্পনায় বাংলার বিদ্যমান জনসংখ্যা ৭,৮৫,০০,০০০ থেকে ৬,০০,০০,০০০ করার প্রস্তাব ছিল। (দেখুন, Britain and Muslim India, K. K. Aziz, pp. 36).

৫৪. বাংলার মুসলমানদের এই আন্দোলনে সাড়া না দেয়ার মুখ্য কারণ, নতুন বঙ্গ-বিভক্তিতে যেহেতু ঢাকাকে রাজধানী করে প্রদেশ গঠিত হবে এতে প্রদেশে তাদের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতাই শুধু থাকবে না (মোট ৩ কোটি ১০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা হবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ, হিন্দু ১ কোটি ১৫ লক্ষ ও অবশিষ্ট অন্যান্য -- Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Eastern Bengal and Assam, pp. 7), উপরন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা লাভের পথও সুগম হবে বলে তারা মনে করেছিলেন।

ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম বলেন, 'In this province the Muslims formed an overwhelming majority and saw a better chance for their progress.' (A Short History of Pakistan, Book Four, pp. 168).

৫৫. বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড মুক্তিসংগ্রাম, পৃষ্ঠা ২১-২২।

৫৬. Dr. A. R Mallick's article, The Muslims and the Partition of Bengal, in, A History of the Freedom Movement, Vol. III., Part I., pp. 1-2; The Bengal Muslims (1871-1906), Dr. Rafiuddin Ahmed, pp. 179.

৫৭. কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বঙ্গভঙ্গের মুখ্য কারণ 'প্রশাসনিক' হিশেবে উল্লেখ করা হলেও এবং অনেক আধুনিক লেখক বিশেষত হিন্দু ঐতিহাসিকগণ তা অস্বীকার করার চেষ্টা করলেও

পুরোপুরি সেই প্রয়োজন থেকে বাংলা বিভাজনের তাড়না অনুভব করেছিল।
হিন্দুদের প্রবল ও সক্রিয় বিরোধিতা সত্ত্বেও লর্ড কার্জনের সরকার (প্রকৃতপক্ষে কার্জন এই সময় ইংল্যান্ডে ছুটিতে যাওয়ায় ভারপ্রাপ্ত গভর্নর-জেনারেল অ্যাম্পটহিলের) ১৯০৫ সালের[৫৮] ১৬ই অক্টোবর[৫৯] (৩০শে আশ্বিন, ১৩১২ সন) বঙ্গ-ভঙ্গ আইনানুসারে কার্যে পরিণত করলো -- '... in spite of a vigorous popular demonstration against the change, the new Province of Eastern Bengal and Assam, with Dacca as its capital, was constituted by combining Assam with fifteen Districts of the old Province of Bengal, under a Lieutenant-Governor.'[৬০]
প্রধানত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহি বিভাগ নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ, এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগ, বিহার ও ওড়িশা নিয়ে গঠিত হয়েছিল বাংলা প্রদেশ।[৬১] পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মূল

কর্তৃপক্ষের এই যুক্তি একেবারেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। ড. মুনতাসীর মামুন বলেন, 'বঙ্গ বিভাগ করার পেছনে প্রশাসনিক যে যুক্তিগুলো সিভিলিয়ানরা উল্লেখ করেছেন তা একেবারে যুক্তিহীন নয়।' (দেখুন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া, পৃষ্ঠা ১৪)।

ড. মুজাফফর আহমেদ চৌধুরীও বলেন, 'It was primarily an administrative measure.' (Government and Politics in Pakistan, pp. 53). আরও দেখুন, ড. রফিউদ্দিন আহমেদ (The Bengal Muslims, 1871-1906 : A Quest for Identity, pp. 179), ড. মুঈন-উদ-দীন আহমেদ (Muslim Struggle for Freedom in Bengal : From Plassey to Pakistan, A.D. 1757-1947), কমরুদ্দীন আহমদ (The Social History of East Pakistan, pp. 1), ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম (The Muslim Society and Politics in Bengal, 1757-1947, pp. 213), ড. প্রদীপ কুমার লাহিড়ী (Bengal Muslim Thought, 1818-1947, pp. 69), ড. এনায়েতুর রহিম (Provincial Autonomy in Bengal, 1937-1943, pp. 5) প্রভৃতি।

৫৮. সায়্যিদ শরিফুদ্দিন পীরজাদা সম্পাদিত 'Foundations of Pakistan, All-India Muslim League Documents : 1906-1947, Vol. I.' গ্রন্থে (pp. xxxii) বঙ্গ-ভঙ্গের সন হিশেবে অক্টোবর, ১৯০৬ সালের উল্লেখ করা হয়েছে, যা সঠিক নয়।

৫৯. Britain and Muslim India, K. K. Aziz, pp. 37; The British Raj in India: An Historical Review, Dr. S. M. Burke and Salim Al-Din Quraishi, pp. 109; History of India's Freedom Movement (1757-1947), Dr. Oneil Biswas, pp. 70; The New Province of Eastern Bengal and Assam, pp. 51; বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, মুক্তিসংগ্রাম, পৃষ্ঠা ৩৪।

৬০ The Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire, Vol. II. (Historical), pp. 529.

৬১. বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, মুক্তিসংগ্রাম, পৃষ্ঠা ২৩-২৪।

Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Eastern Bengal and Assam, (pp. 1)-এর ভাষায়ঃ 'The Province of Eastern Bengal and Assam consists of the territories formerly administered by the Chief Commissioner of Assam, to which have been added the Dacca and Chittagong Divisions, together with the Districts of Rajshahi, Dinajpur, Jalpaiguri, Rangpur, Bogra, Pabna, and Malda.'

প্রশাসনিক অবকাঠামো গঠিত হয়েছিল একজন লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে একটি আইন-পর্ষৎ (Legislative Council), ২-সদস্যবিশিষ্ট 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' এবং কলকাতা হাইকোর্ট সমন্বয়ে (হাইকোর্টের ওপর বঙ্গ-ভঙ্গ আইনের কোন কার্যকারিতা ছিল না")।
পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের নতুন সীমা-পরিসীমা চিহ্নিত হলো এভাবে -- '..It is bounded on the south by the Bay of Bengal; on the east by the territories under the administration of the Lieutenant-Governor of Burma and by hilly country inhabited by independent tribes; on the north by the Himalayas; and on the west by the Madhumati river up to the point where it breaks off from the Ganges, and thence by the Ganges up to Sahibganj. From that point the boundary runs along the western border of Malda, Dinajpur, and Jalpaiguri Districts to the foot of the Himalayas."[৬৩] কিছু কিছু পার্বত্য এলাকা, টিলা প্রভৃতি উঁচু ভূমির কথা বাদ দিলে, এককথায়, 'The province was almost a level expanse, well-watered by numerous rivers, with a rise of level here and there."[৬৪]
এখানে পূর্ববাংলা ও আসাম, এবং বাংলা (বেঙ্গল প্রপার)-এর লেফটেন্যান্ট-গভর্নরশিপের অধীনে পরবর্তী প্রশাসনিক পরিবর্তন (এটিকে একত্রীকরণ বলাই ভালো) অবধি (১৯১১-১২) মূল বাংলা ভূখণ্ডের ও এর বাইরেব যে কিছু অ-বাংলাভাষী জনসমষ্টি-অধ্যুষিত অঞ্চল (যেমন ভুটান প্রভৃতি) অঙ্গীভূত হয়েছিল (১৯০৯ পর্যন্ত), তার একটি তালিকা তুলে ধরা হলো --

পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ			
রাজশাহি বিভাগের জেলাসমূহ	আয়তন (বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা (আদমশুমারি ১৯০১ অনুসারে)	সেসসহ ১৯০৩-৪ সালের ভূমিরাজস্ব দাবি
রাজশাহি	২,৫৯৩	১৪,৬২,৪০৭	১২,২২,০০০
দিনাজপুর	৩,৯৪৬	১৫,৬৭,০৮০	১৬,৮৭,০০০
জলপাইগুড়ি	২,৯৬২	৭,৮৭,৩৮০	৯,০৮,০০০
মালদহ বা মালদা	১,৮৯৯	৮,৮৪,০৩০	৫,০৩,০০০
রংপুর	৩,৪৯৩	২১,৫৪,১৮১	১৩,১৬,০০০
বগুড়া	১,৩৫৯	৮,৫৪,৫৩৩	৬,০৫,০০০
পাবনা	১,৮৩৯	১৪,২০,৪৬১	৫,২১,০০০
৭টি জেলার মোট	১৮,০৯১	৯১,৩০,০৭২	৬৭,৬২,০০০

৬২ Muslim Community in Bengal (1884-1912), Dr. Sufia Ahmed, pp. 237; The Muslim Society and Politics in Bengal (1757-1947), Dr. Muhammad Abdur Rahim, pp. 212.
৬৩. Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Eastern Bengal and Assam, pp. 1-2.
৬৪. The New Province of Eastern Bengal and Assam, pp. 51.

পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ

ঢাকা বিভাগের জেলাসমূহ	আয়তন (বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা (আদমশুমারি ১৯০১ অনুসারে)	সেসসহ ১৯০৩-৪ সালের ভূমিরাজস্ব দাবি
ঢাকা	২,৭৮২	২৬,৪৯,৫২২	৭,২৭,০০০
ময়মনসিংহ	৬,৩৩২	৩৯,১৫,০৬৮	১২,৭৩,০০০
ফরিদপুর	২,২৮১	১৯,৩৭,৬৪৬	৭,৫১,০০০
বাকেরগঞ্জ বা বরিশাল	৪,৫৪২	২২,৯১,৭৫২	২১,৬০,০০০
৪টি জেলার মোট	**১৫,৯৩৭**	**১,০৭,৯৩,৯৮৮**	**৪৯,১১,০০০**
চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহ			
ত্রিপুরা (কুমিল্লা)	২,৪৯৯	২১,১৭,৯৯১	১৩,৪৫,০০০
নোয়াখালি	১,৬৪৪	১১,৪১,৭২৮	৮,৩২,০০০
চট্টগ্রাম	২,৪৯২	১৩,৫৩,২৫০	১৩,২২,০০০
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৫,১৩৮	১,২৪,৭৬২	**
৪টি জেলার মোট	**১১,৭৭৩**	**৪৭,৩৭,৭৩১**	**৩৪,৯৯,০০০**
সুরমা উপত্যকা ও পাহাড়ি জেলাসমূহ			
সিলেট বা শ্রীহট্ট	৫,৩৮৮	২২,৪১,৮৪৮	১০,৯০,০০০
কাছাড়	৩,৭৬৯	৪,৫৫,৫৯৩	৫,১৪,০০০
লুসাই পাহাড়ি এলাকা	৭,২২৭	৮২,৪৩৪	৩০,০০০ (গৃহকরসহ)
নাগা পাহাড়ি এলাকা	৩,০৭০	১,০২,৪০২	৫৮,০০০ (গৃহকরসহ)
খাসিয়া ও জৈন্তিয়া	৬,০২৭	২,০২,২৫০	৩৭,০০০ (গৃহকরসহ)
৫টি জেলার মোট	**২৫,৪৮১**	**৩০,৮৪,৫২৭**	**১৭,২৯,০০০**
আসাম উপত্যকা বিভাগের জেলাসমূহ			
গোয়ালপাড়া	৩,৯৬১	৪,৬২,০৫২	১,৮০,০০০
কামরূপ	৩,৮৫৮	৫,৮৯,১৮৭	১৩,৫১,০০০
দাররাং	৩,৪১৮	৩,৩৭,৩১৩	৭,৮২,০০০
নওগং	৩,৮৪৩	২,৬১,১৬০	৫,১০,০০০
শিবসাগর	৪,৯৯৬	৫,৯৭,৯৬৯	১৫,৬৩,০০০
লখিমপুর	৪,৫২৯	৩,৭১,৩৯৬	৬,৪৯,০০০
৬টি জেলার মোট	**২৪,৬০৫**	**২৬,১৯,০৭৭**	**৫০,৩৫,০০০**
দেশি রাজ্যসমূহ			
পার্বত্য ত্রিপুরা	৪,০৮৬	১,৭৩,৩২৫	২,৭৮,০০০
মণিপুর	৮,৪৫৬	২,৮৪,৪৬৫	৩,৯৫,০০০

সূত্র : Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Eastern Bengal and Assam, Calcutta, 1909 (USHA 1989).

বাংলা বা বেঙ্গল প্রপার (বিহার ও ওড়িশাসহ)

বর্ধমান বিভাগের জেলাসমূহ	আয়তন (বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা (আদমশুমারি ১৯০১ অনুসারে)	সেসসহ ১৯০৩-৪ সালের ভূমিরাজস্ব দাবি
বর্ধমান	২,৬৮৯	১৫,৩২,৪৭৫	৩৫,৩৫,০০০
বীরভূম	১,৭৫২	৯,০২,২৮০	১১,৫৮,০০০
বাঁকুড়া	২,৬২১	১১,১৬,৪১১	৫,৭২,০০০
মেদিনীপুর	৫,১৮৬	২৭,৮৯,১১৪	২৮,০২,০০০
হুগলি	১,১৯১	১০,৪৯,২৮২	১৫,৮৭,০০০
হাওড়া	৫১০	৮,৫০,৫১৪	হুগলি কালেক্টরেটে একত্রে প্র। ত্ত
৬টি জেলার মোট	**১৩,৯৪৯**	**৮২,৪০,০৭৬**	**৯৬,৫৪,০০০**
প্রেসিডেন্সি বিভাগের জেলাসমূহ			
২৪-পরগণা	৪,৮৪৪	২০,৭৮,৩৫৯	২০,৩২,০০০
কলকাতা	৩২	৮,৪৭,৭৯৬	১৮,০০০
নদীয়া	২,৭৯৩	১৬,৬৭,৪৯১	১০,৯৪,০০০
মুর্শিদাবাদ	২,১৪৩	১৩,৩৩,১৮৪	১২,১৪,০০০
যশোহর	২,৯২৫	১৮,১৩,১৫৫	১০,৬০,০০০
খুলনা	৪,৭৬৫	১২,৫৩,০৪৩	৯,২৪,০০০
৬টি জেলার মোট	**১৭,৫০২**	**৮৯,৯৩,০২৮**	**৬৩,৪২,০০০**
পাটনা (বিহার) বিভাগের জেলাসমূহ			
পাটনা	২,০৭৫	১৬,২৪,৯৮৫	১৯,৫৮,০০০
গয়া	৪,৭১২	২০,৫৯,৯৩৩	১৯,৫৪,০০০
শাহাবাদ	৪,৩৭৩	১৯,৬২,৬৯৬	২১,৬২,০০০
সারণ	২,৬৭৪	২৪,০৯,৫০৯	১৬,২২,০০০
চম্পারণ	৩,৫৩১	১৭,৯০,৪৬৩	৬,৮৯,০০০
মুজাফ্ফরপুর	৩,০৩৫	২৭,৫৪,৭৯০	১৩,৬৪,০০০
দ্বারভাঙ্গা	৩,৩৪৮	২৯,১২,৬১১	১২,৯৩,০০০
৭টি জেলার মোট	**২৩,৭৪৮**	**১,৫৫,১৪,৯৮৭**	**১,১০,৪২,০০০**
ভাগলপুর বিভাগের জেলাসমূহ			
মুঙ্গের	৩,৯২২	২০,৬৮,৮০৪	১১,৯৫,০০০
ভাগলপুর	৪,২২৬	২০,৮৮,৯৫৩	৯,৩১,০০০
পূর্ণিয়া	৪,৯৯৪	১৮,৭৪,৭৯৪	১৪,১১,০০০
দার্জিলিং	১,১৬৪	২,৪৯,১১৭	২,০৯,০০০
সাঁওতাল পরগণা	৫,৪৭০	১৮,০৯,৭৩৭	৩,৮৪,০০০
৫টি জেলার মোট	**১৯,৭৭৬**	**৮০,৯১,৪০৫**	**৪১,৩০,০০০**

ওড়িশা বিভাগের জেলাসমূহ			
কটক	৩,৬৫৪	২০,৬২,৭৫৮	১৩,৯১,০০০
বালাশোর	২,০৮৫	১০,৭১,১৯৭	৭,৩০,০০০
আঙ্গুল	১,৬৮১	১,৯১,৯১১	৮৭,০০০
পুরী	২,৪৯৯	১০,১৭,২৮৪	৭,৯৭,০০০
সম্বলপুর	৩,৮৫১	৬,৫৯,৯৭১	১,৮৬,০০০
৫টি জেলার মোট	১৩,৭৭০	৫০,০৩,১২১	৩১,৯১,০০০
ছোট নাগপুর বিভাগের জেলাসমূহ			
হাজারিবাগ	৭,০২১	১১,৭৭,৯৬১	২,৪৬,০০০
রাঁচি	৭,১২৮	১১,৮৭,৯২৫	১,৬৫,০০০
পালামৌ	৪,৯১৪	৬,১৯,৬০০	১,৭১,০০০
মানভূম	৪,১৪৭	১৩,০১,৩৬৪	২,২২,০০০
সিংহভূম	৩,৮৯১	৬,১৩,৫৭৯	১,৬৪,০০০
৫টি জেলার মোট	২৭,১০১	৪৯,০০,৪২৯	৯,৬৮,০০০
দেশিরাজ্য ও বিদেশি উপনিবেশসমূহ			
কুচবিহার	১,৩০৭	৫,৬৬,৯৭৪	১৩,৬৬,০০০(ভূমিকর)
ওড়িশার করদ মহাল	১৪,৩৮৭	১৯,৪৭,৮০২	******
ছোট নাগপুর	৬০২	৩৬,৫৪০	৮৯,০০০
সিকিম	২,৮১৮	৫৯,০১৪	৬১,০০০(১৯০২-৩)
ভুটান			
ফরাসি উপনিবেশ	২০৩	২,৭৩,১৮৫	

সূত্র : Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Bengal, Vol. I & II, Calcutta, 1909.

সরকারি দৃষ্টিকোণ থেকে মূলত প্রশাসনিক কারণে[৬৫] বাংলা বিভাগ হলেও, এবং কলকাতাপ্রেমিক বিশেষত হিন্দু শিক্ষিতশ্রেণীকে তা সংক্ষুব্ধ করলেও[৬৬] বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে ঢাকা রাজধানী হওয়ায়

৬৫. পরবর্তীকালে (১৯১২) লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড কার্জনকে বাহ্‌বা জানিয়ে লিখেছিলেন, '(বাংলা) বিভাগ ছিল একটা বিরাট প্রশাসনিক সংস্কার, প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসঙ্গত আর এর জন্য কৃতিত্বের একমাত্র দাবিদার আপনিই।' (ড. এমাজউদ্দীন আহমদের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ১৯। সংগৃহীত, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া, পৃষ্ঠা ১৪)।

৬৬. ড. কে. কে. আজিজ বলেন, 'The partition was immediately made an occasion for unprecedented agitation by the Hindus, mostly those of West Bengal.' (Britain and Muslim India, pp. 38).
ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী আরও কঠোর ভাষায় বলেন, বাংলা বিভক্তির ফলে, 'The educated Hindus of Calcutta were influenced almost to madness. They

নতুন প্রদেশে পূর্ব বাংলা ও আসামে বসবাসরত স্থানীয় জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা যে আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল সে কথা অনস্বীকার্য।[৬৭]

এক. একদা মোগল সুবে-বাংলার রাজধানী কিন্তু পরবর্তীকালে গুরুত্বহীন হয়ে-পড়া ঢাকায়, পূর্ব বাংলা ও আসামের রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় ঢাকা তার হৃতগৌরব কিছুটা হলেও ফিরে পেয়েছিল। একই সঙ্গে সমুদ্র-বন্দর হিশেবে চট্টগ্রামের গুরুত্ব বেড়েছিল এবং এর উন্নতির পথ হয়েছিল সুগম। ফলত নতুন প্রাদেশিক সরকারকে, 'Schemes for the development of the neglected waterways and construction of new railway lines to connect the inaccessible regions with Dacca and Chittagong'[৬৮] গ্রহণ করতে হয়েছিল।

অধিকন্তু, 'After 1905 the province received closer attention from the local government at Dacca and made progress in trade, indigenous industry (particularly handloom weaving) and literary activity.'[৬৯]

দুই. লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের শাসন-এলাকা বা অধিক্ষেত্র কমে যাওয়ায় তার ও তন্নিম্ন প্রশাসনিক

---

claimed that Bengalis were a nation, and this dichotomy was unnatural and unjust. The Hindu intelligentsia of Calcutta felt that their motherland was insulted. The followers of the militant Hinduism were upset by the creation of a Muslim majority province.' (Government and Politics in Pakistan, pp. 53).

৬৭. ড. জন আর ম্যাকলেন যথার্থই মন্তব্য করেন, 'The partition (*of Bengal*) brought two qualitative changes in relations between Hindu and Muslim elite groups. The partition was welcomed by educated Muslim because it expanded their educational, economic, and political opportunities.' (Article 'Partition of Bengal, 1905 : A Political Analysis', in History of Bangladesh, 1704-1971: Political History, Edited by Dr. Sirajul Islam, pp. 311).

ড. এ এফ সালাহউদ্দিন আহমেদও নিঃসঙ্কোচ মন্তব্য করেন, 'In fact, the creation of a new Muslim majority province consisting of East Bengal and Assam opened up a new horizon of hopes for many-sided developments for the newly emerging Bengali Muslim middle class.' (Bengali Nationalism and the Emergence of Bangladesh: An Introductory Outline, pp. 70).

৬৮. Dacca : A Record of Its Changing Fortunes, Dr. Ahmad Hasan Dani, pp. 126-27; The Muslim Society and Politics in Bengal, pp. 214.

৬৯. The New Province of Eastern Bengal and Assam, pp. 248.

ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক মন্তব্য করেন, 'শিক্ষিত মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করে। ... বঙ্গভঙ্গের দ্বারা পূর্ব বাংলার মুসলমানরা বেশ উপকৃত হয়েছে। অন্যূন পাঁচ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে বেশ উন্নতি লাভ করে।' (ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৭০৭-১৯৪৭, পৃষ্ঠা ১৫৬-৫৭)।

কর্মকর্তাদের পক্ষে প্রদেশের প্রশাসনিক খুঁটিনাটি বিষয়ে বিশেষত আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে পুলিশি তদারকি ও অন্যান্য কাজে অধিকতর নজর দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

ড. মুঈন-উদ-দীন আহমদ খান বলেন, '...the domination of the capitalists of Calcutta on the agrarian economy of Eastern Bengal and Assam had stifled local initiative and progress, and produced a chronic state of poverty among the teeming millions of inhabitants residing in these under-developed areas. For, the drainage of rich agriculrural wealth of Eastern Bengal and Assam to Calcutta, did not pay a reasonable return to the primary producers. The partition of Bengal was, therefore, calculated to restore better efficiency in the government administration on the one hand, and encourage local initiative for progress and industrialisation on the other.'[৭০]

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, তা হলো ১৯০৫-পরবর্তীকালে বাংলার প্রশাসনিক অবকাঠামোর 'Nucleus' হিশেবে কলকাতার মর্যাদা এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে, মায় হিন্দুদের মধ্যেও বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল, সেই তুলনায় ঢাকায় যে প্রশাসনিক রূপরেখা বা 'Model' গড়ে উঠেছিল, তাই-ই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এখানকার তথা নিম্নবাংলার নিজস্ব ধাঁচের প্রশাসনিক অবকাঠামো, যা -- 'separate from that of Bengal.'[৭১]

তিন. 'The partition created an unprecedented enthusiasm among the Muslims of the new province. The fact that Dacca became the capital of the new province filled them with joy and happy recollections of those days when Dacca was the provincial capital of the Mughals; to them, the new province had come to stay. It aroused, as evident from their writings, their self-confidence and made them more concerned with their socio-economic development, thus stimulating the rise of the Muslim middle class.'[৭২] শুধু তাই নয়, 'The emergence of this new middle class underlined important changes in the Muslim Society.'[৭৩]

নানা কারণে মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল। তবে ভিন্ন প্রসঙ্গ বিধায় এখানে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, 'পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রথম সচেতন আবির্ভাব ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগের পর, এখান থেকেই তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির মধ্য গগনে চলে'[৭৪] এসেছিলো।

---

৭০. Muslim Struggle for Freedom in Bengal, pp. 79

৭১. The New Province of Eastern Bengal and Assam, pp. 251.

৭২. Ibid. pp. 252.

৭৩. Bengal Muslims in Search of Social Identity (1905-1947), Dr. Dhurjati Prosad De, pp. 10.

৭৪. মুসলিম মধ্যবিত্তের রাজনীতি, ড. বদিউজ্জামান, পৃষ্ঠা ৯। মূলত বঙ্গভঙ্গ-রদই তাদেরকে ব্রিটিশবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনমুখী করেছিল।

যা হোক, বঙ্গ-বিভাগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারেনি। মূলত শহরকেন্দ্রিক হিন্দু শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রবল আন্দোলন[৭৫] -- রাজনৈতিকভাবে তাদের কঠোর অবস্থান, অসহযোগী মনোভাব ও বিলেতি পণ্য (ইংল্যান্ডে উৎপন্ন চিনি, কাপড় প্রভৃতি) বর্জন নীতির বিপক্ষে সরকারের গৃহীত কর্মসূচির প্রতি মুসলমানদের দুর্বল সমর্থন শেষ পর্যন্ত সরকারকে বাধ্য করে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করতে। ড. আহমাদ হাসান দানী-র ভাষায়, 'Such a weak political support to the Government policy of partition by the Muslims was drowned in the noisy cry of the Hindu agitators. The authorities were awaken to the sense of maintaining political balance in the country, and they started thinking in terms of alternative administrative arrangement, which would meet their ulterior motive of better administration, pacify the agitators, and at the same time bring home to the Muslim leaders that the scheme of partition was carried out, not in love for the Muslims of Eastern Bengal, but just to facilitate their own administration.'[৭৬]
এরই সূত্র ধরে কার্জন-পরবর্তী (অব্যবহিত নয়) ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ (Lord Hardinge) সরকারের গোপন প্রস্তাব অনুসারে[৭৭], ভারত-পরিভ্রমণরত সম্রাট পঞ্চম জর্জ (King-Emperor George V) দিল্লির প্রকাশ্য রাজ-দরবারে নিম্নলিখিত ঘোষণা পাঠ করেছিলেন (১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর)।[৭৮]

১.	ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবে;
২.	একজন গভর্নরের অধীনে নতুন প্রদেশ হিশেবে সমগ্র বঙ্গদেশের পুনর্গঠন;
৩.	বিহার ও ওড়িশাকে একত্র করে একজন লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে দিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন;
৪.	আগের মতো আসামকে 'চীফ কমিশনার'-এর অধীনে ন্যস্তকরণ।

বলাবাহুল্য সম্রাটের ঘোষণার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'The Government of India Act, 1912' নামে নতুন আইন পাশ হয়েছিল। সে অনুযায়ী কলকাতাকে রাজধানী করে বাংলা

৭৫. 'The Hindu zamindars, businessmen, lawyers, journalist and politicians opposed the scheme of partition and they organised a strong agitation against it. They interpreted the partition as an attack on their 'national solidarity, as a chastisement for their leading role in the political movement, as proof of government partiality towards the Muslims and also as establishing Muslim ascendency.'' (The Muslim Society and Politics in Bengal, pp. 215). ড. মুনতাসীর মামুনও স্বীকার করেছেন যে, 'বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল মূলত শহরে, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভদ্রলোকদের মধ্যে।' (দেখুন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া, পৃষ্ঠা ৩১)।

৭৬ Dacca : A Record of Its Changing Fortunes, pp. 133-34.

৭৭. The Struggle for Pakistan, pp. 34.

৭৮. বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, মুক্তিসংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১৫৮।

ভাষাভাষী ৫টি বিভাগ যথা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহি, প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান (দার্জিলিং জেলাসহ) বিভাগ নিয়ে নতুন বাংলা প্রদেশ (Presidency) গঠিত হলো (১লা এপ্রিল, ১৯১২)।[৭৯] মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের মতো এর প্রশাসনিক প্রধান হলেন গভর্নর।[৮০] এর আয়তন ছিল ৭০,০০০ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ।[৮১] অন্যদিকে বিহার, ওড়িশা ও ছোট নাগপুর নিয়ে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে গঠিত হলো নতুন প্রদেশ যার রাজধানী ছিল বিহারের পাটনা। আসাম স্বতন্ত্র একজন 'চীফ কমিশনার'-এর অধীনে ন্যস্ত হলো।

এখানে বাংলা বিভক্তি রদ তথা পুনরেকত্রিকরণের ফলে পূর্ববাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের তীব্র প্রতিক্রিয়ার কথা বলা যেতে পারে। বস্তুত, 'The Muslim leaders of east Bengal considered it 'a distinct breach of faith, ..''[৮২]

ড. শীলা সেন-এর চমৎকার বিশ্লেষণে, 'The creation of the new province of Eastern Bengal and Assam not only created a new consciousness among Muslims but also stimulated a new hope in them because as a majority community in the new province they benefited most from the British administration. Its subsequent annulment shattered their hopes and aspirations. The first event fostered political consciousness among them and the second further strengthened it.''[৮৩]

যা হোক বাংলার এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অবকাঠামো পরবর্তী কয়েক দশক, বলা যায় ইংরেজ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত কমবেশি বর্তমান ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের একটি ভাষ্য (কিছু বছর আগের প্রশাসন সূত্রে বললেও) উল্লেখ করবো।

Alfred Comyn Lyall বলেন, 'The administrative history of India (*as well as Bengal*) during the next fifty years may be described as a development upon the lines that were laid down by these fundamental executive and legislative.''[৮৪]

১৯১৯ সনের 'ভারত সরকার আইন' বলে মূল ৩টি প্রেসিডেন্সি প্রদেশের (বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই) গভর্নর-ইন-কাউন্সিল ব্যবস্থা ছাড়াও অনুরূপ ব্যবস্থা অর্থাৎ গভর্নর-ইন-কাউন্সিল প্রথা

---

৭৯. The Muslim Society and Politics in Bengal, pp. 217; Report on the Administration of Bengal (1921-22), pp. 61.

৮০ ২১শে মার্চ, ১৯১২ তারিখের এক রাজকীয় আদেশ বলে লর্ড কারমাইকেল (Baron Carmichael of Skirling) নিযুক্ত হন নতুন প্রদেশ বা প্রেসিডেন্সির প্রথম গভর্নর (১লা এপ্রিল, ১৯১২ সালেই তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন)। এর আগে তিনি মাদ্রাজের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(দেখুন, Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 61).

৮১. The Muslim Society and Politics in Bengal, pp 217.

৮২. The Bengali Muslims : A Study in Their Politicization (1912-1929), Dr. Chandiprasad Sarkar, pp. 19.

৮৩. Muslim Politics in Bengal (1937-1947), Dr. Shila Sen, pp. 31.

৮৪. The Rise and Expansion of the British Dominion in India, pp. 380.

বিহার, ওড়িশা, আসাম, সংযুক্ত ও মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রবর্তিত হয়েছিল।[৮৫] ১৯৩৫ সালের 'ভারত সরকার আইন'-এর বিধানানুয়ায়ী সিন্ধু ও ওড়িশা নামে দু'টি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত হয় বিহার, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের অংশবিশেষ এবং মাদ্রাজের ওড়িশাভাষী অধ্যুষিত ভূভাগ।[৮৬]

তবে এ পর্যায়ে ভারতীয়দের নানাবিধ চাপে ব্রিটিশ সরকার তথাকথিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি-শাসিত সরকার কায়েম করতে বাধ্য হলেও 'Reserved subjects' হিশেবে ভূমিরাজস্ব, সাধারণ প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ প্রভৃতি কেন্দ্রের তথা ক্ষেত্র মতো গভর্নর-জেনারেল, গভর্নর বা লেফটেন্যান্ট-গভর্নর, চীফ কমিশনার প্রমুখের হাতে সংরক্ষিত রেখেছিল[৮৭]।

এখানে পর্যালোচিত সময়ের প্রশাসনিক স্তর-বিন্যাসে গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল, গভর্নর, লেফটেন্যান্ট-গভর্নর ও চীফ কমিশনার-এর সরকারি বা আনুষ্ঠানিক পদমর্যাদা ও পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিয়ে এ আলোচনা শেষ করবো।

প্রথমেই উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত প্রশাসনিক অধিকর্তাদের অধীনে প্রতিটি প্রশাসনিক স্তর বা অবকাঠামোই স্থানীয় সরকার (Local Government) হিশেবে পরিগণিত হতো। প্রতিটি স্তরের উচ্চাব-ক্রমানুসারে এদের 'Official Status' নিরূপিত হতো।

গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল পদের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে ইতোমধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এখানে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, ১৮৫৮-পরবর্তী সময়ে তিনিই ছিলেন বাংলা তথা ব্রিটিশ ভারতের সাধারণ ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের সর্বোচ্চ বা প্রধান নির্বাহি (Highest dignitary in British India) -- এককথায় ভূমি ও ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত সকল আদেশ-নির্দেশের মূল উৎস। যদিও, 'The Governor-General was to administer the country generally with the advice and consent of his Council', কিন্তু, 'he could overrule the Council if and when he considered it essential. This practically made the Governor-General the supreme arbiter of India's destiny , subject to the control of a Secretary of State[৮৮] and the

৮৫. বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ৩১৪-১৫।

৮৬. An Advanced History of India, pp. 910. অতঃপর ব্রিটিশ ভারত বলতে মোটামুটি ১১টি গভর্নরশিপ বা গভর্নর-শাসিত প্রদেশ (১৯৩২ নাগাদ ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসহ ১০টি -- দেখুন, The Cambridge History of India, Vol. VI, pp. 238), ৪টি চীফ কমিশনারশিপ (দিল্লি, আজমির-মারওয়াড়, কুর্গ বা কোডাগু ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ) এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তান। (দেখুন, A Dictionary of India, pp. 178).

৮৭. An Advanced History of India, pp 905.

৮৮. ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের আইন দ্বারাই এই পদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। এককথায় ভারত-সচিব (The Secretary of State to India) ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের সকল বিষয়ে ইংল্যান্ডের রাজা বা রাণীর সাংবিধানিক পরামর্শক বা আইন-উপদেষ্টা (the constitutional adviser of the Crown)। 'He is appointed, like other Secretaries of State, by the delivery to him of the seals of office. He inherits generally all the powers and duties which were formerly vested either in the Board of Control or in the Company, the Directors, and the Secret Committee

Parliament in far-off England."[৮৯]

ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক অবস্থায় অবিভক্ত বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রধান হিশেবে গভর্নরগণ দায়িত্ব পালন করতেন। পরবর্তীকালে বাংলায় গভর্নর-জেনারেল সরাসরি প্রশাসন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন যা আগেই বলেছি। কিন্তু ১৮৫৮-পরবর্তীকালে পর্যালোচ্য অধিক্ষেত্রে এই পদের সাময়িক বিলুপ্তি ঘটলেও, নতুন করে বিংশ শতাব্দীতে আবার যখন এর প্রচলন শুরু হয় তখন গভর্নর-এর আদত ক্ষমতা ছিল, এককথায় এ রকম, 'The Governor of a Province, with enormous powers and privileges, continued to remain as the real authority over it."[৯০]

লেফটেন্যান্ট-গভর্নর ও চীফ কমিশনার -- এ দু'জনও ছিলেন এক-একটি প্রেসিডেন্সির প্রধান। কিন্তু লেফটেন্যান্ট-গভর্নর যে ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি প্রধান হতেন তার প্রতিটির একটি করে আইন-পর্ষৎ থাকতো। তিনি ভারত-সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর অনুমোদন ক্রমে গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হতেন, তবে এই নিযুক্তির জন্য তাকে ভারতে কোম্পানির বা রাজকীয় চাকুরিতে ১০-বছরের কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হতো। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তার সর্বোচ্চ বেতন (Salary) ছিল বার্ষিক ১,০০,০০০ টাকা।[৯১]

অন্যদিকে চীফ কমিশনারগণ[৯২] --'..stand upon a lower footing, being delegates of the Governor-General-in-Council, appointed without any reference to Act of Parliament. .. is regarded as administering his Province on behalf of the Governor-General-in-Council, who may resume or modify the powers that he has himself conferred."[৯৩] বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তার বার্ষিক সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৫০,০০০ থেকে ৬২,০০০ টাকা।[৯৪]

---

in respect of the government and revenues of India. He has the power of giving orders to every officer in India, including the Governor-General, and of directing all the business relating to the government of India that is transacted in the United Kingdom. Every order or communication sent to India must be signed by him, or in his absence by some other Secretary of State, and every dispatch from India must likewise be addressed to him.' (The Imperial Gazetteer of India, The Indian Empire, Vol. IV, Administrative, pp. 36-37).
স্বভাবতই পদটির গুরুত্ব কী অপরিসীম ছিল তা সহজে অনুমেয়।

৮৯. A Dictionary of Indian History, pp. 400-401.

৯০. An Advanced History of India, pp. 905.

৯১ The Imperial Gazetteer of India, The Indian Empire, Vol. IV. (Administrative), pp. 32.

৯২ প্রথম চীফ কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন জন লরেন্স (John Lawrence), ১৮৫৩ সালে পাঞ্জাবে। (দেখুন, A History of India, Michael Edwardes, pp. 258).

৯৩. The Imperial Gazetteer of India, The Indian Empire, Vol. IV (Administrative), pp. 32.

৯৪. Ibid., pp. 33.

এখানে ১৮৫৪ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর, ও ১৯১২ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাংলা প্রেসিডেন্সির গভর্নরদের নাম ও কর্মকাল উল্লেখ করা হলো।

বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরগণ (১৮৫৪-১৯১১)

স্যাব ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে	১লা মে, ১৮৫৪
স্যার জন পিটার গ্রান্ট	১লা মে, ১৮৫৯
স্যাব সেসিল বা সিসিল বেডন	২৩শে এপ্রিল, ১৮৬২
স্যাব উইলিয়াম গ্রে	২৩শে এপ্রিল, ১৮৬৭
স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল	১লা মার্চ, ১৮৭১
স্যার রিচার্ড টেম্পল	৯ই এপ্রিল, ১৮৭৪
স্যাব অ্যাশলে বা অ্যাশলি ইডেন	৮ই জানুয়ারি, ১৮৭৪ (ভারপ্রাপ্ত) ১লা মে, ১৮৭৭ (পূর্ণ)
স্যাব স্টিউয়ার্ট (স্টুয়ার্ট) কলভিন বেইলি বা বেলি (ভারপ্রাপ্ত)	১৫ই জুলাই, ১৮৭৯ থেকে ১লা ডিসেম্বর, ১৮৭৯
স্যার অগাস্টাস রিভার্স থম্পসন	২৪শে এপ্রিল, ১৮৮২
মিস্টার হোরেস অ্যাবেল কোকারেল (ভারপ্রাপ্ত)	১১ই আগস্ট, ১৮৮৫ থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫
স্যার স্টিউয়ার্ট (স্টুয়ার্ট) কলভিন বেইলি বা বেলি	২রা এপ্রিল, ১৮৮৭
স্যার চার্লস আলফ্রেড ইলিয়ট	১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯০
স্যার অ্যান্থনি প্যাট্রিক ম্যাকডোনেল (ভারপ্রাপ্ত)	৩০শে মে, ১৮৯৩ থেকে ৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৩
স্যার অ্যালেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি	১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫ থেকে ৭ই এপ্রিল, ১৮৯৮
স্যার চার্লস সেসিল স্টিভেন্স (ভারপ্রাপ্ত)	২২শে জুন, ১৮৯৭ থেকে ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৭
স্যার জন উডবার্ন	নভেম্বর, ১৮৯৮-১৯০২
স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার বা ফ্রেসার	১৯০২-১৯০৮
মিস্টার জে এ বোর্ডিলন (ভারপ্রাপ্ত)	নভেম্বর,১৯০২-নভেম্বর,১৯০৩
স্যার এডওয়ার্ড বেকার	১লা এপ্রিল, ১৯০৮-১৯১২

সূত্র . **Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I & II, C. E. Buckland; Aspects of Administration in Bengal (1898-1912), Dr. Dipasri Banerjee; মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ড. আসকার ইবনে শাইখ, পৃষ্ঠা ২৭২**

বাংলা প্রেসিডেন্সির গভর্নরগণ (১৯১২-১৯৪৭)

ব্যারন কারমাইকেল	১লা এপ্রিল, ১৯১২
আর্ল অফ রোনাল্ডশে	২৬শে মার্চ, ১৯১৭
আর্ল অফ লিটন	২৮শে মার্চ, ১৯২২
স্যার এইচ এল স্টিফেনসন	১০ই জুন, ১৯২৬
স্যার এফ স্টেনলি জ্যাকসন	২৮শে মার্চ, ১৯২৭
স্যাব জে অ্যান্ডারসন	২৯শে মার্চ, ১৯৩২
স্যার জে এ উডহেড	১০ই আগস্ট, ১৯৩৪
স্যার জে অ্যান্ডারসন	১লা এপ্রিল, ১৯৩৭
ব্যারন ব্রাবোর্ন	২৭শে নভেম্বর, ১৯৩৭
স্যার আর এন রীড	২৫শে জুন, ১৯৩৮
স্যার জে এ উডহেড	১২ই জুন, ১৯৩৯
লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্যার জে এ হারবার্ট	১৮ই নভেম্বব, ১৯৩৯
স্যার টি জি রাদারফোর্ড	৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩
রাইট অনারেবল আর জি ক্যাসে বা ক্যাসি	২২শে জানুয়ারি, ১৯৪৪-১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫
স্যাব এইচ জে টোয়াইনাম	১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫
স্যার এফ জে বারোজ	১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬-১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭

সূত্র : **Aspects of Administration in Bengal (1898-1912), Dr. Dipasri Banerjee; মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ড. আসকার ইবনে শাইখ, পৃষ্ঠা ৩১৪-১৫**

বোর্ড অফ রেভেন্যু (The Board of Revenue)

'বোর্ড অফ রেভেন্যু' (১৭৭০ সালের 'রেভেন্যু কাউন্সিল', ১৭৭৩-এর 'প্রাদেশিক কাউন্সিল', ১৭৮১-এর 'কন্ট্রোলিং কমিটি অফ রেভেন্যু' প্রভৃতি বিবর্তনের ধারায় বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছিল)-এর গোড়াপত্তন ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ও অন্যত্র কমবেশি বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে যে আলোচনা করবো তা হবে মূলত ১৭৯৩-পরবর্তীকালের 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর অবকাঠামো ও কার্যাবলি সম্পর্কিত।

আগেই জানিয়েছি 'কর্নওয়ালিস-কোড' মারফত বাংলার ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাবিষয়ক নীতি-পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছিল। 'কোডে', বিভিন্ন স্তরে কর্মরত ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামোগুলির ক্ষমতা ও এক্তিয়ারেরও স্পষ্ট রূপরেখা বর্ণিত হয়েছিল। স্বভাবতই তা ছিল একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত আইন-বিধির ফিরিস্তি।

তবে শুরুতেই বলে নেয়া দরকার যে, ১৭৯৩-পরবর্তী কালে 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল -- সময়ে-সময়ে পরিপত্র বা 'সার্কুলার' জারির মাধ্যমে ভূমিরাজস্ব বিষয়ে প্রচলিত আইন-বিধির অস্পষ্টতা দূর তথা পরিপূরক ব্যাখ্যা প্রদান, ও নিম্নস্তরের কর্মকর্তা-

কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা নির্বাহ। 'বোর্ড' এই ক্ষমতা নির্বাহ করতো গভর্নর-জেনারেল ও তদীয় কাউন্সিলের অব্যবহিত পরবর্তী স্তরের প্রশাসনিক অবকাঠামো হিশেবে।
অবশ্য এটাকে ঠিক প্রশাসনিক স্তর বা অবকাঠামো বলা যায় না। কারণ এর নিয়ন্ত্রণ ছিল খুব সীমিত কিছু ক্ষেত্রে, এবং মূলত রাজস্ব বিষয়ে। সাধারণ প্রশাসনিক অবকাঠামো যেমন বিভাগ ও জেলা, জনসমাজে এগুলি সম্বন্ধে যে বিস্তৃত ধারণা ও প্রশাসনিক অধিক্ষেত্রে এর যে সুস্পষ্ট অবস্থান ছিল, 'বোর্ড'-এর তা আদৌ ছিল না। বলা যেতে পারে, এর কাজের ধরনই একে সম্পূর্ণ আলাদা ও রাজস্ব বিষয়ে ব্যাপক ক্ষমতাশালী করে তুলেছিল।
যা হোক 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'র রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণমূলক একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল এ রকমঃ 'To summon any officer to the Presidency to explain and justify his conduct, to impose a fine not exceeding a month's salary, and to suspend him from office.'[৯৫] ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের স্বৈরাচারী কার্যকলাপের জবাবদিহিতা ছিল 'বোর্ডে'র হাতে। 'বোর্ড', কর্মচারীদের যে কোন বেআইনি কাজের কৈফিয়ত তলবই শুধু নয়, এর জন্য আনুষ্ঠানিক তদন্ত করে তাদের উপর নির্দিষ্ট বিভাগীয় শাস্তি আরোপ করতে পারতো।
বস্তুত 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'র ক্রমবিকাশের যে ধারা আমরা লক্ষ্য করেছি তাতে দেখা যায়, প্রথমদিকে 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' বলতে বুঝাতো গভর্নর-জেনারেল ও তদীয় কাউন্সিলকে। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে এটি পুনর্গঠিত হয় এবং গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের একজন সদস্য ('বোর্ডে'র প্রেসিডেন্ট হিশেবে) ও কোম্পানির কর্মে নিযুক্তদের মধ্য থেকে সবচেয়ে অভিজ্ঞ (সিনিয়র) একাধিক কর্মচারী (সদস্য হিশেবে) নিয়ে তা গঠিত হয়েছিল। একেবারে শুরুর দিকে স্বনামধন্য স্যার জন শোর ছিলেন এর প্রেসিডেন্ট। ১৭৯৩-পরবর্তী সময়েও এর প্রেসিডেন্ট ও সদস্য যারা হতেন তারা ছিলেন কোম্পানির বা সরকারের প্রশাসনিক কাজে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ। ফলত এ কথা বলে আমরা বুঝাতে চাচ্ছি যে, 'বোর্ড অফ রেভেনু' মূলত ভূমিরাজস্ব নিয়ে কাজ করতো, এবং যেনতেন প্রকারে রাজস্ব হাসিল-ই যেহেতু ছিল কোম্পানির, ও পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের মূল লক্ষ্য, সুতরাং 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'কে সরকারের নীতি-নির্ধারকগণ অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন তা বলাইবাহুল্য।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে বারাণসী কোম্পানিকর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। তৎপরবর্তীকালে ১৮০১ থেকে ১৮২২ সালের মধ্যে অযোধ্যার নবাবকর্তৃক হস্তান্তর[৯৬], ও মারাঠাধিপতি সিন্ধিয়া ও বেরার-এর রাজা প্রমুখের কাছ থেকে বিজিত মূলে[৯৭] আরও কিছু

---

৯৫. The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 665. ১৮৭৩ সালের ১২নং আইন জারি পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা বলবৎ ছিল।

৯৬ সংক্ষেপে এগুলি 'Ceded Provinces' হিশেবে পরিচিত ছিল। এগুলি -- এলাহাবাদ, কানপুর, গোরক্ষপুর, মোরাদাবাদ, বেরেইলি, ইটাওয়া, ও ফররুখাবাদ।
[দেখুন, Agrarian Relations and Early British Rule in India (Ceded & Conquered Provinces, Uttar Pradesh), pp. 6].

৯৭. সংক্ষেপে এগুলির পরিচয় ছিল 'Conquered Provinces'-রূপে। এগুলি ছিল -- আগ্রা, আলিগড়, উত্তর ও দক্ষিণ শাহারাণপুর, ও বুন্দেলখণ্ড।
(দেখুন, Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp 6)

গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বা ভূখণ্ড ইংরেজ শাসকদের দখলে আসায় সরকার এখানকার ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে ১৮০৭ সালের ১০নং প্রবিধান বলে ২-সদস্যবিশিষ্ট একটি 'কমিশন' গঠন করেছিল। কলকাতাস্থ 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'র উপর যে দায়িত্ব ছিল, অতঃপর তা এই কমিশনের উপর বর্তেছিল। ১৮০৯ সালের ১নং প্রবিধান বলে সেটিকে স্থায়ী করা হয়েছিল।

বলাবাহুল্য এর ফলে কলকাতাস্থ 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'র অধিক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের ১নং প্রবিধান বলে বারাণসী ও বিহারের জন্যও স্বতন্ত্র কমিশনার বা 'বোর্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ সালে এর সঙ্গে বাংলার রামগড়, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একই বছর কমিশনারের সংখ্যা ১ থেকে বাড়িয়ে ২ জন করা হয়েছিল যাতে করে প্রশাসন আরও গতিশীল ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। পরে রংপুর ও দিনাজপুরের ভূমিরাজস্ব কার্যক্রম এর আওতায় ন্যস্ত হয়েছিল। অবশ্য শীঘ্রই তা (১৮১৯ সালের ১নং প্রবিধান বলে) কলকাতাস্থ 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'র হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

১৮২২ সালের ৩নং প্রবিধান অনুসরণে একাধারে ৩টি 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' প্রতিষ্ঠিত হয়। যথা, এক. নিম্ন-প্রদেশ (Lower Provinces), দুই. মধ্য-বাংলা (Central Bengal) ও তিন. পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ (Western Provinces)।[৯৮]

১৮২৯ সাল অবধি মোটামুটি এই অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। 'In 1829, ..., the powers of the several local Boards of Revenue were made over to the Commissioners of Revenue and Circuit under the control of a Chief or Sadar Board of Revenue at Calcutta."[৯৯]

পরবর্তীকালে মধ্য-বাংলার 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' বিলুপ্ত হলেও অন্য দু'টি বহাল রাখা হয়েছিল। সাধারণত ২ জন সদস্য ও ২ জন সচিব নিয়ে এক-একটি 'বোর্ড' গঠিত ও পরিচালিত হতো। নিচে ১৮২৯-উত্তর 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর কর্মকাণ্ড সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

'It exercises general powers of control and sanction, and regulates, by the issue of Standing Orders and Circulars, the procedure and conduct of official business in all revenue departments whenever these matters are not directly provided for by Acts of the Legislature, or rules having the force of law made pursuant to such Acts."[১০০] অধিকন্তু 'in supervising officials, reviewing decisions and orders, sanctioning Settlements, controlling sales for arrears of revenue, controlling the Land Registers, Irrigation, Embankments, Customs, Salt, Opium, Excise, the Court of Wards, Stamps, and many other matters,"[১০১] -

৯৮ The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 665.

৯৯. Report on the Administration of Bengal (1921-22), pp. 51.

১০০. The Land Systems of British India, Vol I., pp. 666.

১০১. The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 666. ১৯১৩ সাল নাগাদ 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'-এর কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি ছিল মোটা দাগে এগুলি -- (১) ওয়ার্ডস, (২) গভর্নমেন্ট এস্টেটস, (৩) ওয়েস্ট ল্যান্ডস, (৪) তৌজি-অ্যাকাউন্টস, (৫) রাস্তা ও

দেখাশুনার ক্ষেত্রেও 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' ব্যাপক ও সুবিস্তৃত এক্তিয়ার প্রয়োগ করতো।
পরিশেষে একটা বিষয় উল্লেখ করতে পারি যে, 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'র প্রেসিডেন্ট-এর পদ, গুরুত্বের দিক দিয়ে ছিল প্রাদেশিক সরকারের কার্যনির্বাহি কাউন্সিলরদের অব্যবহিত পরে-পরেই (next in importance to an Executive Councillor of the Provincial Government)।[১০২]
সুতরাং এ থেকেই অনুমান করা যায়, সমগ্র ইংরেজ আমলে নীতি-নির্ধারকমহলে অত্যন্ত সমীহের চোখে-দেখা একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিশেবে 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' বাংলা, বিহার ও ওড়িশার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় ও প্রশাসনে কতো ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নির্বাহ করতো।

বিভাগ ও বিভাগীয় কমিশনার

আমরা আগেই দেখিয়েছি, ইংরেজ আমলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিশন নিয়োগ বা গঠন করা হয়েছিল। সচরাচর কমিশন-এর সদস্য/সদস্যদের 'কমিশনার' বলে আখ্যায়িত করা হতো। কিন্তু এখানে আলোচ্য 'বিভাগীয় কমিশনার' ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক সৃষ্টি, নবতর প্রশাসনিক অভিধা। সমগ্র ব্রিটিশ শাসনযুগের শেষ ১০০-বছরেরও বেশি কালব্যাপী মাঠ পর্যায়ের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদটি সৃষ্টির সঙ্গে যার নাম ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে তিনি স্বনামধন্য লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। বস্তুত তারই উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত ফসল 'বিভাগীয় কমিশনার'।
১৮২৮ সালে (জুলাই) বেন্টিঙ্ক ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন। এক সময় তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্নরও ছিলেন (১৮০৩-৭)।[১০৩] সঙ্গত কারণে বলা যায়, ভরতের গভর্নর-জেনারেল পদে নিযুক্তি লাভের আগে থেকেই একটি প্রেসিডেন্সি শাসনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় তার পক্ষে পরবর্তী সাত বছরে (১৮২৮-৩৫) যুগের প্রয়োজনে ও স্বীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কার কার্য করা সম্ভব হয়েছিল।
যা হোক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বেন্টিঙ্কের সবচেয়ে আলোচিত কর্ম 'বিভাগীয় কমিশনার' পদ প্রবর্তন সম্বন্ধে আলোচনার আগে প্রসঙ্গত ড. এ এফ সালাউদ্দিন আহমেদের একটি উক্তির উল্লেখ করে নিতে চাই। তিনি বলেন, 'Lord William Bentinck's Governor-Generalship (1828-35) marks a distinct epoch in British Indian History. Though not a doctrinaire liberal, he was thoroughly permeated with the liberal spirit of the age and was able to infuse it into every branch of Indian administration.'[১০৪]

১০২. A Dictionary of Indian History, pp. 156.
১০৩ The Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire (Historical), Vol. II., pp. 497; Lord William Bentinck: The Making of a Liberal Imperialist (1774-1839), John Rosselli, Part V; A Brief History of the Indian Peoples, Sir W W. Hunter, pp. 206; A Dictonary of Indian History, pp. 131.
১০৪ Social Ideas and Social Change in Bengal (1818-1835), Dr. A. F. Salahuddin Ahmed, pp. 77.

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত তথা বাংলার সমাজ জীবন থেকে সতীদাহ বা সহ-মরণের মতো জঘন্য কুপ্রথা নির্মূল করণে কঠোর আইন প্রণয়ন (১৮২৯) ও চরম নৃশংসতার মূর্তিমান প্রতীক বা 'ঠগী'[১০৫] দমন -- যদিও এ দু'টিকে তার মহান ও স্মরণীয় কীর্তি[১০৬] বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে, কিন্তু এর চেয়েও কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বিদ্যমান ব্যবস্থার যুগোপযোগী পরিবর্তনের স্মারক 'কমিশনার' পদের উদ্ভাবন ও প্রচলন।

ড. এইচ আর ঘোষাল যথার্থ বলেন, 'An important innovation introduced in 1829 was the division of the Bengal Presidency into a number of administrative units (divisions), higher than districts, each being placed under a commissioner of revenue and circuit.'[১০৭]

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বেন্টিঙ্ক প্রাদেশিক আদালত (Provincial Courts) বাতিল করে তদস্থলে ৪ বা ৫টি জেলার সমন্বয়ে[১০৮] নতুন প্রশাসনিক স্তর হিশেবে 'বিভাগ' বা 'Division' চালু করেন।[১০৯] অবশ্য প্রাদেশিক আদালতগুলি বাতিলের পক্ষে বেন্টিঙ্কের কিছু বক্তব্য ছিল। মূলত লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ১৭৭৪ সালে গঠিত 'প্রাদেশিক রাজস্ব কাউন্সিল' (Provincial Revenue Councils)-এর আদলে লর্ড কর্নওয়ালিস, কালেক্টরদের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি বা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৭৯৩ সালের ৫নং প্রবিধান বলে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ,

---

১০৫. বেশ প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে 'ঠগী' নামক ছদ্মবেশী পথ-দস্যুদের উপদ্রব থাকলেও বস্তুত আঠারো-উনিশ শতকেই এদের দৌরাত্ম্য বেড়েছিল সর্বাধিক। এরা কখনও একক, আবার কখনও দলবদ্ধভাবে পথিকদের বিশেষত হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণের সঙ্গী হতো। পরে সুযোগ ও সুবিধা মতো পথিকদের নির্জনে নিয়ে আংটাযুক্ত বস্ত্রখণ্ড গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতো ও লাশ মাটিতে পুঁতে ফেলতো। অতঃপর পথিকের যাবতীয় অর্থ-সম্পদ লুট করতো। বলা হয়ে থাকে সম্প্রদায় হিশেবে এরা ছিল হিন্দু দেবী কালীর উপাসক, এবং প্রবল ধর্মীয় জোশ ও উদ্দীপনায় তারা এটা করতো (দেখুন, The Oxford History of Modern India, 1740-1975, Dr. Percival Spear, pp 204)। মূলত প্রতারণার মাধ্যমেই যেহেতু এরা কার্য হাসিল করতো, এ জন্য এদেরকে 'ঠক' বা 'ঠগী' বলা হতো। যা হোক বেন্টিঙ্কের ঐকান্তিক ইচ্ছা (১৮৩০) ও কর্নেল উইলিয়াম স্লীম্যান (Sir William Sleeman) নামক জনৈক সাহসী বীর ইংরেজের কর্ম-তৎপরতায় এদের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়েছিল (১৮৫০)।

১০৬. Sir W. W. Hunter বলেন, 'His two most memorable acts are the abolition of *sati* (suttee), or widow-burning, and the suppression of the *thags* (thugs).'
(A Brief History of the Indian Peoples, pp. 207).
আরও দেখুন, The Imperial Gazetteer of India· The Indian Empire (Historical), Vol. II., pp. 498.

১০৭. A Comprehensive History of India: The Consolidation of British Rule in India (1818-1858), pp 619.

১০৮. Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 52; Role of Higher Civil Servants in Pakistan, Dr. Ali Ahmed, pp. 16.

১০৯. এ সময় বাংলা, বিহার ও ওড়িশাকে মোট ২০টি বিভাগ (Division)-এ বিন্যস্ত করা হয়েছিল। (দেখুন, Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, p. 153).

ঢাকা ও পাটনায় যে ৪টি প্রাদেশিক আদালত (Provincial Courts of Circuit and Appeal) গঠন করেছিলেন, সেগুলি পরবর্তী সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বিচার কার্য সম্পন্ন করে এলেও ততোদিনে এর কার্যক্রমে অনেকটা ঢিলেমি ও দীর্ঘসূত্রিতা চলে এসেছিল।[১১০] শুধু তাই নয়, 'As criminal courts (*of Appeal*) these courts created more difficulties for the prosecution as well as the witnesses, as it was not possible for them to hold their sessions in each district regularly (*i.e., to complete the circuit within six months*).'[১১১] একদা ক্ষোভ করে বেন্টিঙ্ক বলেই ফেলেছিলেন, যে, এগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারি-উচ্চপদস্থ কিন্তু অকর্মণ্য কর্মকর্তাদের আড্ডা ও অবসর যাপনের স্থল। তার ভাষায়, 'as resting-places for those members of the service who were deemed unfit for higher responsibilities.'[১১২]

নবসৃষ্ট বিভাগীয় কমিশনার-এর পূর্ণ সরকারি পদবি ছিল 'Commissioner of Revenue and Circuit'; তিনি ছিলেন একাধারে অভিজ্ঞ ও 'চুক্তিবদ্ধ' (Covenanted) কর্মচারী। গোড়ায় তার মুখ্য দায়িত্ব ছিল -- 'absolutely to superintend both the finance and the criminal justice of their different divisions.'[১১৩]

অবশ্য বেন্টিঙ্কের ইচ্ছা ছিল কমিশনারদের অধিক্ষেত্র এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হবে যাতে তারা অধীন কালেক্টরদেব কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে ও অত্যন্ত নিকট থেকে নিরীক্ষণ করতে সমর্থ হন এবং একই সঙ্গে শাসিত শ্রেণী তথা প্রজাসাধারণও যেন তাদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে তার (কমিশনার) কাছে সহজে ও নির্ভয়ে আসতে-যেতে পারে।

Baden-Powell বলেন, 'The territorial extent of the Commissioner's charge was then wisely determined to be such, that the presiding officer might 'be easy of access to the people' and be able 'frequently to visit the different parts of their respective jurisdictions'.'[১১৪]

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রদেশ বা প্রেসিডেন্সিগুলিতে বিশেষত বাংলায় যেহেতু কমিশনার পদের প্রচলন হয়েছিল, স্বভাবতই এখানকার 'বোর্ড অফ রেভেন্যু' বিলুপ্ত করা হয়েছিল।[১১৫] অন্যভাবে বলা যায় ১৮২৯-পরবর্তী সময় থেকে বাংলায় গভর্নর-জেনারেল বা

১১০. P. E. Roberts-ও বলেন, '... in the domain of administrative reform, Bentinck abolished the provincial courts of appeal and circuit set up by Cornwallis, which by their dilatory procedure had blocked the course of justice.. ' (History of British India, pp 302).

১১১. Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, pp. 153.

১১২. দেখুন, Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 52.

১১৩. Ibid., pp. 52.

১১৪. The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 666-67.

১১৫. Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 52; British Paramountcy and Indian Renaissance, Vol. IX, Part I., Ed. by Dr. R. C. Majumdar, pp. 325. আগে কালেক্টরদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতো 'বোর্ড অফ রেভেন্যু'। এখন থেকে তাদের প্রত্যক্ষ দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছিল বিভাগীয় কমিশনার-এর কাছে।

গভর্নর বা সরকার ও জেলার প্রধান নির্বাহি (সাধারণত 'District Officer' হিশেবে পরিচিত) কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর বা ডেপুটি কমিশনার-এর মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হিশেবে কমিশনারের অবস্থান ছিল অত্যন্ত অমোঘ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

ভূমিরাজস্ব ও দিওয়ানি বিষয়ে 'কমিশনার অফ রেভেন্যু অ্যান্ড সার্কিট'-এর এক্তিয়ার ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল। বস্তুত তাকে জেলা জজের বিচারিক ক্ষমতাই শুধু প্রদান করা হয়নি; উপরন্তু নিজের পদবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কমিশনার যেন কালেক্টরের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম দেখাশুনার পাশাপাশি বিভাগের বিভিন্ন স্থানে 'সার্কিট' বা ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জনসাধারণের সরাসরি বক্তব্য শুনতে পারেন, সেটিও ছিল তার কর্তব্যের অন্যতম দিক। তবে সত্যি বলতে, নির্বাহি কাজের উত্তরোত্তর ব্যস্ততা এবং দিওয়ানি মামলা বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সময়, অভিজ্ঞতা ও ধীরস্থির প্রকৃতি কমিশনারের না-থাকায় অচিরেই (১৮৩১) তার কাছ থেকে বিচারিক ক্ষমতা প্রত্যাহার করে জেলা জজের নেতৃত্বে জেলা দিওয়ানি আদালত পুনর্গঠিত হয়েছিল -- 'It was declared (Regulation VII of 1831) competent to Government to invest the Civil Judges with full powers to conduct the duties of the Sessions, and by Act III of 1835 the Government was authorized "to transfer any part or the whole of the duties connected with criminal justice from any Commissioners of Circuit to any Sessions Judges, and to define the powers which shall be exercised by each respectively".'[১১৬] তবে কমিশনারের ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য ক্ষমতা ও এক্তিয়ার ব্রিটিশ শাসনের শেষদিন পর্যন্ত বহাল ছিল।

এ পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক ও তথ্যবহুল বিবেচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রস্তুতকৃত 'Salaries Commission Report (1885-86)'[১১৭] থেকে বিভাগীয় কমিশনার-এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি তুলে ধরবো। বলাবাহুল্য, বর্ণনাটি দীর্ঘ, কিন্তু এর চুম্বক অংশ তুলে ধরলে ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামোয় তার অবস্থান সুনির্দিষ্ট হবে বলে মনে করিঃ

> Nearly every one of the numerous duties of the District Officer is exercised by him subject to the supervision of the Commissioner of Revenue and Circuit, and even in those branches of public business which do not, ordinarily, come under his immediate observation, he is at any time liable to be called on by Government to interfere or to give an opinion. His work, like that

---

১১৬. Report on the Administration of Bengal, 1921-22, pp. 52.

১১৭ Quoted from, The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 667-68. পরবর্তীকালে বিভিন্ন আইনে 'বিভাগীয় কমিশনার'দের যে ক্ষমতা ও কার্যাবলি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তাতেও মোটামুটি এগুলিই ছিল। এখানে ১৮৮৭ সালে 'The Punjab Land Revenue Act, 1887'-তে বিভাগীয় কমিশনার-কে প্রদত্ত ক্ষমতাবলির উল্লেখ করা হলো। বলাবাহুল্য পাঞ্জাবের জন্য প্রণীত আইনের কার্যাবলি বর্ণিত হলেও মোটামুটি বাংলাসহ ব্রিটিশ ভারতের অন্যত্রও এগুলিই কমবেশি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলি (আইনের হুবহু ভাষায় নয়) ঃ 'The State Government may appoint one or more Commissioners in a

of the Magistrate-Collector, may be divided into administrative and judicial – the former is far more onerous than the latter. A Commissioner's administrative work is very difficult to define, and there is hardly anything, except perhaps taking command of a fleet, or performing a surgical operation, that he may not be called upon, at one time or another, to undertake. He has to inspect the offices of all the Collectors under him once a year, and the Sub-Divisional Officers, as far as he can, and to see not only that work is properly performed, but that the people in all parts of the division are treated with due consideration, and all that affects their interest is carefully watched and reported by District and Sub-Divisional Officers as well as by the Police. He has to collect information from his District Officers concerning a vast variety of matters, and present it in a suitable shape to Government. He receives constant applications from he Collectors for sanction to the disbursement of money, and the performance of official acts, and to these he replies in some cases by giving sanction himself; in others by referring the question to higher authority. ... His *judicial* work consists in hearing appeals in Settlement, partition, certificate sale, wards' and Government estates, and under several other revenue laws, as well as appeals from ministerial and police officers regarding dismissal or other punishment. . .'

division. The Commissioner supervises all other Revenue Officers and their works in his division. He supervises the function of the Deputy Commissioner in the district and of other Revenue Officers subordinate to him. He can listen appeals against the order of the Collector of a district. The Commissioner may withdraw any appeal or application pending before any Revenue Officer subordinate to him or may either dispose it off by himself or refer the same for disposal to any other Revenue Officer. The most important power conferred on a Commissioner under this Act is that the sales of immoveable property for the recovery of arrears of land revenue are non completed till they have not received the confirmation of the Commissioner under section 92 of the Punjab Land Revenue Act. .. The Commissioner has powers to issue the statements of the function and duties of his subordinate officers. If the Commissioner feels that the administration of a district is not properly run by the Revenue Officer of the district concerned he may call the meeting of such Revenue Officers and may ask them for the proper functioning of the administrative works and duties with respect to such district.'
(দেখুন, Land Revenue Law, Dr. Badruddin, pp. 19-20).

অবশেষে বেন্টিঙ্কের রেখে যাওয়া ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসন সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকদের দু'একটি মন্তব্য উল্লেখ করে বিভাগীয় কমিশনারের আলোচনা শেষ করবো। বাংলা তথা ভারতে ৭-বছরব্যাপী গভর্নর-জেনারেলের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে লর্ড ক্যাভেন্ডিস বেন্টিঙ্ক যে সুস্থিত প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরি করেছিলেন, বিশেষত জেলা ও বিভাগীয় স্তরে, এবং কালক্রমে যা টিকেছিল বা টিকে গিয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত, সে সম্পর্কে তার অন্যতম জীবনীকার জন রসেলি অসঙ্কোচ মন্তব্য করেন এই বলে --
'This was in its day one of the most remarkable bureaucratic governments in the world, an administration of the written word rivalling Austria's in its ponderousness, so shaped by a variety of influences – eighteenth-century British distrust of centralised rule, the company's commercial origins, Indian distance, climate, and mortality – as to make even the imperfect translation of will into act a matter of years or decades.'[১১৮] অধিকন্তু এই আমলে বেন্টিঙ্কের উদার নীতি গ্রহণের ফলে প্রশাসনে অধিক হারে বাঙালি তথা ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এর ফলে, Dr Percival Spear-এর ভাষায় বলতে পারি, 'The process was hastened by the increase in the number of Indians entering the administration as a result of Bentinck's policy of Indianization. Thus, as the administration became more western in outlook, it also began to become more Indian in personnel. ... It was his other measures which may fairly be said to have introduced the west to the east and to have set in motion that process which has produced the India of today.'[১১৯]

কালেক্টর/ ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর/ ডেপুটি কমিশনার*

সমগ্র ব্রিটিশ বাংলা তথা ভারতীয় প্রশাসনযন্ত্রের সবচেয়ে কার্যকর, সবচেয়ে দৃশ্যমান ও সবচেয়ে

১১৮ Lord William Bentinck, pp. 298.

১১৯ A History of India, Vol. 2, pp 125-27.
প্রসঙ্গত, ১৮৬৭ সালের ভারতীয় প্রশাসনে মাসিক ৭৫ টাকা বা তদূর্ধ্বের বেতনভোগী কর্মচারীদের একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলো, যাতে দেখা যাবে -- মোট ১৩,৪৩১টি পদের মধ্যে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছিল যথাক্রমে ৪,৭৬০ ও ২,৬৩৩; কিন্তু হিন্দু ছিল ৫,০৯০ ও মুসলমান ৯৪৮। (Problems of British India, M Joseph Chailley, pp. 544). বলাবাহুল্য এই প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ জন্য কৃতিত্বের একক হকদার বেন্টিঙ্ক।

* এই সকল পদবিধারী কর্মকর্তা ছিলেন মূলত ব্রিটিশ জেলা প্রশাসনের মুখ্যনির্বাহি। জেলা প্রশাসন বলতে আমরা যা বুঝি সেটিও এখানে জানিয়ে রাখতে চাই। এককথায়, 'District administration is the management of public affairs within a territory marked off for the purpose. ... (*It*) provides the principal points of contact between the citizen and the processes of government. It is truly the cutting edge of the tool of public administration.' (District Administration in India, S. S. Khera, pp. 1-5).

উজ্জ্বলতম পদ হচ্ছে কালেক্টর/ ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর[১২০] /ডেপুটি কমিশনার[১২১]।
ইদানীন্তনকালে অবশ্য পদটির গুরুত্ব ও ঔজ্জ্বল্য অনেকখানি কমেছে, তথাপি তা যে এখনও একক ও অনন্য, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।
হেনরি ভেরেলস্ট (১৭৬৭-৬৯) নিযুক্ত 'সুপ্রাভাইজর' বা 'সুপারভাইজর'রাই (১৭৬৯) হলেন কালেক্টরের পূর্বসূরী। প্রাক-আলোচনায় আগেই দেখিয়েছি, ইংরেজ আমলে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে গোটা সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন নামের প্রশাসনিক স্তর বা ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছিল। যেমন প্রদেশ (Province), সরকার (Governorship) বা প্রেসিডেন্সি (Presidency), চীফ কমিশনারশিপ (Chief Commissionership), ১৮৩১-পরবর্তীকালের বিভাগ (Division), জেলা প্রভৃতি। তবে বলাবাহুল্য যে গভর্নরশাসিত এলাকা তথা প্রেসিডেন্সি ও জেলা ছাড়া অন্যগুলি বিভিন্ন সময়ের প্রশাসনিক সংস্কার বা বিবর্তনের ফল হলেও ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিওয়ানি অধিগ্রহণের অত্যল্পকালের মধ্যে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় ও

১২০ সাধারণভাবে 'District Officer' হতেন 'কালেক্টর'। Michael Edwardes বলেন, 'The pyramid of district rule had at its apex the collector who, as the name implies, collected the revenue.' (A History of India, pp. 258).
কালের বিবর্তনে তাকে কখনও কখনও ম্যাজিস্ট্রেট-কাম-কালেক্টর বা 'ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর' বা 'কালেক্টর-ম্যাজিস্ট্রেট'ও বলা হতো। General Sir O'Moore Creagh বলেন, 'At the head of the District is the Magistrate of the District; he is called in some provinces the Deputy Commissioner, and in others the Magistrate and Collector.' (Indian Studies, pp. 132).
তবে এটাও উল্লেখ্য যে, সচরাচর 'রেগুলেটরি' অর্থাৎ যে সকল প্রেসিডেন্সিতে (Regulation Provinces) ব্রিটিশ প্রণীত আইন-বিধি কার্যকর হতো বা ছিল, সেখানকার জেলাধ্যক্ষগণই 'কালেক্টর-ম্যাজিস্ট্রেট' পদবির হতেন। [দেখুন, The Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire (Administrative), Vol. IV., pp. 49].

১২১. 'রেগুলেটরি' প্রেসিডেন্সি-বহির্ভূত এলাকা যেমন দিল্লি, পাঞ্জাব, আসাম, টেনাসেরিম, সৌগড়, নর্বদা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং প্রভৃতি প্রদেশ বা অঞ্চলের জেলার প্রধান নির্বাহির পদবি হতো 'ডেপুটি কমিশনার'। ড. এইচ আর ঘোষাল-এর ভাষায়, 'The administration of the non-regulation tracts differed essentially from that of the regulation areas, being characterized, on the one hand, by the union of all powers -executive, judicial and police - in the district officers (usually calle deputy commissioners) and, on the other, by simple rules and procedures.' (A Comprehensive History of India, Vol. Eleven, pp. 619; আরও দেখুন, The Gazetteer of India: History and Culture, Vol. Two, Ed. by Dr. P. N. Chopra, pp. 731).
প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা যায় যে, জেলার দৈনন্দিন প্রশাসনিক প্রয়োজনে ডেপুটি কমিশনার স্বীয় কর্তৃত্বে স্থানীয় সামরিক বাহিনী আহ্বান করতে পারতেন।
(দেখুন, A History of India, Michael Edwardes, pp. 258).
'ডেপুটি কমিশনার'দেরও আবার ক্যাটাগরি ছিল, যেমন ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, History of British India (An Administrative System), Dr. Mohd. Ashiqullah Khan, pp. 17.

স্বদেশীয় নীতি-নির্ধারকদের সচেতন প্রচেষ্টায় হোক, কী কাল প্রবাহে -- বস্তুত 'সুপারভাইজর'দের শাসন-গতিকে কেন্দ্র করেই জেলা প্রশাসনের মূল অবকাঠামো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বলা যায় ১৭৭২ থেকে ১৯৪৭ -- অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংস-এর যুগ থেকে নিয়ে এদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের যে সর্বশেষ স্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তাতে সময়ে-সময়ে কালেক্টরের পদবি ও ক্ষমতার কিছু পরিবর্তন-সঙ্কোচনই কেবল হয়েছিল। তার আসল ভূমিকা অর্থাৎ কালেক্টরের প্রাথমিক ও মুখ্য দায়িত্ব ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত ও রাজস্ব উসুল, এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা -- আগাগোড়া একই রূপ থেকে গিয়েছিল এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য এখানে ব্রিটিশ পূর্ব যুগে বিশেষত মোগল ও নবাবি আমলের জেলা প্রথা (সরকার ও পরগণা ব্যবস্থা) সম্বন্ধে সামান্য ধারণা দেয়াও আবশ্যক।

'কালেক্টরে'র পূর্বোদ্ধৃত কাজ মোগল যুগে দু'জন কর্মচারী দ্বারা সম্পন্ন হতো। আমিল বা আমলগুজার, কড়োরি, দিওয়ান ইত্যাদি পদবির কর্মচারীরা ভূমিরাজস্ব নিরূপণ ও আদায়ের কাজ করতেন। ফৌজদারগণ (এদের পদবিও কখনও কখনও আমিল হতো) দেখাশুনা করতেন জেলার আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনের কাজ। অন্যদিকে ফৌজদারি বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল কাজির ওপর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ যুগে কালেক্টর বা ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর এককভাবে বা যৌথভাবে যে দায়িত্ব-কর্তব্য নির্বাহ করতেন, মোগল ও নবাবি শাসনামলে সেগুলিই করতো সরকারের তিন-তিনজন কর্মচারী।[১২২] ফলে দিওয়ানি অধিগ্রহণের পর থেকেই 'কোম্পানির সরকার চেষ্টা করে পরগণা ও সরকার উঠিয়ে দিয়ে শুধু জেলাকে আঞ্চলিক প্রশাসন ইউনিট করতে। কোম্পানির শাসনকাঠামোয় আন্তঃবিভাগীয় স্বাধীনতা না থাকায় এবং ফৌজদারি বিচার ও রাজস্ব সংগ্রহ ক্ষমতা এক কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় পূর্বেকার পরগণা, সরকার ও জেলা সমন্বিত করে একটি ডিস্ট্রিক্ট বা জেলা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়।'[১২৩]

যা হোক ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসই সর্বপ্রথম সমন্বিত ব্রিটিশ জেলা সৃষ্টি করেছিলেন।[১২৪] তিনি 'সুপারভাইজর'দের পদবি পাল্টে করেন 'কালেক্টর' (মে, ১৭৭২)।[১২৫] বলাবাহুল্য, হেস্টিংস থেকে কর্নওয়ালিস পর্যন্ত দু'দশকে 'অন্যান্য প্রশাসনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ন্যায় জেলা প্রথা ও জেলা সীমানাও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন' হয়েছিল। হেস্টিংস বাংলা, বিহার ও ওড়িশা (ওড়িশার সামান্য অংশ মাত্র)-কে মোট ১৪টি জেলায় বিভক্ত করেছিলেন[১২৬].

---

১২২. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মৎপ্রণীত 'বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ১ম খণ্ড (প্রাচীনকাল থেকে ১৭৬৩ খ্রি: পর্যন্ত)' দেখুন।

১২৩. বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃষ্ঠা ২২৭।

১২৪. বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃষ্ঠা ২২৮। প্রখ্যাত প্রশাসক-লেখক আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, 'This is the famous Hastings' Plan of 1772 to which the office of the D.C. owes its origin.' (The Deputy Commissioner in East Pakistan, A M A Muhith, pp. 6).

১২৫. The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 669. 'The servants of the Company employed in the districts under the designation of "Supervisors" or "Supravisors" were henceforth to be termed "Collectors".' (The Fifth Report, pp. 521).

১২৬. 'After several abortive experiments an entirely new system was introduced by Warren Hastings. European Collectors were appointed

পরবর্তীতে তারই সময়ে তা ১৯টিতে উন্নীত হয়েছিল।[১২৭]
এখানে হেস্টিংস-নিযুক্ত কালেক্টরদের কার্যাবলি সম্পর্কে এককথায় বলা যেতে পারে, 'The collectors from the time of Warren Hastings, besides being responsible for the revenue, were vested with certain judicial powers in civil cases especially connected with the rights of land-holders and cultivators, and claims arising between them and their servants.'[১২৮]
নিযুক্তির অল্পদিনের মধ্যে (১৭৭৩) কালেক্টরদের প্রত্যাহার করে তদস্থলে দেশি কর্মচারীদের পদস্থ করা হয়েছিল। এদের নাম রাখা হয় 'আমিল'[১২৯] বা ফৌজদার।[১৩০] কিন্তু আমিলদেরকেও সরে যেতে হয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যে। ১৭৮৬ সালে জেলাগুলিতে পুনরায় ইউরোপীয় কালেক্টর নিয়োগ দিয়ে পাঠানো হয়।[১৩১] এবারে -- 'The main changes in the office since that time have been with reference to the union of Magisterial and Civil Court powers with Revenue duties.'[১৩২]
বলা যেতে পারে এ থেকেই কালেক্টর বা কালেক্টর-ম্যাজিস্ট্রেটদের অব্যাহত অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল। তবে এখানে কালেক্টরের তথা বাংলার আধুনিক জেলা প্রশাসনের বিবর্তনের আরও কিছু ঐতিহাসিক তথ্য-পরম্পরা তুলে ধরা দরকার, নচেৎ এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে মনে করি।

---

in each of the fourteen Districts into which Bengal was then divided, and the collection of the revenue was placed in their hands.' (Imperial Gazetteer of India· Provincial Series: Bengal, Vol. I., pp. 29).

১২৭. দেখুন, Summary of Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal (1757-1916), Rai Manohan Chakrabarti, pp. 9-10; বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃষ্ঠা ২২৮। কেউ কেউ অবশ্য ২৩টি জেলার উল্লেখ করেছেন। দেখুন, The Deputy Commissioner in East Pakistan, pp. 7; District Administration in Bangladesh, Qazi Azher Ali, pp. 3.
তবে ইংরেজ প্রশাসক-ঐতিহাসিক H. V. Lovett সূত্রে জানা যায় কর্নওয়ালিস যখন বাংলা ত্যাগ করেন তখন বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় মোট ১৬টি জেলা ছিল। জেলাগুলি ছিল বৃহদাকার। (দেখুন, The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 23).

১২৮. Role of Higher Civil Servants in Pakistan, pp. 15.

১২৯. The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 669.

১৩০. Report on the Administration of Bengal (1921-22), pp. 48.

১৩১. এ সময় প্রকৃত কতোটি জেলা ছিল এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বেশ মতভেদ রয়েছে। এর কারণ অবশ্য সঠিক তথ্যের অভাব।
তবে তা, ড. রাধাকুমুদ মুখার্জির মতে, ৩৫টি (Indian Land-System, pp. 202). আবার তিনি জন শোর-এর 'Minute of 13th March, 1787'-এর সূত্রে কমিয়ে আনা জেলার সংখ্যা উল্লেখ করেন ২৩টি (Op. Cit. 203). অন্যদিকে কাজী আজহার আলীর মতে, ৩৬টি জেলা (Decentralised Administration in Bangladesh, pp. 82 & District Administration in Bangladesh, pp. 4) ইত্যাদি।

১৩২. The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 669.

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিস তদীয় 'Code' মারফত আরেকবার জেলাগুলিকে পুনর্গঠিত করেন। তার সময়েই (১৭৯০) আধুনিক জেলা প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল বলে কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন।[১৩৩] এ সময় বৃহত্তর বাংলায় ব্রিটিশ অধিকার আগের তুলনায় অনেক সম্প্রসারিত হয়েছিল, কিন্তু কর্নওয়ালিস প্রধানত প্রশাসনিক ব্যয় সঙ্কোচনের অজুহাতেই স্থিত জেলার সংখ্যা কমিয়ে মাত্র ১৫টিতে সীমিত করেন।[১৩৪] এতে বুঝা যায়, কর্নওয়ালিসকর্তৃক পুনর্বিন্যস্ত '১৭৯৩ সনের জেলাগুলো ছিল অতিকায়'।

উল্লেখ্য পুনর্গঠিত জেলাগুলি আয়তনে সুবিশাল হওয়ায় একজন মাত্র কালেক্টরের পক্ষে যেমন তার ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায় কাজের তদারক করা ছিল কষ্টকর, তেমনি এর চেয়েও জটিল ও দুরূহ হয়ে পড়েছিল জেলার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমাগত ভূমি হস্তান্তরের ফলে জমিদারিগুলির সীমানা-বদল, নতুন জমিদার বিশেষত 'কলকাতা বেনিয়ান'গোষ্ঠীর জমিদারি ক্রয়ে নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব, দিওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের বিচারক যথাক্রমে জজ ও কালেক্টরের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, কৃষির প্রসার ইত্যাদির ফলে প্রদেশের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, বিদ্যমান জেলাগুলির পুনর্বিন্যাস আরেকবার জরুরি হয়ে পড়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে কোম্পানির সরকার কয়েকটি বড় জেলা ভেঙে নতুন কিছু জেলা সৃষ্টি করতে বাধ্য হলো। যা হোক, ১৭৯৩ থেকে কোম্পানির শাসনাবধি (১৮৫৬) নতুন সৃষ্ট জেলাগুলি[১৩৫] --

নবসৃষ্ট জেলার নাম	সন	মূল জেলা
হুগলি	১৭৯৫	বর্ধমান
মালদহ	১৮১৫	পূর্ণিয়া
ফরিদপুর	১৮১৫	ঢাকা
বাকেরগঞ্জ	১৮১৭	ঢাকা
দার্জিলিং	১৮১৭	সিকিম থেকে পাওয়া
বগুড়া	১৮২১	রাজশাহি
নোয়াখালি	১৮২২	ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম
পাবনা	১৮২৮	রাজশাহি-যশোহর
বাঁকুড়া	১৮৩৭	বর্ধমান
সাঁওতাল পরগণা	১৮৫৬	বীরভূম

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বপর্যন্ত কালেক্টরগণ ভূমিরাজস্ব, ম্যাজিস্ট্রেসি ও দিওয়ানি আদালতের ক্ষমতা কমবেশি ভোগ বা প্রয়োগ করে এলেও কর্নওয়ালিস, তদীয় ২নং প্রবিধান বলে (Regulation II of 1793) তাদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করেন। নতুন বিধানে প্রত্যেক জেলায় দু'টি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ -- কালেক্টর ও জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বেতন-ভাতা ও পদমর্যাদায়

১৩৩. বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃষ্ঠা ২২৯।

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৮।

১৩৫. Summary of Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal (1757-1916), সংগৃহীত, বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃষ্ঠা ২২৯।

জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কালেক্টরের কিছুটা উপরে।[১৩৬]

মোটের উপর কালেক্টর ও জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বলতে এ সময় বুঝাতো -- '.. the Collector with executive duties concerning the collection of revenues and the purchase of merchandise for the Company, and the Judge-Magistrate with the civil and criminal jurisdiction."[১৩৭]

কর্নওয়ালিসের নতুন ব্যবস্থার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দিক ছিল, এতে কালেক্টরের ভূমিরাজস্ববিষয়ক মামলা বিচারের ক্ষমতাই শুধু কেড়ে নেয়া হয়েছিল তাই নয়[১৩৮], উপরন্তু তাকে আইনেরও অধীন করা হয়েছিল।[১৩৯] সত্যি বলতে এ ছিল এক অভূতপূর্ব আইনি সংযোজন, যদিও পরবর্তীকালে প্রশাসনিক কর্তব্যকালীন কৃতকর্মের জন্য তাকে আদালতের দায়মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল।

লর্ড কর্নওয়ালিস-এর সময়ে বৃটিশসৃষ্ট জেলাগুলিতে কালেক্টরেরা রাজস্বসংক্রান্ত যে ব্যাপক-বিস্তৃত ক্ষমতা ও কার্যাবলি নির্বাহ করতেন নিচে তার কিছু সুচয়িত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

> The Revenue duties of the Collector, .. were originally enumerated in Regulation II of 1793. His duties have increased in many directions. ... The Collector has to look after the collection of this LAND-REVENUE, involving the sale for arrears in the case of the 'Zamindari' estates, ... He has also the collection of the local or provincial rates, which consist of the Public Works cess.., a cess levied for roads and provincial public works; and the Postal cess .. which provides for local official postage. Besides this, there is the whole subject of the EXCISE revenue under his care .. . To this must be added the supervision of the LICENCE-TAX and INCOME TAX, and the STAMP Revenue. Besides the collection of these revenues, there are all the connected duties which the land-revenue system entails, viz. the registration of titles to land; issue and recovery of loans for agricultural improvements; embankments ..; irrigation ..; the opening of separate accounts, for sharers and others in estates paying one sum of revenue; management of patwaris..; various

১৩৬. কালেক্টরের মাসিক বেতন যেখানে ছিল ১,৫০০ থেকে ২,০০০ টাকা, সেখানে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পেতেন মাসে ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ টাকা।

(দেখুন, Minute of Lord Cornwallis, 11 February, 1793, in Second Report (1810), Parliamentary Select Committee, App, 9A. সংগৃহীত, বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃষ্ঠা ২৩০)।

বলাবাহুল্য কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞদেরই জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত করা হতো। অন্যদিকে কালেক্টরগণ ছিলেন অপেক্ষাকৃত নবীন।

১৩৭. A Comprehensive History of India, Vol. Eleven, pp. 522-23.

১৩৮. 'His Revenue court was abolished. He ceased to be a Magistrate (*too*).' (A Comprehensive History of India, Vol. Eleven, p. 522).

১৩৯. বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃষ্ঠা ২৩০।

. applications under the Tenancy Law (Act VIII of 1885); the management of estates of minors under the Court of Wards, and of attached estates (for recovery of debts due by the owners)."[১৪০]

কর্নওয়ালিসের পরে কালেক্টরদের ক্ষমতা কাঠামোয় সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনামলে, ১৮৩১ সালে।

.বেন্টিঙ্ক 'বিভাগীয় কমিশনার' পদ সর্জনের মাধ্যমে যেমন দিওয়ানি আদালত তথা জেলা জজের ক্ষমতা তার (কমিশনার) উপর ন্যস্ত করেছিলেন (১৮২৯), তেমনি একই সময়ে জজকর্তৃক এ যাবৎ (১৮২৯-১৮৩১ -- দু'বছর ব্যতীত) নির্বাহ করে আসা ভূমি ও ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত মামলা বিচারের ক্ষমতা কালেক্টরের হাতে অর্পণ করেছিলেন। Sir Harrington Verney Lovett বলেন, 'In 1831 further changes were ordained. Sessions work was transferred from the commissioners to the district civil judges, who made over their magisterial duties to the collectors.'"[১৪১]

কিন্তু এই ব্যবস্থাও ছিল সাময়িক। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড অকল্যান্ড (১৮৩৬-৪২)-এর শাসনপর্বে কালেক্টরের মামলা বিচারের ক্ষমতা প্রত্যাহার ও স্বতন্ত্র ম্যাজিস্ট্রেট পদ সৃষ্টি করে তার উপর ভার দেয়া হলো।[১৪২] এর ফলে -- 'Almost every district had its civil and sessions judge, its collector and its magistrate; ..'"[১৪৩]

প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা আলাদা হলেও ১৮৪৫ সাল নাগাদ ওড়িশার ৩টি জেলায় তখনও পর্যন্ত

---

১৪০. The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 670-71.
পরবর্তীকালেও কালেক্টরের মূল রাজস্ববিষয়ক ক্ষমতা মোটামুটি একই রকম ছিল। প্রসঙ্গত 'The Punjab Land Revenue Act, 1887' থেকে কালেক্টর-এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হলো (হুবহু আইনি ভাষায় নয়) ঃ
"The Deputy Commissioner is called the Collector of a district when he discharges his functions as Revenue Officer. ... The Collector is the Senior most Officer of the district. He supervises the works of the Revenue Officers subordinate to him. ... Being the head of the district the Collector or the Deputy Commissioner watches the over all administration of the district *e.g.*, administration of civil justice, the progress of public works and is also responsible for maintaining Law and order situation in the district. ... the Deputy Commissioner may withdraw any case or application pending before any Revenue Officer under his control and he may either dispose it off himself or by written order refer it for disposal to any other Revenue Officer under his control. .. ."
(Land Revenue Law, pp. 20).

১৪১. The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 24.

১৪২. The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 24; British Paramountcy and Indian Renaissance, Vol. IX., Part I., pp. 325.

১৪৩. The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 24.

কালেক্টর-ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১৪৪]
অন্যদিকে পাটনা, মালদহ, বগুড়া, নোয়াখালি, ফরিদপুর, বাঁকুড়া, বারাসত ও চম্পারণ -- এই ৮টি জেলায় নবসৃষ্ট 'স্বাধীন যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট' ("independent"joint magistrates)-দের অধীনে ম্যাজিস্ট্রেসি ও রাজস্ব একীভূত অবস্থায় কার্যকর ছিল।[১৪৫]
১৮৫৯ সালে লর্ড ক্যানিংকর্তৃক কালেক্টরের বিচারিক ক্ষমতা (ম্যাজিস্ট্রেসি) পুনরায় প্রত্যর্পিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জেলার প্রধান নির্বাহি (District Officer) হিশেবে কালেক্টরের হাতে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি মামলা বিচারের ভার তথা ম্যাজিস্ট্রেসি দেয়া হবে কি-না, এ যাবৎ নীতি-নির্ধারক ও বিশেষত প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তামহলে প্রচুর পক্ষে-বিপক্ষে মতামত প্রকাশিত-উত্থাপিত হলেও শেষ পর্যন্ত এই ক্ষমতা কালেক্টরের কাছে রাখার কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তের মূলে যে প্রণোদনা ও উদ্দেশ্য কাজ করেছিল সে সম্পর্কে লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-৫৬)-র বক্তব্য প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় এখানে তুলে ধরা হলো।
ডালহৌসি মনে করতেন, কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট -- এই দুই পদের আলাদা অবস্থান সুষ্ঠু, শক্তিশালী ও জনকল্যাণধর্মী প্রশাসন পরিচালনার শুধু প্রতিকূলই নয়[১৪৬], বরং তা এতদঞ্চলের সুদীর্ঘ প্রশাসনিক ঐতিহ্যবিরোধীও বটে -- *'to identify the defects,* 'that great governor-general (*Lord Dalhousie*) gave the first place to "the separation of the offices of collector and magistrate contrary to the system which had long prevailed in the lieutenant-governorship of the North-Western Provinces".'[১৪৭]
যা হোক, সর্বশেষ[১৪৮] এই পরিবর্তন তথা কালেক্টর-ম্যাজিস্ট্রেটের একীভূতকরণ ছিল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ফলোৎপাদক।

এ পর্যায়ে ব্রিটিশ আমলের জেলাগুলির আয়তন ও কালেক্টরের অধস্তন সহকর্মীদের সম্পর্কে দু'একটি জ্ঞাতব্য বিবৃত করে এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করবো।
১৭৬৯-১৭৭২ এবং ১৭৯৩ থেকে কোম্পানির শাসন পর্যন্ত কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা বা জেলার সীমানা বিভিন্ন সময়ে কমানো-বাড়ানো হলেও ১৮৫৮ সাল নাগাদ এর যে অধিক্ষেত্র ও পরিসীমা লক্ষ্য করা যায়, তাতে এক-একটি জেলার গড়পরতা আয়তন ছিল মোটামুটি ৩,০০০

---

১৪৪. The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 24; British Paramountcy and Indian Renaissance, Vol. IX., Part I., pp. 325.
১৪৫. The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 25; British Paramountcy and Indian Renaissance, Vol. IX., Part I., pp. 325.
১৪৬. 'In the opinion of Dalhousie, the separation of two offices was injurious both to the administration and to the interests of the people.' (A Comprehensive History of India, Vol. Eleven, pp. 537).
১৪৭. Quoted from, The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 28.
১৪৮. 'It was only in 1859 that the Magisterial and Revenue functions were again, finally, united.
(The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 670).

বর্গমাইল ও ১৫/২০টি থানা (Police-station) সমন্বিত।[১৪৯] পরবর্তীকালে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমাবধি সমগ্র ভারতব্যাপী বৃটিশ অধিকার যখন আরও সম্প্রসারিত ও প্রশাসনিক অবকাঠামো আরও সুগঠন ও সুস্থিতি লাভ করে তখনকার (১৯০৭) জেলাগুলির আয়তন ছিল গড়ে ৪,৪৩০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৯,৩১,০০০ জন[১৫০]।

অবশ্য অতিবৃহৎ কিছু জেলাও ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ময়মনসিংহ (আয়তনে ৬,০০০ বর্গমাইলেরও বেশি এবং লোকসংখ্যা ৪০,০০,০০০), মাদ্রাজের বিশাখাপট্টম (১৭,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩০,০০,০০০), বার্মার আপার চিন্দউইন (১৯,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১,৫৩,০০০) এর নামোল্লেখ করা যেতে পারে।[১৫১]

জেলাসমূহের আয়তনিক এই বিশালতা আমাদের সামনে একটা জিনিস নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত করে যে, সরকার ততোদিনে সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনার উপযুক্ত প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, শক্তি ও লোকবল হাসিল করে ফেলেছিল।

যা হোক, জেলার আয়তন ক্রমশ সম্প্রসারিত হওয়ায় এবং একই সঙ্গে জেলা প্রশাসনের কাজের চাপ ও জটিলতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাওয়ায় একজন মাত্র কালেক্টর বা ডেপুটি কমিশনারের পক্ষে তা সামাল দেয়া ছিল প্রকৃতই দুরূহ। ফলে জেলা প্রশাসনে ১৮২১ সালের ৪নং প্রবিধান বলে একজন 'সহকারী' (Assistant-Collector) নিয়োগ করা হয়েছিল। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, এর আগে কালেক্টরের কোন সহযোগী বা সহকারী ছিল না। তবে তারা ছিল অনানুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত এবং 'had no legal powers'. বস্তুত ১৮২১ সালেই সর্বপ্রথম 'চুক্তিবদ্ধ' (Covenanted) ইউরোপীয় সহকারী-কালেক্টরের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।[১৫২] পরবর্তীকালে ১৮৩৩ সালের ৯নং প্রবিধান মূলে 'ডেপুটি কালেক্টর' (Deputy Collectors) নিয়োগ কবা হয়েছিল।[১৫৩] এদের অধিকাংশ শুধু 'অ-চুক্তিবদ্ধ' (Uncovenanted) কর্মচারীই ছিল না, উপরন্তু ডেপুটি-কালেক্টরদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ভারতীয় (Indians)[১৫৪],

১৪৯. The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 26.

১৫০. The Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire (Administrative), Vol. IV, pp. 48.

১৫১. Ibid., pp. 48-49.

১৫২. The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 673.

১৫৩. The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 24; The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 673.
ড. এইচ আর ঘোষাল, ১৮৪৩ সালে 'ডেপুটি কালেক্টর'দের আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন (দেখুন, A Comprehensive History of India, Vol. Eleven, pp. 536)। কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে ১৮৪৩ সালে 'ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট'দের নিয়োগ আইনসিদ্ধ (Legalised) করা হয়েছিল।
(দেখুন, Historical Summary, Bengal Administration Report, 1911-12, p. 45-46; সংগৃহীত, The Cambridge History of India, Vol. VI., p. 25).

১৫৪. প্রবল ভারতীয় তথা বাঙালি বিদ্বেষী কর্নওয়ালিস তার Code মারফত ইতোপূর্বে ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রশাসনে এদেশীয়দের নিযুক্তি নিষিদ্ধ করেছিলেন। ফরাসি লেখক M. Joseph Chailley বলেন, 'When Lord Cornwallis, during his first Governor-Generalship

অবশ্য ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় (Eurasians)-ও কিছু কিছু ছিল।[১৫৫]
এতদসত্ত্বেও কালেক্টরের কাজের চাপ কমানো গেল না। ১৮৭২-৭৩ সালের দিকে তাই 'সাব-ডেপুটি-কালেক্টর' (Sub-Deputy-Collectors) নিয়োগ দিয়ে সেই চাপ কিছুটা হ্রাসের চেষ্টা করা হয়েছিল।[১৫৬]
পরে জেলাকে আরও ক্ষুদ্র প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করে নাম দেয়া হয়েছিল 'সাব-ডিভিশন' (Sub-division)[১৫৭], এর প্রশাসনিক অধিকর্তা ছিলেন 'Sub- Divisional Officer'. আগেই জানিয়েছি. বেন্টিঙ্কের সময়ে ছোট ও দূরবর্তী জেলাগুলিতে 'যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট' নিযুক্ত করা হয়েছিল[১৫৮]; পরবর্তীকালে এদের উপরই জেলার অব্যবহিত-নিম্নবর্তী প্রশাসনিক একক হিশেবে

(1786-93), resolved, taking up the plans of Clive, to purify a corrupt administration, he felt himself obliged to remove nearly all the native functionaries from important posts. .. Cornwallis intended that the revenues should go in full to the Company.' (Problems of British India, pp. 530-31). লর্ড বেন্টিঙ্ক সেই নিষেধাজ্ঞার দ্বার কিছুটা হলেও উন্মোচিত করেছিলেন প্রশাসনের নিম্ন-পদে তথা ডেপুটি-কালেক্টর প্রভৃতি পদে ভারতীয় ও বাঙালিদের নিয়োগের মাধ্যমে। Chailley-র ভাষায়, 'This policy continued till about 1830, when a subsequent Governor-General, the generous and far-seeing Lord William Bentinck, opened up a number of responsible executive and judicial appointments to natives, and thus laid the foundation of what is now known as the "Provincial Services".' (Op. Cit. pp. 531).

১৫৫. The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 24.

১৫৬. 'In 1872, Executive Revenue Officers called 'Sub-Deputy Collectors' were appointed for the purpose of giving local or special aid for particular places or departments of duty.'
(The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 673).

১৫৭. সমগ্র ব্রিটিশ যুগে যুগপৎ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ভূমিরাজস্ব আদায়ের সঙ্গে জড়িত কালেক্টর বা 'সাব-ডিভিশনাল অফিসার'-এর অফিসানুরূপ অব্যবহিত-পরবর্তী আর কোন অধস্তন বা নিম্নবর্তী প্রশাসনিক স্তর বা ইউনিট (lowest tier of administration) ছিল না।
(দেখুন, Bengal District Administration Committee Report, 1913-14, pp 25; Decentralised Administration in Bangladesh, pp. 97).
এখানে প্রসঙ্গত এটাও জানিয়ে রাখা যায় যে, তৎকালীন যশোহর জেলার অধীন 'খুলনা' (Khulna) ছিল ব্রিটিশ-সৃষ্ট প্রথম 'Sub-division' বা মহকুমা। (Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. 26). ১৮৪৫ সাল নাগাদ গোটা বৃহত্তর বাংলায় মহকুমার সংখ্যা ছিল ৩৪টি (The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 674)। অন্যদিকে Buckland ও Lovett-সূত্রে জানা যায়, স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে-র লেফটেন্যান্ট-গভর্নরশিপ-কালে, ১৮৫৬ সালে, সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেসি ছিল ৩৩টি। (দেখুন, Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. 26, 219; The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 25).

১৫৮. যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট-এর পাশাপাশি, গ্রামাঞ্চলের সুষ্ঠু বিচার প্রশাসন পরিচালনার্থ ১৮৫৭ সালে 'অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট' (Honorary Magistrates) পদও সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৮৫৯

'সাব-ডিভিশনে'র ভূমিরাজস্বসহ সার্বিক প্রশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল। Lovett বলেন, 'Desiring to give collectors and magistrates special assistance from senior subordinates who would be entrusted with powers wider than those which could be conceded to ordinary assistants, covenanted or uncovenanted, the government of Lord William Bentinck created a rank of "joint magistrate"... Later on, with the double object of increasing magisterial control over the police and of bringing justice nearer to the doors of the people, joint magistrates were posted to the charge of subdivisions of districts with the title of "subdivional officer"."[১৫৯] 'These officers resided in their subdivisions."[১৬০]

উপসংহারে আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে, বস্তুত আমাদের এ যাবৎকালের আলোচনার সুদীর্ঘ পরিসরে এটা এক্ষণে সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সর্বজনস্বীকার্য হবে বলে ধারণা করা যায় যে, 'The administration set up by the British was, on the whole, more vigorous, more powerful and more comprehensive than any before. In evaluating its success, it has to be remembered that they had a number of advantages over their predecessors, such as priting press and wider diffusion of knowledge, epoch-making developments in science and technology, growth of more rational and systematic ideas in respect of government and public administration and the spirit of adventure."[১৬১] ।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার বা সংযোজন-বিয়োজনের ফলে কালেক্টরের ক্ষমতা ও কার্যাবলি অনেকখানি হ্রাস বা সঙ্কুচিত হয়েছিল, তথাপি সেই শক্তিশালী ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব প্রশাসনযন্ত্রে সরকার ও ভূমিরাজস্ব প্রদাতৃশ্রেণী তথা জমিদার-তালুকদার ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিকগণ এবং কৃষকদের মধ্যকার সরাসরি যোগসূত্র হিশেবে জেলা প্রশাসক বা কালেক্টর বা কালেক্টর-ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসনের অধিষ্ঠান অদ্যাবধি নিঃসন্দেহে অনন্য ও অতুলনীয়। কেননা ততোদিনে[১৬২] --'The district administration has now evolved into a fairly clear establishment, conforming to the total purpose and apparatus of government in the district. The purpose is three-fold: the maintenance of law and order, the revenue administration, and the

---

সালে স্যার হ্যালিডে, উক্ত পদ বিলোপ করলেও অচিরেই ১৮৬০-৬১ সাল নাগাদ গভর্নর-জেনারেলের ঐকান্তিক আগ্রহে এরা পূর্ণোদ্যমে দায়িত্ব পালন শুরু করেছিল।
(দেখুন, Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., pp. 227).

১৫৯. The Cambridge History of India, Vol. VI., pp. 25.

১৬০. Ibid., pp. 25.

১৬১. The Gazetteer of India: History and Culture, Vol II., pp. 732-33.

১৬২. District Administration in India, pp. 254.

development activities for the economic and social advancement of the people of the district.'

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটিশ জেলা প্রশাসন ও বিচার বিভাগ

১. জেলা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট
২. কালেক্টর
৩. দেশি বা 'নেটিভ' কমিশনার বা 'মুন্সেফ'

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের কালেক্টরেট

১. কালেক্টর
২. অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর
৩. ডেপুটি কালেক্টর

ম্যাজিস্ট্রেসি

১. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
২. যুগ্ম ম্যাজিস্ট্রেট
৩. অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট
৪. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

জজশিপ

১. জেলা জজ
২. অতিরিক্ত জেলা জজ
৩. মুখ্য সদর আমিন
৪. সদর আমিন
৫. মুন্সেফ

১৯২১-২২ পরবর্তী কালেক্টরেট ও জজশিপ

	কালেক্টরেট		জজশিপ
১.	ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর	১.	জেলা ও সেসন্স জজ
২.	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	২.	অতিরিক্ত জেলা ও সেসন্স জজ
৩.	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর	৩.	সাবর্ডিনেট বা অধস্তন জজ ও জাজেস অফ দ্য স্মল কজেস কোর্ট
৪.	সাব-ডেপুটি কালেক্টর	৪.	মুন্সেফ

সূত্র: বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃষ্ঠা ২৩৪; Report on the Administration of Bengal (1921-22), pp. 76

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি (Selected Bibliography)

গেজেটীয়ার, রিপোর্ট, প্রতিবেদন, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি

*বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর ঢাকা, ১৯৯৩ : ড. শেখ মাকসুদ আলী

*বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর রংপুর, ১৯৯০ : নুরুল ইসলাম খান

*বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর রাজশাহী, ১৯৯১ : নুরুল ইসলাম খান

*বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর টাঙ্গাইল, ১৯৯০ : নুরুল ইসলাম খান

*বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর ময়মনসিংহ, ১৯৯২ : নুরুল ইসলাম খান

*বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বাখরগঞ্জ, ১৯৮৪ : মেঃ জেঃ (অবঃ) এম এ লতিফ

*ইতিহাস-অনুসন্ধান : গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কে পি বাগচী, ১৯৮৬

*ইতিহাস-অনুসন্ধান-২ : গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কে পি বাগচী, ১৯৮৭

*ইতিহাস-অনুসন্ধান-৩ : গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কে পি বাগচী, ১৯৮৮

*ইতিহাস-অনুসন্ধান-৪ : গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কে পি বাগচী, ১৯৮৯

*ইতিহাস-অনুসন্ধান-৫ : গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কে পি বাগচী, ১৯৯০

*ইতিহাস-অনুসন্ধান-৬ : আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ সম্পাদিত, কে পি বাগচী, ১৯৯১

*দৈনিক আজাদী : ৩৫ বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫

মূল ও অনূদিত গ্রন্থাদি

আকাশ, ড. এম. এম. : *ভাষা আন্দোলন: শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯০

আজাদ, প্রেমেন ইবনে আড্ডি (মূল) অনুবাদ আনোয়ারুল হক : *বিভাগপূর্ব বাংলার রাজনীতি ও সমাজ, মুক্তধারা, ১৯৮৮

আজাদ, ড. লেনিন : *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭

: *ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষি কাঠামো, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯

আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ	*বাঙলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬
আহমদ, ড. ওয়াকিল	*উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭
	*বাংলায় বিদেশী পর্যটক, ঢাকা, ১৯৯০
আহমেদ, ড. শরীফ উদ্দিন	*ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০-১৯২১), একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১
ইসলাম, আনোয়ারুল	*বাংলাদেশ: সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭
ইসলাম, কাবেদুল	*বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯
	*বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ১ম খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১
ইসলাম, ড. সিরাজুল	*বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো (১৭৫৭-১৮৫৭), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, ১৯৯৯
ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল	*বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস, প্যাপিবাস, ঢাকা, ১৯৯৬
উমর, বদরুদ্দীন	*চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৩
	*বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮
কবিরাজ, নরহরি	*স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, মনীষা, কলকাতা, ১৯৮৬
কিং, ব্লেয়ার বি (মূল), অনূদিত ফরহাদ খান ও জুলফিখার আলী	*নীল বিদ্রোহ, বাংলায় নীল আন্দোলন (১৮৫৯-১৮৬২), আইসিবিএস, ১৯৯৫
খান, এ এ	*ভূমি আইন ও ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়েল, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯০
খাসনবিশ, ড. রতন	*আধা সামন্ততন্ত্র ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি, পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৮৬
গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ	*বিক্রমপুরের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৮
ঘোষ, ড. অজিতকুমার (প্রধান সম্পাদক)	*রামমোহর রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮
ঘোষ, বিনয়	*পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৫
	*পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৯২
	*পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ৩য় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৪
ঘোষ, মুরারি	*দ্বারকানাথ ও ভারতে বুর্জোয়া যুগের উদ্বোধন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০০

চক্রবর্তী, ড. রণবীর, কুণাল চক্রবর্তী ও অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	ঃ	*সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস: অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০
চক্রবর্তী, রতন লাল	ঃ	*সিপাহিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬
চন্দ্র, ড. বিপান (মূল) হিমাচল চক্রবর্তী সম্পাদিত	ঃ	*ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, কে পি বাগচী, কলকাতা, ১৯৯৮
(মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী, কে এন পানিক্কর ও সুচেতা মহাজন সহযোগে), ভাষান্তর সুনীল মুখোপাধ্যায়	ঃ	*ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৮৫৭-১৯৪৭), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৪
চৌধুরী, আবদুল হক	ঃ	*চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮
চৌধুরী, কমল	ঃ	*চব্বিশ পরগণা : উত্তর, দক্ষিণ, সুন্দরবন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯
চৌধুরী, ড. কেশব	ঃ	*ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০
চৌধুরী, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন	ঃ	*জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭
চৌধুরী, ড. বিনয়ভূষণ ও অন্যান্য	ঃ	*বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন, দ্বিতীয় ভাগ, আইসিবিএস, ১৯৯৬
চৌধুরী, মীর ফজলে আহমদ	ঃ	*দলিলপত্রে পলাশীর যুদ্ধ, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১
চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর	ঃ	*বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫
চৌধুরী, ড. শশিভূষণ	ঃ	*সিপাহী বিদ্রোহ ও গণবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৮৫৭-১৮৫৯), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬
চৌধুরী, ড সিরাজুল ইসলাম	ঃ	*বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৮
	ঃ	*বাঙালীর জাতীয়তাবাদ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০
জলিল, এ এফ এম আবদুল	ঃ	*সুন্দরবনের ইতিহাস (প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ড একত্রে), লিঙ্কম্যান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৮
ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ, নেপাল মজুমদার সম্পাদিত	ঃ	*বোম্বাই রায়ৎ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬
দত্ত, অমর	ঃ	*উনিশ শতকের মুসলিম মানস ও বঙ্গভঙ্গ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫
দত্ত, ড. অম্লান	ঃ	*শতাব্দীর প্রেক্ষিতে ভারতের আর্থিক বিকাশ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৮
দত্ত, ড. মিলন ও অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত	ঃ	*শব্দসঞ্চয়িতা: বাংলা অভিধান, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড, ১৯৯৫
দত্ত, রমেশ চন্দ্র (মূল) শিশিরকুমার মজুমদার অনূদিত	ঃ	*দি পিজ্যান্ট্রি অফ বেঙ্গল, দীপায়ন, কলকাতা, ১৩৯২

দাশ, বিনোদশঙ্কর ও প্রণব রায় : *মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৯

দাশগুপ্ত, ড. অশীন : *ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য ও রাজনীতি (১৫০০-১৮০০), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯

দাশগুপ্ত, হীরালাল : *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭

দে, ড. অমলেন্দু : *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ১৯৯১

দেশাই, ড. এ আর (মূল) মনস্বিতা সান্যাল অনূদিত : *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, কে পি বাগচী, ১৯৯২

নেহরু, পণ্ডিত জওহরলাল : *ভারত সন্ধানে, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯১

নোভাক, জেম্‌স জে : *বাংলাদেশ: জলে যার প্রতিবিম্ব, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৫

পুরকায়স্থ, বিজনবিহারী : *ত্রিপুরা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫

ফারুক, ড. আবদুল্লাহ : *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংগ্রহ, ১৯৮৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, ড অনিলচন্দ্র : *মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, কে পি বাগচী, ১৯৮৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর : *অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরভি : *গবেষণাঃ প্রকরণ ও পদ্ধতি, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৯৭

বসু, বিষ্ণু ও মিত্র সম্পাদিত : *ইংরেজ শাসনে বাজেয়াপ্ত বই, প্রথম খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোং, কলকাতা, ১৯৯৭

: *ইংরেজ শাসনে বাজেযাপ্ত বই, দ্বিতীয় খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোং, ১৯৯৮

বসু, ড সুগত, আন্দ্রেবেতেই ও বিনয়ভূষণ চৌধুরী : *বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন, প্রথম ভাগ, কে পি বাগচী, ১৯৯৫

বসু, স্বপন : *গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৭

(সম্পাদিত) : *সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০

ভট্টাচার্য, ড. কুমুদকুমার : *রাজা রামমোহন রায়: বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, বর্ণ পরিচয়, কলকাতা, ১৯৯২

: *শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক, বর্ণ পরিচয়, ১৯৮৫

ভট্টাচার্য, ড. সব্যসাচী (মূল) গীতা মুখোপাধ্যায় অনূদিত : *ব্রিটিশ রাজ্যের অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি, কে পি বাগচী, ১৯৭৯

ভদ্র, ড. গৌতম : *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, সুবর্ণরেখা, ১৩৯৮

মণ্ডল, শশাঙ্ক : *ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন, পুনশ্চ, কলকাতা, ১৯৯৫

মজুমদার, অরুণকুমার : *প্রাচীন জরীপের ইতিহাস, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৫

মজুমদার, ড. নেপাল : *চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারী: বাংলার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা, দে'জ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৯

মজুমদার, ড. রমেশচন্দ্র : *বাংলা দেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (আধুনিক যুগ), জেনারেল, কলকাতা, ১৯৯৬

: *বাংলা দেশের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড (মুক্তিসংগ্রাম), জেনারেল, কলকাতা, ২০০০

মনির, ড. শাহজাহান : *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

মল্লিক, ড. আজিজুর রহমান : *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬), বাংলা একাডেমী, ১৯৮২

মল্লিক, কুমুদনাথ : *নদীয়া-কাহিনী, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮

মল্লিক, সমর কুমার : *আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর (১৭০৭-১৮৫৭), ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯৭

মাইতি, বাসুদেব : *বর্গাচাষের ইতিবৃত্ত, বুক স্টোর, কলকাতা, ১৯৯২

মামুন, ড. মুনতাসীর : *ঢাকা: ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দলিলপত্র, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭

: *১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯

মুকুল, এম আর আখতার : *কোলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৭

: *পূর্ব পুরুষের সন্ধানে, অনন্যা, ২০০১

মুখোপাধ্যায়, জগমোহন : *গবেষণা পত্র অনুসন্ধান ও রচনা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২

মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু : *আদিগঙ্গা প্রত্ন-পরিক্রমা, ভস্তক, কলকাতা, ১৯৯৫

রাধাকমল, ড. মুখোপাধ্যায় : *বাঙলা ও বাঙালী, রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা, ১৩৪৭

মুখোপাধ্যায়, ড. সুবোধকুমার : *প্রাক-পলাশী বাংলা: সামাজিক ও আর্থিক জীবন (১৭০০-১৭৫৭), কে পি বাগচী, ১৯৮২

: *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), কে পি বাগচী, ১৯৮৫

: *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী), কে পি বাগচী, ১৯৮৭

: *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (বিংশ শতাব্দী), কে পি বাগচী, ১৯৯১

: *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন (১২০০-১৭৫০), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬

: *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৮

মোর্তজা, গোলাম আহমাদ : *চেপে রাখা ইতিহাস, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ১৯৯৮

যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ : *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, জেলা পরিষদ, কুমিল্লা, ১৯৮৪

রব্বানী, গোলাম	ঃ	*উপনিবেশপূর্ব বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১
রহমান, ড. আতিউর ও ড. লেনিন আজাদ	ঃ	*ভাষা আন্দোলনঃ অর্থনৈতিক পটভূমি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০
রহমান, ড. আতিউর ও ড. লেনিন আজাদ	ঃ	*ভাষা আন্দোলনঃ পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০
রহমান, আসহাবুর (সম্পাদিত)	ঃ	*বাংলাদেশে কৃষিপ্রশ্ন : তত্ত্ব ও বাস্তবতা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৭
রহমান, হাকীম হাবীবুর (মূল) ভাষান্তর মোঃ রেজাউল করিম	ঃ	*ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫
রসুল, মুহম্মদ আবদুল্লাহ	ঃ	*কৃষক সভার ইতিহাস, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৯০
রহিম, ড. এম এ (মূল), মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত	ঃ	*বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২
	ঃ	*বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), ঢাকা,
রহিম, ড. ও অন্যান্য	ঃ	*বাংলাদেশের ইতহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯২
রটরমন, ডাইটমার (মূল), অনুবাদ ড. সিরাজুল ইসলাম	ঃ	*এশীয় বাণিজ্য ও বেনেবাদ যুগে ইউরোপীয় সম্প্রসারণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১
রায়, ড. অনিরুদ্ধ	ঃ	*মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, কে পি বাগচী, ১৯৯৬
রায়, নিখিলনাথ	ঃ	*মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পুথিপত্র প্রকাশনী লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৬
রায়, ড. নিশীথরঞ্জন ও অশোক উপাধ্যায় (সম্পাদিত)	ঃ	*প্রাচীন কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৩৯০
রায়, যতীন্দ্রমোহন	ঃ	*ঢাকার ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ২০০০
রায়, ড. রজতকান্ত	ঃ	*পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪
রায়, সুপ্রকাশ	ঃ	*বিদ্রোহী ভারত, বুক ওয়ার্লড, কলকাতা, ১৯৯৯
	ঃ	*ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (উনবিংশ শতাব্দী), বুক ওয়ার্লড, ২০০০
	ঃ	*ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (১৯০১-১৯১৮), বুক ওয়ার্লড, ১৯৯৬
লাফর্গ, পল (মূল), অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষান্তরিত	ঃ	*সম্পত্তির বিবর্তন: বন্যযুগ থেকে সভ্যযুগ, দীপায়ন, ১৪০২
শরীফ, ড. আহমদ (আহমদ কবির ও আবুল হাসনাত সম্পাদিত)	ঃ	*আহমদ শরীফ রচনাবলী/১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০
	ঃ	*বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ১ম খণ্ড, বর্ণমিছিল,

ঢাকা, ১৯৭৮

: *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১

: *বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তনধারা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭

শফী, মুফতী মুহম্মদ (র.) (মূল) অনুবাদ কাবামত আলী নিযামী : *ইসলামে ভূমি-ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫

শাইখ, ড. আসকার ইবনে : *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৮

শাকুর, আবদুস : *বাংলাদেশের প্রজাই স্বত্বের ভিত্তি, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৭

সরকার, ড. গৌতমকুমার : *ভারতের কৃষি প্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯০

সরকার, ড. জগদীশ নারায়ণ : *মুঘল অর্থনীতি: সংগঠন এবং কার্যক্রম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১

সলীম, গোলাম হোসায়ন (মূল), আকবরউদ্দীন অনূদিত : *রিয়াজ-উস-সালাতীন (বাংলার ইতিহাস), বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪

সিদ্দিকী, ড. নোমান আহমদ (মূল), সনতকুমার বসু অনূদিত : *মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা (১৭০০-১৭৫০), পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪

সিংহ, ড. নির্মাল্য ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : *বাংলায় ভ্রমণ, ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৭

সুর, ড. অতুল : *আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, সাহিত্যলোক, ১৯৮৫

: *বাংলার সামাজিক ইতিহাস, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮

হক, ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল- : *বাংলার ইতিহাস : ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব (১৬৯৮-১৭১৪), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯

: *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

হক, ড. মোঃ নূরুল : *ভূমি আইন ও আলোচনা, আইন গ্রন্থ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

হক, মোজাম্মেল : *বৃটিশ-ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭), বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৭৬

হবিব (হাবিব), ড ইরফান (মূল), : *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭), কে পি বাগচী, ১৯৯০

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত (ভাষান্তর কাবেরী বসু) : *ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গ: মার্কসীয় চেতনার আলোকে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৯

হাশমী, তাজুল ইসলাম : *ঔপনিবেশিক বাঙলা, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮৫

হুদা, মোহাম্মদ শামসুল : *পলাশী-উত্তর বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আশরাফিয়া বইঘর, ঢাকা, ১৯৯১

হোসেন, ড. ইমরান : *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী: চিন্তা ও কর্ম (১৯০৫-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

হোসেন, মোঃ মোশারফ : *বাংলাদেশের নগর: উদ্ভব ও বিকাশ, প্রতীক, ঢাকা, ২০০১

ACTS, GAZETTEERS, REPORTS, JOURNALS, ETC.

*Census of India, 1891, Vol. III. (The Lower Provinces of Bengal and Their Feudatories) . C. J. O'Donnell

*Census of India, 1911, Report: Vol. V. Part II. (Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim) : L. S. S. O'Malley

*Report of Indian Constitutional Reforms

*Report on the Administration of Bengal, 1921-22 : Calcutta, 1923

*The Bengal Tenancy Act, 1885 . E. B. Govt Press, Dacca, 1954.

*Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire, Vol. I (Descriptive), : Oxford, 1907.

*Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire, Vol. II (Historical), : Oxford, 1908.

*Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire, Vol. III (Economic), : Oxford, 1907.

*Imperial Gazetteer of India: The Indian Empire, Vol. IV (Administrative), : Oxford, 1907.

*Imperial Gazetteer of India: Provincial Series, Bengal, Vol. I. · Calcutta, 1909.

*Imperial Gazetteer of India: Provincial Series, Bengal, Vol. II. : Calcutta, 1909.

*Imperial Gazetteer of India: Provincial Series, Eastern Bengal and Assam. : Usha, Delhi, 1989.

*Land Revenue Policy of the Indian Government : Calcutta, 1902.

*Bangladesh District Gazetteers: Khulna : K. G. M. Latiful Bari.

*Bangladesh District Gazetteers: Chittagong : S. N. H. Rizvi, 1975.

*The Bengal Waste Lands Manual, 1936 : Bengal Government Press, Calcutta, 1936.

*The Famine Enquiry Commission Final Report, 1945 : Usha, 1985.

*Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. I., 1940 : Sir Francis Floud

*Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. II., 1940 : Sir Francis Floud

*Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. III (Reply of the Various Landholders Associations)., 1940 : Sir Francis Floud

*Resolution of the Revenue Department, Calcutta, 1874

*The Bengal Sale Law Manual, 1940 : Board of Revenue, Government of Bengal, Alipore, 1940.

TEXT or ORIGINAL BOOKS

Afonso. John Correia, S. J. : *Indo-Portuguese History: Sources and Problems, Oxford University Press, Bombay, 1981.

Agarwal (Aggarwala), Dr. R. C. : *Constitutional History of India and National Movement, S. Chand & Co., 1969.

Ahmad, Kamruddin : *The Social History of East Pakistan, Dacca, 1967.

. *A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh, Inside Library, Dacca, 1975.

Ahmad, Mushtaque, (Rewritten & rendered) : *Glimpses of Cox's Bazar, Cox's Bazar Foundation, 1995.

Ahmed, Dr. Rafiuddin : *The Bengal Muslims: A Quest for Identity (1871-1906), Oxford University Press, Delhi, 1988.

Ahmed, Dr. A. F. Salahuddin : *Social Ideas and Social Change in Bengal (1818-1835), Rddhi, India, 1976.

*Bengali Nationalism and The Emergence of Bangladesh: An Introductory Outline, International

Centre for Bengal Studies, 2000.

Ahmed, Dr. Ali : *Role of Higher Civil Servants in Pakistan, NIPA, Dacca, 1968.

: *Basic Principles and Practices of Administrative Organization: Bangladesh, NILG, Dacca, 1981.

Ahmed, Dr. Sufia : *Muslim Community in Bengal (1884-1912), UPL, 1996, (1974).

Aich, Dr. Dipak Kumar : *Emergence of Modern Bengali Elite: A Study of Progress in Education (1854-1917), Minerva, India, 1995.

Akanda, Dr. Latifa : *Social History of Muslim Bengal, Islamic Cultural Centre, Dacca, 1981.

Akhtar, Dr. S. M. : *Economics of Pakistan, Vol. I, Publishers United Ltd., Lahore, 1963.

Akhtar, Dr. Shirin : *The Role of the Zamindars in Bengal (1707-1772), Asiatic Society of Bangladesh, 1982.

Ali, Dr. Muhammad Mohar : *History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, Ibn Saud Islamic University, Riyàd, 1985.

: *History of the Muslims of Bengal, Vol. IB, Ibn Saud Islamic University, Riyad, 1985.

: *The Fall of Sirajuddaulah, The Mehrub Publications, 1975.

Ali, Qazi (Quazi) Azher : *District Administration in Bangladesh, NIPA, 1978.

: *Decentralised Administration in Bangladesh, UPL, 1995.

Ali, Dr. Shaikh Maqsood, M. Safiur Rahman & K. hanada Mohan Das : *Decentralization and People's Participation in Bangladesh, NIPA, Dhaka, 1983.

Allen, B. C. : *Assam District Gazetteers, Vol. II (Sylhet), Caledonian Steam Printing Works, Calcutta, 1905.

Aziz, A. : *Discovery of Pakistan, Sh. Ghulam Ali & Sons, Lahore, 1964.

Aziz, Dr. K. K. : *Britain and Muslim India, Heine-Mann, 1963.

Badruddin, Dr. : *Land Revenue Law, Ashish Publishing House, 1991.

Bandyopadhyay, Dr. Sekhar : *Caste, Politics and The Raj (1872-1937), K P Bagchi, 1990.
Banerjee, Dr. Anil Chandra : *The Agrarian System of Bengal, Vol. II. (1582-1793), K. P. Bagchi & Company, Calcutta, 1980.
: *History of India, A Mukherjee & Co., Calcutta, 1974.
: *The Rajput States and British Paramountcy, Rajesh Publications, 1980.
Ed. (with Dr. D. K. Ghose) : *A Comprehensive History of India, Vol. Nine (1712-1772), People's Publishing House, 1978.
Banerjee, Dr. Tarasankar : *History of Internal Trade Barriers in British India, Vol. I (Bengal Presidency, 1765-1836), The Asiatic Society, Calcutta, 1972.
Basu, Mahadeb P. : *Anthropological Profile of the Muslims of Calcutta, Anthropological Survey of India, 1985.
Bayly, C. A. : *Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion (1770-1870), Oxford University Press, Delhi, 1998.
Beveridge, Henry (Jn) : *The District of Bakarganj: Its History and Statistics, Bakerganj District Council, Reprint, 1970.
Beveridge, Henry (Sr) : *A Comprehensive History of India, Vol. III., Low Price Publications, 1990.
Bhattacharyya, Dr. Dipankar : *Peasant Movements in Bengal and Bihar (1936-47), Rabindra Bharati University, 1992.
Bhattacharyya, Dr. Hara Sankar : *Zamindars and Patnidars, The University of Burdwan, 1985.
Bhattacharyya, Dr. Sachchidananda : *A Dictionary of Indian History, University of Calcutta, 1997.
Birt, F. B. Bradley : *The Romance of an Eastern Capital, Smith Elder & Co., London, 1906.
Biswas, Dr. Oneil : *History of India's Freedom Movement (1757-1947), Intellectual Publishing House, Delhi, 1990.
Bose, Dr. Nemai : *Indian Awakening and Bengal,

Sadhan		Firma KLM Pvt. Ltd., Calcutta, 1990.
Bose, Dr. Sugata	.	*Peasant Labour and Colonial Capital: Rural Bengal Since 1770, Cambridge University Press, Delhi, 1993.
(Ed)	:	*Credit, Markets, and the Agrarian Economy in Colonial India, Oxford University Press, Delhi, 1994.
Brown, F. Yeats	·	*Indian History – A Panoramic View, Discovery, Delhi, 1985.
Buckland, F. E.	:	*Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I., Calcutta, 1902.
	·	*Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. II., Calcutta, 1901.
Burke, S. M. and Salim Al-Din Quraisi	:	*The British Raj in India: An Historical Review, UPL, 1996.
Carey, W. H. (Ed) by Nisith Ranjan Ray	·	*The Good Old Days of Hon'ble John Company, Riddhi-India, 1980.
Chailley, M. Joseph (Or). Trans by W. S. Meyer from French	:	*Problems of British India, 1909.
Chand, Dr. Tara	·	*History of Freedom Movement in India, Vol. One, Publications Division, Ministry of I & B, Government of India, 1992.
		*History of Freedom Movement in India. Vol. Two, Do, 1992
Chanda, Asok	·	*Indian Administration, George Allen & Unwin Ltd., London, 1969.
Chandra, Dr. Bipan	·	*Modern India, N.C.O.E.R.A.T., 1985.
(with Dr Amalesh Tripathi & Dr Barun De)	:	*Freedom Struggle, National Book Trust, India, 1994.
Chatterjee, Dr. Anjali	:	*Bengal in the Reign of Aurangzib (1658-1707), Progressive Publishers, Calcutta, 1967.
Chatterjee, Dr. Indrani	·:	*Gender, Slavery and Law in Colonial India, Oxford University Press, Delhi, 1999.
Chatterjee, Sunjeeb Chunder	:	*Bengal Ryots: Their Rights and Liabilities, K. P. Bagchi, 1977.
Chatterji, Dr. NandaLal	:	*Mir Qasim: Nawab of Bengal (1760-1763), The Indian Press, 1935.

Chaudhuri, Dr. Muzaffar Ahmed	:	*Government and Politics in Pakistan. Puthighar Limited,
Chhabra, Dr. G. S.	:	*Advanced Study in the History of Modern India, Vol. I. (1707-1813), Sterling Publications Pvt. Ltd., 1984.
Chopra, Dr. P. N. (Ed)	:	*Role of Muslims in the Struggle of Freedom, Light & Life Publishers, Delhi, 1979.
(Ed)	:	*The Gazetteer of India: History and Culture, Vol. Two, Publications Department, Ministry of I & B, Government of India, 1997.
Chaudhuri, Dr. Nani Gopal	:	*Cartier: Governor of Bengal (1769-1772), Firma KLM, 1970.
Choudhury, Dr. Sadananda	:	*Economic History of Colonialism: A Study of British Salt Policy in Orissa, Inter-India Publications, Delhi, 1979.
Cooper, Dr. Adrienne	:	*Sharecropping and Sharecropers' Struggles in Bengal (1930-1950), K P Bagchi, 1988.
Cotton, Henry J. S.	:	*Memorandum on the Revenue History of Chittagong, Calcutta, 1880.
Creagh, General Sir O'moore	:	*Indian Studies, Hutchinson & Co., London.
Cunningham, H. S.	:	*British India and Its Rulers, Low Price Publications, 1995.
Dani, Dr. Ahmad Hasan	:	*Dacca: A Record of Its Changing Fortunes, Dacca, 1962.
Datta, Dr. Kalikinkar	:	*Alivardi Khan and His Times, The World Press Private Limited, 1963.
	:	*Shah Alam II and the East India Company, The World Press Pvt. Ltd., 1965.
Ed. (with Dr. V. A. Narain)	:	*A Comprehensive History of India, Vol. Eleven. (1818-1858), People's Publishing House, 1985.
Davies, A Mervin	:	*Life and Times of Warren Hastings: Maker of British India, Gian Publishing House, 1988.
De, Dr. Amalendu	:	*Roots of Separatism in Nineteenth Century Bengal, Ratna Prakashan, Calcutta, 1974.
Dodwell, H. H.	:	*The Cambridge History of India,

		Vol. V. (1497-1858), S. Chand & Co.
Dodwell & Dr. Vidya Dhar Mahajan	:	*The Cambridge History of India, Vol. VI. (1858-1918 & 1919-1969), S. Chand & Co.
Dutt, Romesh Chandra	:	*Famines and Assessments in India, BR Publishing Corporation, Delhi, 1985.
	:	*The Economic History of India (Two Vols), Low Price Publications, 1990.
Dutta, Dr. Abhijit	.	*Nineteenth Century Bengal Society and the Christian Missionaries, Minerva, India, 1992.
	.	*Muslim Society in Transition: TituMeer's Revolt (1831), Minerva, 1987
Eaton, Richard M.	:	*The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1204-1760), Oxford University Press, Delhi, 1997.
Edwardes, Michael		*A History of India: From the Earliest Times to the Present Day, Nel Mentor, London, 1967.
Firminger, The Ven Walter Kelly	·	*Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report, Today and Tomorrow's Printers & Publishers, Delhi, 1977.
Fisher, Michael H. (Ed)	.	*The Politics of the British Annexation of India (1757-1858), Oxford University Press, Delhi, 1996.
Frazer, R. W	·	*British India, T Fisher Unwin Ltd, London, 1917.
Gait, E. A	:	*A History of Assam, Government Printing Press, Calcutta, 1908.
Ghosh, Dr. B. B	:	*Indian Economics and Pakistani Economics, A. Mukherjee and Company Ltd., Calcutta, 1949.
Ghosh, Dr. Suresh Chandra	:	*The British in Bengal: A Study of the British Society and Life in the Late Eighteenth Century, Munshiram Manoharlal, 1998.
Gopal, Dr. Ram	:	*British Rule India: An Assessment, Asia Publishing House, 1963.
		*How the British Occupied Bengal: A Corrected Account of the 1756-1765

Events, Asia Publishing House, 1963.

Grover, Dr. B. L. : *A New Look on Modern Indian History, S. Chand & Co., 1981.

Guha, Dr. Ranajit : *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Oxford University Press, Delhi, 1999.

Gupta, Dr. Ashin Das : *Indian Merchants and the Decline of Surat (1700-1750), Manohar, 1994.

Gupta, Dr. Pratul Chandra : *Bazi Rao II and the East India Company (1796-1818), Allied Publishers Pvt. Ltd., 1964.

Gupta, Dr. Sulekh Chandra : *Agrarian Relations and Early British Rule in India, People's Publishing House, 1995.

Gupta, Dr. Ranjan Kumar . *The Economic Life a Bengal District – Birbhum (1770-1857), The University of Burdwan, 1984.

Habib, Dr. Irfan : *Essays in Indian History: Towards a Marxist Perception, Tulika, 1998.

Hamilton, Francis : *An Account of Assam, Department of Historical and Antiquarian Studies, Assam, Gauhati, 1963.

Hamilton, Walter : *East-India Gazetteer, Low Price Publications, 1993.

Hand, J. Reginald : *Early English Administration of Bihar (1781-1785), Calcutta, 1984.

Hanifi, Dr. Manzoor Ahmad : *Studies in Indo-Pakistan History, Majid Publishing House, Dacca, 1964.

Hardy, Dr. P. : *The Muslims of British India, Cambridge University Press, London, 1972.

Hawkins, R. E. : *Common Indian Words in English, Oxford University Press, Delhi, 1984.

Hennessy, H. E. : *Administrative History of British India, Neeraj Publishing House, 1983.

Hobson-Jobson : *A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases and .., Munshiram Manoharlal, 1994.

Hollingbury, R. H. : *Zemindari Settlement of Bengal, (Two Vols), Low Price Publications, 1995.

Hoque, Dr. M. Inamul : *Bengal Towards the Close of Aurangzib's Reign (1690-1707).

Islamic Foundation, 1994.

Hunter, Dr. W W. : *The Indian Musalmans, Indological Book House, Varanasi, 1969.

: *Annals of Rural Bengal, Vol. I., Cosmo Publications, 1975.

: *Bengal MS Records, Vol. I., W. H. Allen & Co., London, 1894.

: *A Brief History of the Indian Peoples, Oxford at the Clarendon Press, 1921.

: *A Statistical Account of Bengal, I to IX Vols.

Huq, Dr. Mazharul : *The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal (1698-1784), Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1964.

Husain, Dr. Shawkat Ara : *Politics and Society in Bengal (1921-1936): A Legislative Perspective, Bangla Academy, 1991.

Islam, Dr. Sirajul : *The Permanent Settlement in Bengal: A Study of Its Operation (1790-1819), Bangla Academy, 1979.

: *Bengal Land Tenure, K. P. Bagchi, 1988.

(Ed) : *History of Bangladesh (1704-1971), Vol. 2 (Economic History), Asiatic Society of Bangladesh, 1992.

(Ed) : *Bangladesh District Records: Dacca District, Vol I (1784-1787), University of Dacca, 1981.

(Ed) : *Bangladseh District Records: Chittagong, Vol. I (1760-1787), University of Dacca, 1978.

Islam, Dr. Reazul, Dr. M A Rahim & Dr. Abdul Hamid : *History of Muslims of Indo-Pakistan Sub-Continent,

Jung, Dr. Mahomed Ullah Ibn S. : *A Dissertation on the Administration of Justice of Muslim Law, Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1977.

Kabir, Dr. Lutful : *The Rights and Liabilities of the Raiyats under The Bengal Tenancy Act, 1885 & The State Acquisition and Tenancy Act, 1950, Law House

Publication, Dacca, 1972.

Kabir, Dr. Mafizullah : *A Short History of Pakistan: Books One to Four, Dr. Ishtiaq Hussain Qureshi, General Editor, University of Karachi, 1992.

Kapur, Dr. Anup Chand : *Constitutional History of India (1765-1970), Niraj Prakashan, New Delhi, 1970.

Karim, Dr. Abdul : *Murshid Quli Khan and His Times, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1963.

Karim, Dr. Khondkar Mahbubul : *The Provinces of Bengal and Bihar under Shahjahan, Asiatic Society of Bangladesh, Dacca, 1974.

Keith, Dr. Arthur Berriedale : *A Constitutional History of India (1600-1935), Methuen & Co. Ltd., London, 1937.

Khan, Dr. Akbar Ali : *Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal (1890-1914), Asiatic Society of Bangladesh, 1982.

Khan, Dr. Abdul Majed : *The Transition in Bengal: A Study of Saiyid Muhammad Reza Khan (1756-1775), Cambridge at the University Press, 1969.

Khan, G. R. & M. A. Jalil : *An Anatomy of Pak Economy, Majid Publishing House, Dacca, 1965.

Khan, Dr. Mohd. Ashiqullah : *History of British India: Administrative System, Shree Publishing House, 1988.

Khan, Dr. Mohammad Mohabbat : *Administrative Reforms in Bangladesh, UPL, 1998.

: *Bureaucratic Self-Preservation, University of Dacca, 1980.

Khan, Dr. Muin-ud-din Ahmad : *History of the Fara'idi Movement, Islamic Foundation, 1984.

: *The Great Revolt of 1857 in India and the Muslims of Bengal, Islamic Foundation, 1983.

: *Muslim Struggle for Freedom :From Plassey to Pakistan (1757-1947), Islamic Foundation, 1982.

*TituMir and His Followers in British Indian Records (1831-1833); Islamic

Foundation, 1980.

Khan, Sir Shafaat Ahmad . *The East India Trade in the 17th Century in Its Political and Economic Aspects, S. Chand & Co.

Khera, S. S. · *District Administration in India, Asia Publishing House, Bombay, 1964.

Kulke, Dr. Hermann (Ed) *The State in India (1000-1700), Oxford University Press, Delhi, 1997.

(with Dr. Rothermund) . *A History of India, Rupa & Co., 1990.

Kulshreshtra, Dr V. D · *Landmarks in Indian Legal and Constitutional History, Eastern Book Company, 1995.

Kumar, Dr Dharma · *The Cambridge Economic History of India, Vol. II (1757-1970), Orient Longman, 1991.

Kumar, Dr. Virendra : *India under Lord Hardinge, Rajesh Publications, 1978.

Lahiri, Dr Pradip Kumar : *Bengali Muslim Thought: Its Liberal and Rational Trends (1818-1947), K. P Bagchi & Co., 1991

Lyall, Sir Alfred, Introduced by Dr. B L Grover . *The Rise and Expansion of the British Dominion in India, Oriental Books Reprint Corporation, 1973.

Mahajan, Dr. Vidya Dhar *British Rule in India and After, S. Chand & Co., 1973.

Mahmood, Dr A. B. Muhiuddin : *The Revenue Administration of Northern Bengal (1765-1793), NIPA, Dacca, 1970.

Majumdar, Dr. Romesh Chandra, Dr. Hem Chandra RayChaudhuri & Dr. Kalikinkar Datta : *An Advanced History of India, MacMillan, 1999

Majumdar, Dr. Romesh Chandra (Ed) · *The History and Culture of the Indian People, Vol Eight (The Maratha Supremacy), Bharatiya Vidya Bhavan, 1991

: *The History and Culture of the Indian People, Vol Nine, Part I. (British Paramountcy and Indian Renaissance), Bharatiya Vidya Bhavan, 1988.

*The History and Culture of the

Indian People, Vol Nine, Part II. (British Paramountcy and Indian Renaissance), Bharatiya Vidya Bhavan, 1991.

Mallick, Dr. Azizur Rahman : *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856), Bangla Academy, 1977.

Malleson, Colonel G. B. : *Lord Clive and the Establishment of the English in India, S. Chand & Co., 1962.

Mandal, Dr. Tirtha : *The Women Revolutionaries of Bengal (1905-1939), Minerva, 1991.

Mannan, Mohammad Seraj : *The Muslim Political Parties in Bengal (1936-1947), Islamic Foundation, Bangladesh, 1987.

Mason, Philip . *The Men Who Ruled India, Rupa & Co., 2000.

McLane, Dr. John R. . *Land and Local Kingship in Eighteenth Century Bengal, Cambridge University Press, 1993.

Mill, James Stuart : *The History of British India, Vol. 1, Atlantic Publishers & Distributors, 1990.

: *The History of British India, Vol. 2, Atlantic Publishers & Distributors, 1990.

. *The History of British India, Vol. 3, Atlantic Publishers & Distributors, 1990.

Mills, Arthur : *India in 1858, Gian Publishing House, 1986.

Misra, Dr. B B. : *The Judicial Administration of the East India Company in Bengal (1765-1782), Motilal Banarsidass, 1961.

Mitra, Dr. Debendra Bijoy : *Monetary System in the Bengal Presidency (1757-1835), K P Bagchi, 1991.

Mohshin, Dr. Khan Mohammad : *A Bengal District in Transition: Murshidabad (1765-1793), Asiatic Society of Bangladesh, 1973.

Molla, Dr. M. K. U. : *The New Province of Eastern Bengal and Assam (1905-1911), The Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi

University, 1981.

Momin, Dr. M. A. : *Rural Poverty and Agrarian Structure in Bangladesh, Vicas Publishing House, 1992.

Mookerjee, Dr. Radha Romon : *History and Incidents of Occupancy Right, Neeraj Publishing House, 1987.

Muhith, A. M. A. *The Deputy Commissioner in East Pakistan, NIPA, Dacca, 1968.

Mukhopadyay, Dr. Subhas Chandra *The Agrarian Policy of the British in Bengal, Chugh Publications, Allahabad, 1984.

. *British Residents at the Darbar of Bengal Nawabs at Murshidabad (1757-1772), Gian Publishing House, Delhi.

: *The Career of Rajah DurlabhRam Mahindra: Diwan of Bengal (1710-1770), Manisha Prakashan, 1974.

. *Career of Nawab Najm-ud-Daulah. Diwani in Bengal (1765), Vishwavidyalaya Prakashan, 1980.

Nakazato, Dr Nariaki · *Agrarian System in Eastern Bengal (C. 1870-1910), K P Bagchi, 1994.

Narain, Dr Brij *Indian Economic Life· Past and Present, Low Price Publications, 1996

Novak, James J : *Bangladesh: Reflections in the Water UPL, 1994

Palit, Dr. Chittabrata · *Tensions in Bengal Rural Society: Landlords, Planters and Colonial Rule (1830-1860), Orient Longman, 1998.

Panda, Dr Chitta : *The Decline of the Bengal Zamindars: Midnapore (1870-1920). Oxford University Press, Delhi, 1996.

Panikkar, Dr. Kevalam Madhava : *A Survey of Indian History, Asia Publishing House, 1971.

Pargiter, Frederick Eden : *A Revenue History of the Sundarbans: From 1765 to 1870, Calcutta, 1885.

Patra, Dr. Atul Chandra : *The Administration of Justice under the East-India Company in Bengal, Bihar and Orissa, Asia Publishing House, 1962.

Philips, C. H. *The Evolution of India and Pakistan:

		Select Documents (1858-1947), The English Language Book Society, Oxford, 1965.
Pirzada, Syed Sharifuddin	:	*Foundations of Pakistan: All India Muslim League Documents (1906-1947), Vol I (1906-1924), National Publishing House, Limited, Dacca.
Polier, Antonie Louis Henri	:	*Shah Alam II and His Court, The Asiatic Society, Calcutta, 1989.
Powell, B. H. Baden	:	*The Land Syatems of British India, Vol. I., Oxford at the Clarendon Press, 1892, 1990 (Low Price Pub.).
Prem, Daulat Ram	:	*Judicial Dictionary, Vol. I., Bharat Law Publications, Jaipur, 1993.
	:	*Judicial Dictionary, Vol. II., Bharat Law Publications, Jaipur, 1993.
Qanungo, Dr. Suniti Bhushan	:	*A History of Chittagong: From Ancient Times down to 1961, Vol. I., Signet Library, 1988.
Qureshi, Dr. Ishtiaq Hussain	:	*The Struggle for Pakistan, University of Karachi, 1969.
(with Others)	:	*A Short History of Hind-Pakistan, Pakistan History Board, Karachi, 1963.
Rahim, Dr Enayetur	:	*Provincial Autonomy in Bengal (1937-1943), The Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1981.
Rahim, Dr. Muhammad Abdur	:	*The Muslim Society and Politics in Bengal (1757-1947), The University of Dacca, 1978.
Rawlinson, H. G.	.	*A Concise History of the Indian People, Low Price Publications, 1994.
Raychaudhuri, Dr. Tapan (with Dr. Irfan Habib) Ed.	:	*The Cambridge Economic History of India, Vol. I (1200-1750), Orient Longman, 1993.
Ray, Dr. Ratnalekha	:	*Change in Bengal Agrarian Society, Manohar, 1979.
Richards, John F. (Ed)	:	*The Imperial Monetary System of Mughal India, Oxford University Press, Delhi, 2000.
Rogaly, Ben, Barbara Harriss-White & Sugata		*Sonar Bangla? Agricultural Growth and Agrarian Change in West Bengal

Bose (Joint-Ed) and Bangladesh, UPL, 1999.

Rogers, Alexander : *The Land Revenue of Bombay, Vol. I., Low Price Publications, 1993

: *The Land Revenue of Bombay, Vol. II., Low Price Publications, 1993.

Rosselli, John : *Lord William Bentinck: The Making of a Liberal Imperialist (1774-1839), Thomson Press (India) Limited, 1974.

Roy, Dr. Ranjit Kumar (Ed) : *The Imperial Embrace: Society and Polity under the Raj, Engage Publishers, Calcutta, 1993.

Roy, Dr. S. C. : *Land Revenue Administration in India, Reliance Publishing House, 1988.

Sarkar, Dr. Bikram : *Land Reforms in India, Ashish Publishing House, Delhi, 1989.

Sarkar, Dr. Chandiprasad : *The Bengali Muslims. A Study in Their Politicization (1912-1929), K P Bagchi & Co., 1991.

Sarkar, Dr. Sumit : *Modern India (1885-1947), Macmillan, 1999.

Scrafton, Luke : *A History of Bengal: Before and After the Plassey (1739-1758), Editions Indian, Calcutta, 1975

Sen, Dr. Ranjit : *Metamorphosis of the Bengal Polity (1700-1793), Rabindra Bharati University, 1987.

Sen, Dr. S. P. : *The French in India (1763-1816), Munshiram Manoharlal, 1971.

Sen, Dr. Shila : *Muslim Politics in Bengal (1937-1947), Impex India, New Delhi.

Sewell, Robert : *Analytical History of India: From the Earliest Times to the Abolition of the Honourable East India Company in 1858, Atlantic Publishers & Distributors, Delhi, 1991.

Shah, Dr. Mohammad : *In Search of an Identity: Bengali Muslims (1880-1940), K P Bagchi & Co., 1996.

Sharma, Dr. D. P. & Dr. V. V. Desai : *Rural Economy of India, Vicas Publications, 1980.

Sharma, Dr. Ram Sharan (Ed) : *Land Revenue in India: Historical Studies, Motilal Banarsidass, 1971

Sharma, Dr. Ram Suresh	*Bengal under John Peter Grant, Capital Publishing House, 1989.
Singh, Dr. Meera	*Medieval History of India, Vicas Publishing House, 1992.
Singh, Dr. Rajendra	*Land, Power and People: Rural Elite in Transition (1801-1970), Sage Publications, 1988.
Singh, Dr. V. B. (Ed)	*Economic History of India (1857-1956), Allied Publishers Ltd., 1987.
Sinha, Dr. Narendra Krishna (Ed)	*The History of Bengal (1757-1905), University of Calcutta, 1996.
(with Dr. Nisith Ranjan Ray)	*A History of India, Orient Longman, 1993.
(with Dr. Anil Chandra Banerjee)	*History of India, A Mukherjee & Co., 1958.
Smith, Dr. Vincent Arthur	*The Oxford History of India, Oxford at the Clarendon Press, 1967.
Sobhan, Dr. Rehman	*Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development, UPL, 1993.
Spear, Dr. Percival	*The Oxford History of Modern India (1740-1975), Oxford University Press, Delhi, 1994.
	*A History of India, Vol. II., Penguin Books, 1965.
	*The Nabobs: A Study of the Social Life of the English in Eighteenth Century India, Oxford University Press, Delhi, 1998.
	*A History of Delhi under the Later Mughuls, Low Price Publications, 1990.
Stein, Burton (Ed)	*The Making of Agrarian Policy in British India (1770-1900), Oxford University Press, Delhi, 1992.
Sutherland, J. (Introduced by Dr. Ramesh Chandra Gupta)	*Sketches of the Relations Subsisting Between British Government in India and Different Native States. Publications Scheme, Jaipur, 1988.
Sykes, Ethel R	*Readings from Indian History, Part II., C. L. S. I., London.
Taylor. Meadows	*A Student's Manual of the History of India, Asian Educational Services,

1986.

Tomlinson, B. R : *The Economy of Modern India (1860-1970), Cambridge University Press, Delhi, 1998.

Tripathi, Dr. Amalesh : *Trade and Finance in the Bengal Presidency (1793-1833), Oxford University Press, Calcutta, 1979.

Ulyanovsky, Rostislav : *Agrarian India between the World Wars, Progress Publishers, Moscow, 1985

Wallbank, T Walter : *A Short History of India and Pakistan. From Ancient Times to the Present, A Mentor Book.

Williams, Sir Monier-Monier : *Modern India and The Indians: Being a Series of Impressions, Notes, and Essays, Poonam Publications, Delhi, 1987.

Wilson, C. R. : *The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I., The Asiatic Society, Calcutta, 1996.

Wolpert, Stanley : *India, Prentice-Hall, Inc. New Jersey, 1965.

* তারকাচিহ্নিত গ্রন্থাদি ও পত্রপত্রিকা লেখকের ব্যক্তিগত পাঠাগারে সংগৃহীত